ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়-১: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

প্রশ্ন ▶১ সুলতান সুলেমান বারবার অন্য একটি দেশে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অবশেষে দেশে ফিরে আসেন। অভিযানে তিনি যে ধন-সম্পদ অর্জন করেন তা শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর রাজ্যকে একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। *[ঢা. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭]*

ক. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উক্ত শাসক শুধু সেনানায়কই ছিলেন না, একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন'— এ কথাটি ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১১৯২ সালে সংঘটিত হয়।

খ প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্বামীর শবদেহের সাথে জীবিত বিধবা স্ত্রীকে একই চিতায় দাহ করার রীতিই সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত।
মৃত স্বামীর প্রতি বিধবা স্ত্রীর চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শনের একটি আচার হিসেবে প্রাচীন সমাজে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সতীদাহ প্রথা মেনে চলত। তখন স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত। কিন্তু কালক্রমে এটি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতায় রূপ নেয়। এক সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজপতিরা বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে সহমরণ বরণ করে নিতে বাধ্য করে। তারা জোর করে অনেক বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারতে শুরু করে। হিন্দু সমাজের এ জঘন্য ও নিষ্ঠুর রীতিই সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পঠিত শাসক সুলতান মাহমুদের মিল রয়েছে।
যেকোনো দেশ, রাজ্য বা অঞ্চলকে সমৃদ্ধিশালী ও সুসজ্জিত করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— এই অর্থের প্রয়োজনে অনেক শাসক বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়েছেন। উদ্দীপকের সুলতান সুলেমান এবং ইতিহাসখ্যাত সুলতান মাহমুদ উভয়ের মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত সুলতান সুলেমান নিজ রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য বিভিন্ন দেশে অভিযান প্রেরণ করেন। সেসব অভিযান থেকে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ কাজে লাগিয়ে তিনি তার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তাছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও দেশের উন্নয়নে তিনি ধন-সম্পদ ব্যয় করেন। বিখ্যাত সমরনেতা সুলতান মাহমুদও ধন-ঐশ্বর্যে ভরপুর ভারতবর্ষে বারবার আক্রমণ করে সুলতান সুলেমানের মতোই প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেছিলেন। তার উদ্দেশ্যও ছিল নিজের রাজ্যের উন্নয়ন ঘটানো। তাই তিনি ভারতবর্ষকে তার প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার মনে করে সেখানে ১৭ বার (১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে) অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রতিবারই জয়লাভ করে প্রচুর সম্পদ হস্তগত করেন। তিনি আহরিত অর্থ-সম্পদ কাজে লাগিয়ে গজনি রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি সুলতান সুলেমানের মতোই উদার ও আন্তরিক ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের সুলতান সুলেমান ও গজনির শাসক সুলতান মাহমুদের মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উক্ত শাসক তথা সুলতান মাহমুদ শুধু সেনানায়কই ছিলেন না, একটি রাজ্যের একজন প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।
বিখ্যাত সমরনেতা সুলতান মাহমুদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শত্রুপক্ষের অধীন সকল রাজ্য জয় করে তাদের ক্ষমতার চূড়ান্ত বিলোপ সাধনই ছিল সুলতান মাহমুদের লক্ষ্য এবং তিনি তা অর্জনে সক্ষম হন। পাঞ্জাবে তার শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র গজনি রাজ্যকে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।
ভারতীয় ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সুলতান মাহমুদ ছিলেন বড় মাপের নৃপতি।" একটি পার্বত্য ক্ষুদ্র রাজ্যকে শুধু বাহুবলে বিশাল ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তার পূর্বে এশিয়ার অন্য কোনো আরব বা তুর্কি শাসক হিরাত, কাবুল ও গজনির বাইরে অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তা বাগদাদের সমসাময়িক আব্বাসীয় খলিফার সাম্রাজ্য অপেক্ষা বিশাল ছিল বলে মনে করা হয়। মুসলিম শাসকদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে তিনিই প্রথম ভারতে অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম রাজবংশ প্রতিষ্ঠায় কৃতিত্বের অধিকারী না হলেও তারই দেখানো পথে মুহাম্মদ ঘুরী এদেশে এসে মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।
পরিশেষে বলা যায়, শুধু কৃতী সেনানায়ক নয়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও সুলতান মাহমুদ খ্যাতি অর্জন করেন। অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা বলেই তিনি ক্ষুদ্র গজনিকে বিশাল সাম্রাজ্যে রূপায়িত করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶২ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

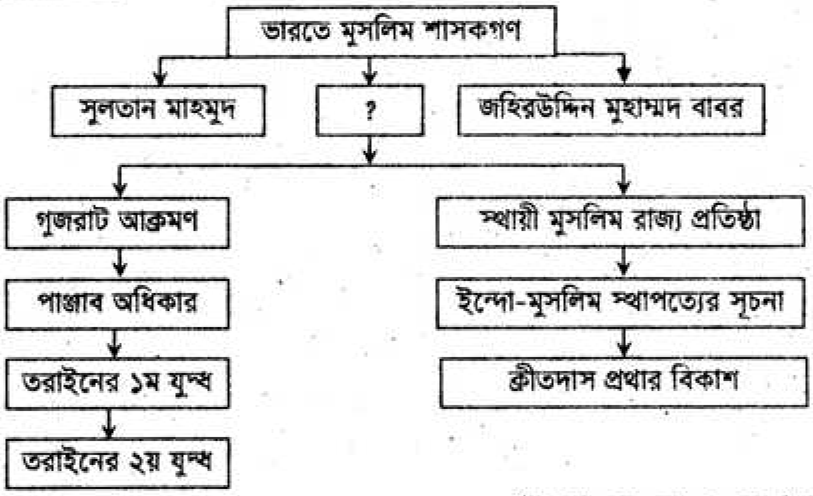

[ঢা. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭]

ক. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধু ও মুলতানের রাজা কে ছিলেন? ১
খ. আরবদের সিন্ধু অভিযানের পূর্বে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '?' স্থান কোন মুসলিম শাসককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাসকের অবদান রয়েছে— পাঠ্যবইয়ের আলোকে এ কথাটির ব্যাখ্যা করো। ৪

teachingbd24.com

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধু ও মুলতানের রাজা ছিলেন দাহির।

খ আরবদের সিন্ধু অভিযানের পূর্বে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা শোচনীয় ছিল।

প্রাক-মুসলিম ভারতীয় সমাজে সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। তাছাড়া বিধবা বিবাহ প্রথার বিলোপ ঘটেছিল। তাই নারীরা সমাজে অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। তারা সব ধরনের অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে এ চিত্র নিম্ন শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যেত। অভিজাত পরিবারের নারীরা শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেত।

গ প্রদত্ত ছকে '?' চিহ্নিত স্থানটি মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীকে নির্দেশ করে।

ঘুর রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দিন হুসেনের মৃত্যুর পর মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম বা মুহাম্মদ ঘুরীকে গজনির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঘুর রাজ্যের অধিপতিরূপে ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান ও উচ জয় করেন। ১১৭৯ এবং ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন। মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করেন। গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় ভীমের নিকট তিনি পরাজিত হন। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে পৃথ্বিরাজের (চৌহান রাজা) সাথে মুহাম্মদ ঘুরী তরাইন প্রান্তরে প্রথম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। তবে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় তরাইন প্রান্তরে পৃথ্বিরাজের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন এবং পৃথ্বিরাজ যুদ্ধে নিহত হন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের ফলেই ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তিনিই ভারতে প্রথম মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা করেন। তার সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের সময়ে নির্মিত দিল্লির 'কুয়াতুল ইসলাম' ও আজমিরের 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া' মসজিদ দুটি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির অভিনব সৃষ্টি। ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ও বিকাশ সাধন ভারতবর্ষে ঘুরীর রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অভিনব মাত্রা সংযোজন করেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসংখ্য প্রশিক্ষিত মেধাবী ক্রীতদাস (কুতুবউদ্দিন আইবেক, বখতিয়ার খলজি প্রমুখ) রেখে গিয়েছিলেন যারা তার সাম্রাজ্যকে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে।

উল্লিখিত তথ্যগুলোই উদ্দীপকে ছক আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকটির '?' চিহ্নিত অংশে মুহাম্মদ ঘুরীর নামটিই বসবে।

ঘ ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘুরী কেবল বিজেতা হিসেবেই নয়, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও অমর হয়ে আছেন।

মুহাম্মদ ঘুরী নিজ দক্ষতায় গজনি সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর ঘুর সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। অদম্য সাহস, অসীম ধৈর্য এবং অভিনব ও উন্নত যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে তিনি আফগানিস্তান থেকে বাংলা পর্যন্ত একটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ও রাজ্যবিস্তার তার পূর্ব পরিকল্পনাপ্রসূত ছিল। কারণ তিনি স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ভারতমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন।

বস্তুত ঘুরীর ভারত অভিযানের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে ভারতে মুসলিম রাজ্য বিজয় এবং রাজত্বকালের সূচনা হয়। ঘুরীর আক্রমণের ফলেই উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে বিজিত অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করে তিনি এ সব অঞ্চলে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করেন। কুতুবউদ্দিন ভারতে যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন, তা প্রায় ৭০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাই ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ঘুরীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাকেই ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ ঘুরী ভারতীয় হিন্দু রাজাগণকে পরাভূত করে ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩ অজয়নগর ও বিজয়নগর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গ্রাম। শাহাদত সাহেব অজয়নগর গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি, অন্যদিকে আমিন সাহেব বিজয়নগরের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। দুইজনেরই শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী আছে, যারা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে শাহাদত সাহেবের এলাকা থেকে আমিন সাহেবের লোকজন শস্য ও গবাদি পশু জোর করে নিয়ে যায়। শাহাদত সাহেব আমিন সাহেবের কাছে এর বিচার চান। আমিন সাহেব তাতে কর্ণপাত করেননি। এতে শাহাদত সাহেব রাগান্বিত হয়ে আমিন সাহেবের এলাকায় হামলা চালান। আমিন সাহেব তা প্রতিহত করতে গিয়ে পরাজিত হন এবং তিনি নিজেও প্রাণ হারান। *[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭; আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. দেবল বন্দর কোথায় অবস্থিত? ১

খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শস্য ও গবাদি পশু জোর করে নিয়ে যাওয়ার সাথে সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত ঘটনাটি সিন্ধু বিজয়ের একমাত্র কারণ নয়।'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেবল বন্দর সিন্ধুতে (বর্তমান পাকিস্তানে) অবস্থিত।

খ নানা রকম ঘৃণ্যপ্রথা ও কুসংস্কার বিদ্যমান থাকায় আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না।

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতে হিন্দুধর্মের প্রবল প্রাধান্য ছিল। হিন্দুদের মধ্যে সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। এ সময় হিন্দু সমাজ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণরা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আর শূদ্ররা ছিল সর্বনিম্ন পর্যায়ে। এ জাতিভেদ প্রথা সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি করে। এ কারণে সমাজে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নানাভাবে অবহেলিত হতো। তাছাড়া সে সময় বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, নরবলি, গঙ্গায় শিশু-সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কু-প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ও চলত। সব মিলিয়ে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বিশৃঙ্খল ও শোচনীয় ছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত শস্য ও গবাদি পশু জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার সাথে সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপঢৌকনপূর্ণ আটটি আরব জাহাজ দেবলস্থ জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনই ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। উদ্দীপকেও এ কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, শাহাদত সাহেবের এলাকা থেকে আমিন সাহেবের লোকজন শস্য ও গবাদি পশু জোর করে নিয়ে যায়। শাহাদত সাহেব আমিন সাহেবের কাছে এর বিচার চেয়েও কোনো প্রতিকার না পেয়ে রাগান্বিত হয়ে আমিন সাহেবের এলাকায় আক্রমণ চালান। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশকিছু আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মূল্যবান উপঢৌকন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌঁছায় তখন জলদস্যুরা এগুলো লুণ্ঠন করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন। তিনি ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান চালান এবং রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকের ন্যায় সিন্ধু বিজয়ের ক্ষেত্রে জাহাজ লুণ্ঠনের ঘটনাটি একমাত্র কারণ ছিল না। এর পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল।

উদ্দীপকে মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের শুধু প্রত্যক্ষ কারণটিই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সিন্ধু বিজয়ের পেছনে এটি ছাড়াও আরো অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল।

https://teachingbd24.com

অষ্টম শতকের সূচনাতে মেকরান এবং বেলুচিস্তান আরবদের হস্তগত হওয়ায় তারা সিন্ধুর সন্নিকটে এসে পড়ে। ভারতীয় হিন্দু রাজাদের বৈরী মনোভাব ও সামরিক উস্কানির পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারণ ব্যতীত খিলাফতের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় মুসলমানগণ বাধ্য হয়ে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সর্বোপরি আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে আরবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়। তাছাড়া জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও ভারতবর্ষ আক্রমণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আরব খলিফার নিকট প্রেরিত উপঢৌকন ও আরব বণিকদের বাণিজ্যিক আটটি জাহাজ দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ দাহিরের কাছে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ ও জলদস্যুদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু রাজা দাহির উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের এই ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন ছিল আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। তবে সিন্ধু বিজয়ের পেছনে এর বাইরেও বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪ অটোমান সুলতান অরখান জেনিসারি বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এসব রাজ্য থেকে অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে তিনি নিজ এলাকার উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি একটি দ্বীপের সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত উপাসনালয়ের মূল্যবান অর্থ-সম্পদের সন্ধান পেয়ে সেটি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও উপাসনালয়টিকে লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। *[সকল বো. '১৬]*

ক. সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন? ১
খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয়টি আক্রমণের সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অরখানের জেনিসারি বাহিনীর মতো সুলতান মাহমুদও একই উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ করেন— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ গজনির (বর্তমান আফগানিস্তান) শাসনকর্তা ছিলেন।

খ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী (ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকারী) ও তার বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে এবং পৃথ্বিরাজ (দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত এবং চৌহান বংশের রাজা) ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। ফলে ভারতীয় রাজ্যগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয় আক্রমণের সাথে সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির (গুজরাটের চালুক্য রাজ্যের কাথিওয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত) অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুলতান মাহমুদ (আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি রাজ্যের শাসনকর্তা) ছিলেন সাহসী ও সমরপ্রিয় বীর। ১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার এ অভিযানের কারণ হিসেবে সম্পদের প্রতি মোহকে দায়ী করেন। সুলতান মাহমুদের ষোলোতম অভিযান তথা সোমনাথ মন্দির আক্রমণ এবং সেখান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। আর উদ্দীপকেও এরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জেনিসারি বাহিনী একটি মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। মন্দিরটি মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সোমনাথ মন্দিরও ছিল উদ্দীপকের মন্দিরের ন্যায়। এ মন্দিরটি ছিল প্রচুর ধনরত্ন আর মূর্তি-বিগ্রহাদিতে পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, এ মন্দির বিজয় সুলতান মাহমুদের সাধ্যের বাইরে ছিল বলে পুরোহিতরা মনে করতেন। কিন্তু ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দিরে অভিযান পরিচালনা করেন। মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার আক্রমণ থেকে সোমনাথ মন্দিরকে রক্ষা করতে পারেননি। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দু'কোটিরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহাদি এবং ২শ মণ অলংকার ও মণিমুক্তা নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। একইভাবে অটোমান সুলতান অরখান ও তার বাহিনী একটি দ্বীপের সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত উপাসনালয়টি আক্রমণ করে। স্থানীয় অধিবাসীদের বাধা উপেক্ষা করে তারা উপাসনালয়টি লুণ্ঠন করে মূল্যবান অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং দেখা দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লেখিত উপাসনালয় আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঘটনায় সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ অরখানের জেনিসারি বাহিনীর মতো সুলতান মাহমুদও একই উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ করেন— উক্তিটি যথার্থ।

সুলতান মাহমুদ একজন উচ্চাভিলাষী এবং অর্থলোভী সমরনায়ক ছিলেন। রাজ্যাভিযানে তিনি আনন্দ পেলেও তার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। নিজ সাম্রাজ্য গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও অনিন্দ্যসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার প্রচুর সম্পদের দরকার ছিল। আর ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কল্পতরু মনে করে এখানে বার বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ হস্তগত করে গজনির শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যয় করেন। অটোমান সুলতান অরখানের অভিযানের পেছনেও এ ধরনের উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অটোমান সুলতান অরখানের গঠিত জেনিসারি বাহিনী বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করে। সুলতান এ সম্পদ ব্যয় করে অটোমান সাম্রাজ্যের উন্নয়নে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ নিজ এলাকার উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহই ছিল জেনিসারি বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য। গজনি রাজ্যকে সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিতকরণ, নিজ সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধন, বিরাট সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি কারণে সুলতান মাহমুদ ভারতে বার বার অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযানে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ তিনি সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয় যে, অরখানের জেনিসারি বাহিনীর সম্পদ লুণ্ঠন এবং সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা উভয়ই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৫ যমুনার একপাশে টাঙ্গাইল ও অন্যপাশে সিরাজগঞ্জ জেলা অবস্থিত। একদিন সিরাজগঞ্জের এক জেলে নদীতে নৌকা দিয়ে মাছ ধরছিল। এমন সময় এলেঙ্গাচরের কিছু লোক এসে নৌকাসহ মাছ লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি এলেঙ্গাচরের উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ এবং ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি জানান। তিনি ক্ষতিপূরণ ও ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি অস্বীকার করেন। ফলে সিরাজগঞ্জ এলাকার লোকজন এলেঙ্গাচরবাসীর ওপর হামলা চালায়। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কে? ১
খ. বর্ণপ্রথা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ভারতের কোন অভিযানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অভিযানের ফলাফল আলোচনা কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা।

খ হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথা বলতে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণিকে বোঝায়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ধর্মকর্ম, যাগযজ্ঞ এবং অন্যান্য সকল কাজে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তারাই আইন-কানুন প্রণয়ন করত এবং শাসনদণ্ডও ছিল তাদের হাতে। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল অধঃপতিত ও অসহায়। বেদবাক্য শুনলে কিংবা বেদ গীতা পাঠ করলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। আর এই চার শ্রেণির বাইরের লোকদের অপবিত্র মনে করা হতো। হিন্দু সমাজের এ বিভক্তিই বর্ণভেদ প্রথা নামে পরিচিত।

teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত লুণ্ঠনের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের মিল রয়েছে।
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপঢৌকনপূর্ণ আটটি আরব জাহাজ দেবলস্থ জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনই ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সিরাজগঞ্জে এক জেলে নদীতে নৌকা দিয়ে মাছ ধরছিল। এমন সময় এলেঙ্গাচরের কিছু লোক এসে নৌকাসহ মাছ লুট করে নিয়ে যায়। বিষয়টি জেনে সিরাজগঞ্জের উপজেলা চেয়ারম্যান এলেঙ্গাচরের উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ এবং ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি জানান; কিন্তু তিনি ক্ষতিপূরণ ও ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি অস্বীকার করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। একই ঘটনা আরবদের সিন্ধু অভিযানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু রাজা দাহির তার এলাকায় জলদস্যু কর্তৃক মুসলমানদের জাহাজ লুণ্ঠন ও এর ক্ষতিপূরণের দাবিকে অগ্রাহ্য করলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে আরবদের সিন্ধু অভিযানের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত অভিযান বলতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানকে বোঝানো হয়েছে। আর এ অভিযানের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।
আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আরবীয়রা ১৫০ বছর সিন্ধুতে শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় অবস্থানের পরেও সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব সামান্য হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।
ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি নিষ্ফল বিজয় হলেও এ বিজয়ের সূত্র ধরে ভবিষ্যতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর অমুসলিমরা ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এ বিজয়ের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আরবদের অনেক পরিবর্তন আসে। আরবগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে আর্য ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। এ বিজয়ের ফলে আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানদের সাথে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।
পরিশেষে বলা যায় যে সিন্ধু বিজয় আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬ ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব শুরু হবার প্রাক্কালে সমগ্র ইউরোপে সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক দুর্বিষহ সঙ্কট বিরাজ করছিল। অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অনাচারে লিপ্ত ছিল। জনসাধারণের মঙ্গলার্থে উদারনীতির পরিবর্তে সামাজিক অসাম্য বৈষম্যই প্রাধান্য পায়। ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় কতিপয় রাজন্যবর্গের ওপর। ফলে একটি গোষ্ঠী সর্বদাই আমলাদের দ্বারা নিষ্পেষিত হতো। *[শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*

ক. 'ভরত' কে? ১
খ. সিন্ধুতে আরবদের সাফল্য সম্পর্কে কী জান? ২
গ. উদ্দীপকে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তার সাথে তোমার পাঠ্যবই এর মিল লক্ষ করা যায়— সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের এ রকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও একটি দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন থেমে থাকে না? এর সাথে কি তোমার পঠিত অংশের কোন মিল পাওয়া যায়? তোমার বক্তব্য লেখ। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভরত একজন হিন্দু রাজা।

খ আরবদের সিন্ধু অভিযান মুসলিম ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুতে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আরবদের এ সাফল্য রাজনৈতিকভাবে ফলাফল শূন্য হলেও সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে ফলপ্রসু ছিল।

গ উদ্দীপকে আরবদের ভারতবর্ষে আগমনের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অবস্থার একটি সার্বিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়।
প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন ঐক্য ছিল না তেমনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সামাজিক ব্যবস্থায়ও নানা কুসংস্কারের নিমজ্জিত ছিল সমাজ, যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে দ্রষ্টব্য ফরাসি বিপ্লব শুরু হবার প্রাক্কালে ইউরোপে সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক দুর্বিষহ সঙ্কট বিরাজমান ছিল। প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল এবং ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের হাতে। যা প্রাক-ইসলামি যুগে ভারতের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। আরবদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। সমাজে হিন্দু সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। জনগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। পাশাপাশি সমাজে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধকরণের মত সামাজিক সংস্কার প্রচলিত ছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ সময় রাজতন্ত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়, রাজা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গ্রামের শাসক পরিচালিত হত পঞ্চায়েত দ্বারা। প্রাচীনকালে বাংলার অর্থনীতি ছিল সমৃদ্ধ তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে অনেক তফাৎ ছিল। উদ্দীপকে বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের অবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের এ রকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও একটি দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন থেমে থাকে না। সংস্কৃতি তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়।
মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সর্বক্ষেত্রে অসাম্যতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ের সমাজ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যেমনটি উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে জনসাধারণের মঙ্গলার্থে উদারনীতির পরিবর্তে সামাজিক অসাম্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের ওপর। যেমনটি আমরা আরবদের বিজয়ের প্রাক্কলে ভারতের অবস্থায়ও দেখতে পাই। এ সময় ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কতিপয় বৈষম্য ও কুসংস্কার পরিলক্ষিত হলেও সংস্কৃতির চর্চা থেমে থাকেনি। প্রাক-মুসলিম এ সময়েও ভারতবর্ষে শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি সভ্যতার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার বিস্তার ঘটে। টোল, মঠ, পাঠশালা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ভারতে বল্লভী ও বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, ভদন্দীপুর, বিক্রমশীলা, এগুলোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষে হিন্দু কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গদ্য, সাহিত্যে ও বিকাশ লাভ করে। ভগবতি, বাহমান, জয়বেদ, রাজশেখর শ্রীহর্ষ, কালিদাস ছিল বিখ্যাত কবি। গণিত বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্রের পাশাপাশি তারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। কৈলাশ মন্দির, কোনারকের মন্দির, ইলোরা, অজন্তা প্রভৃতির চিত্র স্থাপত্যকীর্তি ভারতীয়দের উচ্চমানের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে।
সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংস্কৃতি অত্যন্ত ব্যাপক একটি বিষয়। সে তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়, প্রাক-ইসলামি যুগেও ভারতের সংস্কৃতির এ ধারা থামেনি।

প্রশ্ন ▶ ৭ জানবিল একটি সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি যেমন কঠোর তেমনি নিষ্ঠুর। কিন্তু তিনি আবার একই সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও উচ্চাভিলাষী। নতুন দেশ, রাজ্য ও জনপদ জয়ে তিনি আনন্দ লাভ করতেন। টগবগে তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র নাভিদকে দিয়ে নিজের স্বপ্ন পুরণের আকাঙ্ক্ষা! সীমান্তে বিরোধের ঘটনা যেন তার স্বপ্ন পূরণকে একধাপ এগিয়ে দিল। সীমান্তে দুটি অভিযান পাঠিয়ে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত রূপ দিতে তরুণ নাভিদ এগিয়ে এলো এবং জয়মাল্য এনে দিল। *[শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*

https://teachingbd24.com

ক. রাজা দাহিরের পত্নীর নাম কী? ১
খ. সুলতান মাহমুদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কী জান? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ভারতবর্ষে কোন বিজয়াভিযানের সাথে সম্পর্কিত? পঠিত জ্ঞান থেকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অভিযানকে কি সর্বক্ষেত্রেই "নিষ্ফল বিজয় উপাখ্যান" বলে অভিহিত করা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজা দাহিরের পত্নীর নাম রানিবাঈ।

খ সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা।
গজনির শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এটিকে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণের মানসে তার অনেক অর্থের দরকার পড়েছিল। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। আর ভারত হতে সংগৃহীত অর্থ তিনি স্বীয় রাজধানী গজনির উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ভারতবর্ষে আরবদের সিন্ধু বিজয়াভিযানের সাথে সংগতিপূর্ণ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী ও উচ্চাভিলাষী শাসনকর্তা সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী দেশ জয়ের চেষ্টা করেন। তার প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হলে তৃতীয় অভিযানে নিকটাত্মীয় জায়েদকে প্রেরণ করেন এবং জায়েদের সামরিক প্রতিভা দ্বারা জয়লাভ করেন। অনুরূপভাবে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা ওয়ালিদের অনুমোদনক্রমে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে ওবায়েদুল্লাহ ও পরে বুদাইলের নেতৃত্বে রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুইটি অভিযানই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ফেলার জন্য হাজ্জাজ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে তৃতীয় অভিযান পাঠান। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম 'দেবল' বন্দরে এসে উপস্থিত হন, যা ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তিনি দুর্গটি অবরোধ করলেন এবং 'মানজানিকের' সাহায্যে বৃহদাকার প্রস্তর নিক্ষেপ করে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে দেবল অধিকার করেন।
দেবল দখলের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম নিরুন, সিওয়ান, সিসাম জয় করে রাজা দাহিরের মুখোমুখি হন। রাওয়ারে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ এবং সিন্ধুর রাজধানী আলোর অধিকার করে ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধশালী শহর মুলতান অবরোধ ও দখল করেন। মুলতান বিজয়ের মধ্য দিয়ে রাজা দাহিরের সমগ্র রাজ্যের ওপর আরবদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফলকে শুধু উপাখ্যান বলা যথাযথ হবে না। কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর সিন্ধু ও মুলতানে আরব শাসন দেড়শ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাছাড়া তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।
আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে ভারতে বসতি স্থাপন করে। বিজিত অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন তাদের কীর্তি আজও বিদ্যমান। ইতিহাসবিদ টড 'রাজস্থানের ইতিহাস' গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এর ধর্মীয় ফলাফল ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পির-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্যে আগমন করেন; যাদের প্রভাবে সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ইসলাম ধর্মে দলে দলে নির্যাতিত সম্প্রদায় যোগদান করতে থাকে।
সিন্ধু ও মুলতানে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয় এবং উভয় দেশের বাণিজ্য সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরবগণ সর্বপ্রথম হিন্দু সম্প্রদায়ের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ফলে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সমঝোতা ও আর্য ও সেমেটিক জাতির এ মহামিলন ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করে। আরবদের কল্যাণমুখী শাসন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো সংরক্ষণ উভয়ের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিমের এ সহাবস্থানই পরবর্তীতে ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আরবদের সিন্ধু অভিযান কোনো নিষ্ফল বিজয় নয়।

প্রশ্ন ▶ ৮ বালুখালি এলাকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ত্রাণসামগ্রী আসলে ঐ এলাকার চেয়ারম্যান সেগুলো গ্রহণ করার পূর্বে একদল লুটেরা কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়ে যায়। চেয়ারম্যান এ ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি করলেও কোনো প্রতিকার না পেয়ে নিজেই জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ হয়। প্রতিপক্ষের প্রধান নিহত হয়। প্রতিপক্ষের বাকি লোকজনও প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন? ১
খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'লুণ্ঠনের ঘটনার সাথে আরবের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের লুণ্ঠনকারীদের পরিণতি ও সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল এক নয় — বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ ছিলেন উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা।

খ মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ছিল খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশ।
মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পিছনে রাজা দাহিরের কন্যা সূর্যদেবী ও পরিমল দেবীর মিথ্যা অভিযোগকে দায়ী করা হয়। তবে এ ঘটনার ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতি খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেই তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। খলিফার নির্দেশেই তাকে রাজধানী দামেস্কে এনে কারারুদ্ধ করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত লুণ্ঠনের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের মিল রয়েছে।
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপঢৌকনপূর্ণ আটটি আরব জাহাজ সিন্ধুর দেবলস্থ জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনই ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ, উদ্দীপকেও যার প্রতিফলন লক্ষণীয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বালুখালির চেয়ারম্যানের কাছে আসা ত্রাণসামগ্রী লুটেরা কর্তৃক লুট হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি চেয়ে চেয়ারম্যান আবেদন করলেও কোনো লাভ হয়নি। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। একই ঘটনা আরবদের সিন্ধু অভিযানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু রাজা দাহিরের সীমানায় জলদস্যু কর্তৃক মুসলমানদের জাহাজ লুণ্ঠন হলে খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের কাছে এর ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু রাজা দাহির এ ক্ষতিপূরণের দাবিকে অগ্রাহ্য করলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন।
সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের লুটের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত লুণ্ঠনকারীদের পরিণতি আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফলের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়।
ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি একটি নিষ্ফল বিজয় হলেও সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। আরবদের সিন্ধু অভিযানে রাজা দাহিরের পরিণতির সাথে উদ্দীপকের প্রতিপক্ষের পরিণতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অন্যান্য দিক দিয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, বালুখালি এলাকার চেয়ারম্যান লুটকারীদেরকে শাস্তি দেন। এতে প্রতিপক্ষের প্রধান নিহত হয় এবং অন্যান্য লুটকারী প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। সিন্ধু অভিযানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, রাজা দাহির মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পরাজিত ও নিহত হয়। তবে সিন্ধু অভিযানের সূত্র ধরেই ভবিষ্যতে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করে। ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে। আরবরা সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা এ বিজয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৫০ বছর ভারত শাসন করে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর বিধর্মীদের ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এ বিজয়ের ফলে আরবদের সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আসে। আরবগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে আর্য ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। এ বিজয়ের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরবদের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের লুণ্ঠনকারীদের পরিণতি ও সিন্ধু বিজয়ে ফলাফল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶ ৯ সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কামাল সাহেব এর উন্নতির জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। আর্থিকভাবে সচ্ছল হবার জন্য তিনি কয়েকটি ধনী দেশে জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনার ব্যবস্থা করলেন এবং দেশটিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ নিলেন। দেশীয় পণ্ডিতদের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গবেষণায় নিয়োগ করলেন। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশটি স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. সোমনাথ মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত? ১
খ. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের কামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের কোন কারণটির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? তার বিবরণ দাও। ৩
ঘ. উভয়ের উদ্দেশ্য এক হলেও পন্থা ভিন্ন—বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের গুজরাটে সোমনাথ মন্দিরটি অবস্থিত।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ কামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের অর্থনৈতিক কারণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

গজনীর শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, একে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করার জন্য, একটি বিশাল সেনাবাহিনীকে পোষণের মানসে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার মহান উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কল্পতরু মনে করে তথায় ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। সদ্য স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোবারক সাহেবের নানামুখী উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ অর্থের যোগানের জন্য তিনি ধনী দেশে জনশক্তি রপ্তানির ব্যবস্থা করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। তার গৃহীত কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ প্রেসিডেন্ট কামাল সাহেবের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও কৌশল বা পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে।

স্বীয় সিংহাসনকে সুরক্ষিত করে উচ্চাভিলাষী ও যুদ্ধপ্রিয় সুলতান মাহমুদ তার ৩২ বছরের রাজত্বকালে ভারতে মোট ১৭বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেকটি অভিযানে তিনি জয়লাভ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করেন।

প্রেসিডেন্ট কামাল সাহেব দেশের উন্নয়নের জন্য বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অন্যদিকে সুলতান মাহমুদ নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে যুদ্ধ অভিযানের মাধ্যমে ধন-সম্পদ অর্জন করেন। কামাল সাহেব ও সুলতান মাহমুদ উভয়ই নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান মাহমুদ ও প্রেসিডেন্ট কামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও পন্থাগত ভিন্নতা ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ কমল মজুমদারের সীমানার পাশেই আফসার গোমেজের জমিদারী অবস্থিত। পাশাপাশি জমিদারী হওয়ায় সীমানা এবং চোর-ডাকাতের আশ্রয় প্রশ্রয় নিয়ে দুই জমিদারের বিবাদ লেগেই থাকত। একবার চর এলাকা থেকে কমল মজুমদারের কিছু প্রজা তাদের নিজেদের শস্য বোঝাই নৌকা নিয়ে আসার সময় জমিদার আফসার গোমেজের এলাকার কিছু জলদস্যু শস্যগুলো লুট করে নিয়ে যায়। কমল মজুমদারের এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু আফসার গোমেজ তাতে অস্বীকৃতি জানান। কমল মজুমদার তার লোকজনকে আফসার গোমেজের জমিদারী আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। এতে আফসার গোমেজ বাধা প্রদান করতে এসে নিহত হন এবং তার এলাকার লোকজনদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। লোকজন প্রাণভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. সিন্ধুর প্রধান বন্দরটির নাম কী ছিল? ১
খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাব আফসার গোমেজের পরিণতি এবং রাজা দাহিরের পরিণতি কি একই ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিন্ধুর প্রধান বন্দরটির নাম দেবল বন্দর।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শস্য বোঝায় নৌকা নিয়ে যাওয়ার সাথে সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপঢৌকনপূর্ণ আটটি আরব জাহাজ দেবলস্থ জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনই ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। উদ্দীপকেও এ কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, কমল মজুমদারের কিছু প্রজা তাদের নিজেদের শস্য বোঝাই নৌকা নিয়ে আসার সময় জমিদার আফসার গোমেজের এলাকার কিছু জলদস্যু শস্যগুলো লুট করে নেওয়ায় কমল মজুমদার জড়িতদের শাস্তি এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করলে আফসার গোমেজ অস্বীকৃতি জানায়। পরে কমল মজুমদার তার লোকজনকে আফসারের জমিদারি আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশকিছু আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মূল্যবান উপঢৌকন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌছায় তখন জলদস্যুরা এগুলো লুণ্ঠন করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন। তিনি ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান চালান এবং রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত প্রদান করে।

ঘ উদ্দীপকে আফসারের জমিদারির পরিণতি ও রাজা দাহিরের পরিণতি একই ধরনের।

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে সিন্ধুর রাজা দাহির কর্তৃক বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান ও দেবল বন্দরের জলদস্যুদের জাহাজ লুণ্ঠনের এবং অন্যান্য কারণে খলিফার অনুমতিক্রমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০

https://teachingbd24.com

খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রথমে ওবায়দুল্লাহ এবং পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর ২টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উভয় সেনাপতি নিহত হন এবং অভিযান দুটিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ১৭ বছর বয়স্ক মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু দেশে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ বাছাই করা সৈন্য নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে দেবল দুর্গ, নিরুন, সিওয়ান ও সিসাম বিজয় করেন। অবশেষে তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করে রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন এবং ২০ জুন ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা দাহিরকে হত্যা করেন। উদ্দীপকেও একইভাবে কমল মজুমদারের লোকজন আফসারের জমিদারি আক্রমণ করে সবকিছু ছারখার করে আফসারকে উৎখাত করে। সুতরাং জমিদার আফসার পরিণতি এবং রাজা দাহিরের পরিণতি যেন একই সূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ▶১১ অতি সম্প্রতি চীনের দুটি যুদ্ধ জাহাজ জাপানের টৌকিও নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু দ্বীপের জলসীমায় প্রবেশ করে। বেইজিং এর কাছে দ্বীপটি দিয়াউস নামে পরিচিত। এই দ্বীপটিতে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য দু'বার অভিযান পরিচালনা করেছিল। কিন্তু দুটি অভিযানেই চীন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে তারা আবার অভিযান পরিচালনা করলো এবং সফল হলো। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*

ক. শাহনামা কী? ১

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অভিযানের সাথে প্রাক-সালতানাত যুগের কোন অভিযানের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তৃতীয় অভিযানের সফলতা কি মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের সফলতার অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাহনামা মহাকবি কবি ফেরদৌসি রচিত একটি মহাকাব্য।

খ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল অন্যতম।
পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশের রাজা জয়পাল ও তাঁর বংশীয় রাজন্যবর্গের শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো ও গজনি রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। এ হুমকির কারণেই তিনি ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, মধ্য এশিয়ায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তবে তিনি পাঞ্জাব ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোনো এলাকা তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। কারণ সে সময় মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষব্যাপী এত বিশাল একটি সাম্রাজ্য শক্তভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অভিযানের সাথে প্রাক-সালতানাত যুগে সিন্ধু অভিযানের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে।
দুবার অভিযান পরিচালনা করে ব্যর্থ হওয়া এবং সেই ব্যর্থতার গ্লানি দূর করতে পুনর্বার অভিযান পরিচালনা করাই উদ্দীপকে বর্ণিত চীনাদের অভিযান এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে উভয় অভিযানের প্রকৃতি একই ধরনের।
উদ্দীপকের বর্ণিত চীনারা পূর্বে দুইবার চেষ্টা করেও জাপানের টৌকিও নিয়ন্ত্রিত 'সেনকাকু দ্বীপ' অধিকার করতে পারেনি। এ প্রেক্ষিতে তারা আবার দ্বীপটি দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করেছে। এ ধরনের ঘটনা মুসলমানদের সিন্ধু (বর্তমান পাকিস্তানের একটি প্রদেশ) অভিযানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রথমে সেনাপতি ওবায়েদুল্লাহ এবং পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর ২টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অভিযান দুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দুবার পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ বাছাই করা সৈন্য নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুতে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অভিযানের প্রকৃতিগত দিক এবং ঘটনাপ্রবাহ বিবেচনায় উদ্দীপকটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাথেই তুলনীয়।

ঘ উদ্দীপকের তৃতীয় বারের অভিযানের মতো মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্ব মুসলমানরা সিন্ধু জয় করে সফলতা অর্জন করে।
আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আরবেরা ১৫০ বছর সিন্ধুতে শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় অবস্থানের পরেও সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব কিঞ্চিৎকর হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।
ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র। এটি একটি নিষ্ফল বিজয়। এ বিজয়ের সূত্র ধরে ভবিষ্যতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর অমুসলিমদের ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এ বিজয়ের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আরবদের অনেক পরিবর্তন আসে। আরবগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে আর্য ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। এ বিজয়ের ফলে আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।
পরিশেষে বলা যায় যে, সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

প্রশ্ন ▶১২ ইয়াসিন 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারে, সম্রাট M ও Z সম্রাট এর মৃত্যুর পর সমগ্র সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে কোন প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল না। তখন দেশে কোন প্রকার কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না, ফলে তারা কোন প্রকার বহিরাক্রমণের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*

ক. সুলতান মাহমুদ কত সালে সোমনাথ বিজয় করেন? ১

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক কারণসমূহ লিখ। ২

গ. ইয়াছিনের পঠিত 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে তোমার পঠিত মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর কী কী ব্যবস্থা নিলে বহিরাক্রমণের শক্তির প্রতিরোধ করতে পারত বলে তুমি মনে কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির বিজয় করেন।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ ইয়াছিনের পঠিত 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কোনো রাজ্যে রাজনৈতিক ঐক্য না থাকলে সে রাজ্যের পতন অনিবার্য। রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগে বহিঃশত্রু আক্রমণ করে সহজেই রাজ্য জয় করে নেয়। উদ্দীপক ও মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতাই তার প্রমাণ।
উদ্দীপকের 'ক' রাজ্যের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, রাজ্যটিতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ফলে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যটি কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে। সে সময় মৌর্য সম্রাট অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এক বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে একক রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন। কিন্তু তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে কয়েক শতাব্দী ধরে অস্থিরতা বিরাজমান থাকে। অতঃপর সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে উত্তর ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য সম্রাট পুলকেশি ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালান। এ দুই মহান শাসকের মৃত্যুর পর সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল রাজ্যের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ফলে তারা বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় কোনো একক শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের 'ক' সাম্রাজ্যটি মূলত মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালের ভারতবর্ষ। শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অনৈক্যের কারণেই মুসলিম শাসকদের অধিকারে চলে যায়। এক্ষেত্রে ঐক্য থাকলে তারা সহজেই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে (আফগানিস্তান, কাশ্মির, কনৌজ, সিন্ধু, মালব, গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড, আসাম, বাংলা প্রভৃতি) যদি একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে রাখা যেত তাহলে তারা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়াতে পারত। ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ যদি নিজেদের মধ্যকার পরস্পর বিভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসত তাহলে তারা বহিঃশত্রুদের সহজভাবে মোকাবিলা করতে পারত। এছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় রাজ্যের রাজারা যদি সকলে একমত পোষণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করত এবং এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত তাহলে তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত। এছাড়াও সকল রাজা মিলে যদি সীমান্ত নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত এবং দুর্গসমূহ সংরক্ষিত করত তাহলে তারা বিদেশি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করতে সক্ষম হতো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বিশাল সাম্রাজ্য ও প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী রাজা দ্বিতীয় জফস এর মৃত্যুর সাথে সাথেই সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় বিশাল সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজ্যগুলোর মধ্যে পরস্পরিক শত্রুতা বিদ্যমান থাকায় কোন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজনৈতিক অরাজকতার পাশাপাশি জীবনেও নেমে আসে দুর্ভোগ। বর্ণ বৈষম্যের কষাঘাতে নিম্নশ্রেণির মানুষ ছিল জর্জরিত। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেয়া হতো না।

[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, গাজীপুর]

ক. সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বাংলার শাসনকর্তা কে ছিলেন? ১

খ. ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজজীবনের সাথে মুসলিম বিজয়পূর্ব ভারতের সামাজিক অবস্থার কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুসলিম বিজয়পূর্ব উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী।

খ ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য জাতি, গোষ্ঠী ও নানা ধর্মের মানুষের বসবাস লক্ষ করে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) এই উপমহাদেশকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছেন।

আর্যদের আগমন থেকে শুরু করে আধুনিককালে ইউরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত বহু জাতি ভারতে প্রবেশ করেছে। প্রাচীন যুগে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক, গ্রিক, শাক্ত, কুষাণ, হুন; মধ্যযুগে আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং আধুনিক যুগে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষ বহু জাতিগোষ্ঠীর মহাজনসমাবেশে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণে ভিনসেন্ট স্মিথ একে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলে অভিহিত করেছেন।

গ নারীর অধিকার বঞ্চনা ও শ্রেণিবৈষম্যের দিক দিয়ে উদ্দীপকের সমাজ ব্যবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার মিল রয়েছে।

জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজব্যবস্থার একটি কুসংস্কার বলা যায়। ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ সৃষ্টিই হলো এই জাতিভেদ প্রথা। এ প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে একদল মানুষ সমাজে শোষিত হয় এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আবার পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হতে হয়। তারা নিগৃহীত ও অধিকার বঞ্চিত হয়ে অনেক সময় মানবেতর জীবনযাপন করে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতে বিদ্যমান এ জাতিভেদ প্রথা ও নারীর অবস্থানগত দিক উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি, সমাজে নানা বৈষম্য বিদ্যমান। সমাজের অধিকাংশ লোক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হলেও সমাজে তারা নানাভাবে অধঃপতিত, নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত। সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা নেই। ঠিক একই রকম বৈষম্য লক্ষ করা যায় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায়। তখন ভারতীয় হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। ধর্ম-কর্ম, যাগযজ্ঞের অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল অধঃপতিত ও অসহায়। সামাজিকভাবে তারা ছিল অবহেলিত। তারা প্রতিনিয়ত শোষণ, নির্যাতন, যন্ত্রণার শিকার হতো। অনেক সময় সমাজে তাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। সুতরাং বলা যায়, রাজা জফসের সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্যের দিকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান জাতিভেদ প্রথা এবং নারীর অধিকার বঞ্চনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা ২য় জফসের রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা প্রাক-মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব যেকোনো অঞ্চলের স্বাধীনতাকে হুমকির সম্মুখীন করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিকের দেশেও রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রাক-মুসলিম ভারতেও একই অবস্থা বিরাজ করছিল।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে এ দেশে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য লক্ষ করা যায়নি। বিভিন্ন রাজ্য পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করত। এ বিচ্ছিন্নতার ফলেই মুসলিম অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ একটি সুসংহত ও সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। উপরন্তু চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, ও হর্ষবর্ধনের মতো কোনো পরাক্রমশালী রাজাও তখন উত্তর ভারতে ছিল না। ভারতের অবশিষ্ট অংশও বহু স্বাধীন নৃপতির মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে শতধাবিভক্ত ভারতে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরূপ বিভক্তি জাতীয় চেতনার উন্মেষের পরিপন্থি হয়ে দাঁড়ায়, যা দেশের কল্যাণের জন্য অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যায়, রাজা জফসের দেশের অবস্থা প্রাক-মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থারই প্রতিরূপ।

প্রশ্ন ▶ ১৪ তৈমুর লং সমরকন্দের সিংহাসন বসেই দিগ্বিজয়ের নেশায় মেতে ওঠেন। তিনি সিস্তান, হামদান, রাই, ইস্পাহান ফারস, সিরাজ এবং চীনের বিভিন্ন এলাকা দখল করে এবং বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু রাজবংশের পতন ঘটিয়ে সেখান থেকে বিলাসবহুল সামগ্রী এনে রাজধানী সমরকন্দকে অনিন্দ্যসুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। মধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য এবং এ জন্য তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ঐ সকল এলাকা দখল করেন। *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সুলতান মাহমুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন? ১

খ. কুতুবউদ্দিন আইবককে দ্বিতীয় হাতেম তাই বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লংয়ের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের অভিযানের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তৈমুর লং এবং সুলতান মাহমুদের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

খ অসীম উদারতা ও দানশীলতার জন্য কুতুবউদ্দিন আইবেককে দ্বিতীয় হাতেম তাই বলা হত।

কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন মহানুভব সুলতান। তার বদান্যতা কিংবদন্তির পর্যায়ভুক্ত ছিল। প্রতিদিন তিনি লাখ লাখ টাকা দান করতেন বলে তাকে 'লাখবকস' বা লক্ষ টাকা দানকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বদান্যতায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হাতেম তাই।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তৈমুর লংয়ের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে।
সুলতান মাহমুদ (আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি রাজ্যের শাসনকর্তা) ছিলেন সাহসী ও সমরপ্রিয় বীর। ১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার এ অভিযানের কারণ হিসেবে সম্পদের প্রতি মোহকে দায়ী করেন। ভারতে পরিচালিত অভিযান থেকে সুলতান মাহমুদ প্রচুর অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ রাজ্য গজনির উন্নতিতে ব্যয় করেন। আর উদ্দীপকেও এরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, তৈমুর লং চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে প্রচুর অর্থ-সম্পদ হস্তগত করেন। এসব সম্পদ তিনি নিজ রাজ্য সমরকন্দের উন্নতিতে ব্যয় করেন। একইভাবে সুলতান মাহমুদ ভারতে অভিযান পরিচালনা করে প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করেন। সুলতান মাহমুদের ষোলোতম অভিযান তথা সোমনাথ মন্দির আক্রমণ এবং সেখান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দিরে অভিযান পরিচালনা করেন। মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার আক্রমণ থেকে সোমনাথ মন্দিরকে রক্ষা করতে পারেননি। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দু' কোটিরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহাদি এবং ২শ মণ অলংকার ও মণিমুক্তা নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। তৈমুর লংয়ের সমরকন্দের মতোই গজনি নগরকে সুলতান মাহমুদ অনিন্দ্য সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঘটনায় সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে তৈমুর লংয়ের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাদৃশ্য থাকলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে।
সুলতান মাহমুদ একজন উচ্চাভিলাষী এবং অর্থলোভী সমরনায়ক ছিলেন। রাজ্যাভিযানে তিনি আনন্দ পেলেও তার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। নিজ সাম্রাজ্য গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও অনিন্দ্যসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার প্রচুর সম্পদের দরকার ছিল। আর ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কল্পতরু মনে করে এখানে বার বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ হস্তগত করে গজনির শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যয় করেন। তৈমুর লং এর অভিযানের পেছনেও এ ধরনের উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হলেও তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেন।
তুর্কি বীর তৈমুর লংয়ের উদ্দেশ্য ছিল বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই তিনি বহু রাজবংশের পতন ঘটিয়ে বিজিত এলাকায় নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি তার বাহিনী বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করে। তৈমুর এ সম্পদ ব্যয় করে সমরকন্দ সাম্রাজ্যের উন্নয়নে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইভাবে সুলতান মাহমুদ গজনি রাজ্যকে বিশ্বের তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করার জন্য এর সুসজ্জিতকরণ, নিজ সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, বিরাট সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি কারণে ভারতে বার বার অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযানে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ তিনি সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন। কিন্তু তিনি একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া বিজিত কোনো অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন নি। অর্থাৎ তার ভারত অভিযানের পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি ভারত আক্রমণ করেন।
উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে, তৈমুর লংয়ের উদ্দেশ্য ছিলো মধ্য এশিয়ায় একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাই বলা যায়, তাদের অভিযানের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জান্দাল বি ইয়াহিয়া ছিলেন একজন দেশের গভর্নর। তার কঠোর শাসনে দেশটিতে অনেক বিদ্রোহীর জন্ম হয়। এসব বিদ্রোহীরা সীমান্ত পার হয়ে পাশের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। জান্দাল বিন ইয়াহিয়া এসব বিদ্রোহীকে ফেরৎ চাইলে উক্ত দেশটির রাজা ফেরৎ দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ থেকেই উভয় দেশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।
[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, গাজীপুর]

ক. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১
খ. ভারতবর্ষকে 'Wealth of India' বলা হয় কেন। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নিষ্ফল বিজয়— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম মুহাম্মদ বিন কাসিম।

খ প্রাকৃতিক ধনসম্পদে পরিপূর্ণ থাকায় ভারতবর্ষকে 'Wealth of India' বলা হয়।
প্রাচীনকাল থেকেই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত ছিল। এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পেরও ব্যাপক খ্যাতি ছিল। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত ভ্রমণকারী চীনা পর্যটক ফা হিয়েন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন। অর্থাৎ বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য ভারত বর্ষকে Wealth of India বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণটি হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিদ্রোহীদেরকে রাজা দাহিরের আশ্রয় দান।
আরবদের সিন্ধু অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। নানা ঘটনা ও পরিস্থিতি আরবীয়দের সিন্ধু অভিযানে প্ররোচিত করেছিল। এ অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর দেবলস্থ বন্দরে উপঢৌকনসহ ৮টি মুসলিম জাহাজ লুণ্ঠন। তবে পরোক্ষ নানা ঘটনা উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ ও তার পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সিন্ধু অভিযানে বাধ্য করেছিল, যার একটি ঘটনা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, গভর্নর জান্দাল বিন ইয়াহিয়ার দেশের বিদ্রোহীরা পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিলে গভর্নর তাদেরকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশের রাজা তা অগ্রাহ্য করলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। একইভাবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর শাসনের প্রতিবাদে কতিপয় বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ করে আরব সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধুরাজ দাহিরের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। হাজ্জাজ তাদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবি জানালে দাহির তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে সিন্ধু ও মুলতানে অভিযান পরিচালনা করেন। সুতরাং দেখা যায় উদ্দীপকের ঘটনায় আরবদের সিন্ধু বিজয়ের উল্লিখিত কারণেই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফলকে নিষ্ফল বিজয় বলা যথাযথ হবে না। কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর সিন্ধু ও মুলতানে আরব শাসন দেড়শ বছর স্থায়ী হয়েছিল।
মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরি ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিন্ধু বিজয়ের পর আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে ভারতে বসতি স্থাপন করে। বিজিত অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন তাদের কীর্তি আজও বিদ্যমান। ইতিহাসবিদ টড 'রাজস্থানের ইতিহাস' গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এর ধর্মীয় ফলাফল ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পির-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্যে আগমন করেন; যাদের প্রভাবে সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ইসলাম ধর্মে দলে দলে নির্যাতিত সম্প্রদায় যোগদান করতে থাকে।
সিন্ধু ও মুলতানে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরবগণ সর্বপ্রথম হিন্দু সম্প্রদায়ের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ফলে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সমঝোতা ও আর্য ও সেমেটিক জাতির এ মহামিলন ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করে। আরবদের কল্যাণমুখী শাসন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো সংরক্ষণ উভয়ের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিমের এ সহাবস্থানই পরবর্তীতে ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আরবদের সিন্ধু অভিযান কোনো নিষ্ফল বিজয় নয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৬ সিংহজানির রাজা জামালপুরের শাসনকর্তার নিকট ৮ ট্রাক উপহার সামগ্রী পাঠান। কিন্তু নন্দীপুরের নিকট দিয়ে আসার সময় ডাকাতেরা ট্রাকের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। জামালপুরের শাসনকর্তা মির্জা মনি ডাকাতদের প্রত্যার্পণ অথবা লুটকৃত মালামাল ফেরত দিতে নন্দীপুরের রাজা নন্দলালের নিকট দূত পাঠান। নন্দীপুরের রাজা এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে জামালপুরের শাসনকর্তা নন্দীপুর দখল করার জন্য সেনাপতি প্রেরণ করেন এবং ইহা দখল করেন।

[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]

ক. সুলতান মাহমুদ কোথাকার সুলতান ছিলেন? ১

খ. সুলতান মাহমুদ মন্দির আক্রমণ করেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্য বই এর কোন বিষয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে? সংক্ষেপে বিজয়ের কারণগুলো লিখ। ৩

ঘ. উক্ত বিজয় কী নিস্ফল বিজয় ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ আফগানিস্তানের গজনীর সুলতান ছিলেন।

খ সুলতান মাহমুদ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

ভারতের গুজরাটের কাথিওয়াড়ে অবস্থিত সোমনাথ মন্দির ছিল ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণ মতে, মন্দিরের পুরোহিতদের ধারণা ছিল এ মন্দির বিজয় মাহমুদের সাধ্যের বাইরে। সুলতান মাহমুদ তাই ১২২৬ সালে এই মন্দিরে অভিযান চালিয়ে সফল হন। অন্যান্য মন্দির আক্রমণের পিছনেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল প্রধান।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পাঠ্য বইয়ের সিন্ধু বিজয়ের ঘটনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সিংহলের রাজা ৮টি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক জাহাজগুলোর মালামাল লুণ্ঠন হয়। হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট এর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে হাজ্জাজ তার সেনাপতি প্রেরণ করে সিন্ধু অধিকার করেন।

উদ্দীপকের লুণ্ঠন এর ঘটনা এবং তার জবাবে সামরিক অভিযানের বিষয়টি সিন্ধু জয়ের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু উদ্দীপকে যে ট্রাক ও ডাকাতের কথা বলা হয়েছে তা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। ইতিহাসে ট্রাক ও ডাকাতের স্থলে যথাক্রমে জাহাজ ও জলদস্যুর উল্লেখ পাই।

এছাড়া ইতিহাসে সিন্ধু জয়ের ঘটনার পাঠে দেখা যায় হাজ্জাজ এর পাঠানো সেনাপতিরা প্রথম দুটি অভিযানে ব্যর্থ হয়। তৃতীয় অভিযানে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু দখলে সক্ষম হন।

কাজেই সিন্ধু বিজয়ের উপর্যুক্ত ঘটনার সাথেই উদ্দীপকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে।

ঘ উক্ত বিজয় তথা আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে স্টেনলি লেনপুল বলেন, "আরবগণ সিন্ধু জয় করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে এ বিজয় ছিল একটি উপাখ্যান মাত্র, একটি নিষ্ফল বিজয়।"

সিন্ধু ও সুলতান বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল পর্যালোচনা করলে লেনপুলের উপরিউক্ত মন্তব্য সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ এই সত্য স্বীকার করেছেন। কেননা আরব প্রভাব শুধু সিন্ধু ও সুলমানেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের আর কোন স্থানে আরব প্রভাব ছিল না। মুহাম্মদ বিন কাসিমের অকাল মৃত্যু, খলিফাদের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন, মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট ও উত্তর ভারতে শক্তিশালী রাজপুত, গুর্জর-প্রতিহারদের উত্থান ইত্যাদি মুসলিম অগ্রযাত্রার পথরোধ করে।

ফলে সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে কোন স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে, এ এল শ্রী বাস্তব, টমাস আরনওসহ কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সিন্ধু বিজয় পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল একথা অনস্বীকার্য। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিজয়ের সফলতা পরিদৃষ্ট হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, উক্ত বিজয় তথা আরবদের সিন্ধু বিজয় ছিল অনেকাংশেই নিষ্ফল বিজয়। তবে এই বিজয়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রশিদপুরের সুলতান 'ক' কম্পপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন এবং চন্দ্রার প্রান্তরে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে রশিদপুরের রাজা চরমভাবে পরাজিত হন। এই যুদ্ধকে চন্দ্রার ১ম যুদ্ধ বলে। পরের বছর রশিদপুরের রাজা আবার যুদ্ধাভিযান করেন এবং চন্দ্রার প্রান্তরে যুদ্ধে কম্পপুরের রাজাকে পরাজিত করে কম্পপুর অধিকার করেন।

[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]

ক. ভারতের প্রথম মুসলিম সুলতান কে ছিলেন? ১

খ. সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের মিল আছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত সুলতানের ভারত বিজয়ের বিবরণ দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের প্রথম মুসলিম সুলতান ছিলেন কুতুব উদ্দিন আইবেক।

খ সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য হলো মাহমুদ কখনো ভারতে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে ১৭ বার সফল অভিযান পরিচালনা করে অঢেল ধন-সম্পদ হস্তগত করেন এবং গজনিতে ফিরে যান। বিজয়ের আনন্দ ও সম্পদের লোভই ছিল মাহমুদের আক্রমণের উদ্দেশ্য বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। অন্যদিকে ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল মুহাম্মদ ঘুরীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পাঠ্য বইয়ের তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের মিল আছে।

ভারতে স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ঘুরী দিল্লি ও আজমীরের চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজের মুখোমুখি হন। কনৌজের রাজা জয়চাঁদ ব্যতীত প্রায় সকল হিন্দু রাজা পৃথ্বিরাজের পক্ষাবলম্বন করেন। ১১৯১ সালে মুহাম্মদ ঘুরীর সাথে পৃথ্বিরাজের বাহিনীর মধ্যে তরাইন নামক প্রান্তরে এক সংঘর্ষ হয়। ইহা তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর চরমভাবে পরাজিত হন। পরের বছর ১১৯২ সালে মুহাম্মদ ঘুরী আবার যুদ্ধাভিযান করেন এবং তরাইনের প্রান্তরে পৃথ্বিরাজের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রশিদপুরের সুলতান 'ক' কম্পপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন এবং চন্দ্রার প্রান্তরে প্রথমবার পরাজিত হন। পরের বছর একই প্রান্তরে কম্পুরের রাজাকে পরাজিত করে কম্পপুরে অধিকার করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পানিপথের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের সাথে উদ্দীপকের যুদ্ধের মিল রয়েছে।

ঘ উক্ত সুলতান অর্থাৎ সুলতান মুইজ উদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয় এর বিবরণ দেয়া হলো।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে একটি স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা। তাই তিনি ধারাবাহিক বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। ১১৭৫ সালে তিনি ভারতের মুলতান রাজ্য দখল করেন। পরবর্তীতে ১১৮৬ সালে ঘুরী খসরু মালিক পরাজিত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। পাঞ্জাব এরপর দিল্লি ও আজমিরের চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করার জন্য ১১৯১ সালের অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঘুরী এতে দমে না গিয়ে ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ ঘুরীর উন্নত রণকৌশলের কাছে পৃথ্বিরাজ বাহিনীর পরাজয় হয়। পলায়নরত অবস্থায় পৃথ্বিরাজ ধৃত ও নিহত হন। ঘুরী শাসনভার তার বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবউদ্দিন এর ওপর দিয়ে গজনীতে ফিরে গেলেও ১১৯৪ সালে কনৌজের রাজা জয়চাঁদকে দমনের জন্য পুনরায় ভারত আসেন। চান্দওয়ার যুদ্ধে জয়চাঁদকে পরাজিত করে ঘুরী ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী কনৌজ এবং ধর্মীয় রাজধানী বারানসী হস্তগত করেন। ঘুরীর প্রতিনিধি কুতুব উদ্দিন আইবেক ১১৯৬ সালে গোয়ালিয়র ও গুজরাট অধিকার করেন। ১২০২ সালে কুতুব উদ্দিন কালিঞ্জর জয় করেন। একই সময়ে তাঁর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা ও বিহার বিজয় করেন।

পরিশেষে বলা যায়, ঘুরীর ভারত বিজয় অভিযান ছিল, পরিকল্পিত, সফল ও সার্থক।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶১৮

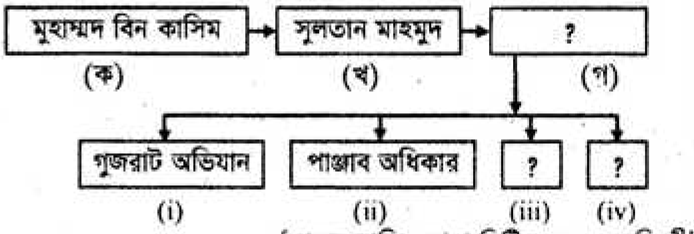

[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. আব্বাসি খলিফার কাছ থেকে সুলতান-ই-আজম উপাধি কে গ্রহণ করেন? ১

খ. বলবন 'রক্তপাত ও কঠোর' নীতি গ্রহণ করেছিলেন কেন? ২

গ. প্রদত্ত ছকে 'গ' চিহ্নিত স্থানে কোন মুসলিম শাসককে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় (iii) ও (iv) নং স্থানে নির্দেশিত বিষয় কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল? মূল্যায়ন কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খলিফার কাছ থেকে সুলতান ইলতুৎমিশ সুলতান-ই-আজম উপাধি গ্রহণ করেন।

খ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে তুর্কি অভিজাতদের ষড়যন্ত্র এবং বহিরাক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সুলতান বলবন ষড়যন্ত্রপরায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও শত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গ প্রদত্ত ছকে 'গ' চিহ্নিত স্থানটি মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীকে নির্দেশ করে।

ছকের 'ক' ও 'খ' স্থানে নির্দেশিত যথাক্রমে মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং সুলতান মাহমুদের পর মুহাম্মদ ঘুরীই ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেন। ঘুর রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দিন হুসেনের মৃত্যুর পর মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম বা মুহাম্মদ ঘুরীকে গজনির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঘুর রাজ্যের অধিপতিরূপে ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান ও উচ জয় করেন। ১১৭৯ এবং ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন। মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করেন। গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় ভীমের নিকট ঘুরী পরাজিত হন। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে পৃথ্বিরাজের (চৌহান রাজা) সাথে মুহাম্মদ ঘুরী তরাইন প্রান্তরে প্রথম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী পুনরায় তরাইন প্রান্তরে পৃথ্বিরাজের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন এবং পৃথ্বিরাজ যুদ্ধে নিহত হন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের ফলেই ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তিনিই ভারতে প্রথম মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা করেন। তার সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের সময়ে নির্মিত দিল্লির 'কুয়াতুল ইসলাম' ও আজমিরের 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া' মসজিদ দুটি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির অভিনব সৃষ্টি। ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ও বিকাশ সাধন ভারতবর্ষে ঘুরীর রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অভিনব মাত্রা সংযোজন করেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসংখ্য প্রশিক্ষিত মেধাবী ক্রীতদাস (কুতুবউদ্দিন আইবেক, বখতিয়ার খলজি প্রমুখ) রেখে গিয়েছিলেন যারা তার সাম্রাজ্যকে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে।

ঘ ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার (iii) ও (iv) নং স্থানে নির্দেশিত তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তরাইনের প্রথম এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব অপরীসিম। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী জয়লাভ করতে পারেনি ঠিকই তবে এ পরাজয়ের গ্লানি তাকে ভারতবর্ষ জয়ে আরো উদ্বুদ্ধ করে। যার ফলে তিনি ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং এর মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তরাইনের প্রথম এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়। এ পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য তিনি অদম্য মনোবল নিয়ে দ্বিতীয় বছর ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পুনরায় পৃথ্বিরাজের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কাছে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রায় দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এরপর থেকে হিন্দুগণ আর মুসলিম আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ এটা হিন্দু স্থানের ওপর মুসলিম আধিপত্যের চরম সাফল্যের সূচনা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তরাইনের এ বিজয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি রচনা করেছিল। ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেগ বলেন, 'তরাইনের বিজয়ে উত্তর ভারত পর্যন্ত সব শহরের ফটক মুহাম্মদ ঘুরীর জন্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, তরাইনের প্রথম এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের ভূমিকা ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶১৯ ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাধবপুর এলাকায় বাদল মিয়ার লোকেরা সিলেটের চা ব্যবসায়ী তাহের মহাজনের চা বোঝাই ৮টি ট্রাক ছিনতাই করে। তাহের মহাজন তা ফেরত চাইলে বাদল মিয়া তার দায় অস্বীকার করে। এতে তাহের মহাজন ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। তবে বাদল মিয়ার সাথে তার আগে থেকেই কিছু বিষয়ে বিরোধ ছিল। [আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে সিন্ধু অভিযানের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মতো উক্ত অভিযানের কি পরোক্ষ আরও কারণ ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

খ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা।

গজনির শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এটিকে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া সমরনায়ক হিসেবে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণের জন্য তার অনেক অর্থের দরকার ছিল। ফলে ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। আর ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি স্বীয় রাজ্য গজনির উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন।

গ উদ্দীপকের সাথে সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজ্যবিস্তার, ধনৈশ্বর্য আহরণ, সিন্ধুরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ, ইসলাম বিস্তার প্রভৃতি পরোক্ষ কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। তখন একটি ঘটনা তাকে সিন্ধু আক্রমণের সুযোগ এনে দেয়। আর এ ঘটনাটি হলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক মুসলমানদের ৮টি জাহাজ লুট।

উদ্দীপকে তাহের মহাজন কর্তৃক বাদল মিয়াকে আক্রমণের ক্ষেত্রে লুণ্ঠনের একটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। চা ব্যবসায়ী তাহের মহাজনের চা বোঝাই ৮টি ট্রাক বাদল মিয়ার লোকেরা ছিনতাই করে এবং বাদল মিয়া তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশকিছু আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে, সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মূল্যবান উপঢৌকন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌছায় তখন জলদস্যুগণ জাহাজগুলো লুণ্ঠন করে এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

teachingbd24.com

সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত প্রদান করে।

ঘ উদ্দীপকের ন্যায় সিন্ধু বিজয়ের ক্ষেত্রে জাহাজ লুণ্ঠনের কারণটিই একমাত্র কারণ ছিল না। এর পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল।

উদ্দীপকে মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের শুধু প্রত্যক্ষ কারণটিই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সিন্ধু বিজয়ের পেছনে এটি ছাড়াও আরো অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল।

অষ্টম শতকের সূচনাতে মেকরান এবং বেলুচিস্তান আরবদের হস্তগত হওয়ায় তারা সিন্ধু দেশের অতি সন্নিকটে এসে পড়ে। ভারতীয় হিন্দু রাজাদের বৈরী মনোভাব ও সামরিক উস্কানির পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারণ ব্যতীত খিলাফতের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় মুসলমানগণ বাধ্য হয়ে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সর্বোপরি আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে আরবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়। তাছাড়া জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও ভারতবর্ষ আক্রমণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আরব খলিফার নিকট প্রেরিত উপঢৌকন ও আরব বণিকদের বাণিজ্যিক আটটি জাহাজ দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ দাহিরের কাছে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ ও জলদস্যুদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু রাজা দাহির উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের এই ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন ছিল আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। তবে সিন্ধু বিজয়ের পেছনে এর বাইরেও বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২০

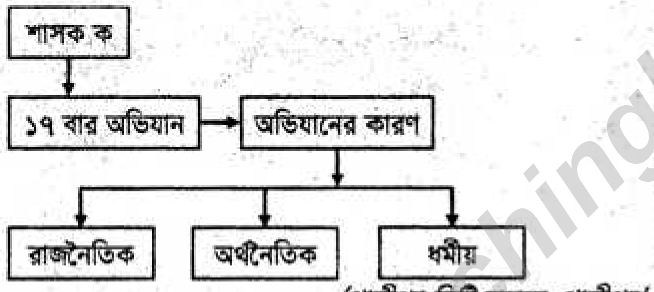

[গাজীপুর সিটি কলেজ, গাজীপুর]

ক. শাহনামা কে রচনা করেন? ১

খ. তরাইনের ২য় যুদ্ধ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উপরিউক্ত ছকের শাসক 'ক' এর সাথে পাঠ্য বই এর সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক কে? তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানটি সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের অভিযানের প্রকৃত কারণ কি বলে তুমি মনে কর? পাঠ্য বই এর আলোকে লিখ। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি শাহনামা রচনা করেন।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উপর্যুক্ত ছকের শাসক 'ক' এর সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক হলেন সুলতান মাহমুদ। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান হলো সোমনাথ মন্দির আক্রমণ।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি ভারতবর্ষে মোট সতের বার অভিযান প্রেরণ করে বিস্ময়করভাবে প্রত্যেকবারই সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণগুলো ছিল তার ভারত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য। যেমনটি ছকে উল্লিখিত শাসক 'ক' এর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

ছকে উল্লিখিত শাসক 'ক' ১৭ বার অভিযান প্রেরণ করেন। এ তথ্য সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাথে সংগতিপূর্ণ। সোমনাথ বিজয় তথা ভারতে তার ১৬ তম অভিযান ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি তিনি সোমনাথের দ্বারে এসে উপস্থিত হন। গুজরাটের রাজা ভীমদেবের নেতৃত্বে স্থানীয়রা বাধা দিলেও তারা সুলতানের কাছে পরাজিত হয়। এ মন্দির হতে সুলতান মাহমুদ দু'কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং দু'শ মণ অলংকার সংগ্রহ করেন। ঐতিহাসিক ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'সোমনাথ বিজয় মাহমুদের ললাটে নতুন বিজয় গৌরব সংযুক্ত করে।' তাই বলা যায়, ছকে বর্ণিত শাসক 'ক' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক সুলতান মাহমুদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিযান হলো সোমনাথ মন্দির বিজয়।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান মাহমুদের অভিযানের প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক ছিল বলে আমি মনে করি।

ধন-সম্পদ লাভ এবং স্বীয় বীরত্বকে জাহির করার জন্য ইতিহাসে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। অনেক শাসকই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একের পর এক বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করেছেন। আর সুলতান মাহমুদ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে অনেকে মনে করেন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতে বার বার অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক হাবিব বলেন, "এটি ধর্মযুদ্ধ ছিল না, বরং গৌরব ও স্বর্ণের লোভেই সংঘটিত পার্থিব যুদ্ধ।" ধনলিপ্সার তীব্র বাসনা তার অভিযানে প্রতিফলিত হয়েছে। *'An Advanced History of India'* গ্রন্থেও 'ভারতীয় ধনৈশ্বর্য' সংগ্রহ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এম মোহর আলীর মতে, "সদ্য প্রতিষ্ঠিত গজনি রাজ্যের উন্নয়ন, রাজ্যকে সুদৃঢ়করণ, রাজ্যে নিজ কর্তৃত্ব এবং মুসলিম নৃপতিদের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা, বিরাট সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ, মধ্য এশিয়ায় অভিযান, রাজধানী গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও সুসজ্জিতকরণ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি কারণে সুলতান মাহমুদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল।" সুলতান মাহমুদ ভারতকে তার প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার মনে করেছিলেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, '১৭ বার অভিযান পরিচালনা করে তিনি সোনা, রুপা, হীরা, জহরত, মণি-মাণিক্য আহরণ করে গজনিতে নিয়ে যান। গজনিকে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করার জন্য তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এ কারণে তিনি ভারতে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন।'

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ।

প্রশ্ন ▶ ২১ 'ক' রাজ্যের অধিপতিরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মির্জা শাহ অন্য একটি রাজ্যকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করার অভিপ্রায়ে অভিযান চালান এবং ১ম যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হন। পূর্বের পরাজয়ের গ্লানি মোচন করতে গিয়ে তিনি তার সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পরের বছর একই প্রান্তরে দ্বিতীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে তিনি বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন এবং স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'শাহনামা' কী? ১

খ. 'সোমনাথ' বিজয়ের ওপর টীকা লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত মির্জা শাহের যুদ্ধ পাঠ্যবইয়ের কোনো যুদ্ধের সাথে কি সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাহনামা হলো মহাকবি ফেরদৌসি রচিত একটি মহাকাব্য।

খ সোমনাথ মন্দির বিজয়ের মাধ্যমে সুলতান মাহমুদ (আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি রাজ্যের শাসনকর্তা) প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেন। তাই তার এ অভিযানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সোমনাথ মন্দিরটি ছিল প্রভূত ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ। মন্দিরের পুরোহিতদের ধারণা ছিল এ মন্দিরটি আক্রমণ করা সুলতান মাহমুদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু স্থানীয় জনগণ এবং পুরোহিতদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও

Teachingbd24.com

সুলতান ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটি আক্রমণ করে জয় লাভ করেন। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দুই কোটিরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা এবং বিগ্রহাদির অলংকার থেকে দু'শ মণ মূল্যবান মণি-মুক্তা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বিপুল সাফল্যের জন্যই তার এ অভিযানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঐতিহাসিকেরা মত দেন।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ কেশবপুরের শাসনকর্তা খায়রুজ্জামান পার্শ্ববর্তী দেশ খড়মপুর বারবার আক্রমণ চালিয়ে প্রতিটি অভিযানে জয়লাভ করে। কিন্তু স্থায়ীভাবে রাজ্য দখল করা কিংবা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কোনোটাই তার উদ্দেশ্য ছিল না। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল খড়মপুর থেকে টাকা-পয়সা, মণিমুক্তা সংগ্রহ করে নিজ দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা। *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. দেবল বন্দর কোথায় অবস্থিত? ১
খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কেশবপুরের শাসনকর্তা খায়রুজ্জামানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের যুদ্ধাভিযানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. কেশবপুরের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের তুলনা করবে? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেবল বন্দর ভারতে অবস্থিত।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ খায়রুজ্জামান-এর সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সুলতান মাহমুদের অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুলতান মাহমুদ ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ভ্রাতা ইসমাইলকে পরাজিত এবং কারারুদ্ধ করে গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্প বয়সে ক্ষমতা গ্রহণ এবং দিগ্বিজয়ের নেশা তাকে উপমহাদেশ বিজয়ে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উপমহাদেশে মোট ১৭টি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। প্রতিটি অভিযানেই তিনি কৃতিত্বের সাথে জয়লাভ করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

কেশবপুরের শাসনকর্তা খায়রুজ্জামান পার্শ্ববর্তী খড়মপুরে বারবার আক্রমণ চালিয়ে প্রতিটি অভিযানে সফলতা লাভ করেন। তার এ অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল ধনরত্ন সংগ্রহ করে নিজ রাজ্যকে সমৃদ্ধ করা। খায়রুজ্জামানের এ অভিযানের সাথে গজনির সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষে অভিযানের মিল রয়েছে। সুলতান মাহমুদও তার পার্শ্ববর্তী উপমহাদেশে সতেরো বার অভিযান পরিচলনা করেন এবং প্রতিটি অভিযানেই সাফল্য অর্জন করেন। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। তিনি মূলত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে বারবার ভারতবর্ষে আক্রমণ করেছেন। প্রতিবার অভিযানের সময় অসংখ্য ধন-রত্ন সংগ্রহ করে তিনি গজনিতে প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং কেশবপুরের শাসক খায়রুজ্জামান-এর সাথে সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষ অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ কেশবপুরের শাসকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সুলতান মাহমুদের মিল লক্ষ করা যায়

পৃথিবীতে এমন অনেক বিজয়ী বীর রয়েছেন, যারা অসীম বীরত্বে যুদ্ধ করে দেশ জয় করেছেন; কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি। যুদ্ধজয়ের নেশা আর সম্পদের মোহ তাদেরকে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করেছে। এ রকমই দু'জন শাসক উদ্দীপকের খায়রুজ্জামান এবং পাঠ্যবইয়ের সুলতান মাহমুদ। সুলতান মাহমুদ উপমহাদেশের ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্যবার অভিযান প্রেরণ করেছেন এবং প্রতিবারই সাফল্য অর্জন করেন। প্রতিবার অভিযানের সময় তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ এ উপমহাদেশ থেকে লুট করে নিয়ে যান। তবে এ উপমহাদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। কেশবপুরের শাসনকর্তাও তার পার্শ্ববর্তী দেশে শুধু ধনসম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যেই অভিযান প্ররণ করেন এবং প্রতিবার অভিযানেই তিনি সফল হন। একইভাবে সুলতান মাহমুদও ভারতবর্ষে সতেরো বার অভিযান প্রেরণ করে প্রতিবারই সফলতা অর্জন করেন। তিনি ভারত দেশে প্রচুর ধন রত্ন, মণিমুক্তা সংগ্রহ করে নিজ রাজ্য গজনিতে নিয়ে যান এবং এ রাজ্যের উন্নতিকল্পে এসব সম্পদ ব্যয় করেন। কেশবপুরের শাসক খায়রুজ্জামানের মতো তিনিও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই এ সকল অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে কেশবপুরের শাসকের অভিযানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সুলতান মাহমুদের উপমহাদেশে অভিযানের তুলনা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আরিফ 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারে যে, সম্রাট 'M' ও সম্রাট 'Z' এর মৃত্যুর পর সমগ্র সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজ্যর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল না। তখন দেশে কোনো প্রকার কেন্দ্রীয় সরকারও ছিল না। ফলে তারা কোনো প্রকার বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কে সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন? ১
খ. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. আরিফের পঠিত 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে তোমার পঠিত মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো কী কী ব্যবস্থা নিলে বহিঃ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ আরিফের পঠিত 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোনো রাজ্যে রাজনৈতিক ঐক্য না থাকলে সে রাজ্যের পতন অনিবার্য। রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগে বহিঃশত্রু আক্রমণ করে সহজেই রাজ্য জয় করে নেয়। উদ্দীপক ও মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতাই তার প্রমাণ।

উদ্দীপকের 'ক' রাজ্যের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, রাজ্যটিতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ফলে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যটি কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। একই রূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। সে সময় মৌর্য সম্রাট অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এক বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে একক রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন। কিন্তু তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে কয়েক শতাব্দী ধরে অস্থিরতা বিরাজমান থাকে। অতঃপর সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে উত্তর ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য সম্রাট পুলকেশি ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালান। এ দুই মহান শাসকের মৃত্যুর পর সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল রাজ্যের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ফলে তারা বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় কোনো একক শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের 'ক' সাম্রাজ্যটি মূলত মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালের ভারতবর্ষ। শতধাবিভক্ত ভারতবর্ষ রাজনৈতিক অনৈক্যের কারণেই মুসলিম শাসকদের অধিকারে চলে যায়। এক্ষেত্রে ঐক্য থাকলে তারা সহজেই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে (আফগানিস্তান, কাশ্মির, কনৌজ, সিন্ধু, মালব, গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড, আসাম, বাংলা প্রভৃতি) যদি একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে রাখা

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

যেত তাহলে তারা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়াতে পারত। ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ যদি নিজেদের মধ্যকার পরস্পর বিভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসত তাহলে তারা বহিঃশত্রুদের সহজভাবে মোকাবিলা করতে পারত। এছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় রাজ্যের রাজারা যদি সকলে একমত পোষণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করত এবং এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত তাহলে তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত। এছাড়াও সকল রাজা মিলে যদি সীমান্ত নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত এবং দুর্গসমূহ সংরক্ষিত করত তাহলে তারা বিদেশি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করতে সক্ষম হতো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সম্প্রতি চীনের দুটি যুদ্ধ জাহাজ জাপান নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু দ্বীপের জলসীমায় প্রবেশ করে। চীনের কাছে দ্বীপটি দিয়ায়ুস নামে পরিচিতি এবং এটিকে তারা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য দু'বার অভিযান প্রেরণ করে। কিন্তু এ অভিযান দুটিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল দু'বছরের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য তারা আবার অভিযান প্রেরণ করে এবং এই অভিযানে সফল হয়। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন? ১

খ. আরবদের ভারত অভিযানের প্রাক্কালে কনৌজ-এর অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত অভিযানের ঘটনাবলি ভারতের ইতিহাসে কোন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত অভিযানের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ, আলোর ও মুলতানের পতন ঘটেছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তা।

খ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে কনৌজ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এ সময় যশোবর্মণ এ রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁর সময় কনৌজ রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামরিক মর্যাদায় উত্তর ভারতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। যশোবর্মণের শাসনামলে তার সাম্রাজ্য হিমালয় হতে নর্মদা পর্যন্ত এবং বঙ্গদেশ হতে থানেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কনৌজে অভিযান চালান।

গ উদ্দীপকের ঘটনা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

দুবার অভিযান পরিচালনা করে ব্যর্থ হওয়া এবং সেই ব্যর্থতার গ্লানি দূর করতে পুনর্বার অভিযান পরিচালনা করাই উদ্দীপকে বর্ণিত চীনাদের অভিযান এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে উভয় অভিযানের প্রকৃতি একই ধরনের।

উদ্দীপকের বর্ণিত চীনারা পূর্বে দুইবার চেষ্টা করেও জাপানের টোকিও নিয়ন্ত্রিত 'সেনকাকু দ্বীপ' দখল করতে পারেনি। এ প্রেক্ষিতে তারা আবার দ্বীপটি দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করেছে। এ ধরনের ঘটনা মুসলমানদের সিন্ধু (বর্তমান পাকিস্তানের একটি প্রদেশ) অভিযানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রথমে সেনাপতি ওবায়েদুল্লাহ এবং পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর ২টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অভিযান দুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দুবার পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ বাছাই করা সৈন্য নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুতে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অভিযানের প্রকৃতিগত দিক এবং ঘটনাপ্রবাহ বিবেচনায় উদ্দীপকটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাথেই তুলনীয়।

ঘ উক্ত অভিযান অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ, আলোর ও মুলতানের পতন ঘটেছিল।

আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উৎসাহ ও প্রেরণায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবরা সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন, যা উদ্দীপকের চীন অভিযানেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে দিয়ায়ুস দ্বীপটি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য চীন দুর্বার অভিযান প্রেরণ করে। দু'বার ব্যর্থ হবার পর ৩য় অভিযানে তারা সফলকাম হয়। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে অভিযানে আরবরা সিন্ধু ও মুলতানসহ বেশকিছু অঞ্চল অধিকার করতে সক্ষম হয়। সিন্ধু রাজ্যের রাজধানী ছিল আলোর। রাজ্যটি ব্রাহ্মণ্যবাদ, সিস্তান, ইস্কান্দো ও মুলতান চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে প্রেরিত অভিযানে আরবরা দু'বার ব্যর্থ হয়। অবশেষে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে অভিযানে সিন্ধুর দেবল বন্দর আক্রমণের মধ্যদিয়ে সিন্ধুতে কাসিমের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা দাহিরের পরাজয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সিন্ধুর রাজধানী আলোর আরবদের করতলগত হয়। অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু শক্তির শেষ উৎস মুলতান নগরী অবরোধ করেন। তীব্র প্রতিরোধ মোকাবিলা করে ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী মুলতান জয় করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ, আলোর ও মুলতানের পতন ঘটেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৫ রাজশাহীর ছেলে আখতার জয়পুরহাটের বন্ধু শ্যামলের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করল সেখানে সমাজে বর্ণপ্রথা খুবই প্রকট। সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে দুটি বর্ণের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশি। সে এক নিম্ন শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে জানতে পারে যে, ধর্মশাস্ত্র শুনলে বা পাঠ করলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এছাড়া হিন্দু সমাজে আখতার এক শ্রেণির লোক দেখতে পায় যারা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত। শ্যামলের সমাজে অনেক মেয়েকে ১২ বছর বয়সে বিবাহের পিঁড়ায় বসতে হয় এবং অনেক পুরুষকে ৪/৫ টা বিবাহ করতে দেখা যায়। শামলের সমাজব্যবস্থা আখতারকে পীড়া দেয়। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. মুহম্মদ বিন কাশিম কত সালে সিন্ধু অভিযান চালান? ১

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আখতারের দেখা শ্যামলের সমাজব্যবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার কি মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজব্যবস্থা কেমন হলে আখতার দুঃখ না পেয়ে বরং খুশি হতো? মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭১১ সালে মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে অভিযান চালান।

খ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা।

সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৬ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। গজনির শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এটিকে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া সমরনায়ক হিসেবে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণের জন্য তার অনেক অর্থের দরকার ছিল। ফলে ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। আর ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি স্বীয় রাজ্য গজনির উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন।

গ উদ্দীপকের আখতারের দেখা সমাজব্যবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথার মিল লক্ষ করা যায়।

জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজব্যবস্থার একটি কুসংস্কার বলা যায়। ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ সৃষ্টি এই জাতিভেদ প্রথা। এ প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে একদল মানুষ সমাজে শোষিত হয় এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আবার বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের কারণে নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আরব আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতে বিদ্যমান ঘৃণ্য প্রথাগুলোই উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্যামলের সমাজে বর্ণপ্রথা বিদ্যমান থাকায় নিম্নশ্রেণির লোকেরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। আবার মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুরুষেরা ৪/৫টা বিয়ে করছে। ঠিক একইরকম পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায়। ভারতীয় হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। ধর্ম-কর্ম, যাগযজ্ঞের অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল অধঃপতিত ও অসহায়। বেদবাক্য শুনলে কিংবা গীতা পাঠ করলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। সামাজিকভাবে ছিল তারা অবহেলিত। আমার সমাজে নারীরা ছিল নানা শোষণ-বঞ্চনার শিকার। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় নারীদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো, যার ফলে তারা তাদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। আবার পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করে নারীর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করত।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাগুলো মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ শ্যামলের সমাজব্যবস্থা আধুনিক সভ্য সমাজব্যবস্থার অনুরূপ হলে আখতার দুঃখ না পেয়ে বরং খুশি হতো।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতে সমাজ ব্যবস্থা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এ সময় সমাজে বর্ণ প্রথা। জাতি ভেদ প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি নানা ধরনের সামাজিক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যা আধুনিক সভ্য সমাজের পরিপন্থি উদ্দীপকের শ্যামলের সমাজ ব্যবস্থায় অনুরূপ অবস্থা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্যামলের সমাজে জাতি-বর্ণ প্রথা প্রকট। সমাজে নিচু বর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়। এমনকি ধর্ম শাস্ত্র শুনলে বা পাঠ করলেও তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়। তার সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রচলিত রয়েছে, যা আধুনিক সভ্য সমাজে দেখা যায় না। আখতার শ্যামলের সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিক সমাজের কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পায় না। আধুনিক সমাজে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে। জাতিভেদে কারও প্রতি বৈষম্য করা হয় না। তাছাড়া বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো প্রথাগুলোকে আধুনিক সভ্য সমাজে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শ্যামলের সমাজব্যবস্থা আধুনিক সমাজের ন্যায় হলে আখতার দুঃখ না পেয়ে বরং খুশি হতো।

প্রশ্ন ▶২৬ অস্ট্রেলিয়ার একটি আদিম উপজাতি সূর্য দেবতার মন্দিরকে সবচেয়ে নিরাপদ ও শক্তির আধার মনে করে তাদের সকল ধন-সম্পদ সেখানে গচ্ছিত রাখে। তাদের বিশ্বাস শত্রু যতই শক্তিশালী হোক সূর্য দেবতা তাদের রক্ষা করবে। মন্দিরে ধন সম্পদ গচ্ছিত রাখার বিষয়ে একটি ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল অবগত হয়। তাদের স্বপ্ন ছিল গ্রিনল্যান্ডে তারা একটি অবকাশ কেন্দ্র স্থাপন করবে। এ জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য মন্দির লুণ্ঠন করার মনস্থির করে। অভিযাত্রীরা অস্ত্রে সস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মন্দির আক্রমণ করে। উপজাতিরা প্রাণপণ লড়াই করেও পরাজিত হয়। অভিযাত্রীরা মন্দির হতে প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করে। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. আল বিরুনির সিন্ধু বিজয় সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থটির নাম কী? ১
খ. হাজি শরিয়তউল্লাহর পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকের সূর্য দেবতার মন্দির আক্রমণের সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানেরর সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক দিকটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল বিরুনির সিন্ধু বিজয় সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থটি হলো 'কিতাবুল হিন্দ'।

খ হাজি শরিয়ত উল্লাহ ছিলেন ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭৮১ সালে তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ শেষে তিনি ১৭৯৯ সালে আরবে গমন করেন এবং পবিত্র হজব্রত পালন করেন। ১৮১৮ সালে তিনি বাংলায় ফিরে এসে বাংলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে ফরায়েজি আন্দোলন নামে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৪০ সালে আন্দোলনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের অভিযাত্রীদের মন্দির আক্রমণের উদ্দেশ্যের মধ্যে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৬ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রতিটি অভিযানেই তিনি সফল হন। তবে বিজিত কোনো অঞ্চলে তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি। বরং এসব অঞ্চল থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে তিনি নিজ রাজ্য গজনিতে নিয়ে যান। এটি তার ভারত অভিযানের পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। গজনির শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং একে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করার জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনীকে পোষণের মানসে এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদের অর্থের প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কল্পতরু মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। ভারত হতে সংগৃহীত অর্থ তিনি স্বীয় রাজধানী গজনির উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন। কেবল অর্থলোলুপতা চরিতার্থ করার জন্যই সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে এতবার যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। অধ্যাপক হাবিবের মতে, গৌরব ও স্বর্ণের লোভে মাহমুদ ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটন করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ধন-সম্পদ হস্তগত করার জন্যই ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল আফ্রিকার সূর্যদেবতার মন্দির আক্রমণ করে। অর্থাৎ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের এবং ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের সূর্য মন্দির আক্রমণের প্রধান ও মুখ্য বিষয় ছিল অর্থনৈতিক।

প্রশ্ন ▶২৭ ঘটনা-১: শতধাবিভক্ত পার্বত্য অঞ্চল ছিল গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় মি. হাসান অতি সহজেই অত্র অঞ্চল জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।
ঘটনা-২: পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও জাতিভেদের কারণে নিশ্চিতপুর এলাকায় অশান্তি বিরাজ করছিল। উঁচু বর্ণের মানুষের নিপীড়নের কারণে নিচু বর্ণের অনেক লোকই ধর্মান্তরিত হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকার রফিক সাহেব অতি সহজেই সেই এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১
খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে লেখো। ২
গ. ঘটনা-১ এ বর্ণিত হাসান সাহেবের পার্বত্য অঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ভারতের কোন কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত রফিক সাহেব যেন মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিচ্ছবি - যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ হাসান সাহেবের পার্বত্য অঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘটনা ভারতের মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রাক-মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তাই শাসকদের মধ্যে কোনো রকম ঐক্য ছিল না। তাই মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতের শাসকগণ কোনো শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলতে পারেননি। তাদের এ অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হাসান সাহেবের ঘটনায়ও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘটনা-১ এ আমরা দেখতে পাই যে, শতধাবিভক্ত পার্বত্য অঞ্চলে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় মি. হাসান অতি সহজেই অত্র অঞ্চল জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন কাসিমও ভারতের অরাজকতাপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার কারণে সহজেই সিন্ধু ও মুলতান জয় করতে সক্ষম হন। কেননা মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। একে অন্যের ওপর প্রাধান্য

Teachingbd24.com

প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র এ রাজ্যগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ফলে তাদের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল। আর এ বিরোধের কারণে আরবরা সিন্ধু ও মুলতান আক্রমণ করলে সামন্ত নেতারা সিন্ধুর রাজা দাহিরকে কোনো সহযোগিতা করেননি। ফলে সহজেই সিন্ধু মুসলমানদের দখলে আসে। উদ্দীপকের ঘটনা-১-এ এ ঘটনারই প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক সাহেব যেন মুহাম্মদ ঘুরীরই প্রতিচ্ছবি— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ লক্ষ করা যায় যে, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, জাতিভেদ প্রথা ও উঁচু বর্ণের মানুষের নিপীড়নের কারণে নিশ্চিতপুর এলাকার নিচু বর্ণের অনেক লোকই ধর্মান্তরিত হয়। ফলে রফিক সাহেব অতিদ্রুত এ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ বিষয়গুলোতে মূলত ভারতে মুহাম্মদ ঘুরীর সফল অভিযানের বিষয়ই ফুটে উঠেছে।

তৎকালীন ভারতে জাতিভেদ প্রথা ছিল হিন্দু সমাজের মূলভিত্তি। পুরোহিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা ছিল উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী। একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত। তাদের ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ এমনকি শোনারও অধিকার ছিল না। অধ্যাপক হাবিব বলেন, 'ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছা করে জনগণকে অজ্ঞ রাখতেন।' দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা জনসাধারণের দুর্বলতা ও ভীতির সুযোগ নিয়ে কেবল জীবিকা নির্বাহই করতেন না নিজেদের আধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করতেন। এ কারণে ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটার পর ইসলামের সুমহান সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার হিন্দু সমাজের জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক সামাজিক বৈষম্য তৈরি করেছিল। এ সকল কারণে ভারতের জনগণের মধ্যে অভিন্ন জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থার প্রেক্ষিতেই মুহাম্মদ ঘুরী এ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রকট আকার ধারণ করলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। তাছাড়া ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য না থাকায় বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। আর এ অবস্থায় মুহাম্মদ ঘুরী ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ হন এবং ভারত জয় করে স্থায়ী মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাই যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, ঘটনা-২ এর রফিক সাহেবের মাধ্যমে মূলত মুহাম্মদ ঘুরীকেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী জলদস্যুরা প্রায়ই অটোমান সুলতানদের বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করত। যার ফলে অটোমান সুলতানগণ অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কাজেই ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের আধিপত্য বিস্তার এবং জলদস্যুদের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য তারা উপকূলবর্তী দ্বীপগুলো দখলসহ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করেন। ফলে ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ সুগম হয়।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১

খ. সিন্ধু বিজয়ের অর্থনৈতিক কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অভিযানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন অভিযানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে আরবরা কীভাবে ভারতীয়দের ধর্মীয়, সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম মুহাম্মদ বিন কাসিম।

খ আরবদের সিন্ধু অভিযানের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ধন-সম্পদ আহরণ করা।

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও ভারতবর্ষ ছিল অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। প্রাচীনকাল হতেই আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আরব বণিকগণ তখনকার ভারতের ধনসম্পদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নতুন অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করা তাদের পেশা ও নেশায় পরিণত হয়েছিল। আর এ কারণেই বলা হয়ে থাকে আরবরা অর্থনৈতিক কারণে ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অভিযানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের আরবদের সিন্ধু অভিযানের মিল রয়েছে।

আরবদের সিন্ধু অভিযান মুসলিম ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। আরবগণ ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে এ অভিযান প্রেরণ করেন। তবে তাদের এ অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের আরবদের জাহাজ আক্রমণ। উদ্দীপকেও এ অভিযানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী জলদস্যুরা প্রায়ই অটোমান সুলতানদের বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করত। ফলে ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের আধিপত্য বিস্তার এবং জলদস্যুদের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য তারা উপকূলবর্তী দ্বীপগুলো দখলসহ বাইজান্টাইন সাম্রাজের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করেন। একইভাবে ভারতবর্ষের সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের দ্বারা আরবদের ৮টি জাহাজ লুণ্ঠন হয়। জানা যায় যে, সিংহলের রাজা আটটি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে সেগুলো জলদস্যুরা লুণ্ঠন করে। হাজ্জাজ সিন্ধু রাজা দাহিরের নিকট এর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু দখল করে নেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে আরবরা ভারতীয়দের ধর্মীয়, সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, অটোমান সুলতানদের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখলের মাধ্যমে ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। একইভাবে আরবরা সিন্ধু ও মুলতান দখল করে। আরবরা সিন্ধু ও মুলতান দখলের ফলে এ অঞ্চলের ধর্ম-সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রভাব পড়ে।

মুসলমানদের সিন্ধু ও মুলতান দখলের ফলে ভারতবর্ষে বহু আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের আগমন ঘটে। অনেক সুফি-দরবেশের আগমনে এ অঞ্চল শান্তি ও সমৃদ্ধির অভয়ারণ্যে পরিণত হয়। তাদের প্রচারিত ইসলামের শাশ্বত বাণী, সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা, উদারতা বর্ণপ্রথার কঠিন নিগড়ে নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। আবার আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তাদের বাণিজ্যিক লেনদেন আরও ব্যাপকতর হয়। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপকূলে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সুদূরপ্রসারী হয়, যা তাদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে। এ বিজয়ের ফলে এ অঞ্চলের সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন আসে। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং তাদের মধ্যে আন্তঃবিবাহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে সিন্ধুবাসীর জীবনে অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে। ফলে আর্য ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণে ভারতে এক নতুন জাতির উদ্ভব ঘটে। আর এ জাতিই প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-সারাসেনীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে এ অঞ্চলের ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের আধিপত্য তৈরি হয়। ফলে এ সকল ক্ষেত্রে মুসলিম রীতিনীতি ও সংস্কৃতির অত্যধিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ সম্প্রতি চীনের দুটি যুদ্ধ জাহাজ জাপান নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু দ্বীপের জলসীমায় প্রবেশ করেছে। বেইজিংয়ের কাছে দ্বীপটি 'দিয়াওউ' নামে পরিচিত। এটিকে তারা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য এর আগে দুইবার অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু এ অভিযান দুটিতে তারা ব্যর্থ হয়। দু'বারের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য তারা আবার সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। *[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. 'ললিতা বিগ্রহ রাজা' ও 'হারাকেলী' কখন রচিত হয়? ১

খ. ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনা আরবীয়দের কোন অভিযানের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুলতান মাহমুদের বারবার ভারত আক্রমণ এবং চীনাদের অভিযানকে একসূত্রে গাঁথা যায় কি? যৌক্তিক মত দাও। ৪

https://teachingbd24.com

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লি ও আজমিরের শাসক বিশালদেব চৌহানের শাসনামলে (১০৬৬-১১২০ খ্রি.) 'ললিতা বিগ্রহ রাজা' এবং 'হারাকেলী' নাটক রচিত হয়।

খ ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য জাতি, গোষ্ঠী ও নানা ধর্মের মানুষের বসবাস লক্ষ করে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) এই উপমহাদেশকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছেন।

আর্যদের আগমন থেকে শুরু করে আধুনিককালে ইউরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত বহু জাতি ভারতে প্রবেশ করেছে। প্রাচীন যুগে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক, গ্রিক, শাক্ত, কুষাণ, হুন; মধ্যযুগে আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং আধুনিক যুগে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষ বহু জাতিগোষ্ঠীর মহাজনসমাবেশে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণে ভিনসেন্ট স্মিথ একে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলে অভিহিত করেছেন।

গ সৃজনশীল ১১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ প্রকৃতি ও ধরন বিবেচনায় চীনাদের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের বারবার ভারত আক্রমণকে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্যগত দিক বিবেচনায় সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণ উদ্দীপকে উল্লিখিত অভিযান থেকে ভিন্ন। তাছাড়া সংখ্যার দিক দিয়েও সুলতান মাহমুদের ১৭ বার ভারত অভিযানই এগিয়ে। আবার প্রতিটি অভিযানে সুলতান মাহমুদের বিজয়ের দিকটিও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

জাপান নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু দ্বীপ অধিকারের জন্য চীনাদের তৃতীয়বার অভিযান প্রেরণের প্রেক্ষাপট হলো পূর্বের অভিযান দুটির ব্যর্থতা। পূর্বের ব্যর্থতার গ্লানি দূর করতেই তারা পুনর্বার অভিযান প্রেরণ করেছে। কিন্তু সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে যে ১৭টি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তার সবকটিই ছিল সফল। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বিপুল ধন- ঐশ্বর্যের মোহে পড়েই সুলতান একের পর এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাছাড়া বারবার সফল হওয়ার কারণেও সুলতান মাহমুদ একের পর এক অভিযানের প্রেরণা পেয়েছিলেন। বারবার অভিযানের মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী সমরনেতা। তিনি তার সমরদক্ষতার মাধ্যমে ভারত অভিযানে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি চীনাদের মতো কোনো ব্যর্থতার সম্মুখীন হননি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের চীনাদের অভিযান সুলতান মাহমুদের ১৭ বার ভারত আক্রমণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

প্রশ্ন ▶ ৩০ মণিপুরের লোকজন মির্জাপুরের একটি মালবাহী জাহাজ লুণ্ঠন করে ও ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে মির্জাপুরের জমিদার হাসেম খান মণিপুরে অভিযান চালান। মণিপুরের অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সেখানকার লোকজনও মির্জাপুরের সঙ্গে যোগ দেয়। এতে মির্জাপুরের অভিযান সফল হয়। *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক. নৃতত্ত্বের জাদুঘর কোন স্থানকে বলা হয়? ১
খ. জাতিভেদ প্রথা বলতে কী বুঝ? ২
গ. মণিপুর ও মির্জাপুরের জাহাজ লুণ্ঠন দ্বন্দ্বের সাথে পাঠ্যবিষয়ের কোন ঘটনার মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মণিপুরের রাজার অত্যাচারই তার পতনের অন্যতম কারণ" - তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলা হয়।

খ প্রাক-মুসলিম ভারতের হিন্দু সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল— যা জাতিভেদ প্রথা হিসেবে পরিচিত।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ ধর্মীয় বিধানের নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজের পৌরহিত্য ও সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণরা। ক্ষত্রিয়রা দায়িত্ব নেয় রাজ্য শাসনের। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। তাদের কোনো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। আর মানুষে মানুষে বর্ণের ভিত্তিতে সৃষ্ট এই ভেদাভেদকেই জাতিভেদ প্রথা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মণিপুর ও মির্জাপুরের জাহাজ লুণ্ঠন দ্বন্দ্বের সাথে পাঠ্যবইয়ের আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আরবদের সিন্ধু অভিযান মুসলিম ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে আরবগণ এ অভিযান প্রেরণ করেন। তবে তাদের এ অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের আরবদের জাহাজ আক্রমণ। উদ্দীপকের ঘটনায়ও এ অভিযানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মণিপুরের লোকজন মির্জাপুরের একটি মালবাহী জাহাজ লুণ্ঠন করে ও ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে মির্জাপুরের জমিদার হাসেম খান মণিপুরে অভিযান চালান। এ অভিযানে মণিপুরের অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সেখানকার লোকজনও যোগ দিলে মির্জাপুর সফল হয়। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশকিছু আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে, সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মূল্যবান উপঢৌকন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌঁছায় তখন জলদস্যুগণ জাহাজগুলো লুণ্ঠন করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন। তিনি ৭১১ খ্রি. ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ না, মণিপুরের রাজা অর্থাৎ সিন্ধুরাজ দাহিরের অত্যাচারই তার পতনের অন্যতম কারণ নয় বলে আমি মনে করি।

সিন্ধু রাজ দাহির নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি রণকুশলী এবং দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন না। তার মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও অভাব ছিল। ফলে মুসলিম আক্রমণের মুখে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। এছাড়া তার নিপীড়নে বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে কোনো সহযোগিতা করেনি বরং তারা আরবদের সিন্ধু দখলে সাহায্য করেছিল। এ কারণগুলো তার পতনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

রাজা দাহিরের অদূরদর্শিতা ও রণনীতি নির্ধারণে অপরিপক্বতা তার পরাজয় এবং আরব মুসলমানদের বিজয়কে সহজ করেছিল। তিনি মুসলিম বাহিনীর রণদক্ষতা, দিগ্বিজয়ে তাদের সাফল্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মুসলমানদের মেকরান বিজয়ের পরও তিনি সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তারা বিনা বাধায় নিরুন, সিওয়ান ও সিসাম জয় করে। তাছাড়া সিন্ধুর সামরিক বাহিনী ছিল বিশৃঙ্খল ও দুর্বল। মুসলিম বাহিনীর উন্নত সামরিক রণকৌশল থাকলেও তাদের ছিল অনুন্নত অস্ত্র-শস্ত্র এবং ত্রুটিপূর্ণ যুদ্ধকৌশল। এছাড়া ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বিরোধের কারণে সামন্ত রাজারা দাহিরকে সহযোগিতা করেননি। প্রাদেশিক শাসকদের কাছ থেকেও তিনি কোনো সাহায্য পাননি। যার ফলে তিনি মুসলিম বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, রাজা দাহিরের পতনে তার অত্যাচারই একমাত্র কারণ নয়। তার পতনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৩১ সালাহউদ্দিন নামক একজন শাসক বারবার অন্য একটি দেশে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অভিযান শেষে দেশে ফিরে যান। অভিযানে তিনি যে ধন-সম্পদ অর্জন করতেন তা শিক্ষা বিস্তার ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যয় করতেন। তিনি তার রাজ্যকে একটি সমৃদ্ধিশালী ও সুসজ্জিত রাজ্যে পরিণত করেন। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. রাজা দাহির কে ছিলেন? ১
খ. আলাউদ্দিন হোসেনকে জাহানসুজ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সালাউদ্দিনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই এ ধরনের হামলা পরিচালনা করেছিলেন? মতামত দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজা দাহির ছিলেন মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজা।

খ প্রতিশোধস্পৃহা থেকে গজনি রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করায় তৃতীয় শাহজাদা আলাউদ্দিন হুসাইন জাহানসুজ উপাধি লাভ করেন।
গজনির সুলতান বাহরাম শাহ ঘুর রাজ্য আক্রমণ করে কুতুবউদ্দিন ও সাইফউদ্দিন নামক দু'জন শাহজাদাকে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৃতীয় শাহজাদা আলাউদ্দিন ১১৫১ সালে গজনি দখল করে ৭ দিন ৭ রাত ধরে গজনিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এজন্য তিনি 'জাহানসুজ' বা 'পৃথিবীদাহক' হিসেবে খ্যাত।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ গজনি থেকে সবুক্তগীন বংশধরদের অবসান ঘটলে ঘুরী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক গজনির শাসক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি তার রণকৌশলের দ্বারা ভারতের অনেক রাজ্য তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ। তিনি ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. আল বিরুনি কে ছিলেন? ১
খ. সোমনাথ অভিযানের বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘুরী বংশের শাসক কীভাবে তরাইনের ২য় যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. তরাইনের ২য় যুদ্ধকে সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ বলার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত আরবীয় শিক্ষাবিদ ও গবেষক, যিনি ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।

খ সৃজনশীল ২১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘুরী বংশের শাসক অর্থাৎ মুহম্মদ ঘুরী তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি থেকে সৃষ্ট প্রতিশোধের স্পৃহা এবং উন্নত রণকৌশলের কারণে তরাইনের ২য় যুদ্ধে জয়লাভ করেন।
তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রি.) পরাজয়ের গ্লানি মুহম্মদ ঘুরীকে প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। এ অবস্থায় ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি পুনরায় যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় পৃথ্বিরাজ তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেন। থানেশ্বরের তরাইন প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রাণপণ যুদ্ধ করে। তাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী মুহম্মদ ঘুরীর উন্নত রণকৌশলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পলায়নরত অবস্থায় রাজা পৃথ্বিরাজ ধৃত ও পরে নিহত হন।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে— একজন শাসক তার রণকৌশলের দ্বারা ভারতের অনেক রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন, যা মুহম্মদ ঘুরীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শাসক হলেন মুহম্মদ ঘুরী এবং তিনি মূলত উন্নত রণকৌশলের কারণেই তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

ঘ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধকে সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ বলার কারণ হলো— এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।
১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে চূড়ান্ত সংঘর্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এটি হিন্দুস্থানের ওপর মুসলিম আক্রমণের চরম সাফল্যের সূচনা করেছিল। একদিকে এ বিজয় ছিল একজন দৃঢ়সংকল্প বিজেতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং অপরদিকে এটি ছিল পুরো দ্বাদশ শতাব্দী ধরে বিস্তৃত একটি ধারার সফল পরিণতি। বস্তুত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজপুতদের রাজনৈতিক শক্তি খর্ব হয় এবং তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর মুহম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত হয়। এ কারণেই এ বি এম হবীবুল্লাহ বলেন, মুহম্মদ ঘুরীর এ বিজয় কোনো বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিজয় কিংবা দৈব ঘটনা ছিল না। মূলত উল্লিখিত কারণগুলোর উপর ভিত্তি করেই তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটানোর জন্য যে মহানায়কের ভূমিকা ছিল অম্লান তার মৃত্যু নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেন দুজন নারীর সতীত্ব হননের জন্য খলিফা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। আবার কেউ বলেন রাজদরবারের ষড়যন্ত্র তার মৃত্যুর কারণ। বিষয়টি দুঃখজনক যে তার মতো শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, রাজনীতিবিদ ও শাসকের মৃত্যুর সত্যিকার রহস্য উদঘাটিত হবে না।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. দেবল বন্দর কোথায় অবস্থিত? ১
খ. সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে মহান শাসকের কথা বলা হয়েছে তার মৃত্যুর বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর সিন্ধু অভিযানে উক্ত শাসকের ভূমিকা ছিল অপরিসীম? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেবল বন্দর সিন্ধুতে অবস্থিত।

খ সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ হলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের মুসলমানদের ৮টি জাহাজ লুণ্ঠন।
অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে সিংহলের রাজা আটটি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে সেগুলো জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট এর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, যা সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ।

গ উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে মহান শাসকের কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। তার মৃত্যুর বিষয়টি সত্যিই খুব দুঃখজনক। 'চাচনামা' গ্রন্থের বিবরণ হতে জানা যায়, মুহাম্মদ বিন কাসিম বন্দি রাজা দাহিরের দুই কন্যা সূর্যদেবী ও পরিমল দেবীকে দামেস্কে খলিফা সুলায়মানের নিকট প্রেরণ করেন। তারা খলিফার নিকট অভিযোগ করেন যে, দামেস্কে প্রেরণের পূর্বে মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের শ্লীলতাহানি করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে খলিফা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে লবণ মিশ্রিত গরুর চামড়ার থলিতে পুরে রাজধানীতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ঐতিহাসিক তারিখ-ই-মাসুমির বর্ণনা মতে, চামড়ার থলিতে আবদ্ধ অবস্থায় তিন দিন পরে তার মৃত্যু ঘটে। পরবর্তীতে রাজকুমারীগণ খলিফাকে বলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে তাদের আনীত অভিযোগ মিথ্যা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই তারা এরূপ অভিযোগ করেছিল। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতি খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। 'ফতুহুল বুলদানে' উল্লেখ করা হয়েছে, খলিফার নির্দেশে মুহম্মদ বিন কাসিমকে রাজধানী দামেস্কে এনে কারারুদ্ধ করে খলিফার আদেশ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন শাসকের মৃত্যু নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন দুজন নারীর সতীত্ব হননের জন্য খলিফা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। আবার কেউ বলেন রাজদরবারের ষড়যন্ত্রের কারণে তার মৃত্যু ঘটে। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উদ্দীপকের মৃত্যুর ঘটনাটি মুহম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে শাসকের কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন মুহম্মদ বিন কাসিম।

Teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি সিন্ধু অভিযানে উক্ত শাসক অর্থাৎ মুহম্মদ বিন কাসিমের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ভারতবর্ষে পরপর দুটি অভিযানে অংশগ্রহণ করে ব্যর্থ হন। কিন্তু তিনি ব্যর্থতায় হতোদ্যম না হয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তার জামাতা সতেরো বছর বয়সী তরুণ সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে পুনরায় অভিযান প্রেরণ করেন। সাহসী বীর সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসিম ৬,০০০ সিরীয় ও ইরাকি সৈন্য, ৬,০০০ উষ্ট্রারোহী এবং ৩০০০ রসদবাহী উষ্ট্র নিয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দিকে যাত্রা করে মেকরানে উপস্থিত হন। মেকরানের শাসনকর্তা হারুন আরো সৈন্য দিলে সমন্বিত বাহিনী নিয়ে মুহম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দেবল বন্দর আক্রমণ করেন।, দেবল মুসলমানদের হস্তগত হলে মুসলিম বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় নিরুন, সিওয়ান এবং সিসাম জয় করে। আরব বাহিনীর ক্রমাগত বিজয়ে সিন্ধুর রাজা দাহির বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ৫০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাওয়ারে উপস্থিত হন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ও দাহিরের বাহিনীর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। ফলে সিন্ধু মুসলমানদের দখলে আসে।

উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, যখন হাজ্জাজ বারবার পরাজিত হচ্ছিলেন তখন মুহম্মদ বিন কাসিম তার সুকৌশল নেতৃত্ব দিয়ে সিন্ধু বিজয় করেন। তাই বলা যায়, সিন্ধু অভিযানে মুহম্মদ বিন কাসিমের অবদান অতুলনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ শিক্ষাই বদলে দিতে পারে জীবন। এ কথাটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সুনীল। আর তাই ৩৬ বছর বয়সী এই ভারতীয় পরিচ্ছন্নতা কর্মীর পেশায় নিয়োজিত থাকার পরও চালিয়ে গেছেন পড়াশোনা অর্জন করেছেন চারটি ডিগ্রি। তবে এত পড়াশোনা করেও নিজের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তন করতে পারেননি সুনীল। চাকরিতে তার কোনো পদোন্নতিও হচ্ছে না। কারণ তিনি দলিত বর্ণের এক হিন্দু তাদেরকে ছুঁয়ে দেখাও পাপ বলে মনে করেন অনেকে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার কোন দিকটি তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুনীলের ভাগ্যোন্নয়নে সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা কতটুকু কার্যকর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা আল বিরুনি।

খ ভৌগোলিক দিক থেকেও ভারতবর্ষ একটি বিচিত্র অঞ্চল। এর উত্তর, উত্তর পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), পশ্চিমে পারস্য (ইরান) ও আরব সাগর। বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটানের বিস্তৃত অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্যা পর্বত দেশটিকে দুটি অসমান ভাগে বিভক্ত করেছে। বিন্ধ্যা পর্বতের উত্তর অংশ 'আর্যাবর্ত' বা উত্তর ভারত এবং দক্ষিণাংশ 'দাক্ষিণাত্য' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার ধর্মীয় দিকটি তুলে ধরে।

জাতিভেদ প্রথা সনাতনপন্থি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত একটি কু-প্রথা। মানুষ পরিচয়কে ছোট করে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করাই এ প্রথার মূলকথা। এর ফলে অনেক মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে এ দিকটি প্রবল ছিল, যা উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত সুনীল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত ছোট জাতের বলে চাকরিতে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ ঘটনাটি হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। মুসলমানদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে এ জাতিভেদ প্রথা আরও প্রকট ছিল। সে সময় পুরোহিত শ্রেণির অন্তর্গত ব্রাহ্মণেরা ছিল উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী। অথচ একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। তাদের ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ ও শোনার অধিকারও ছিল না। পেশাগত ক্ষেত্রেও তাদের স্ব-স্ব পেশার বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না। অর্থাৎ উদ্দীপকের সুনীল যেমন তার অধিকার ও প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত, তেমনি তৎকালীন সময়ে নীচু জাতের হিন্দুরাও বঞ্চিত ছিল। সুতরাং বলা যায়, সুনীলের পরিস্থিতি আমাদের সামনে তৎকালীন অধিকারবঞ্চিত হিন্দু সমাজের চিত্রই উপস্থাপন করে।

ঘ সুনীলের ভাগ্যোন্নয়নে সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ কার্যকর।

মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ কিংবা ধন-সম্পদের ওপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ করা ঠিক নয়। বরং সকল মানুষ সমান এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করাই যুক্তিসংগত এবং বিবেকবান মানুষের কাম্য। এ সাম্যের জয়গান গেয়ে সিন্ধু বিজয়ের (৭১২ খ্রি.) পর ভারতবর্ষে ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছিল। সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল থেকে আমরা সাম্যের এ মহান শিক্ষাই পাই।

উদ্দীপকের সুনীলের ক্ষেত্রে যদি জাতিভেদ প্রথার নিষ্পেষণ না থেকে সাম্য বজায় থাকত তাহলে তিনি খুব সহজেই তার ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে পারতেন। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি অবহেলিত। অথচ ভারতবর্ষে সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল থেকে আমরা ভেদাভেদহীন সমাজ গঠনের শিক্ষা পাই। এ শিক্ষা যদি সুনীলের নিয়োগকর্তারা বাস্তবজীবনে অনুসরণ করেন তাহলে সমাজে সহজেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সিন্ধু বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তখন কারো বঞ্চিত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার কুফল সিন্ধু বিজয়ের পর সবাই অনুধাবন করতে পেরেছিল। এ জন্য শান্তির ধর্ম ইসলামের সাম্য নীতিতে মানুষ আস্থা স্থাপন করেছিল। বর্তমান সময়ের আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে সব ধর্মের মানুষেরই এ শিক্ষায় উজ্জীবিত হওয়া উচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে, সুনীলের মতো মানুষদের প্রাপ্য সম্মান দিতে সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফলের সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ আনিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন ছাত্রী। সে একটি গবেষণা পত্র তৈরি কর। গবেষণায় সে উল্লেখ করে খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে ১৭ বছরের এক তরুণ মুসলিম সেনাপতির নেতৃত্ব ভারতবর্ষে একটি অভিযান প্রেরিত হয়। আর এ অভিযানে জয়লাভের কারণেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন পথ সুগম হয়। যদিও অনেক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এই জয়লাভ বা বিজয় ছিল নিষ্ফল। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১

খ. 'কুতুব মিনার' সম্পর্কে টীকা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জয়ের কারণে কীভাবে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পথ সুগম হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি এই বিজয়কে নিষ্ফল বলে মনে কর? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ দিল্লির 'কুতুব মিনার' ছিল কুতুবউদ্দিন আইবেকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইসলামের বিজয়গাঁথা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত সুফি কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে তা তৈরি করা হয়। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক মিনারের নির্মাণকার্য আরম্ভ করলেও তা সমাপ্ত হয় সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে। এর উচ্চতা ২৩৮ ফুট এবং মিনারটি ৪ তলাবিশিষ্ট। এর বারান্দা সমকোণবিশিষ্ট পাথরের দ্বারা নির্মিত এবং মিনারটির ঘোরানো সিঁড়ির গায়ে কুরআন শরিফের আয়াত খোদাই করা রয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা তাদের ভারতবর্ষে আগমনের পথ সুগম করে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ বিজয় ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হলেও মুসলিম সুফি-দরবেশ ও বণিক শ্রেণির আসার উপযুক্ত পরিবেশ

https://teachingbd24.com

সৃষ্টি করেছিল। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আছে এবং দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যা এ অঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের পথকে সুগম করেছিল।

উদ্দীপকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। যে বিজয়ের ফলে অসংখ্য পির-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আগমন করে। তাদের প্রচারিত ইসলামের শাশ্বত বাণী সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা, বর্ণপ্রথার কঠিন নিগড়ে নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এছাড়া এ বিজয়ের ফলে আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়। আরব মুসলমানদের অনেকে বিজিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে। এভাবেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্থায়ীভাবে বসবাস ও স্থানীয় জনগণের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির ফলে মুসলমানদের আগমনের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যা ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের ধারাকে বেগবান করে।

ঘ সৃজনশীল ১৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ মাত্র ২৬ বছর বয়সে এক সুলতান উপমহাদেশে অভিযান শুরু করেন। নবম অভিযান ছিল তার উল্লেখযোগ্য অভিযান। এছাড়া ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত তার ১৬তম অভিযানও ইতিহাস খ্যাত।

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. সুলতান মাহমুদের পিতার নাম কী? ১
খ. 'সড়ক-ই-আজম' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন মুসলিম সুলতানের বিভিন্ন অভিযানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ইঙ্গিতপূর্ণ অভিযান দুটি ছাড়াও উক্ত সুলতান বার বার উপমহাদেশ আক্রমণ করেন বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদের পিতার নাম আমীর সবুক্তিগীন।

খ সড়ক-ই-আজম বা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড শেরশাহ নির্মিত একটি রাস্তা শের শাহ নির্মিত রাস্তাসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল সড়ক-ই-আযম বা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ এ রাস্তাটি পূর্ব বঙ্গের সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গ উদ্দীপকে সুলতান মাহমুদের পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অধিকার এবং সোমনাথ অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সুলতান মাহমুদ পিতার ন্যায় একজন উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। তিনি মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে আক্রমণ শুরু করেন। তার এ অভিযানগুলোর মধ্যে নবম অভিযান ছিল উল্লেখযোগ্য অভিযান। তিনি এ অভিযানটি ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিলোচন পাল-এর বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। তিনি তার এ অভিযানে ত্রিলোচন পালকে কাশ্মীরে বিতাড়িত করে নন্দনা অধিকার করেন। এরপর মাহমুদ কাশ্মীর আক্রমণ করে ত্রিলোচন পাল ও তার আশ্রয়দাতা কাশ্মীররাজা তুঙ্গারকে পরাজিত করেন। এরপর ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ তার ষোড়শ অভিযানে সোমনাথ বিজয় করেন। তিনি সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। এ অভিযান থেকে প্রাপ্ত সম্পদ তিনি গজনিতে নিয়ে যান। তার এ অভিযান ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ দুটি অভিযান ছাড়াও সুলতান মাহমুদ আরও ১৫টি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি তার প্রতিটি অভিযানই সফলভাবে পরিচালনা করেন।

সুলতান মাহমুদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে। ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে তার দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় তার পিতৃশত্রু জয়পালের বিরুদ্ধে। পেশোয়ারের নিকট একটি যুদ্ধে তিনি জয়পালকে পরাজিত করেন। ঝিলাম নদী তীরস্থ ভীরার রাজা বিজয় রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে ১০০৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ তার তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের রাজা আনন্দপাল এবং মুলতানের শাসনকর্তা আবুল ফাতেহ দাউদের বিরুদ্ধে তিনি চতুর্থ অভিযান প্রেরণ করেন। আর ১০০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সুখপালের বিরুদ্ধে তার পঞ্চম অভিযান প্রেরণ করেন। এছাড়াও সুলতান মাহমুদ ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্মিলিত হিন্দুবাহিনীর বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযান চালান। তিনি ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে সপ্তম অভিযানে কাংড়া ও নগরকোট দুর্গ অধিকার করে বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত করেন। ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মুলতানের শাসনকর্তা দাউদের বিরুদ্ধে অষ্টম অভিযান পরিচালনা করে তাকে পরাজিত করেন। তিনি ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে দশম অভিযানের মাধ্যমে থানেশ্বর বিজয় করেন। এছাড়াও ১০১৫-১০১৬ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ একাদশ অভিযানে কাশ্মীর দখলে ব্যর্থ হন। সুলতান মাহমুদ ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুশাহী রাজধানী কনৌজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ত্রয়োদশ অভিযানে চান্দেলারাজ গোন্ডাকে পরাজিত করেন। এছাড়াও তিনি তার চতুর্দশ অভিযানে গোয়ালিয়র দখল করেন। তিনি পঞ্চদশ অভিযানে কালিঞ্জর এবং জীবনের শেষ অর্থাৎ সপ্তদশ অভিযানে জাঠদের পরাজিত করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, সুলতান মাহমুদ ১০০০–১০২৬ খ্রি. পর্যন্ত মোট ২৭ বছরে ভারতবর্ষে ১৭টি অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ আরিফ একটি ইসলামের ইতিহাস বই পড়ে তার বন্ধু আসিফকে বলেন— ভারতবর্ষে এমন একজন সুলতান ছিলেন, যিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ২৭ বছরে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রতিটি অভিযানে জয়লাভ করেন। এসব অভিযানের ফলে প্রচুর ধনসম্পদ সুলতানের হস্তগত হয়।

[কক্সবাজার সিটি কলেজ]

ক. মুহাম্মদ ঘুরীর আসল নাম কী? ১
খ. রাজা দাহিরের পরিচয় দাও। ২
গ. আরিফের পঠিত সুলতানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সুলতানের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার পঠিত সুলতান যে কারণে অভিযান পরিচালনা করেন তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ ঘুরীর আসল নাম মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী।

খ রাজা দাহির ছিলেন সিন্ধুর রাজা।

মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের (৭১২ খ্রি.) সময়কালে সিন্ধুর রাজা ছিলেন দাহির। সিন্ধুর পূর্ববর্তী রাজা চাচ মৃত্যুবরণ করলে সিন্ধু রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে চাচের পুত্রদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। উক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে দাহির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পরাজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও উদ্ধত, যা তার পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ 'ক' নামের একজন বীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য একটি বৃহৎ অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু তা রাজনৈতিকভাবে ফলাফল শূন্য হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী, দুটি ভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে ঐ অঞ্চলের সমাজব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাদের মধ্যে বিনিময়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংযোগ সম্ভব হয়।

[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. ভারতবর্ষ কোন মহাদেশে অবস্থিত? ১
খ. আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' এর বিজয়ের মধ্যে প্রাক-সালতানাত যুগের কোন সেনাপতির বিজয়ের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।

খ সৃজনশীল ৩৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর বিজয়ের মধ্যে প্রাক-সালতানাত যুগের তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একটি বৃহৎ অঞ্চল দখল করেন। কিন্তু তার এ বিজয় রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। তবে এ বিজয়ের ফলে বিজিত অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সফলতার সাথে সিন্ধু ও মুলতান বিজয় করেছিলেন। কিন্তু তার এ বিজয় রাজনৈতিকভাবে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। কারণ আরব আধিপত্য কেবল সিন্ধু ও মুলতানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ভারতের অপরাপর অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব পড়েনি। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ বিজয়ের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সামাজিক ক্ষেত্রে আরব বসতি ও আন্তঃবিবাহের ফলে আরবদের মধ্যে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি প্রবেশ করে। আবার সিন্ধুবাসীর জীবনও পরিবর্তিত হয়। আরবদের বিজয়ের ফলে ভারতের দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য, চিত্রশিল্পসহ সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আন্তঃবিনিময় নতুন সংস্কৃতির দ্বার উন্মোচন করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটির সাথে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফলের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উক্ত বিজয় অর্থাৎ সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়— মন্তব্যটি যথার্থ।

আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের চেহারায় আমূল পরিবর্তন সাধন করে। হিন্দু অভিজাত শ্রেণির বৈষম্য ও নির্যাতনের বিপরীতে ইসলামের সুমহান আদর্শ তাদেরকে নতুন জীবনের পরশ এনে দেয়। ফলে এখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে ভারতে বসতি স্থাপন করে। আরবগণ বিজিত অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করে। তারা ইসলামের দর্শন ও জীবনধারাকে এদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেন। সিন্ধু ও মুলতানে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। সিন্ধুর বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরবগণ সর্বপ্রথম হিন্দু সম্প্রদায়ের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ফলে উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। আরবদের কল্যাণমুখী শাসন ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, উভয়ের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিমের এ সহাবস্থানই পরবর্তীতে ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় এ রাজ্যের চেহারা সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়। আর্যদের আগমনের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে একে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ এ ঘটনা ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থাকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনা তা করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের আমলে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য জয় হলো স্পেন বিজয়। এ সময় স্পেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তখন স্পেনের রাজা ছিলেন রডারিক। তিনি অত্যাচারী শাসক ছিলেন। ফ্লোরিডার সাথে অন্যায় আচরণ করার কারণে তার বাবা কাউন্ট জুলিয়ান আফ্রিকার গভর্নর মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানান। মুসা বিন নুসায়ের তারেক বিন জিয়াদকে সঙ্গে নিয়ে স্পেন আক্রমণ ও জয় লাভ করেন। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. সিন্ধু বিজয়ের সময় ইরাকের শাসনকর্তা কে ছিলেন? ১

খ. মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পেন আক্রমণের কারণের সাথে মুসলমানদের সিন্ধু আক্রমণের কারণের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পেনের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার চেয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা ছিল বেশি শোচনীয়—এর পক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পেন বিজয়ের কারণের সাথে মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণের প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

খলিফা ওয়ালিদের আমলে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তার কঠোর শাসনে কতিপয় বিদ্রোহী আরব সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধু দেশে গমন করলে সিন্ধুরাজ দাহির তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করে। হাজ্জাজ বিদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তনের দাবি জানালে রাজা দাহির তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এছাড়া পরবর্তীতে সিন্ধুর দেবল বন্দরে সিংহল রাজার প্রেরিত উপঢৌকনপূর্ণ আটটি যুদ্ধজাহাজ লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু এবারও তিনি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে স্পেন বিজয় হয়। এ সময় স্পেনের রাজা ছিলেন রডারিক। তিনি অত্যাচারী শাসক ছিলেন। ফ্লোরিডার সাথে অন্যায় আচরণ করার কারণে তার বাবা কাউন্ট জুলিয়ান উত্তর আফ্রিকার গভর্নর মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানালে তিনি ও তারিক বিন জিয়াদ সম্মিলিতভাবে স্পেন জয় করেন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সিন্ধু ও স্পেন মুসলমান কর্তৃক বিজিত হলেও এ দুটি ঘটনার মধ্যে প্রেক্ষাপট বা কারণগত ভিন্নতা ছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'স্পেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চেয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল বেশি শোচনীয়'— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সে সময়ে ভারতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। মৌর্য সম্রাট অশোক ও হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারের অভাবে ভারতে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা না থাকায় স্বার্থগত দ্বন্দ্বের কারণে এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। তৎকালীন ভারতের সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। হিন্দু সমাজে সংকীর্ণ জাতিপ্রথা বিদ্যমান ছিল। সমাজে নানা ঘৃণ্যপ্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। বহু বিবাহ প্রচলিত থাকলেও বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

খলিফা ওয়ালিদের সময় মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালেও সেখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। স্পেন কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত না এবং স্পেনে ভারতের জাতিভেদ প্রথা ও বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রচলন ছিল না। এজন্য আমি মনে করি তৎকালীন স্পেনের চেয়ে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বেশি শোচনীয় ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪০ সম্রাট ইভান ছিলেন একজন দিগ্বিজয়ী বীর। বিজয়ের নেশায় তিনি একই অঞ্চলে ১৭ বার আক্রমণ করেন। এই ১৭ বারের মধ্যে এটা ছিল ১৬তম অভিযান। উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল এক ধর্মীয় উপাসনালয় আক্রমণ। কিন্তু এই আক্রমণ ইভানের জীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। ঘটনাস্থলে তিনি ও তার সৈন্যবাহিনী চরম পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁর অনেক সৈন্য মারা যায়। *[ডা: আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]*

ক. গজনি কোথায় অবস্থিত? ১

খ. আল বিরুনি সম্পর্কে আলোচনা কর। ২

গ. সম্রাট ইভানের ১৬তম অভিযানের সাথে তোমার পঠিত সুলতান মাহমুদের কোন অভিযান সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সম্রাট ইভানের ১৬ তম অভিযান অপেক্ষা সুলতান মাহমুদের ১৬ তম অভিযান কোন অর্থে অধিক গ্রহণযোগ্য? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গজনি আফগানিস্তানে অবস্থিত।

Teachingbd24.com

ঘ আবু রায়হান আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষী।
আল বিরুনি ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজমে (আফগানিস্তানে অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল হিন্দ। তিনি সুলতান মাহমুদের দরবারের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও গবেষক ছিলেন। ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

গ সম্রাট ইভানের ১৬তম অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের ১৬তম অভিযান তথা সোমনাথ মন্দির (গুজরাটের চালুক্য রাজ্যের কাথিওয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত) আক্রমণের সাদৃশ্য রয়েছে।
সুলতান মাহমুদ (আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি রাজ্যের শাসনকর্তা) ছিলেন সাহসী ও সমরপ্রিয় বীর। ১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার এ অভিযানের কারণ হিসেবে সম্পদের প্রতি মোহকে দায়ী করেন। সুলতান মাহমুদের ষোলোতম অভিযান তথা সোমনাথ মন্দির আক্রমণ এবং সেখান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। আর উদ্দীপকেও এরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট ইভান ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি একই অঞ্চলে ১৭ বার আক্রমণ করেন। তার ১৬ তম অভিযানে তিনি ধর্মীয় উপাসনালয় আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, সোমনাথ বিজয় সুলতান মাহমুদের সাধ্যের বাইরে ছিল বলে পুরোহিতরা মনে করতেন। কিন্তু ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দিরে অভিযান পরিচালনা করেন। মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার আক্রমণ থেকে সোমনাথ মন্দিরকে রক্ষা করতে পারেননি। সুতরাং দেখা দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয় আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঘটনায় সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ সম্রাট ইভানের ষোলতম অভিযান অপেক্ষা সুলতান মাহমুদের ষোলতম অভিযান সফলতার দিক থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য।
সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে তার ষোলতম অভিযান সোমনাথ মন্দিরে পরিচালনা করেন। এ অভিযানে গুজরাটের রাজা ভীমদেবের নেতৃত্বে হিন্দুরা বাধা দিলেও সুলতান মাহমুদ তা বিজয় করতে সক্ষম হন। এটি বিজয় করে মন্দিরস্থ প্রায় ৩০০ দেব-দেবীর মূর্তি বিচূর্ণ করা হয়। এ মন্দির হতে সুলতান মাহমুদ দু' কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং প্রচুর অলঙ্কার হস্তগত করেন। ঐতিহাসিক ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সোমনাথ বিজয় মাহমুদের ললাটে নতুন বিজয় গৌরব সংযুক্ত করে।" ড. নাজিম বলেন, "সোমনাথ অভিযান ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম দুঃসাহসিক কার্য।" ফলে সোমনাথ বিজয় করে সুলতান মাহমুদ প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হন। আর উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সম্রাট ইভানের ষোলতম অভিযান তার জীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। ঘটনাস্থলে তিনি ও তাঁর সৈন্যবাহিনী চরম পরাজয় বরণ করেন এবং অনেক সৈন্য মারা যায়।
পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান মাহমুদের ষোলতম অভিযান ছিল সফলতার দীপ্ততায় পরিপূর্ণ আর সম্রাট ইভানের ষোলতম অভিযান ছিল ব্যর্থতার সাগরে নিমজ্জিত।

প্রশ্ন ▶ ৪১ ইমন একজন টগবগে তরুণ। তাঁর মেধা ও সামরিক প্রতিভা সবাইকে মুগ্ধ করে। তাঁর একজন নিকটাত্মীয় মঞ্জিলাবাদ সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ও উচ্চাভিলাষী। নতুন দেশ, রাজ্য ও জনপদ জয় করে তিনি আনন্দ পেতেন। সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই তিনি উক্ত দেশের শাসকের শাস্তি প্রদানের জন্য একাধিক অভিযান পাঠান। কিন্তু এগুলো ব্যর্থ হয়। অবশেষে ইমন তাকে পরাজিত ও নিহত করে দেশটিকে মঞ্জিলাবাদ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

[ডা: আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

ক. শাহনামার রচয়িতা কে? ১
খ. রাজা দাহির সম্পর্কে আলোচনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ভারতবর্ষে কোন বিজয়াভিযানের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অভিযানকে কি নিষ্ফল বিজয় উপাখ্যান বলে অভিহিত করা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাহনামার রচয়িতা মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি।

খ সৃজনশীল ৩৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনাটি ভারতবর্ষে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়াভিযানের সাথে সংগতিপূর্ণ।
মুসলমানদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষে মুসলিম ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ এ বিজয়ের মধ্যদিয়েই মুসলমানরা ভারতে প্রবেশ করে। আর এ অভূতপূর্ব বিজয়ে নেতৃত্ব দেন তরুণ বিজেতা ও সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন সেনানায়ক মুহাম্মদ বিন কাসিম। আর তার এ সফল অভিযানেরই প্রতিফলন উদ্দীপকে লক্ষণীয়
মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন উমাইয়া খলিফার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশপাল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর জামাতা। তরুণ ও সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন মুহাম্মদ বিন কাসিম সহজেই রাজশক্তির নজর কাড়ে। সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সিন্ধু প্রদেশের রাজা দাহিরের সাথে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সম্পর্কের অবনতি হয়। তাই তিনি সিন্ধুরাজা দাহিরকে শাস্তি প্রদানের জন্য ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তার দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। অবশেষে হাজ্জাজ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তার জামাতা ১৭ বছর বয়সী তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধুতে প্রেরণ করেন। কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন। পরে তিনি নিহত হন, এর ফলে সিন্ধু মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমনের বিজয়াভিযানের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়াভিযান সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

ঘ সিন্ধু বিজয় কে শুধু নিষ্ফল অভিযান বলা যথাযথ হবে না। কারণ, মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর সিন্ধু ও মুলতানে আরব শাসন দেড়শ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাছাড়া তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।
আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই স্থায়িভাবে ভারতে বসতি স্থাপন করেন এবং বিজিত অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন, তাদের কীর্তি আজও বিদ্যমান। ইতিহাসবিদ টড 'রাজস্থানের ইতিহাস' গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এর ধর্মীয় ফলাফল ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পীর-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্যে আগমন করেন, যাদের প্রভাবে সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ইসলাম ধর্মে দলে দলে নির্যাতিত সম্প্রদায় যোগদান করতে থাকে।
সিন্ধু ও মুলতানে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয় এবং উভয় দেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরবগণ সর্বপ্রথম হিন্দু সম্প্রদায়ের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ফলে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সমঝোতা ও সহ-অবস্থান নতুন কৃষ্টির সূচনা করে। আর্য ও সেমেটিক জাতির এ মহামিলন ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করে। আরবদের কল্যাণমুখী শাসন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো সংরক্ষণ উভয়ের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিমের এ সহাবস্থানই পরবর্তীতে ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল।
সুতরাং আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আরবদের সিন্ধু অভিযান কোনো নিষ্ফল বিজয় অভিযান নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪২ 'ক' রাজ্যের অধিপতিরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মির্জা খালিদ অন্য রাজ্যকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করার অভিপ্রায়ে অভিযান চালান এবং প্রথম যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হন। পূর্বের পরাজয়ের গ্লানি মোচন করতে গিয়ে তিনি তাঁর সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনীসহ একটি শক্তিশালী বিশাল বাহিনী নিয়ে পরের বছর একই প্রান্তরে দ্বিতীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তিনি বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন এবং স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

[ডা: আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

https://teachingbd24.com

ক. কার নাম অনুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ করা হয়? ১
খ. সোমনাথ অভিযান সম্পর্কে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মির্জা খালিদের যুদ্ধের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের কী সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনশ্রুতি অনুযায়ী রাজা ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ করা হয়।

খ সৃজনশীল ২১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মির্জা খালিদের যুদ্ধ পাঠ্যবইয়ের তরাইনের যুদ্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে– মির্জা খালিদ অন্যরাজ্যকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার অভিপ্রায়ে অভিযান করেন এবং প্রথমবার পরাজিত হন। দ্বিতীয় যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হলেও তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ইতিহাস পাঠে দেখতে পাই মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজ এর মুখোমুখি হন। ১১৯১ সালে থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইন নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিতি। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর বাহিনী পরাজিত হয়। পরবর্তীতে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ ঘুরী ১১৯২ সালে ১,২০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। ঘুরীর মোকাবিলায় পৃথ্বিরাজ ৩,০০,০০০ সৈন্য সমবেত করেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ ঘুরীর উন্নত রণকৌশলের কাছে পৃথ্বিরাজের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ঘটে। ইতিহাসে এটা তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিতি। তরাইনের ২য় যুদ্ধের ফলে ভারতে মুহাম্মদ ঘুরী স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুতরাং যা কিনা উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে হুবহু মিলে যায়।

ঘ মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উক্ত শাসক অর্থাৎ মুহাম্মদ ঘুরীর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। পরাজয়ে হতোদ্যম না হয়ে লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি অবিচল দৃঢ়তার পরিচয় দেন। তিনি যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন তা ভারতে প্রায় ৭০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। বস্তুত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম করে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম স্থায়ী আসন দখল করে আছেন। মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী। এ.বি এম হবীবুল্লাহ বলেন, "সিন্ধু দরিয়া থেকে যমুনা পর্যন্ত প্রায় সাংবাৎসরিক সামরিক অভিযান তার সমরকুশলতা উল্লেখযোগ্যরূপে প্রমাণ করে।" তিনি প্রতিভার মূল্যায়ন করতেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক, তুগ্রিল ও ইয়ালদুজের মতো প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের তিনি তাঁর বিজয় অভিযান ও প্রশাসনে সাফল্যের সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। মুহাম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর তার নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে দায়িত্ব দিয়ে গজনিতে ফিরে যান। কনৌজের রাজা জয়চাঁদকে দমনের জন্য তিনি পুনরায় ভারতে আসেন এবং চান্দওয়ার যুদ্ধে জয়চাঁদকে পরাজিত করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর সেনানায়কদের মাধ্যমে গোয়ালিয়র, গুজরাট, কালিঞ্জর, বাংলা ও বিহারে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পাঞ্জাব ও মুলতানের বিদ্রোহসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘুরীর রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ অটোমান সুলতান অরখান জেনিসার বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করে অর্থ। সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজ এলাকার নিজ এলাকার উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। সম্প্রতি একটি দ্বীপের সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত ধর্মীয় উপাসনালয়ের মূল্যবান অর্থ সম্পদের সন্ধান পেয়ে অরখান সেটি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এই অভিযানে তিনি অফুরন্ত ধনরত্ন, মণিমাণিক্য ও হীরা-জহরত হস্তগত করেন। যা তার রাজ্যের উন্নতিতে ব্যয় করেন বলে মনে করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও উপাসনালয়টিকে লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. 'শাহনামা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১
খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয়টি আক্রমণের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অরখানের মতো ইঙ্গিতকৃত তোমার পঠিত শাসক কি রাজত্বে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে এনেছিলেন? মতামত দাও। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাহনামা গ্রন্থের রচয়িতা মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি।

খ সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

আরব মুসলিমদের সিন্ধু বিজয়ের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে ইসলামের বীজ রোপিত হয়। এ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পির-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন এবং তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া, হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতি প্রমুখ মনীষীগণ। তাদের প্রচারিত ইসলামের শাশ্বত বাণী সাম্য, মৈত্রী, বর্ণপ্রথার কঠিন নিগড়ে নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে অরখানের মতো ইঙ্গিতকৃত শাসক তথা সুলতান মাহমুদও তার রাজত্বে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে এনেছিলেন।

সুলতান মাহমুদ একজন উচ্চাভিলাষী এবং অর্থলোভী সমরনায়ক ছিলেন। রাজ্যাভিযানে তিনি আনন্দ পেলেও তার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। নিজ সাম্রাজ্য গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও অনিন্দ্যসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার প্রচুর সম্পদের দরকার ছিল। আর ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কল্পতরু মনে করে এখানে বার বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ হস্তগত করে গজনির শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যয় করেন। অটোমান সুলতান অরখানের অভিযানের পেছনেও এ ধরনের উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অটোমান সুলতান অরখানের গঠিত জেনিসারি বাহিনী বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করে। সুলতান এ সম্পদ ব্যয় করে অটোমান সাম্রাজ্যের উন্নয়নে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইভাবে সুলতান মাহমুদ গজনি রাজ্যকে বিশ্বের তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করার জন্য এর সুসজ্জিতকরণ, নিজ সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, বিরাট সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি কারণে ভারতে বার বার অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযানে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ তিনি সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন। তিনি গজনিকে অতুলনীয় সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করেন। তার চেষ্টায় গজনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুলতান গজনিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি জাদুঘর নির্মাণ করেন। তিনি গজনিতে 'স্বর্গীয় বন্ধু' নামের যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা ঐতিহাসিকদের কাছে প্রাচ্যের বিস্ময় বলে অভিহিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে অরখানের মতো ইঙ্গিতকৃত শাসক তথা সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে সংগৃহীত বিপুল ধনৈশ্বর্য দ্বারা তার রাজত্বে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে এনেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ সত্ত্বেও কতিপয় দুষ্কৃতকারী এর সাথে জড়িত থেকে অবাধে এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালায়। পরপর দুবার অভিযান চালিয়েও সেসকল দুষ্কৃতকারীদের ধরতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর পুলিশ বিভাগের র‍্যাব সদস্যদের নেতৃত্বে একটি অভিযান চালিয়ে দশ জন মাদক ব্যবসায়ীকে ধরা সম্ভব হয়। ফলে রায়ের বাজার এলাকায় মাদকের ব্যবহার কমে আসে। *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. মুসলমানের সিন্ধু অভিযানের সময় সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন? ১
খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের করুণ মৃত্যুর ঘটনা লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে র‍্যাব অভিযানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন অভিযানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অভিযানের সুদূরপ্রসারী ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

Teachingbd24.com

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানের সময় সিন্ধুর রাজা ছিলেন দাহির।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে 'র‍্যাবের' অভিযানের সাথে পাঠ্যবইয়ের মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়েল নামক দুজন সেনাপতির নেতৃত্বে সিন্ধু রাজ্যের বিরুদ্ধে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু তার দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। উপর্যুপরি ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে হাজ্জাজ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে পুনরায় সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম এ অভিযানে বীরত্বের সাথে জয়লাভ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাদকদ্রব্য চোরাচালানকারীদের ধরতে পুলিশ দুবার অভিযান চালায়। কিন্তু পরপর দুবার তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে পুলিশ ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে র‍্যাবের সহায়তায় তারা মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাচালানকারীদের গ্রেফতার করে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের র‍্যাবের অভিযানের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত অভিযান বলতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানকে বোঝানো হয়েছে। আর এ অভিযানের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আরবীয়রা ১৫০ বছর সিন্ধুতে শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় অবস্থানের পরেও সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব সামান্য হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি নিষ্ফল বিজয় হলেও এ বিজয়ের সূত্র ধরে ভবিষ্যতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর অমুসলিমরা ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। এ বিজয়ের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আরবদের অনেক পরিবর্তন আসে। আরবগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে আর্য ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে এক নতুন জাতির উদ্ভব ঘটে। আর এ জাতিই— ইন্দো-সাবাসেনায় সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে। তাছাড়া সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। অন্যদিকে সিন্ধুবাসীর জীবনেও অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে। এ বিজয়ের ফলে আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানদের সাথে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সিন্ধু বিজয় আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ নারায়ণপুর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ রাজ্য। তাই সব সময়ই বিদেশিদের কাছে এটি একটি লোভনীয় ও আকর্ষণীয় রাজ্য হিসেবে বিবেচিত। এ রাজ্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা মল্লিক খানের নজর লাগে। তাই সে তার প্রশিক্ষিত সৈন্য সামন্ত নিয়ে বারবার নারায়ণপুর রাজ্য আক্রমণ করে ধন-সম্পদ নিয়ে যান। নিয়ে যাওয়া ধন-সম্পদ দিয়ে তিনি স্বীয় রাজধানীকে সমৃদ্ধ করেন। *[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]*

ক. প্রাচ্যের হোমার বলা হতো কোন কবিকে? ১
খ. তরাইনের ২য় যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর সাফল্য লাভের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মল্লিক খানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিজেতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের বারবার অপর রাজ্য আক্রমণের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবুল কাসেম ফেরদৌসিকে প্রাচ্যের হোমার বলা হতো।

খ ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বেশ কয়েকটি কারণে মুহাম্মদ ঘুরী জয়লাভ করেছিলেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘুরীর প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী তার বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়া ঘুরীর বেপরোয়া আক্রমণে হিন্দু শিবিরে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা নেমে আসে, যা তার বিজয়কে সুনিশ্চিত করে। মুহাম্মদ ঘুরীর তরাইনের প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মোছার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তার বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ ইসলাম খান ছিলেন আরব অঞ্চলের শাসনকর্তা। তাঁর সমসাময়িক ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা দশরথ। ইসলাম খানের কিছু বিদ্রোহী রাজা দশরথের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের আশ্রয় প্রদানসহ নানা কারণে রাগান্বিত হয়ে ইসলাম খান তার জামাতাকে রাজা দশরথের সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। জামাতা দশরথ সাম্রাজ্য দখল করলেও সেখানে তিনি স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি। *[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]*

ক. কার নাম অনুসারে 'ভারতবর্ষ' নামকরণ করা হয়? ১
খ. আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের রাজা দশরথের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের শাসন সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজা ভরতের নাম অনুসারে 'ভারতবর্ষ' নামকরণ করা হয়।

খ সৃজনশীল ৩৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের রাজা দশরথের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সিন্ধুরাজ দাহিরের শাসন সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজা দাহির ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সমসাময়িক সিন্ধু রাজ্যের শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী ও প্রজানিপীড়ক। তার উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নিকট রাজা দাহির পরাজিত এবং নিহত হন। রাজা দশরথের ক্ষেত্রেও এমন পরিস্থিতি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইসলাম খান ছিলেন আরব অঞ্চলের শাসনকর্তা। তার সমসাময়িক ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা দশরথ। ইসলাম খানের কিছু বিদ্রোহী রাজা দশরথের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের আশ্রয় প্রদানসহ নানা কারণে রাগান্বিত হয়ে ইসলাম খান তার জামাতাকে রাজা দশরথের সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। ঠিক একইভাবে খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর শাসনের প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে কতিপয় আরব বিদ্রোহী সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট আশ্রয় নেয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাদের ফেরত পাঠানোর দাবি জানালে রাজা দাহির তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তিনি রাজা দাহিরকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে ও আরো বিভিন্ন কারণে জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু রাজ্য দখল করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রাজা দশরথের সাথে সিন্ধু রাজা দাহিরই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ৪৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ সম্রাট মিজান সুবিশাল রাজ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে শাসন করছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর সাথে সাথেই রাজ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। পরবর্তীতে মহান শাসকের নেতৃত্বে এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হলেও তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে বিশাল রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এসব রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা ও অবিশ্বাস এতই প্রকট ছিল যে, কেন্দ্রীয় শাসন বলে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তবে এ অবস্থায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজ্য আক্রমণ করলে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। *[উত্তরা হাইস্কুল এন্ড কলেজ]*

https://teachingbd24.com

ক. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতির নাম কী? ১
খ. ভারতবর্ষ নামকরণ হয় কীভাবে? ২
গ. উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতি হলো দ্রাবিড়।

খ প্রাচীনকালে 'ভরত' নামে একজন হিন্দু রাজা এদেশ শাসন করতেন। সম্ভবত তার নামানুসারে এদেশের নাম রাখা হয়েছে 'ভারতবর্ষ'। কারো মতে, গ্রিকরা এ দেশে আক্রমণ করতে এসে প্রথমত সিন্ধু অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়। সিন্ধু নদের অববাহিকাকে তারা 'ইন্ডাস' নামে অভিহিত করে। ইংরেজগণ তাদের শাসনামলে সিন্ধুকে 'ইন্ডাস' বলত। পরবর্তীকালে এই 'ইন্ডাস' হতে সমগ্র উপমহাদেশ 'ইন্ডিয়া' নামে অভিহিত হয়।

গ অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার দিক দিয়ে উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন শাসনামলে রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য একটি পরিচিত দৃশ্যপট। এ কারণেই বিভিন্ন অঞ্চল অতীতে ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়েছে এবং বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত হয়েছে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা তার বাস্তব প্রমাণ। উদ্দীপকেও এরূপ একটি দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, সম্রাট মিজান-এর মৃত্যুর সাথে সাথে রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পরবর্তী শাসকের নেতৃত্বে রাজ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হলেও তার মৃত্যুর সাথে সাথে বিশাল রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এখানে কেন্দ্রীয় শাসন বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট অশোক উত্তরে হিমালয় ও উত্তর-পশ্চিম হিন্দুকুশ পর্বতমালা হতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পশ্চিমে পারস্যের সীমানা ও আরব সাগর হতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই (২৩২ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা হয়। অতঃপর সপ্তম শতকের প্রথমভাগে উত্তর ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য সম্রাট পুলকেশি মোটামুটিভাবে এদেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালান। তবে তাদের মৃত্যুর পর ভারতীয় ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো তাদের আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করতে তারা ব্যর্থ হয়। সুতরাং বলা যায়, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাই উদ্দীপকের দৃশ্যপটের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালের ভারতবর্ষের মিল রচনা করেছে।

ঘ উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়।
উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সম্রাট মিজান-এর রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা আক্রমণ করলে এদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তি প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। ফলে মুসলিম আক্রমণকে প্রতিহত করতে তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।
খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে আফগানিস্তান ভারতীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও অরাজকতার সুযোগ নিয়ে লানিয়া নামক এক ব্যক্তি সেখানকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এছাড়াও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে নেপাল স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ভাস্কর বর্মা আসামে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। আর যশোবর্মণ নামে এক স্বনামধন্য রাজা কনৌজে একটি স্বাধীন শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। সিন্ধুতে শাশীর চাচ ও পরে তার পুত্র রাজা দাহির শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তাছাড়া মালব, দিল্লি, আজমির, বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট, বাংলা ও বিহারে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে শতধাবিভক্ত ভারতীয় হিন্দু রাজ্যগুলো মুসলমানদের আক্রমণের বিরুদ্ধে একক কোনো শক্তি হিসেবে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিরোধের বিষয়টি মুসলমানদের ভারত আক্রমণকালে ভারতীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ আনিস সাহেব একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। নিজের প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য তিনি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক শেয়ার হস্তগত করেন এবং এটিকে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বৃদ্ধি পেলে বহু লোক চাকরি লাভে আগ্রহী হয়। মি. জওহরকে তিনি পদোন্নতি প্রদানের শর্তে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেও তিনি তার খেলাপ করেন। এতে মি. জওহর ক্ষুব্ধ হয়ে তার প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন।। *[শরীয়তপুর সরকারি কলেজ]*
ক. আল-বিরুনি কে ছিলেন? ১
খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আনিস সাহেবের কর্মকাণ্ড প্রাক-সালতানাত যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. জওহরের প্রতি আনিস সাহেবের এরূপ আচরণকে তুমি কীভাবে দেখবে? ইতিহাসের আলোকে মতামত দাও। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত মুসলিম শিক্ষাবিদ ও গবেষক, যিনি ৯৭৩ সালে উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।

খ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা।
সুলতান মাহমুদ গজনির শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণ এবং গজনিকে একটি সমৃদ্ধিশালী ও তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করার মানসে অর্থের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ভারতবর্ষ সে সময় ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। তাই প্রয়োজনীয় অর্থের ভান্ডার হিসেবে সুলতান মাহমুদ ভারতকেই বেছে নিয়েছিলেন। আর এটিই মূলত সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

গ উদ্দীপকে আনিস সাহেবের কর্মকাণ্ড প্রাক-সালতানাত যুগের শাসক সুলতান মাহমুদের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ।
যোগ্য ও গুণী লোককে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কিন্তু উদ্দীপকের আনিস সাহেব মি. জওহরকে যথাযথ মূল্যায়ন করেননি। সুলতান মাহমুদও ইতিহাসের একজন গুণী কবির সম্মানহানি করেছিলেন বলে জানা যায়।
সুলতান মাহমুদ গজনির শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শিক্ষাবিদ ও গবেষক আল বিরুনি ও মহাকবি ফেরদৌসিকে তার দরবারে চাকরি দেন। সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসিকে তার রাজত্বকালকে স্মরণীয় রাখতে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করেন। কথিত আছে যে, 'শাহনামা' গ্রন্থ রচনার জন্য সুলতান মাহমুদ তাকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু এটি রচনা শেষ হলে সুলতান মাহমুদ ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ৬০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করতে চাইলে ফেরদৌসি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের আনিস সাহেব যেরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে মূল্যায়ন না করে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, তেমনি সুলতান মাহমুদও তার কথার বরখেলাপ করেছেন। এদিক থেকে তাদের দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে মি. জওহরের প্রতি আনিস সাহেবের এরূপ আচরণ মোটেও সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি।
কথা দিয়ে কথা রাখা একটি মানবীয় গুণ। প্রত্যেকেরই উচিত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করতে পারলে তার ফলাফল কখনোই ভালো হয় না। এর ফলে অন্য কারও বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমনটি উদ্দীপকের মি. জওহর এবং মহাকবি ফেরদৌসির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে আনিস সাহেব তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। মি. জওহরকে তিনি পদোন্নতি দেওয়ার শর্তে তার কোম্পানিতে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে তাকে পদোন্নতি দেননি। আনিস সাহেবের এরূপ আচরণ কাঙ্ক্ষিত নয় এবং ইতিহাসের আলোকে এ ধরনের আচরণকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলা যায়। ইতিহাসে সুলতান মাহমুদ মহাকবি ফেরদৌসিকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন এবং এর ফলে ফেরদৌসি ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি রাগে, ক্ষোভে ও অভিমানে

https://teachingbd24.com

গজনি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অল্পকালের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুতে সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। সুতরাং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণাম যে ভালো হয় না তা ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই জানা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, মি. জওহরের প্রতি আনিস সাহেবের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶৪৯ ফয়সাল নামক একজন সেনাপতি বারবার অন্য একটি দেশে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অভিযান শেষে দেশে ফিরে যান। তিনি অভিযানে যে ধনসম্পদ অর্জন করতেন, তা শিক্ষা বিস্তার, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন একজন ভালো বিজেতা এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা। *[শরীয়তপুর সরকারি কলেজ]*

ক. সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলোর অন্যতম কারণ কী ছিল? ১
খ. মুহাম্মদ ঘুরীর ধর্মীয় নীতি কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে যে সেনাপতির ধারণা পাওয়া যায় পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের ব্যক্তিটি সচ্চরিত্রবান? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলোর অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক।

খ মুহাম্মদ ঘুরীর ধর্মীয় নীতি ছিল অসাম্প্রদায়িক।
মুহাম্মদ ঘুরীর উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মনিষ্ঠা। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিস্তা তাকে আল্লাহভীরু, সত্যনিষ্ঠ এবং প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে ধর্মনিষ্ঠ হলেও তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। ইতিহাসে তার পরধর্মসহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পঠিত শাসক সুলতান মাহমুদের মিল রয়েছে।
যে কোনো দেশ, রাজ্য বা অঞ্চলকে সমৃদ্ধশালী ও সুসজ্জিত করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— এই অর্থের প্রয়োজনে অনেক শাসক বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়েছেন। উদ্দীপকের সেনাপতি ফয়সাল এবং ইতিহাসখ্যাত সুলতান মাহমুদ এমনই দুজন শাসক।
উদ্দীপকে বর্ণিত সেনাপতি ফয়সাল নিজ রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য বিভিন্ন দেশে অভিযান প্রেরণ করেন। সেসব অভিযান থেকে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ কাজে লাগিয়ে তিনি তার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তাছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও শিল্পকলার উন্নয়নে তিনি আহরিত ধন-সম্পদ ব্যয় করেন। বিখ্যাত সমরনেতা সুলতান মাহমুদও বারবার ধন-ঐশ্বর্যে ভরপুর ভারতবর্ষে আক্রমণ করে সেনাপতি ফয়সাল মতোই প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেছিলেন। তার উদ্দেশ্যও ছিল নিজের রাজ্যের উন্নয়ন ঘটানো। তাই তিনি ভারতবর্ষকে তার প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রতিবারই জয়লাভ করে প্রচুর সম্পদ হস্তগত করেন। তিনি আহরিত অর্থ-সম্পদ কাজে লাগিয়ে গজনি রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি সেনাপতি ফয়সালের মতোই উদার ও আন্তরিক ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের সেনাপতি ফয়সাল ও গজনির শাসক সুলতান মাহমুদের মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের ব্যক্তিটি অর্থাৎ সুলতান মাহমুদ সচ্চরিত্রবান।
সুলতান মাহমুদ শুধু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমরনায়কই ছিলেন না, চরিত্রগত দিক থেকেও ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'মাহমুদ ছিলেন একজন বড় মাপের নৃপতি। তার চরিত্রে উচ্চাভিলাষ ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুলতান মাহমুদ নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। দেহের গঠনের দিক থেকে তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির এবং শক্তিশালী ও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় ধর্মনিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ী, কর্তব্যপরায়ণ ও পরমতসহিষ্ণু। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেননি। একজন সুশাসক, ন্যায়বিচারক ও প্রজারঞ্জক নৃপতি হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার বিভিন্ন রাজ্যে সামরিক অভিযান চালানোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল অর্জিত ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যমে নিজ রাজ্যের উন্নয়ন করা। তার সময়ে গজনি রাজ্য সমৃদ্ধি ও গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি কোনো আপস করতেন না। দয়াবান নৃপতি হিসেবে তিনি প্রজাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। কোরান ও হাদিসে তার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি স্বয়ং কোরানে হাফিজ ছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তার নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করতেন। ইসলাম জগতে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম সম্রাট এবং রাজতন্ত্রের আদর্শ স্থাপনকারী মহান ব্যক্তিত্ব। তার সময়ে গজনি রাজ্য সুশাসন ও সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, সুলতান মাহমুদ ছিলেন একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি।

প্রশ্ন ▶৫০ অদম্য সাহসী নাসির খান তুর্কি বাহিনীর সামান্য সৈনিক পদে কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর যোগদান করতে সক্ষম হন। তিনি মিশরের সীমান্ত অঞ্চলে দায়িত্ব পালনকালে দেখতে পান যে মিশরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা চলছে। ইংরেজ, ফরাসি, মামলুক ও তুর্কিদের মধ্যে বিরাজিত ও অরাজকতার সুযোগে নাসির খান তুর্কি বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং মিশরকে অতর্কিত আক্রমণ করে নিজের দখলে নিয়ে নেন। বিবদমান ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ মিশর ছেড়ে পালিয়ে যান। নাসির খান প্রথমে তুর্কি সুলতানের গভর্নর হিসেবে মিশরে নিয়োগ পেলেও পরবর্তীতে মিশর স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. বাংলার সেন বংশের সর্বশেষ রাজা কে ছিলেন? ১
খ. হিন্দুদের 'বর্ণভেদ প্রথা' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিশরের অরাজকতার সাথে প্রাক-মুসলিম বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কোনো সামঞ্জস্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের নাসির খানের কর্মকাণ্ডের আলোকে মুসলমানদের বঙ্গ-বিজয়ের ঘটনার বিবরণ দাও। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলার সেন বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন।

খ হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথা বলতে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণিকে বোঝায়।
অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ধর্মকর্ম, যাগযজ্ঞ এবং অন্যান্য সকল কাজে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তারাই আইন-কানুন প্রণয়ন করত এবং শাসনদণ্ডও ছিল তাদের হাতে। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল অধঃপতিত ও অসহায়। বেদবাক্য শুনলে কিংবা বেদ গীতা পাঠ করলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। আর এই চার শ্রেণির বাইরের লোকদের অপবিত্র মনে করা হতো। হিন্দু সমাজের এ বিভক্তিই বর্ণভেদ প্রথা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মিসরের অরাজকতার সাথে প্রাক-মুসলিম বাংলার বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সামঞ্জস্য রয়েছে।
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক অনৈক্য একটি পরিচিত দৃশ্যপট। রাজনৈতিক অনৈক্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চল অতীতে ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়েছে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যার বাস্তব প্রমাণ। এছাড়া জাতিভেদ প্রথার কারণে সামাজিক অবস্থাও ছিল মারাত্মক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। উদ্দীপকেও এমনি একটি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে।
উদ্দীপকে মিসরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে; যেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা বিরাজমান। অনুরূপভাবে

https://teachingbd24.com

প্রাক-মুসলিম বাংলার সামাজিক অবস্থা ছিল চরম বিশৃঙ্খল। তৎকালীন সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। অপরপক্ষে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল নানা প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও নির্যাতিত। এছাড়া তৎকালীন বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এ সমস্ত রাষ্ট্রসমূহ একে অপরের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ফলে সেখানে চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তাই বলা যায় যে, প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষের বাংলার পরিস্থিতি উদ্দীপকে বর্ণিত মিসরের অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে নাসির খানের কর্মকাণ্ডের সাথে মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে।

মুসলমানদের বঙ্গ বিজয় ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজিত হলেও তিনি পুরো ভারতবর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। কেননা তিনি মাত্র তিন বছরের মধ্যে পরবর্তী শাসক সুলায়মানের রোষানলে পড়ে নিহত হন। পরবর্তীতে মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করে বাংলা জয় করতে সক্ষম হন। উদ্দীপকেও বাংলা জয়ের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নাসির খান মিসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে অতর্কিত অভিযান পরিচালনা করে মিসর জয় করেন। মিসরের শাসক পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নাসির খান প্রথমে তুর্কি সুলতানের গভর্নর হিসেবে এবং পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অনুরূপভাবে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে মাত্র সতেরো জন সৈন্য নিয়ে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে অতর্কিতভাবে বাংলা আক্রমণ করেন। বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন ভয়ে রাজপ্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এভাবে বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন। বখতিয়ার খলজি মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের অধীনে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি স্বাধীনভাবে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। তিনিই প্রথম বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৫১ 'ক' অঞ্চলের মুসলমান বিজেতা 'খ' অঞ্চল অধিকারের নিমিত্তে বারবার অভিযান প্রেরণ করেন। অনেকগুলো অভিযান সফল করে তারা 'খ' অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তবে এ কথা সত্য যে, শাসন ক্ষমতা দখল করে তারা পরিপূর্ণভাবে শাসন করতে সক্ষম হননি। বরং বারবার বিজিত অঞ্চলের বিদ্রোহের মুখোমুখি হন এবং বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন করে। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও]*

ক. সুলতান মাহমুদ কত খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করেন? ১
খ. প্রাক-মুসলিম শাসনামলে ভারতের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন ধরনের ফলাফলের চিত্র ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. 'ক' অঞ্চলের মতো আরবরাও সিন্ধুতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছিল— মতামত দাও। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করেন।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফলের চিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চল কর্তৃক 'খ' অঞ্চল দখলের পরবর্তী পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে। শাসন ক্ষমতা দখলের পরেও 'ক' অঞ্চলের শাসকেরা 'খ' অঞ্চল পরিপূর্ণভাবে শাসনে সক্ষম হননি। বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে তারা বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন করেন। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরূপ পরিস্থিতিই সৃষ্টি হয়েছিল।

সিন্ধুতে মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বল্পকালের উপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। খলিফা আল ওয়ালিদের পরের উমাইয়া শাসকগণ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির পরিবর্তে সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন। ফলে আরবদের উদ্যম-উৎসাহ ও নতুন নতুন রাজ্য জয়ের বাসনা হারিয়ে যায়। দামেস্কের উমাইয়া খলিফাদের গোত্র-কলহ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, গৃহযুদ্ধ সিন্ধু প্রশাসনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক স্টেনলি লেনপুল বলেন, 'ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র। এটি একটি নিষ্ফল বিজয়।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সফলতার সাথে সিন্ধু জয় করলেও স্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্ষম হননি। এ দিকটিই উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের মতো আরবরাও সিন্ধুতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছিল।

উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলের শাসকেরা বিজিত অঞ্চলে শাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। সিন্ধুতে মুসলিম শাসকেরাও নানা কারণে এরূপ ব্যর্থতার শিকার হয়েছিলেন। ফলে সিন্ধু বিজয় রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল।

আরবরা ১৫০ বছর সিন্ধু শাসন করেছিল ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে শাসন পরিচালনা দীর্ঘায়িত করতে পারেনি। কেননা উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ইসলামের রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির পরিসমাপ্তি ঘটে। আব্বাসীয় খলিফাগণ এ ব্যাপারে আগে কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করায় সিন্ধুতে আরবের সামরিক কার্যকলাপ অবহেলিত হয়ে পড়ে। আরবগণ বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও দুর্গম অঞ্চল অতিক্রম করে সিন্ধুদেশে প্রবেশ করেন। এ অঞ্চলের প্রকৃতির বিরূপতা ও সম্পদের অপ্রতুলতা তাদেরকে দারুণভাবে হতাশ করে। সিন্ধু দেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে অবশিষ্ট ভারতবর্ষকে বিজয় করা দুরূহ বলে তারা উৎসাহ ও উদ্যম হারিয়ে ফেলে। রাজধানী দামেস্ক থেকে সুদূর ভারতবর্ষে পরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে অভিযান পরিচালনা করতে খিলাফতের কেন্দ্রীয় শক্তির অনিচ্ছা ও অক্ষমতা সিন্ধু দেশে প্রবাহিত আরব শাসনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তাছাড়া সিন্ধুর পরবর্তী আরব শাসকদের দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব হিন্দুদেরকে তাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে উদ্দীপনা জোগায়। ফলে সেখানে আরব শাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আরবরা সিন্ধুতে কার্যকর শাসন প্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ৫২ তুরাগ নদীর দুই পাড় দুই জমিদার শাসন করেন। উভয় পাড়ের প্রজারা এই নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। পূর্ব পাড়ের জমিদারদের একটি শস্য বোঝাই নৌকা পশ্চিম পাড়ের লোকজন লুট করে। পূর্ব পাড়ের জমিদার যখন এর ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার দাবি করেন। পশ্চিম পাড়ের জনগণ এতে কর্ণপাত করেননি। ফলে পূর্ব পাড়ের জমিদার তাদের আক্রমণ করলে পশ্চিম পাড়ের জমিদারের বেশ কিছু লাঠিয়াল মারা যায় এবং লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. মুহম্মদ বিন কাসিম কত সালে মুলতান বিজয় করে? ১
খ. মুহম্মদ বিন কাসিম সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবিষয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনার ফলাফল এবং সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল কি না মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহম্মদ কাসিম ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান বিজয় করে।

খ সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা করে মুহাম্মদ বিন কাসিম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

https://teachingbd24.com

কাসিম ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। তিনি সিন্ধু দেশে তৃতীয় অভিযানের সফল নেতৃত্ব দেন। মুহাম্মদ বিন-কাসিম মাত্র তিন বছরের মধ্যেই সিন্ধু ও মুলতানে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুধু সুদক্ষ সেনাপতিই ছিলেন না, একজন সুযোগ্য শাসক হিসেবেও ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ তারেক আজারমান সাম্রাজ্যের সম্রাট। তার এক বন্ধু রাজা বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তার নিকট উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে উপঢৌকনসমূহ লুণ্ঠিত হলে তারেক সে অঞ্চলের রাজার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করে। রাজা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করলে তারেক চরম ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি তার ভাইয়ের পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। *[সরকারি হাজি মুহাম্মদ মুহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. রাজা দাহির কোন বংশের লোক ছিলেন? ১

খ. শাহনামা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রাজ্য আক্রমণের সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের উক্ত কারণ ব্যতীত আরও কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজা দাহির সিন্ধুর ব্রাহ্মণ বংশের লোক ছিলেন।

খ শাহনামা মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি রচিত একটি মহাকাব্য। মহাকবি ফেরদৌসি ৯৭৭ থেকে ১০১০ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর ধরে এ মহাকাব্যটি রচনা করেন। প্রায় ষাট হাজার শ্লোক সম্বলিত মহাকাব্যে রয়েছে ৯৯০টি অধ্যায় ৬২ টি কাহিনি। শাহনামাতে মূলত ইরানের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এটি পৃথিবীর একমাত্র মহাকাব্য, যা সাক্ষী হয়ে আছে একটি নির্দিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজ্য আক্রমণের সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

আরবদের সিন্ধু অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। সিন্ধু অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু ধরনের কারণই কার্যকর ছিল। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর দেবল উপকূল থেকে আরবদের বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠন। এই ঘটনার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। উদ্দীপকেও এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের সম্রাট তারেকের নিকট প্রেরিত উপঢৌকন লুণ্ঠন হলে তিনি সীমানা সংশ্লিষ্ট রাজার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু ওই রাজা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে সেখানে অভিযান প্রেরণ করেন। ফলে তাদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনুরূপভাবে সিংহলের রাজা আটটি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তার দাবি প্রত্যাখান করেন। দাহিরের ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে তা দখল করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের মিল রয়েছে।

ঘ ঐ রাজ্য অর্থাৎ সিন্ধু দখল করার পেছনে আরও কারণ বিদ্যমান ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

আরবদের সিন্ধু বিজয় এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। এটি মুসলমানদের পরবর্তী যুগের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তারকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল। আরবদের সিন্ধু অভিযানের পিছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এ দু ধরনের কারণই কার্যকর ছিল। সিন্ধু দেবল বন্দরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত জাহাজ লুণ্ঠন এবং রাজা দাহিরের ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতির পাশাপাশি অন্যান্য কারণও এ অভিযানের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে ঘটনাটির মাধ্যমে সিন্ধুর দেবল বন্দরে জাহাজ লুণ্ঠিত হওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি সিন্ধু অভিযানের পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ভূমিকা রাখে। তবে এ অভিযানের পেছনে আরো কিছু কারণ ছিল। যেমন : উমাইয়াদের সম্প্রসারণবাদী নীতি। খলিফা আল ওয়ালিদ এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উভয়ই ছিলেন মনে-প্রাণে সাম্রাজ্যবাদী। এছাড়া ভারতের অফুরন্ত ধনসম্পদ আরবদের সিন্ধু অভিযানে প্ররোচিত করেছে। সিন্ধুর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং দাহির কর্তৃক হাজ্জাজের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দানও অন্যতম কারণ ছিল। তাছাড়া সিন্ধু অভিযানের পিছনে ধর্মীয় অনুপ্রেরণাও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানের পিছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ বাংলাদেশের অনেক শ্রমিক সৌদি আরবে কর্মরত। হঠাৎ করেই সৌদিতে অবস্থানরত কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যু হলে সৌদি বাদশাহ কয়েকটি বিমানে করে মৃত শ্রমিকদের বিধবা স্ত্রী ও এতিম পুত্র-কন্যাসহ বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ বেশকিছু দামি উপহারসামগ্রী বাংলাদেশের জনৈক মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে ভারতের কলকাতা বিমানবন্দরে বিমানগুলো ছিনতাই ও লুণ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট অনতিবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ক্ষিপ্ত মন্ত্রী কলকাতা আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং তা জয় করেন। *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. সোমনাথ মন্দির বিজিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১

খ. তরাইনের ২য় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের কলকাতা আক্রমণের সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ ছাড়া আরবদের সিন্ধু বিজয়ের আরো কারণ আছে বলে কি তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সোমনাথ মন্দির বিজিত হয় ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের কলকাতা আক্রমণের সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আরবদের সিন্ধু অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। সিন্ধু অভিযানের পেছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এ দুই ধরনের কারণই কার্যকর ছিল। প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর জলদস্যু কর্তৃক আরব বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠন। সিন্ধুর দেবল উপকূল থেকে আরবদের বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু রাজা দাহিরের নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হয়ে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশে পাঠানো সৌদি সরকারের উপঢৌকন ও অন্যান্য সামগ্রী কলকাতা বন্দরে ছিনতাই ও লুণ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মন্ত্রী এর ক্ষতিপূরণ দাবি করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা দিতে অস্বীকার করে। তাই মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযান চালিয়ে কলকাতা দখল করে নেন। ঠিক একইভাবে সিংহলের রাজা আটটি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা ও হাজ্জাজের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট এর

প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্ব ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তা দখল করেন। তাই বলা যায়, কলকাতা আক্রমণের অভিযানের সাথে আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ সামাদ ও সাহেদ দুটি পাশাপাশি রাজ্যের অধিপতি, ফলে সীমান্তবর্তী সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ আশ্রয়-প্রশ্রয় নিয়ে শাসকের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত। একবার পার্শ্ববর্তী অন্য এলাকা থেকে সামাদের কিছু ভক্ত প্রজা তাদের নিজের নৌকা বোঝাই উপহার সামগ্রী নিয়ে আসার সময় সাহেদের লোকজন তা লুট করে নিয়ে যায়। এতে সামাদের লোকজন ক্রুদ্ধ হয়ে শাহেদের রাজ্য আক্রমণ করে তাকে উৎখাত করে এবং রাজ্যটি দখল করে নেয়। *[ক্যান্টেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. মহাকাব্য শাহনামার লেখক কে? ১
খ. ভারতবর্ষ নামকরণ হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লুটের ঘটনার সাথে সিন্ধু বিজয়ের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাহেদের পরিণতির সাথে রাজা দাহিরের পরিণতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাকাব্য 'শাহনামার' লেখক আবুল কাসেম ফেরদৌসি।

খ সৃজনশীল ৪৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের সাহেদের পরিণতি এবং রাজা দাহিরের পরিণতি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অভিযানের সূত্র ধরেই ভবিষ্যতে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করে। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম ও রাজা দাহিরের চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা হয়। তাদের মধ্যে সংঘটিত এ যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত হন। যেমনটি উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় সামাদের কিছু ভক্ত প্রজা তাদের নিজেদের নৌকা বোঝাই উপহার সামগ্রী নিয়ে আসার সময় সাহেদের লোকজন তা লুট করে নিয়ে যায়। এতে সামাদের লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে সাহেদের রাজাকে আক্রমণ করে ও তাকে উৎখাত করে। যেমনটি রাজা দাহিরকে ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সিংহাসনের রাজার উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ লুণ্ঠনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। রাজা দাহির মুসলিম বাহিনীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হলে সিন্ধু আরবদের হস্তগত হয় এবং ভারতবর্ষে তারা মুসলিম শাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সাহেদের পরিণতি ও রাজা দাহিরের পরিণতি ছিল একই।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ রাজশাহীর ছেলে মাহমুদ তার সাতক্ষীরার বন্ধু আলোকপালের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করল সেখানে হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথা খুবই প্রকট। সমাজে বিদ্যমান চারটি বর্ণের মধ্যে প্রথম দুটি বর্ণের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশি। সে এক নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছে জানতে পারে যে, ধর্মশাস্ত্র শুনলে বা পাঠ করলে তাদের শাস্তি দেয়া হয়। এ ছাড়াও হিন্দু সমাজে মাহমুদ এক শ্রেণির লোক দেখতে পায় যারা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত। আলোকপালের সমাজে অনেক মেয়েকে ১২ বছর বয়সে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয় এবং অনেক পুরুষকে ৪/৫ টা বিয়ে করতে দেখা যায়। বন্ধুর এলাকার সমাজব্যবস্থার এ ভেদাভেদ মাহমুদকে অনেক পীড়া দেয়। *[চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]*

ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান চালান? ১
খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মাহমুদের দেখা সমাজব্যবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সমাজব্যবস্থার কী মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমাজব্যবস্থা সামাজিক প্রগতি ও অগ্রগতির অন্তরায়স্বরূপ— উক্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধর। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান চালান।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে সামাজিক অসাম্য ও কুসংস্কারের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা যেকোনো দেশের উন্নতিতে প্রতিবন্ধকস্বরূপ— ইতিহাস থেকেই আমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পরি।

প্রাক-মুসলিম যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সে সময় সামাজিক অবস্থা উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার মতোই ছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথার মতো সামাজিক অসাম্যের নীতি সমাজের উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা সমাজের প্রগতিকে নিম্নমুখী করে তোলে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ মূলত চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। হিন্দু সমাজের বর্ণ-বৈষম্য বা শ্রেণিভেদ তাদেরকে দুর্বল করে রেখেছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রবল প্রতাপ ছিল। তারা তাদের স্বার্থ অনুযায়ী আইন-কানুন প্রণয়ন করত। নিম্নস্তরের হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও অসহায় অবস্থায় কালযাপন করতে হতো। নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের গীতা পাঠের অধিকার ছিল না। নারী-পুরুষের মাঝেও বৈষম্য ছিল। পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারত। কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল না। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে সহমরণ বরণ করতে হতো। এ সামাজিক অসাম্যই সে সময় ভারতের জাতীয় চেতনার উন্মেষের পরিপন্থি হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। আবার বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় নারীরা তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেত না, তাদেরকে অকালেই ঝরে পড়তে হতো। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী এ অবস্থায় থাকলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইতিহাসই এই সাক্ষ্য বহন করে যে, সামাজিক অসাম্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা দেশের উন্নতির গতিকে রোধ করে এবং দেশকে স্থবির করে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভবেরচর এলাকার সবুর ব্যাপারী লোকেরা ঢাকার চাল ব্যবসায়ী গফুর মহাজনের চাল বোঝাই ৮টি ট্রাক ছিনতাই করে। গফুর মহাজন তা ফেরত চাইলে সবুর ব্যাপারী তা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। গফুর মহাজন তখন সবুর ব্যাপারীকে শায়েস্তা করার জন্য তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বাড়ি ঘরে হামলা চালায়। সবুর ব্যাপারী বাধা প্রদান করতে এসে নিহত হন। তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে আশে-পাশের লোকজনেরও অনেক ক্ষতি হয়। তারাও এ ঘটনায় ভয়ে পালিয়ে যায়। *[দিনিয়া কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন সূচিত হয় কত শতাব্দীতে? ১
খ. মুহম্মদ বিন-কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লুটের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সবুর ব্যাপারীর পরিণতি এবং সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল এক নয়— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

https://teachingbd24.com

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন সূচিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত লুটের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজ্যবিস্তার, ধনৈশ্বর্য আহরণ, সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ, ইসলাম বিস্তার প্রভৃতি পরোক্ষ কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রত্যক্ষ একটি ঘটনা তাকে সিন্ধু আক্রমণের সুযোগ এনে দেয়। আর এ ঘটনাটি হলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক মুসলমানদের ৮টি জাহাজ লুট।

উদ্দীপকে গফুর মহাজন কর্তৃক সবুর ব্যাপারীকে আক্রমণের ক্ষেত্রে লুণ্ঠনের একটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। চাল ব্যবসায়ী গফুর মহাজনের চাল বোঝাই ৮টি ট্রাক সবুর ব্যাপারীর লোকেরা ছিনতাই করে এবং সবুর ব্যাপারী তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশকিছু আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে, সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মূল্যবান উপঢৌকন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌঁছায় তখন জলদস্যুগণ জাহাজগুলো লুণ্ঠন করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং তিনি ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত প্রদান করে।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ বহুধা বিভক্ত দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি শাসকবর্গের মধ্যে অনৈক্য ও ঈর্ষাপরায়ণতার সুযোগে এবং সমৃদ্ধিশালী দক্ষিণাঞ্চল হতে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দাক্ষিণাত্যের অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। কথিত আছে বরঙ্গল বিজয়ের পর ১০০০ উট অতিকষ্টে উক্ত লব্ধ ধনরত্ন দিল্লিতে নিয়ে যায়। *[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. শাহনামা কে রচনা করেন? ১

খ. আল বেরুনির পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকের বরঙ্গল বিজয় ও প্রাপ্তির সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মাধ্যমে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক দিকটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি শাহনামা রচনা করেন।

খ আবু রায়হান আল বেরুনি ছিলেন সুলতান মাহমুদের দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী।

আল বেরুনি ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজমে (আফগানিস্তানে অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিশাস্ত্রে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল হিন্দ। ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ আব্দুল্লাহ টিভিতে প্রামাণ্য চিত্র দেখছিল। প্রামাণ্য চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্য ও বর্ণনাতে সে জানাতে পারে যে, 'ক' দেশের রাজার উদ্দেশ্যে 'গ' দেশের রাজা কিছু মূল্যবোন উপঢৌকন পাঠায়। পথিমধ্যে 'খ' দেশের ডাকাত দল এসব উপঢৌকন লুণ্ঠন করে। তাই 'ক' দেশ 'খ' দেশের রাজার কাছে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। 'খ' দেশের রাজা তা দিতে অস্বীকার করলে 'ক' দেশের রাজা সৈন্য প্রেরণ করে 'খ' দেশ দখল করে নেয়। *[আল-আমীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]*

ক. কুতুব উদ্দিন আইবেক কে ছিলেন? ১

খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুল্লাহর দেখা প্রামাণ্য চিত্রের ঘটনার সাথে তোমার পঠিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন ঘটনার সামঞ্জস্য রয়েছে? দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কারণের বাইরেও উক্ত ঘটনার আরও অনেক কারণ বিদ্যমান— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুতুব উদ্দিন আইবেক ছিলেন দিল্লির স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষের সিন্ধু অভিযানের মিল রয়েছে।

আরবদের সিন্ধু অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। সিন্ধু অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু ধরনের কারণই কার্যকর ছিল। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর দেবল উপকূল থেকে আরবদের বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠন। এই ঘটনার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। উদ্দীপকেও এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের আবদুল্লাহ টিভিতে একটি প্রামাণ্য চিত্রে দেখতে পায় 'ক' দেশের রাজার উদ্দেশ্যে 'গ' দেশের রাজা উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে 'খ' দেশের ডাকাত দল তা লুণ্ঠন করে নেয়। ফলে তাদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনুরূপভাবে সিংহলের রাজা আটটি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখান করেন। দাহিরের ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং তা দখল করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ঘটনার মিল রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-১: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

১. ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন সূচিত হয় কত শতাব্দীতে? (জ্ঞান) [দনিয়া কলেজ, ঢাকা]
ⓚ অষ্টম ⓛ নবম
ⓖ দশম ⓘ একাদশ — উত্তর: ক

২. ভারত উপমহাদেশকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ ইবনে বতুতা ⓛ ভিনসেন্ট স্মিথ
ⓖ মাসুয়ান ⓘ হিউয়েন সাং — উত্তর: খ

৩. ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছে কখন থেকে? (জ্ঞান)
ⓚ মুসলিম অভিযানের পর থেকে
ⓛ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পর
ⓖ হিন্দু শাসকদের রাজ্য শাসন থেকে শুরু করে
ⓘ ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের পর থেকে — উত্তর: ক

৪. কোন পর্তুগিজ নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন? (জ্ঞান) [বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ⓚ ভাস্কো দা গামা ⓛ ক্যাপ্টেন হকিন্স
ⓖ স্যার টমাস রো ⓘ জব চার্নক — উত্তর: ক

৫. মহারাজ অশোক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ মৌর্য সম্রাট ⓛ মুঘল সম্রাট
ⓖ পাল রাজা ⓘ সেন রাজা — উত্তর: ক

৬. বর্তমান ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। এটি ভারতবর্ষের কোন শাসনামলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ⓚ প্রাচীন বৌদ্ধ শাসনামল
ⓛ মুঘল শাসনামল
ⓖ প্রাক বৌদ্ধ শাসনামল
ⓘ নবাবি শাসনামল — উত্তর: ক

৭. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? (জ্ঞান) [তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]
ⓚ বিচ্ছিন্ন ও ঐক্যহীন
ⓛ ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল
ⓖ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুক্ত
ⓘ ন্যায় ও আদর্শবান — উত্তর: ক

৮. ফা-হিয়েন কোন দেশের পর্যটক ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ চীন ⓛ মরক্কো
ⓖ ইংল্যান্ড ⓘ রাশিয়া — উত্তর: ক

৯. 'আল মুকাদ্দিমা' গ্রন্থটির লেখক কে? (জ্ঞান) [সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ]
ⓚ ইবনে খালদুন ⓛ আল বালাজুরী
ⓖ আল খাওয়ারিজমী
ⓘ ইবনে হাইসাম — উত্তর: ক

১০. জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ মহাবীর ⓛ গৌতম বুদ্ধ
ⓖ গুরু নানক ⓘ শ্রীচৈতন্যদেব — উত্তর: ক

১১. 'সিদ্ধার্থ' নামে পরিচিত ছিলেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ গৌতম বুদ্ধ ⓛ মহাবীর
ⓖ গুরু নানক ⓘ শ্রীচৈতন্যদেব — উত্তর: ক

১২. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী কারা? [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ⓚ আর্যগণ ⓛ দ্রাবিড়গণ
ⓖ হুনগণ ⓘ হিন্দুগণ — উত্তর: খ

১৩. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? (জ্ঞান) [ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]
ⓚ ওবায়দুল্লাহ ⓛ বুদায়েল
ⓖ তারিক বিন জিয়াদ ⓘ মুহাম্মদ বিন কাসিম — উত্তর: ঘ

১৪. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন? (জ্ঞান) [বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]
ⓚ পূর্বাঞ্চলের ⓛ দক্ষিণাঞ্চলের
ⓖ উত্তরাঞ্চলের ⓘ পাঞ্জাবের — উত্তর: ক

১৫. মুসলিম খলিফাগণ ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেন কেন? (অনুধাবন) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]
ⓚ ভারতের ধন-ঐশ্বর্য লাভের জন্য
ⓛ ভারতের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য
ⓖ ভারতের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য
ⓘ সামরিক দক্ষতা অর্জনের জন্য — উত্তর: ক

১৬. খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা কে ছিলেন? (জ্ঞান) [বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ⓚ রাজা দাহির ⓛ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
ⓖ খলিফা আল মামুন ⓘ খলিফা হারুনর রশিদ — উত্তর: খ

১৭. 'চাচনামা' কী জাতীয় গ্রন্থ? (অনুধাবন)
ⓚ কাব্যগ্রন্থ ⓛ ধর্মীয় গ্রন্থ
ⓖ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ⓘ রাজনৈতিক গ্রন্থ — উত্তর: গ

১৮. দেবল বন্দরে মুসলমানদের কয়টি জাহাজ লুণ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান) [চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]
ⓚ ৮ টি ⓛ ৭ টি
ⓖ ৯ টি ⓘ ১০ টি — উত্তর: ক

১৯. রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন কে? (জ্ঞান) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
ⓚ মুহাম্মদ ঘুরী ⓛ সুলতান মাহমুদ
ⓖ মুহাম্মদ বিন কাসিম ⓘ কুতুবউদ্দীন — উত্তর: গ

২০. 'চাচনাম' গ্রন্থে কীসের বিবরণ পাওয়া যায়? (অনুধাবন) [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]
ক আরবদের পারস্য অভিযান
খ আরবদের ভারত অভিযান
গ আরবদের তমসাচ্ছন্ন অতীত
ঘ আরবীয় ও ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক — খ

২১. আরবদের সিন্ধু বিজয় এত সহজ হয় কেন? (অনুধাবন) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক স্থানীয় জনগণকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বলে
খ রাজা দাহিরের কোনো বাহিনী ছিল না বলে
গ আরবদের রাজ্যজয়ের নেশা ও উন্নত রণনীতির কারণে
ঘ মীর কাসিমের যোগ্যতায় — গ

২২. 'The Sultanate of Delhi' গ্রন্থটির লেখক কে? (জ্ঞান)
ক এ. এল শ্রীবাস্তব খ মো. মোহর আলী
গ ঈশ্বরী প্রসাদ ঘ বালাজুরী — ক

২৩. 'শশ্রুত', 'চরক' গ্রন্থ দুটি কী জাতীয় গ্রন্থ? (জ্ঞান)
ক রাজনীতি বিষয়ক খ অর্থনীতি বিষয়ক
গ চিকিৎসা বিষয়ক ঘ ধর্ম বিষয়ক — গ

২৪. গজনি বংশ কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]
ক ৯৭৫ খ ৯৭৭
গ ৯৯৯ ঘ ১০০১ — খ

২৫. 'আমিন-উল-মিল্লাত'-শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ধর্ম বিশ্বাসের রক্ষক খ ন্যায়পরায়ণ
গ বিশ্বাসযোগ্য ঘ সাহসী ও বিচক্ষণ — ক

২৬. 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা ও 'আমির-উল-মিল্লাত' কার উপাধি? [জ্ঞান]
ক মুহম্মদ বিন কাসিমের
খ সুলতান মাহমুদের
গ মুহাম্মদ ঘুরীর
ঘ কুতুব উদ্দিন আইবকের — খ

২৭. গজনি বংশকে 'ইয়ামিনি বংশ' বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক সুলতান মাহমুদের ইয়ামিনি-উদ-দৌলা' উপাধি লাভের জন্য
খ ইয়ামিন নামের সুযোগ্য শাসক থাকার জন্য
গ গজনি বংশের প্রতিষ্ঠার উপাধি ইয়ামিন ছিল বলে
ঘ ইয়ামিন রাষ্ট্র সম্মান ছিল বলে — ক

২৮. সুলতান মাহমুদের অভিযানের সময় পাঞ্জাবের রাজা কে ছিলেন? (অনুধাবন)
ক আনন্দপাল খ বিজয় রায়
গ সুখপাল ঘ জয়পাল — ঘ

২৯. 'ট্রান্স অক্সিয়ানা' অঞ্চলটি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক মধ্য ইউরোপে খ মধ্য এশিয়ায়
গ আফ্রিকায় ঘ আমেরিকায় — খ

৩০. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল?
ক কলকাতা খ মালব
গ আজমীর ঘ বিহার — ঘ

৩১. গজনি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান) [শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]
ক কান্দাহারে খ পেশোয়ারে
গ আফগানিস্তানে ঘ তুরস্ক — গ

৩২. গজনি ও হিরাতের মধ্যবর্তী স্থানের নাম কী? (জ্ঞান) [শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]
ক ঘুর খ মুর
গ সুর ঘ হেলমন্দ — ক

৩৩. 'চক্রস্বামী' বিগ্রহটি কোন জায়গায় সংরক্ষিত ছিল? (জ্ঞান)
ক থানেশ্বরে খ সোমনাথে
গ মথুরায় ঘ নাগরকোটে — ক

৩৪. সুলতান মাহমুদের ভিরা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল? (অনুধাবন) [সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]
ক গজনি সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করা
খ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে অর্থ সংগ্রহ করা
গ হিন্দুধর্মের ওপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা
ঘ ভারতে স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা — ক

৩৫. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কোনটি? (অনুধাবন) [সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]
ক কাশ্মীর অভিযান খ কনৌজ অভিযান
গ নগরকোট বিজয় ঘ সোমনাথ বিজয় — ঘ

৩৬. করদ রাজ্য বলতে কী বোঝায়? [ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]
ক বিজিত রাজ্য খ পরাজিত রাজ্য
গ করদাতা রাজ্য ঘ করগ্রহীতা রাজ্য — গ

৩৭. 'কিতাব উল-হিন্দ'— গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ক ইবনে হায়সাম খ বায়হাকি
গ আল বেরুনী ঘ আল রাজি — গ

৩৮. 'স্বর্গীয় বধূ' কী? (জ্ঞান) [ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]
ক মন্দির খ মসজিদ
গ সরাইখানা ঘ গির্জা — খ

৩৯. গজনি বংশের সর্বশেষ সুলতান কে ছিলেন? (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ, ঝিনাইদহ]
ক মাসুদ খ বাহরাম
গ কায়মুস ঘ খসরু মালিক — ঘ

৪০. 'ঘুর' রাজ্যটি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ⓚ পারস্যে ⓛ আফগানিস্তানে
ⓖ ইরাকে ⓘ ইয়েমেনে ⓛ

৪১. মুহাম্মদ ঘুরীর প্রকৃত নাম কী? (জ্ঞান) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও]
ⓚ গিয়াসউদ্দীন
ⓛ মুইজউদ্দীন মুহাম্মদ বিন শাম
ⓖ সিহাবুদ্দীন বিন শাম
ⓘ শিহাবউদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী ⓛ

৪২. ঘুর বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান) [মদনমোহন কলেজ, সিলেট]
ⓚ সুলতান মাহমুদ
ⓛ মুহাম্মদ ঘুরী
ⓖ গিয়াস উদ্দিন তুঘলক
ⓘ কুতুবউদ্দিন আইবেক ⓛ

৪৩. তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ কী? ছিল? (অনুধাবন)
ⓚ অভিজ্ঞ সেনাবাহিনীর অভাব
ⓛ মুসলিম সৈন্যদের দায়িত্বে অবহেলা
ⓖ কনৌজ রাজ্যের বিশ্বাসঘাতকতা
ⓘ সাজোয়াযানের অপর্যাপ্ততা ⓘ

৪৪. তরাইনের ২য় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর জয়লাভের কারণ কী? (অনুধাবন) [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]
ⓚ সৈন্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ
ⓛ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন
ⓖ পৃথ্বিরাজের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা
ⓘ মুহাম্মদ ঘুরীর অপূর্ব রণকৌশল ⓘ

৪৫. কুয়াতুল ইসলাম মসজিদটি কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও]
ⓚ মুহাম্মদ ঘুরী
ⓛ কুতুবউদ্দিন আইবেক
ⓖ সুলতান মাহমুদ
ⓘ বখতিয়ার খলজি ⓛ

৪৬. মুহাম্মদ ঘুরী শুধু ভারতের ধনসম্পদে আকৃষ্ট হয়েই অভিযান প্রেরণ করেন। এটি সুলতান মাহমুদের সাথে তার কোন দিক দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে? (প্রয়োগ)
ⓚ দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে
ⓛ সমরকুশলতার দিক দিয়ে
ⓖ প্রজাকল্যাণের দিক দিয়ে
ⓘ স্বৈরনীতির দিক দিয়ে ⓚ

৪৭. ভারতবর্ষকে বহুজাতিক দেশ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ বিদেশি শাসকেরা এদেশ শাসন করেছে বলে
ⓛ বহু জাতির লোক এদেশে বসবাস করছে বলে
ⓖ বাইরের দেশ থেকে লোক সমাগম ঘটেছে বলে
ⓘ বিভিন্ন দেশের বণিকেরা এদেশে বাণিজ্য করেছে বলে ⓛ

৪৮. আরব বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর ছিল কোনটি? (জ্ঞান) [রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
ⓚ গ্রাম ⓛ প্রদেশ
ⓖ মন্ত্রিজ ⓘ জেলা ⓚ

৪৯. চান্দেলা রাজ্যের রাজা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ রাজ্যপাল ⓛ গোন্ডা
ⓖ ভীমপাল ⓘ আনন্দপাল ⓛ

৫০. 'স্বর্গীয় বধূ' মসজিদটিকে ঐতিহাসিকগণ কী নামে আখ্যায়িত করেছেন? (জ্ঞান)
ⓚ প্রাচ্যের পেপিস ⓛ প্রাচ্যের বিস্ময়
ⓖ প্রাচ্যের হোমার ⓘ প্রাচ্যের ভার্জি ⓛ

৫১. অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ঘুরীরা কোন জাতি থেকে উদ্ভূত? (জ্ঞান)
ⓚ পূর্বাঞ্চলীয় পারসিক ⓛ আফগান
ⓖ উত্তরাঞ্চলীয় তুর্কি ⓘ পাঞ্জাবি ⓚ

৫২. মুহাম্মদ ঘুরীর বিশ্বস্ত সেনাপতি কে ছিল? (জ্ঞান) [সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল]
ⓚ মুহাম্মদ-বিন-কাসিম
ⓛ খালেদ-বিন-ওয়ালিদ
ⓖ ইলতুৎমিশ
ⓘ কুতুবউদ্দিন আইবেক ⓘ

৫৩. মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি— (অনুধাবন)
i. শাসকদের শাসনকাল সম্পর্কে
ii. অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে
iii. তৎকালীন সময়ের সংস্কৃতি সম্পর্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii ⓘ

৫৪. বর্তমান হিন্দু সমাজে শান্তনুর পরিবার এবং বিজনের পরিবারের সদস্যগণ সমাজে বেশি প্রভাব বিস্তার করছে। হিন্দু বর্ণভেদ প্রথা অনুযায়ী তারা— (প্রয়োগ)
i. ব্রাহ্মণ ii. বৈশ্য iii. ক্ষত্রিয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii ⓛ

৫৫. প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করেছিল— (অনুধাবন)
i. হিন্দু গদ্য সাহিত্য ii. মুসলিম কাব্য
iii. হিন্দু নাটক-উপন্যাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৫৬. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে— (অনুধাবন)
i. আর্য ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণ ঘটে
ii. ইন্দোসারাসেনিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে
iii. হিন্দুদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫৭. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণ— (অনুধাবন)
i. রাজা দাহির কর্তৃক মুসলিম বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান
ii. উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি
iii. সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৫৮. মুহাম্মদ ঘুরীর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে— (অনুধাবন)
i. সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করেছিল
ii. ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল
iii. পরস্পর থেকে বেশি বীরত্ব প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করেছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৫৯. প্রাচীন হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরা দুর্নীতিপরায়ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কারণ তারা— (অনুধাবন)
i. জনসাধারণের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করত
ii. সাধারণ জনগণকে ধর্মের ভয় দেখিয়ে নিজেদের ফায়দা লুটত
iii. রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ আত্মসাৎ করত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ক

উদ্দীপকটি পড়ে ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' রাজ্যের রাজা মৃত্যুর পূর্বে তার ছোট ছেলেকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু বড় ভাই এ মনোনয়নে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ভাই-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ভাইকে পরাজিত করে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

৬০. উদ্দীপকের ঘটনাটি নিচের কোন ব্যক্তির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ক মুঘল সম্রাট বাবর
খ গজনির সুলতান মাহমুদ
গ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি
ঘ মুহাম্মদ ঘুরী খ

৬১. উক্ত ব্যক্তি সফলতা অর্জন করেছিলেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে
ii. রাজ্যাভিযানের ক্ষেত্রে
iii. ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

উদ্দীপকটি পড়ে ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
পার্বত্য অঞ্চলের জমিদার সাই-মু-প্রু প্রতিবছর তার পার্শ্ববর্তী জমিদারি আক্রমণ করে প্রচুর বাড়িঘর ধ্বংস করেন এবং ধনসম্পদ নিয়ে নেন। তার বারবার এরূপ আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে এলাকায় প্রচুর বিতর্ক রয়েছে।

৬২. উদ্দীপকে বর্ণিত জমিদার সাই-মু-প্রুর কার্যক্রম ভারতের কোন সুলতানের কার্যক্রমকে মনে করিয়ে দেয়? (প্রয়োগ)
ক সুলতান মাহমুদ
খ সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী
গ সুলতান ইলতুৎমিশ ঘ সুলতান বলবন ক

উদ্দীপকটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বানিয়াচং অঞ্চলের জমিদার জনাব মীর সাহেব। তিনি সাহিত্য ভালোবাসেন। কবি রফিক তার সভাকবি। জমিদার তার সভাকবিদের পূর্ব পুরুষদের বীরগাঁথা নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করতে বলেন। বিনিময়ে কবিকে আকর্ষণীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গ্রন্থ রচনার পর কবি পুরস্কার চাইলে জমিদার পূর্ব প্রতিশ্রুত পুরস্কারের চেয়ে স্বল্পমূল্যের পুরস্কার গ্রহণ করতে বলেন। এতে কবি রাগান্বিত হন এবং তার দরবার ত্যাগ করেন। [মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

৬৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের বৈশিষ্ট্য তোমার পঠিত কোন শাসকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ক মুহাম্মদ বিন কাসিম
খ মুহাম্মদ ঘুরী
গ সুলতান মাহমুদ
ঘ কুতুব উদ্দিন আইবেক গ

৬৪. কবির প্রতি উক্ত আচরণ দ্বারা প্রকাশ পায়- (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মহানুভবতা খ বদান্যতা
গ অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ঘ সাহিত্যপ্রেম গ

অধ্যায়-২: দিল্লি সালতানাত যুগ (১২০৬—১৫২৬ খ্রি.)

৬৫. দাস বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন? (জ্ঞান) [তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]
ক কুতুবউদ্দিন আইবেক
খ শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ গিয়াসউদ্দিন বলবন
ঘ সুলতান রাজিয়া — খ

৬৬. কুতুবউদ্দিন আইবেক তার রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেন? (জ্ঞান) [সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]
ক মিরাট খ দিল্লি
গ লাহোর ঘ পাঞ্জাব — খ

৬৭. কুতুবউদ্দিনের কোন আঙ্গুল কাটা ছিল? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক বৃদ্ধা আঙ্গুল খ তর্জনী আঙ্গুল
গ মধ্যমা আঙ্গুল ঘ কনিষ্ঠ আঙ্গুল — ঘ

৬৮. 'দাস বংশের' কতজন শাসক শাসনকাল পরিচালনা করেন? (জ্ঞান) [রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
ক ৯ জন খ ১০ জন
গ ১২ জন ঘ ১৫ জন — খ

৬৯. কত খ্রিস্টাব্দে ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন শুরু হয়? (জ্ঞান) [সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]
ক ১২০৪ সালে খ ১২০৬ সালে
গ ১২০৮ সালে ঘ ১২১০ সালে — খ

৭০. কুতুব মিনার কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫]
ক গৌড় খ আজমির
গ দিল্লি ঘ গুজরাট — গ

৭১. সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রতিষ্ঠিত বংশকে মামলুক বংশ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কারণে
খ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার কারণে
গ দাসত্বের জালে আবদ্ধ থাকার কারণে
ঘ রাজ্যজয়ের নেশায় ব্যস্ত থাকার কারণে — গ

৭২. ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হলেও নিজ মেধা আর যোগ্যতা দ্বারা বখতিয়ার খলজি তার নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিহাসের কোন ব্যক্তির সাথে তার জীবনের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক কুতুবউদ্দিন আইবেকের
খ সুলতান মাহমুদের
গ মুহাম্মদ বিন কাসিমের
ঘ মুহাম্মদ ঘুরীর — ক

৭৩. বখতিয়ার খলজি কে ছিলেন—(জ্ঞান) [সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]
ক দিল্লির প্রথম মুসলিম শাসনকর্তা
খ প্রথম বঙ্গ বিজেতা
গ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা
ঘ লাহোরের শাসনকর্তা — খ

৭৪. উত্তর ভারতের 'উচ' প্রদেশের শাসনকর্তা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক কুতুবউদ্দিন আইবেক
খ নাসিরউদ্দিন কুবাচা
গ তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ
ঘ শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ — খ

৭৫. কুতুবুদ্দিন আইবেক কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান) [রূপসা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়, যশোর]
ক স্বাভাবিকভাবে
খ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে
গ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে
ঘ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে — গ

৭৬. ভারতবর্ষে প্রথম কোন সুলতান খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন? (জ্ঞান)
ক কুতুবউদ্দিন আইবেক
খ সুলতান ইলতুৎমিশ গ সুলতান নাসিরউদ্দিন
ঘ সুলতান বলবন — খ

৭৭. সুলতান ইলতুৎমিশের আমলে প্রদেশগুলোকে কী বলা হতো? (জ্ঞান) [ঢাকা কলেজ]
ক সুবা খ তালুক গ ইকতা ঘ মুক্তা — গ

৭৮. সুলতান ই-আজম কার উপাধি ছিল? (জ্ঞান) [নজিপুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ]
ক ইলতুৎমিশ খ বাহারাম শাহ
গ আরাম শাহ ঘ মাসুদ শাহ — ক

৭৯. ইলতুৎমিশ উজির পদের সৃষ্টি করেন কেন? (অনুধাবন)
ক খাজনা আদায়ের জন্য
খ সৈন্যবাহিনী দেখার জন্য
গ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য
ঘ রাজ্যসীমানা বৃদ্ধির জন্য — গ

৮০. ইলতুৎমিশের সময় ভারত আক্রমণকারী মোঙ্গল নেতা কে ছিলেন? (জ্ঞান) [সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]
ক হালাকু খান খ কুবলাই খান
গ চেঙ্গিস খান ঘ গাজন খান — গ

৮১. দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক চেঙ্গিস খান খ খাওয়ারিযম
গ জালালউদ্দিন ঘ সুলতান মাহমুদ — ক

Teachingbd.com

৮২. 'ভারতের আবহাওয়া তার স্বাস্থ্যের অনুকূল হবে না'-এ অজুহাতে জালালুদ্দিনকে আশ্রয়দানে অস্বীকৃতি জানান ইলতুৎমিশ। এখানে শাসকের চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা) [দনিয়া কলেজ, ঢাকা]
ক কঠোরতা খ দুর্বলতা

৮৩. 'সুলতান-ই-আজম' কার উপাধি ছিল? (জ্ঞান)
ক কুতুবউদ্দিন আইবেক
খ সুলতান ইলতুৎমিশ
গ আরাম শাহ ঘ গিয়াসউদ্দিন বলবন খ

৮৪. কে নিজেকে 'আল্লাহর বান্দার সাহায্যকারী' হিসেবে পরিচিত করান? (জ্ঞান)
ক সুলতান মাহমুদ খ কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ মুহাম্মদ ঘুরী ঘ সুলতান ইলতুৎমিশ ঘ

৮৫. কোন ব্যক্তিকে 'আল্লাহর রাজ্যের রক্ষক' বলা হয়? (জ্ঞান)
ক সুলতান ইলতুৎমিশকে
খ সুলতান মাহমুদকে
গ মুহাম্মদ ঘুরীকে
ঘ কুতুবউদ্দিন আইবেককে ক

৮৬. কার রাজত্বকালকে 'গৌরব ও সমৃদ্ধিশালী' যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? (জ্ঞান)
ক কুতুবউদ্দিন আইবেকের
খ সুলতান মাহমুদের
গ গিয়াসউদ্দিন বলবনের
ঘ সুলতান ইলতুৎমিশের ঘ

৮৭. সুলতান রাজিয়া কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
ক ১২৩৪ খ্রি. খ ১২৩৬ খ্রি.
গ ১২৩৮ খ্রি. ঘ ১২৪০ খ্রি. খ

৮৮. 'চল্লিশ চক্র' রাজ্যের ক্ষমতা কীভাবে কুক্ষিগত করেছিল? (অনুধাবন)
ক রাজ্যের অস্থিরতার সুযোগে
খ রাজিয়ার প্রতি সৎ মনোভাব পোষণ করে
গ জনগণের সমর্থন আদায় করে
ঘ আমির-উমরাহদের উস্কে দিয়ে ক

৮৯. বলবনকে কারা দাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে? (জ্ঞান)
ক মোঙ্গলরা খ পাণ্ডবরা
গ তুর্কিরা ঘ আফগানরা ক

৯০. বলবনকে উলুঘ খান উপাধিতে ভূষিত করেন কে? (জ্ঞান) [নজিপুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ]
ক নাসিরউদ্দিন মাহমুদ খ আলাউদ্দিন খলজি
গ সুলতান রাজিয়া ঘ ফিরোজ শাহ ক

৯১. সুলতান নাসিরউদ্দিন বলবনকে কী উপাধি প্রদান করেন? (জ্ঞান)
ক উলুঘ খান খ আরাম খান
গ সাহসী বীর ঘ সংগ্রামী মানুষ ক

৯২. সুলতান বলবনের মতে রাজতন্ত্র কী? (জ্ঞান)
ক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা
খ উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ
গ ক্ষমতার চর্চা
ঘ রাজনীতির বিকাশ ক

৯৩. 'আফরাসিয়াব' কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক রাজসভার কবি খ পৌরাণিক কবি
গ ঐতিহাসিক ঘ ধর্মনেতা খ

৯৪. 'চল্লিশ চক্রের' সদস্য ছিলেন নিচের কোন ব্যক্তি? (জ্ঞান)
ক বলবন খ ইলতুৎমিশ
গ রাজিয়া ঘ আইবেক ক

৯৫. বলবন দিল্লি সালতানাতকে সম্পূর্ণরূপে একটি তুর্কি প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এতে তার কোন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সাম্প্রদায়িকতা খ ধর্মনিরপেক্ষতা
গ উগ্রজাতিচেতনা ঘ স্বাজাত্যবোধ গ

৯৬. বিচক্ষণ আলাউল মুলক আলাউদ্দিন খলজির দিগ্বিজয়ের স্বপ্নকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)
ক সুলতানের সামর্থ্য ছিল না বলে
খ সুলতানের বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিল না বলে
গ সুলতানের দক্ষ সেনাবাহিনীর অভাব ছিল বলে
ঘ সুলতান ধর্মহীন ছিলেন বলে খ

৯৭. 'আগলিক' শব্দ থেকে 'তুঘলক' শব্দের উৎপত্তি—এটি কার মত? (জ্ঞান)
ক ঈশ্বরী প্রসাদের খ ইবনে বতুতার
গ ডব্লিউ হেইগের ঘ শেখ রুকনুদ্দিনের গ

৯৮. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান) [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]
ক গিয়াসউদ্দিন তুঘলক খ জুনা খান
গ নাসিরউদ্দিন খসরু ঘ গিয়াসউদ্দিন বলবন ক

৯৯. 'মালিক উল গাজি' উপাধি কার? (জ্ঞান)
ক ফিরোজ শাহ তুঘলক
খ কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ
গ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
ঘ জাফর খান গ

http://teachingbd.com

১০০. মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাজারের সমস্ত আসল ও নকল তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে রাজকোষ থেকে রৌপ্যমুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এর প্রভাবে কী হয়? (অনুধাবন)
ক) দেশে রূপার অভাব দেখা দেয়
খ) তাম্র ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটে
গ) রাষ্ট্রের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়
ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় — গ

১০১. দেবগিরি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান) [শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]
ক) উড়িষ্যায় খ) বাংলায়
গ) দাক্ষিণাত্যে ঘ) বিহারে — গ

১০২. দিল্লির কোন সুলতান সর্বপ্রথম রৌপ্যমুদ্রা "তংকা" ও তাম্রমুদ্রা "জিতল" প্রচলন করেন? (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ, ঝিনাইদহ]
ক) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
খ) শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ) ফিরোজ শাহ তুঘলক
ঘ) গিয়াসউদ্দিন বলবন — খ

১০৩. সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? (জ্ঞান) [সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]
ক) মুবারক শাহ খ) খিজির খান
গ) মুহাম্মদ শাহ ঘ) ফরিদ শাহ — খ

১০৪. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের বিরোধী শক্তি কে ছিল? (জ্ঞান)
ক) সম্রাট বাবর খ) আহম্মদ শাহ আবদালি
গ) সম্রাট হুমায়ুন ঘ) রাজা পৃথ্বীরাজ — ক

১০৫. কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতে কোন শাসনের প্রতিষ্ঠাতা? (জ্ঞান)
ক) সুলতানি খ) মুঘল
গ) সুবাদারি ঘ) নবাবি — ক

১০৬. তুর্কি ভাষায় 'আইবেক' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক) সূর্যদেবতা খ) চন্দ্রদেবতা
গ) বীরযোদ্ধা ঘ) জ্ঞানের দেবতা — খ

১০৭. ইলতুতমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক) মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করা
খ) বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করা
গ) খলিফার কাছ থেকে খেতাব প্রাপ্ত হওয়া
ঘ) দিল্লিতে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা — ঘ

১০৮. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃতি কেমন ছিল? (অনুধাবন)
ক) গণতান্ত্রিক
খ) একনায়কতান্ত্রিক
গ) নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক
ঘ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক — গ

১০৯. কারা 'চল্লিশ চক্র' নামে পরিচিত? (জ্ঞান) [বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক) তুর্কি অভিজাত সম্প্রদায়
খ) বিদ্রোহী মুসলিম সম্প্রদায়
গ) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্রোহী গোষ্ঠী
ঘ) শাহ তুর্কানের বিদ্রোহী দল — ক

১১০. ফখরুদ্দিন জুনা খানকে কোন উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়? (জ্ঞান)
ক) উলুঘ খান খ) বীর খান
গ) বীর বক্স ঘ) বীর উলুঘ — ক

১১১. খিজির খান কত বছর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন? (জ্ঞান)
ক) ৫ বছর খ) ৬ বছর
গ) ৭ বছর ঘ) ১০ বছর — গ

১১২. 'আমি দুই-এক জন নয়, কয়েকশ পুত্র রেখে গেলাম' মুহাম্মদ ঘুরী তার এ বক্তব্য দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন— (প্রয়োগ)
i. ইলতুৎমিশের প্রতি
ii. কুতুবউদ্দিন আইবেকের প্রতি
iii. তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — গ

১১৩. কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন— (অনুধাবন)
i. রাজনীতিতে দূরদর্শী
ii. অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী
iii. ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ক

১১৪. সরাসরি ক্রীতদাস ছিলেন— (অনুধাবন) [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. কুতুবউদ্দিন আইবেক
ii. ইলতুৎমিশ iii. গিয়াসউদ্দিন বলবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

১১৫. সুলতান রাজিয়া আলতুনিয়াকে বিবাহ করেছিলেন কেন? (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫]
i. নিজেকে রক্ষা করার জন্য
ii. ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য
iii. সংসারী হওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ক

১১৬. গিয়াসউদ্দিন বলবন চল্লিশ চক্রের ক্ষমতা খর্ব করতে সক্ষম হন- (অনুধাবন) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
i. চল্লিশ চক্রের ক্ষমতা হ্রাস করে
ii. নিম্নপদস্থ তুর্কিদের পদোন্নতি দিয়ে
iii. অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

http://teachingbd.com

১১৭. সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে উচ্চাভিলাষী করে তুলেছিল— (অনুধাবন)
i. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণে সাফল্য
ii. বিরুদ্ধবাদীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষমতা
iii. প্রজাসাধারণের সমর্থন লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii
খ

১১৮. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন— (অনুধাবন)
i. উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য
ii. ভূমিকর ধার্যকরণের জন্য
iii. কৃষকদের অবস্থা বোঝার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

১১৯. সুলতান গিয়াসউদ্দিন দস্যু তস্করদের হাত থেকে কৃষক ও সাধারণ জনতাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন— (অনুধাবন)
i. দুর্গ নির্মাণ করেন ii. পরিখা নির্মাণ করেন
iii. পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১২০. সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক প্রণীত ভূমিসংস্কার ও রাজস্বনীতির ফলে— (অনুধাবন)
i. ভূমি সংশ্লিষ্ট সকলে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পায়
ii. জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে
iii. রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১২১. দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ছিল— (অনুধাবন) [কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]
i. সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে দেবগিরির অবস্থান
ii. সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
iii. দাক্ষিণাত্যে ইসলামি সংস্কৃতির প্রবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১২২. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রবর্তনের কারণ— (অনুধাবন)
i. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিবিধান
ii. লেনদেন ও বিনিময় সহজলভ্য করা
iii. সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য অবদান রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

১২৩. ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ভূমিকা রেখেছিল ইলতুৎমিশের— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দৃঢ়তা
ii. উদ্যমশীল কর্মপ্রচেষ্টা
iii. বিশ্বস্ত অনুচর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৪ ও ১২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ক্ষমতা আরোহণের পর অভ্যন্তরীণ সংকট এবং বহিঃশক্তির আক্রমণের সম্ভাবনা অত্যন্ত কার্যকরভাবে মোকাবিলা করেন রাষ্ট্রপতি দীনেশ বড়ুয়া। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীনেশ বড়ুয়ার রাজ্যটি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

১২৪. উদ্দীপকের দীনেশ বড়ুয়ার সাথে ইলতুৎমিশের মিল পাওয়া যায়— (প্রয়োগ)
i. প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার
ii. ন্যায়পরায়ণতার
iii. সাহসিকতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

১২৫. মিল থাকলেও দীনেশ বড়ুয়ার থেকে ইলতুৎমিশের অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। কারণ তিনি— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সফল বিজেতা ছিলেন
ii. সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন
iii. দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ১২৬ ও ১২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতের এক চরম সংকটকালে ক্ষমতা আরোহণ করে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমণকে প্রতিহত করে। মুসলমানদের জানমাল রক্ষার্থে তিনি গ্রহণ করেন নানা উদ্যোগ।

১২৬. সুলতান বলবনের সাথে নিচের কোন সুলতানের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক জালালউদ্দিন খলজি
খ আলাউদ্দিন খলজি
গ কুতুবউদ্দিন আইবেক
ঘ মুহাম্মদ বিন তুঘলক
খ

১২৭. মিল থাকলেও তারা দুজন ভিন্ন ধারার মানুষ— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিগত দিক দিয়ে
ii. ধর্মনিষ্ঠার দিক দিয়ে
iii. কর্তব্যপালনের দিক দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

http://teachingbd.com

অধ্যায়-২: দিল্লি সালতানাত যুগ (১২০৬ —১৫২৬ খ্রি.)

প্রশ্ন ▶১ শ্রীমাভো বন্দরনায়েক আধুনিক বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দেশ-বিদেশের কতিপয় অভিজাত শ্রেণির সমালোচনার মুখোমুখি হন। কিন্তু নিজ মেধা ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি সকল বিশৃঙ্খলা দূর করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

[দি. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭; আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. সালতানাতের শেষ সুলতান কে ছিলেন? ১

খ. আলাউদ্দিন খলজির মোঙ্গলনীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহিলা শাসকের সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন মহিলা শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মহিলা শাসকের কৃতিত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিচার করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সালতানাতের শেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদি।

খ আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে দিল্লি সালতানাতে প্রায় সাত বার মোঙ্গল আক্রমণের তথ্য পাওয়া যায়। তাই মোঙ্গলদের প্রতিহতকরণে তিনি কতিপয় কার্যকর মোঙ্গলনীতি গ্রহণ করেন।

আলাউদ্দিন খলজি মোঙ্গলদের মোকাবিলায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সাথে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মোঙ্গলদের আক্রমণ পথে তিনি পুরাতন কেল্লা সংস্কার ও নতুন কেল্লা স্থাপন করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি উন্নতমানের অস্ত্রের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিশ্বস্তদের ওপর ন্যস্ত করেন। এছাড়া তিনি মোঙ্গলদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ করেন। এভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবিলায় সাফল্য লাভ করেন। তার রাজত্বকালে মোঙ্গলরা আর ভারত আক্রমণে সাহস করেনি।

গ উদ্দীপকে শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের সঙ্গে দিল্লির সালতানাতের মহিলা শাসক সুলতান রাজিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা চিরকালই অবহেলিত হয়ে আসছে। এই অবহেলার মাঝেও নারীরা স্বীয় যোগ্যতাবলে সমাজের উন্নয়নে অংশীদার হয়েছে। নানা বাধার সম্মুখীন হয়েও তারা সফল হয়েছে; সকল সমালোচনার উচিত জবাব দিয়েছে। উদ্দীপকের শ্রীমাভো বন্দরনায়েক এবং সুলতান রাজিয়া এমনই দুজন নারী ব্যক্তিত্ব।

শ্রীমাভো বন্দরনায়েক ছিলেন আধুনিক বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বিভিন্ন দেশের কিছু অভিজাত শ্রেণির সমালোচনার মুখোমুখি হন। তারা নারী বলে শ্রীমাভো বন্দরনায়েককে শাসনকার্যে অনুপযোগী ও অদক্ষ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু নিজ মেধা, তেজস্বিতা আর কর্মদক্ষতার গুণে শ্রীমাভো সকল বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রতিহত করে দেশের উন্নতি সাধন করেন। সুলতান রাজিয়াও একইভাবে ১২৩৬ থেকে ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সিংহাসনে বসে সুলতানি শাসন পরিচালনা করেন। তার ৪ বছরের রাজত্বকাল মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ প্রতিহত করেন। তিনি উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা শাসনকর্তা। তার সাহসিকতা, দক্ষতা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তুর্কি জাতির সাহসিকতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। তার উদার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বস্তুত মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সুতরাং দেখা যায় উদ্দীপকের শ্রীমাভো বন্দরনায়েক এবং সুলতান রাজিয়া শাসন পরিচালনার দিক দিয়ে একে অন্যের প্রতিরূপ।

ঘ ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা।

সালতানাতের এক সংকটকালে সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের হিসেব মতে, তিনি ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী একজন নারী। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেন। মিনহাজ-উস-সিরাজ তাকে মহান নৃপতি, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও মহানুভব বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সার্বভৌম নৃপতির প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহর মতে, সাহসিকতা ও অদম্য দৃঢ়তাই (Courage and unflincing determination) ছিল রাজিয়ার আদর্শ।

চারিত্রিক দৃঢ়তায় সুলতান রাজিয়া নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও যোগ্যতাই তার ক্ষমতা ও অস্তিত্বের চাবিকাঠি ছিল। সুলতান রাজিয়া প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন, অশ্বারোহণে জনসমক্ষে বের হন এবং প্রকাশ্যে দরবার পরিচালনা করেন। অধ্যাপক কে. এ. নিজামী যথার্থই বলেছেন, "অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, তিনি ছিলেন ইলতুৎমিশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যোগ্যতম।"

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান রাজিয়া ছিলেন অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

প্রশ্ন ▶২ নিপু বাজারে গিয়ে দেখলেন যে, বাজারে প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য তালিকা দেয়া আছে কিন্তু ব্যবসায়ীগণ তা মানছেন না। প্রতি কেজি চাল ৩০ টাকার পরিবর্তে ৩৭/৩৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। *[দি. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭]*

ক. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বলবনের 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (শাসনকাল ১৩২০-১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ)।

খ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপই 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' (Blood and Iron policy) নামে পরিচিত।

সিংহাসনে আরোহণ করেই বলবন নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আমির-ওমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য, দ্বন্দ্ব-কলহ ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, দিল্লির সন্নিকটস্থ মেওয়াটি দস্যুদের উপদ্রব, উপর্যুপরি মোঙ্গল আক্রমণ প্রভৃতি। এসব সমস্যা সাম্রাজ্যের ভিতকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। তাই নিজের ক্ষমতা সুসংহত করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি গুপ্তচর প্রথা চালু, বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, মোঙ্গল নীতি প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলোই বলবনের 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' হিসেবে স্বীকৃত।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের শাসক দিল্লি সালতানাতের সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই নানামুখী সংস্কার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কাজগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। মূলত আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতি বিধানের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকে একটি বাজারের দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিশীল অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে না। এ রকম অবস্থার প্রেক্ষিতেই সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

Teachingbd24.com

আলাউদ্দিন খলজি খাদ্যশস্য সুলভ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন– গম, বার্লি, চাল, চিনি, আটা, ডাল, তৈল, সোডা ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করে দেন। এছাড়া তিনি বস্ত্র, পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যের তালিকা করে দেন। এছাড়া তিনি দ্রব্যাদির চাহিদা অনুসারে সরবরাহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বস্ত্র, পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যের তালিকা করে দেন। উদ্দীপকে এরকমই একটি মূল্যতালিকার কথা বলা হয়েছে, যা আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত বহন করছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জনজীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজি প্রবর্তিত সংস্কারসমূহের মধ্যে ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত তিনিই একমাত্র শাসক, যিনি একটি বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করে ইতিহাসে অমর ও অক্ষয় হয়ে রয়েছেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তাৎপর্য ও ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বলেন, 'বাজারে শস্যের অপরিবর্তিত মূল্য সে যুগের অন্যতম বিস্ময় ছিল'। স্টেনলি লেনপুলের মতে, 'এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল। সকল শ্রেণির জনগণ এ অভূতপূর্ব পদ্ধতির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছিল'। সুলতানের দৃঢ় সংকল্প, কঠোর নজরদারি, কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এবং জনগণের সহযোগিতায় এ পদ্ধতি কার্যকর ও সফল হয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ, খাদ্য সমস্যার সমাধান এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধিত হয়। সুলতানের এ মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবল তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করেনি, এটা জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুলতানের পক্ষে যেমন অল্প বেতনে বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিপালন সম্ভব হয়, তেমনি এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আনয়নেও তিনি সফল হন।

প্রশ্ন ▶ ৩ অনলাইন শপিং এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে। মানুষের ব্যস্ততা ও কর্মপরিধি বাড়তে থাকায় তারা আজ বাজারে যাবার পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে না। তাছাড়া প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারিত থাকায়, সঠিক ওজন ও পণ্যের গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করায় এ শপিং ব্যবস্থার উপর ক্রেতাদের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্রব্য সামগ্রীর বিপুল সমাহার ও বৈচিত্র্য থাকায় অনলাইন শপিং মানুষের সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় করছে।

[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭; আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. তৈমুর লঙ এর ভারত আক্রমণের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনার সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, অনলাইন শপিং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মতো সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও উক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? তোমার উত্তরে পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক।

খ তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণের ফলে দিল্লি সালতানাত পতনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায়।

দিল্লি সালতানাতের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ সমরনেতা আমির তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮-৯৯ খ্রি.)। তার এ আক্রমণের ফলে দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। এ সুযোগে সালতানাতের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সালতানাতের পতনের বিষয়টি শুধু সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনার সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার বিষয়টির মিল রয়েছে।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই নানামুখী সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কার্যগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। তিনি মূলত সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকেও তার এ ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পণ্যের সঠিক ওজন ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও তার শাসনামলে খাদ্যশস্য সুলভ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। যেমন– গম প্রতি মণ $৭\frac{১}{২}$ জিতল (১ জিতল = ০.৬ পয়সা), বার্লি প্রতিমণ ৪ জিতল, ধান প্রতিমণ ৫ জিতল, ডাল প্রতিমণ ৫ জিতল, তিল ও তৈল তিন সের ১ জিতল, মাখন $২\frac{১}{২}$ সের ১ জিতল, ঘি $২\frac{১}{২}$ সের ১ জিতল ইত্যাদি। সুলতান কেবল দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। উদ্দীপকের অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনায়ও সুলতান আলাউদ্দিন খলজির এ কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, অনলাইন শপিং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মতো সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার জন্য পণ্যের সঠিক ওজন ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এছাড়া পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্রব্য সামগ্রীর বিপুল সমাহার রাখা হয়েছে। ফলে এটি জনগণের নিকট অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ঠিক একইভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কিছু যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিন খলজি পণ্য বাজার স্থাপন করেন। তিনি দিল্লিতে মান্ডি নামে প্রধান ও কেন্দ্রীয় শস্য বাজার বসান। ঔষধপত্র, কাপড়, শুকনো ফল, চিনি, মাখন এবং জ্বালানি তেলের বাজার বসানো হয় দিল্লির বাদাউন তোরণে 'সেহরা আদলে'। এ সময়ে পণ্য বাজার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য 'শাহানা ই মান্ডি' এবং 'দিউয়ান ই রিয়াসত' নামক দুজন পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্যসহ পণ্য আমদানি এবং নির্দিষ্ট মূল্যে তা বিক্রির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসায়ীদের পণ্য মূল্য টানিয়ে রাখার নির্দেশ ছিল। নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত আদায় ও ওজন পরিমাপে কারচুপি করা হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। প্রাকৃতিক কারণে যাতে খাদ্য ঘাটতি না পড়ে এবং চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যায় সেজন্য দিল্লিতে একটি রাজকীয় শস্যাগার স্থাপন করা হয়েছিল। পণ্য বরাদ্দ নির্ধারণের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী একটি পরিবারের সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও অধিক মুনাফার লোভে কেউ যাতে পণ্যের মজুতদারি না করতে পারে সুলতান সে ব্যবস্থা করেন। মজুতদারি নিরোধে জরিমানা ও পণ্য বাজেয়াপ্ত করা সহ নানা রকমের শাস্তি দেওয়া হতো। এ সকল ব্যবস্থাছাড়াও সুলতান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ উচ্চাভিলাষী জমিদার প্রবাল রায়ের অত্যাচার ও কঠোর কর আদায় নীতির কারণে সাধারণ প্রজাগণ বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বন্ধ করে দেয়, কৃষক কৃষিকাজ ফেলে পালিয়ে যায়। বিদ্রোহ দমন করতে যেয়ে তার মৃত্যু হয়। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে চাচাত ভাই শ্যামল রায় নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জমিদারির দায়িত্ব নেন। তিনি জমিদারের প্রতি প্রজাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক জনকল্যাণকর কাজ করেন। তিনি সাধারণ প্রজার বকেয়া কর মাফ করে দেন। আবার ঋণ প্রদান করেন। তবে অধিক হারে ঋণ প্রদান ও বেহিসেবি দান খয়রাতের ফলে রাজকোষে প্রচণ্ড অর্থ ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে জমিদারির দুরবস্থার জন্য তাকে দায়ী করা হয়।

[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭]

ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ১

খ. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদার শ্যামল রায়ের সাথে কোন ভারতীয় সুলতানি শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জমিদার শ্যামল রায়ের মতো উক্ত সুলতানকেও তার বংশের পতনের জন্য দায়ী করা যায় কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক কাফুর ছিলেন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

খ দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করা।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল হিন্দু বিদ্রোহ দমন এবং জমিদারদের দর্পচূর্ণ করা। আবার অনেকেই মনে করেন রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান ও কারাচিল অভিযানের ব্যর্থতা এবং প্রতীকী মুদ্রার বিফলতার কারণেই সুলতান দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। কর বৃদ্ধির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বারানী বলেন যে, সুলতান দোয়াবে দশ হতে বিশগুণ কর বৃদ্ধি করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদার শ্যামল রায়ের সাথে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাদৃশ্য রয়েছে।

দিল্লি সালতানাতের তুঘলক বংশের অন্যতম খ্যাতিমান শাসক ছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সালতানাতের ক্ষমতা গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উদ্দীপকের জমিদার শ্যামল রায়ের মধ্যে এ শাসকেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, বিদ্রোহ দমন করতে যেয়ে জমিদার প্রবাল রায়ের মৃত্যু হয়। এরপর তার চাচাতো ভাই শ্যামল রায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জমিদারির দায়িত্ব নেন। তিনি জমিদার হওয়ার পর অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। অনুরূপভাবে তাকির বিদ্রোহ দমন করত গিয়ে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তার চাচাতো ভাই ফিরোজ শাহ অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমির ও অভিজাতগণের অনুরোধ এবং সাম্রাজ্যের বাস্তব সংকটজনক অবস্থা বিবেচনা করে সালতানাতের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি প্রজা কল্যাণে মনোনিবেশ করেন। প্রজাকল্যাণমূলক কার্যাবলির জন্য তিনি ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার সময়ে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো, তিনি পূর্ববর্তী সুলতানের দেওয়া ঋণ মওকুফ করে দেন। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের জমিদার শ্যামল রায়ের সাথে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের জমিদার শ্যামল রায়ের মতো উক্ত সুলতানকেও অর্থাৎ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলককেও তার বংশের পতনের জন্য দায়ী করা যায়।

উদ্দীপকের শ্যামল রায় জমিদারের প্রতি প্রজাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক জনকল্যাণকর কাজ করেন। তিনি প্রজাদের বকেয়া কর মাফ করেন এবং নতুন করে ঋণ প্রদান করেন। তবে অধিক হারে ঋণ প্রদান ও বেহিসেবি দান খয়রাতের ফলে রাজকোষে ব্যাপক অর্থ ঘাটতি দেখা দেয়, যা জমিদারকে দুরবস্থায় ফেলে দেয়। শ্যামল রায়ের মতো দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও তার বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিলেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কার ও উদারনীতির মধ্যে তুঘলক বংশের পতনের বীজ নিহিত ছিল। তার কোনো কোনো নীতি ও কার্যাবলি শুধু তুঘলক বংশের নয়, দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্যও দায়ী ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। সমাজের বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দমনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তার আরেকটি বড় ভুল ছিল জায়গিরদারি প্রথার পুনঃপ্রবর্তন। এর ফলে অভিজাতবর্গ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে। তিনি সেনাবাহিনীতে বংশানুক্রমিক চাকরির অধিকার প্রদান করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তার সৃষ্ট ক্রীতদাস বাহিনীর ভরণপোষণে রাজকোষের প্রচুর অর্থ অপচয় হয়। ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। আবার যুদ্ধনীতি পরিহার করায় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। শাসনকাজে উলামাদের প্রাধান্য দেওয়ায় সুলতান অসুন্নি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের রোষানলে পতিত হন। তার সময়ে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান রহিত করার ফলে দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা সরকারি অর্থ সম্পদ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এ সকল কর্মকাণ্ড তুঘলক বংশকে পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসননীতি ও কার্যাবলি তুঘলক বংশের পতন এমনকি সালতানাতের পতনের পথকে সুগম করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫ প্রশাসনের একজন অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে দেখলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আমলা শ্রেণি তৈরি করা হয়েছিল তারাই এখন প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচরণ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি এবং সিন্ডিকেটভিত্তিক অফিসিয়াল কার্যাদি পরিচালনা করছে। এমতাবস্থায় মেয়র প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সিন্ডিকেটদের কঠোরভাবে দমন-বদলি, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ফলে সিটি কর্পোরেশনে সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সুনাম বৃদ্ধি পায়।

[সকল বো. '১৬]

ক. সুলতান মাহমুদের পিতার নাম কী? ১

খ. কুতুবমিনার নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমলা সিন্ডিকেটের সাথে বন্দেগান-ই-চেহেলেগানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়র কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদের পিতার নাম আমির সবুক্তগীন।

খ মহান সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে কুতুবমিনারের নামকরণ করা হয়।

দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি বেশ অনুরাগী। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই তিনি ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ সময় কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী নামে একজন মহান সাধক সুলতানের সংস্পর্শে আসেন। তাকে সুলতান খুবই পছন্দ এবং শ্রদ্ধা করতেন। তাই তার নামানুসারে এ বিজয় স্তম্ভের নামকরণ করা হয় কুতুবমিনার।

গ কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে বন্দেগান-ই-চেহেলেগানের সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত আমলা সিন্ডিকেটের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সুলতান ইলতুৎমিশের শাসনামলে তুর্কি অভিজাতরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। এরাই 'বন্দেগান-ই-চেহেলেগান' নামে পরিচিত ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনও এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইলতুৎমিশ-পরবর্তী দুর্বল উত্তরাধিকারীদের (রুকুনউদ্দিন ফিরোজ, মুইজ উদ-দীন বাহরাম, আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ) যুগে এ গোষ্ঠী প্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। মাঝে মধ্যে তারা শাসকদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধেও এ চক্র শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা নানা ধরনের অপকর্ম করে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। উদ্দীপকের আমলা সিন্ডিকেটের মধ্যেও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রশাসনের একজন অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিটি মেয়র নির্বাচিত হলে শাসনকার্য পরিচালনায় আমলা শ্রেণি তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে বন্দেগান-ই-চেহেলেগান নামক আমলা শ্রেণিও গিয়াসউদ্দিন বলবনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সুলতান বলবন এ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের ওপর সুলতানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকের সিন্ডিকেট দমনেও সিটি মেয়রকে সুলতান বলবনের ন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়। সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান, আভিজাত্য, অপচেষ্টা প্রভৃতি কার্যাবলি বিবেচনায় বন্দেগান-ই-চেহেলেগান ও উদ্দীপকের সিন্ডিকেট একই ধরনের আমলা শ্রেণি।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়র কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপের অনুরূপ।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় 'বন্দেগান-ই-চেহেলেগান' নামক তুর্কি অভিজাতদের অপকর্মের দৌরাত্ম্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সুলতান তাদের অপরাধ চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তাদের পদোন্নতি বন্ধ করে দেন এবং বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদের জনসমক্ষে শাস্তি দেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের উদ্যোগ লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিটি মেয়র দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি কর্মকর্তাদের বদলির আদেশ দেন। একইভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবনও দুর্নীতিবাজ বন্দেগান-ই-চেহেলেগানদের শাস্তি দেন। তিনি অপরাধীদের চিহ্নিত করে যেমন জনসমক্ষে বিচার করতেন তেমনি সিটি মেয়র একই ধরনের বাস্তবধর্মী ও নিরপেক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে সিটি কর্পোরেশনে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গিয়াসউদ্দিন বলবনের বন্দেগান-ই-চেহেলেগানদের দমনের ফলেও সাম্রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান বলবন এ চক্রের প্রভাব খর্ব করে সাম্রাজ্যে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সিটি মেয়র এবং গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবধর্মী এবং কার্যকর হওয়ায় উভয়ই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ৬ জমিদার আবুল হাসান মৃত্যুর পূর্বে তার বিদূষী ও বুদ্ধিমতী কন্যা হাসনা বানুকে তার বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আপনজনদের নানামুখী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তাকে জমিদারি হারাতে হয়েছিল। কিন্তু শত্রুদের হাতে তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি জমিদারি ফিরে পান। সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারী হওয়ার কারণে তিনি নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। *[সকল বো. '১৬]*

ক. 'আইবেক' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. গিয়াসউদ্দিন বলবন কেন রক্তপাত ও কঠোরনীতি গ্রহণ করেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদার কন্যার সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হাসনা বানু ও উক্ত নারী শাসকের ব্যর্থতার কারণ একই সূত্রে গাঁথাম— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আইবেক' শব্দের অর্থ চন্দ্র দেবতা।

খ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় তুর্কি অভিজাতদের ষড়যন্ত্র এবং বহিরাক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সুলতান বলবন ষড়যন্ত্রপরায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও শত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদার কন্যার সাথে দিল্লি সালতানাতের সুলতান রাজিয়ার মিল রয়েছে।

সুলতান ইলতুৎমিশ পুত্রদের তুলনায় কন্যা রাজিয়াকেই সালতানাত পরিচালনায় অধিক যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি কন্যা রাজিয়াকে দিল্লি সালতানাতের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। রাজিয়া দিল্লি সালতানাতের দায়িত্ব নিলে তার কাছের মানুষেরা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাদের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করলে রাজিয়াকে ক্ষমতা হারাতে হয়। উদ্দীপকেও এ ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবুল হাসানের মৃত্যুর পর তার যোগ্য কন্যা জমিদারি লাভ করলে আপনজনরা বিরোধিতা করে। এ ধরনের আপন লোকেরাই সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটিয়েছিল। সুলতান হিসেবে রাজিয়াকে নানা বাধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। রাজিয়াকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে অভিজাত আলেম-উলেমা এবং আত্মীয়রা নানা ধরনের বিরোধিতা করেন। ভিন্ন সাম্রাজ্যের সাথে বিরোধ থাকলে অথবা প্রতিযোগিতা থাকলে তাতে জয় লাভ করা যায়। কিন্তু নিজ সাম্রাজ্যের অভিজাতদের সাথে শত্রুতা থাকলে তা অনেক সময় পরাজয় ডেকে আনে। উদ্দীপকে হাসনা বানু ও দিল্লি সালতানাতের রাজিয়ার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। সুতরাং নারী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ, যোগ্যতা, পরাজয় প্রভৃতি বিষয় অনুসারে সুলতান রাজিয়ার সাথে উদ্দীপকের হাসনা বানুর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু নারী হওয়ার কারণেই হাসনা বানু ও সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটেছিল।

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র নারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। শাসনকার্যে চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। তিনি তার প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুর্কি অভিজাত শ্রেণি নারী বলে সুলতান রাজিয়ার এ সকল কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেন। অভিজাত শ্রেণির এ বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের ফলেই তার পতন হয়। হাসনা বানুর ব্যর্থতার পেছনেও এ ধরনের বিষয় প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, হাসনা বানু জমিদারি গ্রহণ করে সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারীসুলভ দুর্বলতার কারণে নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। ঠিক একইভাবে সুলতান রাজিয়াও সিংহাসনে আরোহণ করার পর শাসন ক্ষেত্রে নানাবিধ গুণাবলি ও যোগ্যতার প্রমাণ দিলেও ব্যর্থ হন। মূলত নারীত্বই ছিল তার প্রধান অযোগ্যতা। ভি. ডি. মহাজন বলেন, 'যদি রাজিয়া একজন নারী না হতেন তাহলে তিনি ভারতের অন্যতম সফল শাসক হতেন।' শক্তিশালী পুরুষ আমির-উমরাহগণ একজন নারী কর্তৃক শাসিত হতে অপমান বোধ করে তার উৎখাত সাধনে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। তাছাড়া রাজিয়ার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কঠিন হস্তে শাসন পরিচালনা সুলতানি সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কি অভিজাতদের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে তুর্কি অভিজাতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটায়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, একজন নারী হিসেবে সুলতান রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করার বিষয়টিকে তুর্কি অভিজাতগণ নিজেদের অপমান হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে তারা নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটায়। আর এতে প্রমাণিত হয়, হাসনা বানু ও সুলতান রাজিয়ার ব্যর্থতার কারণ একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ ভুটানের 'কিংস কাপ' ফুটবল ফাইনাল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের রক্ষণভাগের সাহসী খেলোয়াড় ইয়াছিন তার চমৎকার ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে ভারতের শক্তিশালী পুনে ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় এনে দেন। ইয়াছিন ডিফেন্স থেকে প্রতিপক্ষের দুর্বলতাগুলো লক্ষ করেন এবং সুযোগ বুঝে মধ্যমাঠ দিয়ে না গিয়ে বরং সাইড লাইন ঘেঁষে ক্ষিপ্র গতিতে গিয়ে গোলপোস্ট ছেড়ে দূরে দাঁড়ানো বিপক্ষ গোল কিপারকে বোকা বানিয়ে বলটিকে অতর্কিতে প্রতিপক্ষের জালে পাঠিয়ে দেন। বাকি সময়ে প্রতিপক্ষ সে গোল আর শোধ করতে পারেনি। অথচ জয়ের নায়ক ইয়াছিন ইতোপূর্বে জাতীয় দলসহ বিভিন্ন ক্লাবে নিজের নাম অন্তর্ভুক্তির প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক. ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১

খ. কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রতিষ্ঠিত বংশকে দাসবংশ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ইয়াছিনের খেলোয়াড় হিসেবে ক্লাবে নাম অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টার সাথে বখতিয়ার খলজির প্রথম জীবনের ইতিহাসের কী মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কিংস কাপ জয়ের কৌশল ও বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের কৌশল প্রায় একই—উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক।

খ কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে এবিএম হবিবুল্লাহ কুতুবউদ্দিনের এ রাজবংশকে 'মামলুক' বা 'দাস বংশ' নামে অভিহিত করেছেন।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন আইবেক সুলতান উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন ও একটি নতুন রাজবংশের সূচনা হয়। কুতুবউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশই ইতিহাসে 'দাস বংশ' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে ইয়াছিনের খেলোয়াড় হিসেবে ক্লাবে নাম অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টার সাথে বখতিয়ার খলজির প্রথম জীবনের সেনাবাহিনীতে চাকরি প্রাপ্তির প্রচেষ্টার মিল রয়েছে।

ভাগ্য সব সময় মানুষের অনুকূলে থাকে না। তবে প্রচেষ্টা থাকলে শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ অনিবার্য। উদ্দীপকের ইয়াছিন প্রথম জীবনে ভাগ্যের আনুকূল্য পাননি। বারবার চেষ্টা করেও তিনি জাতীয় দলসহ কোনো ক্লাবে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে নাম লেখাতে পারেননি। বখতিয়ার খলজির প্রথম জীবনের ঘটনাও অনুরূপ।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি দারিদ্র্যের নিপীড়নে তিনি প্রথম জীবনে স্বদেশ ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে বের হন। প্রথমেই গজনির সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর সৈন্যবাহিনীতে চাকরি প্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি দিল্লিতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের দরবারে হাজির হন। এখানেও তিনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি বাদাউনে যান, সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিন বখতিয়ার খলজিকে নগদ বেতনে সেনাবাহিনীতে চাকরি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি সামান্য বেতনভোগী সিপাহি হয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। অল্পকাল পরে তিনি অযোধ্যায় যান। অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিন তাকে দুইটি পরগনায় জায়গির প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে মনোনিবেশ করেন। এভাবে উদ্দীপকের খেলোয়াড়ের ন্যায় প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে বখতিয়ার খলজি নিজের অবস্থান দৃঢ় করেন।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের কিংস কাপ জয়ের কৌশল ও বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের কৌশল প্রায় একই— উক্তিটি সঠিক।

যেকোনো কাজে সফলতা লাভের জন্য পরিকল্পনা ঠিক করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা যত সূক্ষ্ম ও যথাযথ হবে ততই সফলতা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। উদ্দীপকের ইয়াছিন অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষ দলের দুর্বলতা চিহ্নিত করে কৌশলে গোল করতে সক্ষম হয়েছেন। তার এরূপ কৌশল বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের কৌশলের সাথে প্রায় মিলে যায়।

বখতিয়ার খলজি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাংলার সেন রাজা লক্ষ্মণ সেন এ সময় দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়াতে অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার খলজি বুঝেছিলেন যে, স্বাভাবিক কারণেই লক্ষ্মণ সেন বাংলায় প্রবেশের একমাত্র পথ তেলিয়াগরহিতে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। তাই তিনি বাংলা আক্রমণের জন্য বেছে নিলেন ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল। তিনি তার সেনাবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করেন। সতেরো সৈন্যের প্রথম দলের অগ্রভাগে ছিলেন বখতিয়ার খলজি। অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে তারা বিনা বাধায় লক্ষ্মণ সেনের নদীয়ার রাজপুরীতে চলে আসেন। মধ্যাহ্ন দুপুরে লক্ষ্মণ সেনের অপ্রস্তুত প্রহরীদের সহজেই তিনি পরাজিত করলেন। এভাবে সহজেই কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি জয়লাভ করলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ যেন উদ্দীপকে বর্ণিত কিংস কাপ জয়েরই প্রতিরূপ।

প্রশ্ন ▶ ৮ একটি পাঁচ টাকার কয়েন গলিয়ে ২টি চা-চামচ তৈরি করে তা দশ টাকায় বিক্রি করার ফলে হঠাৎ 'ক' দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। অভাব মোকাবিলায় সরকার উর্বর দক্ষিণ অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করে। ওদিকে ব্যবসায়ীরা মুদ্রার অভাবে সিলযুক্ত কাগজের স্লিপ ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু অসাধু ব্যক্তিরা এসব স্লিপ জাল করে দেশের অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. কারাচিল কোথায় অবস্থিত? ১

খ. দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উর্বর দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ভারতের কোন অঞ্চলের তুলনা করা যায়? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রা ব্যবস্থার মতই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 'প্রতীক মুদ্রা' পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারাচিল হিন্দুস্থান ও চীনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

খ ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব, প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন, অনুকূল আবহাওয়া প্রভৃতি কারণে মুহাম্মদ বিন তুঘলক দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব লক্ষ করে তাদের ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সুলতান দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা দূর করে রাজধানী নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে দৌলতাবাদই ছিল উপযুক্ত স্থান। দাক্ষিণাত্যের প্রাচুর্য ও সম্পদের অধিকতর সদ্ব্যবহারের জন্য সুলতান দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন অধিক সমীচীন বলে মনে করেছিলেন। মূলত শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত উর্বর দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ভারতের দোয়াব অঞ্চলের তুলনা করা যায়।

উদ্দীপকে অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে 'ক' দেশের উর্বর দক্ষিণাঞ্চলে সরকার কর্তৃক কর বৃদ্ধির ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। একই রকম প্রেক্ষাপটে দিল্লি সালতানাতের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক উর্বর দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য অঞ্চল দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল দোয়াব নামে পরিচিত। দিল্লি সালতানাতের 'শস্যভাণ্ডার' নামে খ্যাত এ অঞ্চলে কর বৃদ্ধি ছিল মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা। ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেগের মতে, 'সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শাসনব্যবস্থাকে কার্যক্ষম করার উদ্দেশ্যে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা হয়।' তাছাড়া ওই অঞ্চলের বিদ্রোহী প্রজাদের শাস্তি প্রদান করা ছিল অন্য একটি কারণ। এছাড়া রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান ও কারাচিল অভিযান এবং মুদ্রা প্রবর্তনের ফলে রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়লে তিনি এ অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। আধুনিক গবেষকদের মতে, দোয়াব অঞ্চলে ধার্যকৃত করের পরিমাণ ৫০%-এর বেশি ছিল না। বিত্তবানদের বিদ্রোহ, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এবং দুর্ভিক্ষের কারণে সুলতানের দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাব্যবস্থার মতোই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী মুদ্রা পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের 'ক' দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দিলে ব্যবসায়ীরা সিলযুক্ত কাগজের স্লিপের ব্যবহার শুরু করেন, যা প্রতীকী মুদ্রার ন্যায়। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা এই স্লিপ জাল করায় এ ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী মুদ্রার প্রচলনও নানা কারণে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 'প্রতীকী মুদ্রা' পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, নতুন মুদ্রা নির্মাণে একচেটিয়া সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় হিন্দুরা ব্যাপক জাল মুদ্রার প্রচলন করেন। প্রদেশেও ব্যাপকভাবে জালমুদ্রা চালু হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে আসল ও জাল মুদ্রা চেনা সম্ভব না হওয়ায় তারা এ মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। সুলতান মুদ্রা জাল করা বন্ধ করতে অসমর্থ হলে এই মুদ্রা অচল হয়ে পড়ে। বিদেশি বণিকগণও এই মুদ্রা গ্রহণে অসম্মতি জানায়। কারণ তাদের দেশে এই মুদ্রার কোনো মূল্য ছিল না। ঐতিহাসিক আগা মেহেদী হাসানের মতে, সুলতানি যুগে ঘন ঘন রাজবংশের পরিবর্তন হেতু পরবর্তী সুলতানগণ বৈধ মুদ্রা হিসেবে তামার মুদ্রা স্বীকার করবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। প্রতীকী মুদ্রা যাতে জাল হতে না পারে সে জন্য সুলতান উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেননি এবং জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারীদের শাস্তিদানেরও কোনো ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি। ফলে মুদ্রা জালিয়াতি রোধ করা যায়নি।

পরিশেষে বলা যায়, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রাব্যবস্থার পরিকল্পনা মহৎ হলেও উপর্যুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে তা ব্যর্থ হয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ উত্তরাধিকার সূত্রে তকী খান এক বিশাল জমিদারির মালিক হন। তিনি এতিম ও অসহায়দের সাহায্যার্থে বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ কাজে রাজকোষের প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এ ছাড়া জমিদারি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে খাজনা-ট্যাক্স আদায়ে যথেষ্ট নমনীয়তার পরিচয় দেন। এতে জমিদারের প্রতি জনগণের ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ পেলেও রাজ্যে সুদূরপ্রসারী আর্থিক সংকট দেখা দেয়, যার পরিণতিতে ধীরে ধীরে জমিদারি পতনের দিকে ধাবিত হয়। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. ফিরোজ শাহ তুঘলক কত খ্রিষ্টাব্দে সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন? ১

খ. ফিরোজ শাহ ছিলেন ক্রীতদাসদের প্রতি অনুরক্ত — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তকী খানের প্রজাহিতৈষী কাজের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তকী খানের জমিদারির পরিণতির সাথে তুঘলক বংশের পরিণতি আলোচনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন।

খ ফিরোজ শাহ ছিলেন ক্রীতদাসদের প্রতি অনুরক্ত।
ফিরোজ শাহ একটি বিরাট ক্রীতদাস বিভাগ গড়ে তোলেন। তার আমলে ১,৮০,০০০ জন ক্রীতদাস ছিল। এর মধ্যে দরবারে প্রায় বারো হাজার ক্রীতদাস বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থেকে পারদর্শী হয়ে ওঠে। ক্রীতদাসদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' নামে একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করা হয়। যুদ্ধবন্দিদের অযথা হত্যা না করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সুলতান তাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেন। এ ব্যবস্থা মানবোচিত হলেও এতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে পরবর্তীকালে রাজ্যে আর্থিক সংকট দেখা দেয় এবং এসব দাস দিল্লি সালতানাতের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে তকী খানের প্রজাহিতৈষী কাজের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের ফিরোজ শাহ তুঘলকের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে।
জমিদার তকী খান প্রজাদরদি ছিলেন। তিনি এতিম ও অসহায়দের সাহায্যার্থে বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ কাজে রাজকোষের প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ফলে তিনি জনগণের নিকট প্রশংসিত হন। ফিরোজ শাহ তুঘলকও তার প্রজাতিতৈষী কাজের জন্য প্রশংসিত ছিলেন।
ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত কয়েকটি প্রজাহিতৈষী পদক্ষেপ ইতিহাসে 'মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য দিকের মধ্যে ছিল বিবাহ দপ্তর এবং চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা। বিবাহ দপ্তরের মাধ্যমে গরিব ও অনাথ মেয়েদের সরকারি খরচে বিয়ে এবং বেওয়ারিশ লাশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের ব্যবস্থা করা হতো। 'দিওয়ান-ই-ইস্তহাক' নামক দপ্তর থেকে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো। প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুলতান 'দারউস শেফা' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য শহরে এরকম আরও ৪টি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। সুলতান ৩৬টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিলেন। কৃষিকাজের উন্নতির জন্য খাল খনন করেন এবং প্রায় ১২০০ উদ্যান নির্মাণ করে আয়ের টাকা দিয়ে খাদ্যঘাটতি পূরণ করেন। এভাবে সুলতান জনস্বার্থমূলক কাজের দ্বারা তার শাসনব্যবস্থাকে স্মরণীয় করে রাখেন। সুতরাং জনকল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণের দিক দিয়ে তকী খান এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের তকী খানের জমিদারির পরিণতির সাথে তুঘলক বংশের পরিণতির সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং জনকল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণের দিক দিয়ে তকী খান এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।
প্রজাহিতৈষী কার্যক্রমের মাধ্যমে জমিদার তকী খান জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা পেলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হতে পারেননি। তার গৃহীত পদক্ষেপ আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে এবং তার জমিদারির পতন ঘটে। দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে ফিরোজ শাহ তুঘলককেও অনুরূপ পরিণতির শিকার হতে দেখা যায়।
ফিরোজ শাহ জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন কিন্তু সিংহাসনের মূলভিত্তি তিনি রক্ষা করতে পারেননি। সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা দমনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তার আরেকটি বড় ভুল ছিল জায়গিরদারি প্রথার পুনঃপ্রবর্তন। এর ফলে অভিজাতবর্গ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে। তিনি সেনাবাহিনীতে বংশানুক্রমিক চাকরির অধিকার প্রদান করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তার সৃষ্ট ক্রীতদাস বাহিনীর ভরণপোষণে রাজকোষের প্রচুর অর্থ অপচয় হয়। ফলে সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুলতান যুদ্ধনীতি পরিহার করায় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সুলতান ফিরোজ শাহ শাসনকার্যে উলামাদের প্রাধান্য দেওয়ায় অসুন্নি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের রোষানলে পতিত হন। অপরাধীদের শাস্তি প্রদান রহিত করার ফলে দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা সরকারি অর্থসম্পদ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে রাজ্যের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।
পরিশেষে বলা যায়, ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসননীতি ও কার্যাবলি তুঘলক বংশের পতনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হলেও এ বংশের পতনের পথকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ ফরাসী গৃহযুদ্ধের ফলে প্রজাতন্ত্রী সরকারের অর্থ সংকট দেখা দেয়। অর্থ সংকট মোচনের জন্য সরকার কৃষকদের প্রদেয় করের ওপর প্রতি ফ্রা পিছু ৪৫ সেন্টিম পরিমাণ কর বৃদ্ধি করেন। কর বৃদ্ধির জন্য কৃষক সমাজ অসন্তুষ্ট হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিস নগরীকে ভেঙে পুনর্গঠন আরম্ভ করেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ব্যারন হজম্যানের পরিকল্পনা অনুসারে নতুন রাস্তাঘাট ও ঘর বাড়ি তৈরি করা হয়। উদ্যান ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করে শহরের জীবনযাত্রার উন্নতি করা হয়। প্যারিস একটি উন্নত নগরীতে পরিণত হয়। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. কোন সুলতান দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? ১

খ. গিয়াউদ্দিন বলবন এর মোঙ্গল নীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন পরিকল্পনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর এর ঘটনা তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

খ মোঙ্গলদের প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নীতিই মোঙ্গল নীতি নামে পরিচিত।
মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বলবন সেনাবাহিনী পুনর্গঠন এবং তাদেরকে সামরিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত করেন। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সুলতান নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। মোঙ্গলদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদা রাজধানীতে অবস্থান করতেন। মূলত বলবন নতুন রাজ্য বিজয়ে উৎসাহিত না হয়ে রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যকে শঙ্কামুক্ত রাখতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতের জন্য বেশি সচেষ্ট ছিলেন।

গ উদ্দীপকের ঘটনা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ফরাসী গৃহযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থ সংকট মোচনে সরকার কৃষকদের প্রদেয় করের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন। অনুরূপভাবে, অনেকটা একই রকম প্রেক্ষাপটে দিল্লি সালতানাতের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক উর্বর দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে উভয় ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।
গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল দোয়াব নামে পরিচিত। দিল্লি সালতানাতের শস্যভাণ্ডার নামে পরিচিত এই অঞ্চলে কর বৃদ্ধি ছিল মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা। ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেগের মতে, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শাসনব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিস নগরীকে ভেঙে পুনর্গঠন আরম্ভ করেন। একইভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করলে নতুন শহর এর অবকাঠামো বিনির্মাণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে সুলতান তার উচ্চাভিলাষী নীতির মাধ্যমে দোয়াব অঞ্চল থেকে অতিরিক্ত কর আহরণের মাধ্যমে খরচ যোগানোর পরিকল্পনা করেন। দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধির মাধ্যমে সুলতান দেবগিরিকে উন্নত নগরে পরিণত করতে পারলেও পরবর্তীতে নানা কারণে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের এই সিদ্ধান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

Teachingbd24.com

ঘ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অন্যতম শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ ছিল দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন যেমন প্যারিস নগরীকে ভেঙ্গে পুনর্গঠন করেন, নতুন রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেন। অনুরূপভাবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকও কতগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের অন্যতম কারণ ছিল এর ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব। দেবগিরি বিশাল দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় কৌশলগত সুবিধা ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কেন্দ্রভূমিতে রাজধানী স্থাপন অধিক যৌক্তিক বলে সুলতান মনে করেছিলেন। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের পটভূমিতে দিল্লি অপেক্ষা দেবগিরি ছিল অনেক বেশি নিরাপদ। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের ওপর নজরদারি ও এর ধনৈশ্বর্য নিয়ন্ত্রণ ও সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন অধিক সমীচীন ছিল। এ সকল কারণেই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করা হয়, যা উদ্দীপকের রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনৈক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ভাইদের ষড়যন্ত্র কারণে দাস হিসেবে একজন শাসকের কাছে বিক্রি হন। অল্প দিনের মধ্যে তার আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়ে উক্ত শাসক নিজ কন্যার সাথে তার বিয়ে দেন। শাসকের মৃত্যুর পর তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন এবং রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ১
খ. শাসনকার্যে সুলতান রাজিয়া কেন ব্যর্থ হলেন? ২
গ. উদ্দীপক উল্লিখিত শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ৩
ঘ. উক্ত শাসককে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক কাফুর ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সেনাপতি।

খ শাসনকার্যে সুলতান রাজিয়ার ব্যর্থতার মূলে ছিলে তুর্কি অভিজাতদের উচ্চাভিলাষ। অ-তুর্কি মুসলমানদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ এবং তাদের ওপর রাজিয়ার নির্ভরতা সুলতানি সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কিদের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া রাজিয়ার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কঠিন হস্তে শাসন পরিচালনার প্রয়াসও তাদের নিকট কাম্য ছিল না। ফলে তুর্কি অভিজাতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে রাজিয়ার পতন ঘটায়।

গ উদ্দীপকের জনৈক ব্যক্তির সাথে সুলতানি আমলের শাসক শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশের মিল রয়েছে।

শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ তুর্কিস্তানের অভিজাত ইলবারি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের শিকার হয়ে তিনি দাস হিসেবে প্রাথমিক জীবন পার করেন। পরবর্তীতে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে দিল্লি সালতানাতের শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। উদ্দীপকের জনৈক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির জীবনেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে। জনৈক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেও মানব পাচারের শিকার হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের খুমস প্রদেশের শাসনকর্তার নিকট বিক্রয় হন। পরবর্তীতে নিজ যোগ্যতাবলে ঐ শাসকের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি খুমস প্রদেশের শাসক হন। ঠিক একইভাবে ইলতুৎমিশ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ভ্রাতৃবিরোধের শিকার হয়ে শৈশবেই জনৈক ব্যক্তির নিকট দাস হিসেবে বিক্রি হন। পরবর্তীতে তাকে দিল্লিতে এনে কুতুবউদ্দিন আইবেকের নিকট দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়। ইলতুৎমিশের প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে কুতুবউদ্দিন স্বীয় কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্দেশে তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আইবেকের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিশ দিল্লির সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন। উদ্দীপকে এ দৃশ্যপটেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশকে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ ইলতুৎমিশকে নিঃসন্দেহে মামলুক বংশের 'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' এবং স্টেনলিলেনপুল সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করেছেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সুযোগে ক্ষমতালোভী অভিজাত বর্গ, আমির-মালিক এবং প্রদেশ পালদের বিদ্রোহ এবং সিন্ধু, বাংলা, রনথম্ভোর ও গোয়ালিয়র ইত্যাদির স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে ভারতে তুর্কি আধিপত্য যখন বিপদাপন্ন, ঠিক সেই সংকটমুহূর্তে ইলতুৎমিশ সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে সাহস, দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করে শুধু দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব রক্ষা করেননি বরং একে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম সালতানাতের বিরুদ্ধে হিন্দুদের চ্যালেঞ্জকেও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করেন। বস্তুত তার দৃঢ়তা ও উদ্যমশীল কর্মপ্রচেষ্টা দিল্লি সালতানাতকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অঙ্কুরে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তার এ অসামান্য কীর্তিই তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং প্রাথমিক তুর্কি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

উল্লিখিত আলোচনার নিরিখে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুলতান ইলতুৎমিশ স্বীয় কর্মের মাধ্যমেই দাস বা মামলুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১২ সেনবাগ পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব আবু জাফর টিপু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে পৌরসভার বাজারে মূল্যতালিকা বোর্ড স্থাপন করেন। এ তালিকার সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয় প্রতি লিটারে ১২০ টাকা। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখা যায় সয়াবিন তেলসহ প্রতিটি দ্রব্যের দাম তালিকায় দামের চেয়ে অনেক বেশি। দোকানিরা এ উচ্চমূল্যের জন্য যোগানের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি গুদামের অভাব ও অসাধু ব্যবসায়ীদের তৎপরতাকে দায়ী করেন। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া মসজিদ কে নির্মাণ করেন। ১
খ. চল্লিশ চক্রের পরিচয় দাও। ২
গ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জনাব আবু জাফর টিপুর কর্মকাণ্ডে তোমার পঠিত কোন শাসকের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে মেয়র আবু জাফর টিপু কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া মসজিদ নির্মাণ করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক।

খ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে প্রভাব– প্রতিপত্তিসম্পন্ন চল্লিশজন আমিরই চল্লিশচক্র হিসেবে পরিচিত।

এ চল্লিশজন তুর্কি-আমিরের বিরুদ্ধে বলবন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিম্নপদস্থ তুর্কিদেরকে আমির পদে নিয়োগ দেন এবং পূর্বের প্রভাবশালী আমিরদেরকে সামান্য অপরাধের কারণে শাস্তির বিধান করেন। ফলে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনামলে যে চল্লিশজন আমিরের দরুন সুলতানের সম্মান ও ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে তিনি জনমনে স্বীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

গ উদ্দীপকে মেয়র আবু জাফর টিপুর দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সেনবাগ পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব আবু জাফর টিপু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে পৌরসভার বাজারে মূল্যতালিকা বোর্ড স্থাপন করেন। এ মূল্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রতিফলন আমরা আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যেও লক্ষ করি।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সিংহাসনে আরোহণ করেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। মূলত আলাউদ্দিন খলজি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও রাজ্যবিস্তারের জন্য যে সেনাবাহিনী গঠন করেন তাদের স্বল্পব্যয়ে

https://teachingbd24.com

পোষণের জন্য তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করেন। যেমন— গম প্রতিমণ ৭½ জিতল (জিতল = .০৬ পয়সা), বার্লি প্রতিমণ ৪ জিতল, ধান প্রতিমণ ৫ জিতল, ডাল প্রতিমণ ৫ জিতল, তিল তৈল ৩ সের ১ জিতল, মাখন ২½ সের ১ জিতল ইত্যাদির মূল্য তিনি নির্ধারণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত মেয়রের কর্মকাণ্ড সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকে মেয়র আবু জাফর টিপু মুদ্রাস্ফীতি রোধ, গুদামঘর নির্মাণ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দমনের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণে পণ্য বাজার স্থাপন, বাজার পরিদর্শন ব্যবস্থা, নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করা, মজুত নিরোধব্যবস্থা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। উদ্দীপকের মেয়রও এরূপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সফল হতে পারেন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণে আবু জাফরকে প্রথমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এছাড়া খাদ্যঘাটতি পূরণ করার জন্য শস্যাগার বা গুদামঘর নির্মাণ করার মাধ্যমে তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা যাতে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে সেদিকেও তাকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধের মাধ্যমেও এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন। পণ্যদ্রব্য যাতে সময়মতো ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা যায় সেজন্য পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া বাজারের ফটকা ব্যবসায়ীদের দমন করে তিনি এ নীতি কার্যকর করতে পারেন। পণ্যদ্রব্য মজুত করে মজুতদাররা যাতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যও তাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে আবু জাফর টিপুকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতোই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রশ্ন ▶১৩ তুঘলক বংশের একজন শাসনকর্তা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে উক্ত শাসক রাজধানী দিল্লি হতে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। বিদ্রোহীদের দমন করতে খোরাসান ও কারাচিল অভিযান করেন এবং তাম্রমুদ্রা প্রচলন, দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগী হন। কিন্তু তিনি দিল্লি সুলতানদের মধ্যে বিদ্বান ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. গিয়াসউদ্দিন বলবনের বাংলা অভিযানের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ দিল্লি সালতানাতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ।

খ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পরপর তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। উপর্যুপরি ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান বলবন স্বয়ং তুঘরিলের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। শাহজাদা বুগরা খান এ অভিযানে পিতার সঙ্গী হন। সুলতানের আগমনে ভীত হয়ে তুঘরিল খান রাজধানী ছেড়ে উড়িষ্যার অরণ্যে আশ্রয় নিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তিনি রাজকীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে বলবন বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের শাসক মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন শাসক সিংহাসনে আরোহণ করেই তার রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং পুরাতন রাজধানীর সকল মানুষকে নতুন রাজধানীতে যেতে বাধ্য করেন। ফলে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে। এ তথ্য মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসননীতির সাথে সংগতিপূর্ণ।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করেই রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেছিলেন। দেবগিরিকে রাজধানী হিসেবে পরিবার-পরিজন, আমির-ওমরাহ, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং দিল্লির জনগণসহ দেবগিরিতে গমন করেন। দিল্লি থেকে দেবগিরির দূরত্ব ছিল ৭০০ মাইল। এই দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে পথিমধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটে এবং রাজধানীতে পৌঁছার পর অসংখ্য মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এছাড়া দিল্লির বিরূপ আবহাওয়া এবং হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ার কারণে সেখানে আমির-ওমরাহগণ বসবাস করতে রাজি ছিলেন না। এ কারণে সুলতান বাধ্য হয়ে রাজধানী দিল্লিতে ফিরিয়ে আনেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কর্মকাণ্ডেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ মুহম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ দিল্লি সালতানাতে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও এগুলো ছিল আধুনিক ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

মুহাম্মদ বিন মুঘলক ছিলেন একজন আধুনিক সংস্কারক। উদ্ভাবন ও অভিনবত্ব ছিল তার প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি মোট পাঁচটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার সব কয়টি পরিকল্পনাই ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। তবুও তার পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে আধুনিকতার ছাপ ছিল। উদ্দীপকে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাগুলোর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, একজন শাসক তার রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং পুরাতন রাজধানী শহরের লোকদের নতুন শহরে যেতে বাধ্য করেন। যা বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনাটি মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেটি বহু মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। তবুও তার এ পরিকল্পনাটিকে নির্বুদ্ধিতা প্রসূত কাজ বলা যায় না। কেননা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যের জন্য মঙ্গলকর। তিনি মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রাজধানীকে রক্ষা করা এবং দাক্ষিণাত্যের ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যের জন্য মঙ্গলকর। তিনি মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রাজধানীকে রক্ষা করা এবং দাক্ষিণাত্যের ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। তবে এ কথা সত্য যে, সুলতানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তার দিল্লির সকল মানুষকে দেবগিরিতে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। কিন্তু তিনি প্রজাদের মঙ্গলার্থেই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও তার পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না।

প্রশ্ন ▶১৪ সুরুজ মিয়া চেয়ারম্যান হওয়ার পর অনেকেই তার কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। কেউ চিকিৎসা সাহায্যের জন্য, কেউ কন্যা দায়গ্রস্ত হয়ে, কেউ ছেলেমেয়েদের চাকুরির তদবিরের জন্য, কেউ মৃতের সৎকারের জন্য। সুরুজ মিয়া ভাবলেন, তাঁর একার পক্ষে এ সকলের সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই এলাকার বিত্তশালীদের সহযোগিতা নিয়ে এসব সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করেন। প্রথমেই তিনি একটি ফান্ড গঠন করে এলাকার কন্যা দায়গ্রস্তদের সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. তৈমুর লঙ কত খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন? ১

খ. আলাউদ্দিন খলজির মোঙ্গল নীতি আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সুরুজ মিয়ার প্রথম সমস্যা সমাধানের সাথে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের কোন কাজটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা ছাড়া আর কোন কোন সমস্যা সমাধানে ফিরোজ শাহ তুঘলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তৈমুর লঙ ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

https://teachingbd24.com

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের সুরুজ মিয়ার প্রথম সমস্যা সমাধানের সাথে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের মানব কল্যাণমূলক কাজের মিল রয়েছে।

ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন দয়ার্দ্রচিত্ত ও প্রজারঞ্জক সুলতান ছিলেন। তার প্রজাহিতৈষণামূলক কয়েকটি পদক্ষেপ ইতিহাসে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকের মধ্যে ছিল 'বিবাহ দপ্তর' এবং 'চাকরি দপ্তর' প্রতিষ্ঠা। 'দিওয়ান-ই-খায়রাত'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিবাহ দপ্তরের মাধ্যমে গরিব ও অনাথ মেয়েদের সরকারি খরচে বিয়ে এবং বেওয়ারিশ লাশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের ব্যবস্থা করা হতো। আর 'দিওয়ান-ই-ইস্তহক' নামক দপ্তরের মাধ্যমে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো। চাকরি দপ্তরের কাজ ছিল যোগ্যতা অনুযায়ী বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়ার নিকট অনেকেই আসেন সাহায্যের জন্য। কেউ চিকিৎসা, কেউ কন্যা দায়গ্রস্ত হয়ে, কেউ চাকরির তদবির নিয়ে, আবার কেউ মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য। পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উদ্দীপকের কাজগুলো সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা ছাড়াও ফিরোজ শাহ তুঘলক দুর্বল প্রশাসনিক ভিত মজবুতকরণ, আর্থিক অব্যবস্থাপনা রোধ এবং প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতসহ অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

দিল্লি সালতানাতের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রথমেই প্রশাসনিক ভিত মজবুত করার চেষ্টা করেন। সুদক্ষ প্রশাসক মালিক-ই-মকবুলকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়। অভিজাত ও উলেমাদের শুভেচ্ছা, সমর্থন ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের কিছু বৈষয়িক সুবিধা প্রদান এবং সাধারণ জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের চেষ্টা করা হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক সরকারি ঋণ মওকুফ ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্যমূল্য হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর দেন। সালতানাতের আর্থিক অব্যবস্থাপনা রোধ এবং অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজস্ব প্রশাসনে নানা সংস্কার সাধন করেন। জনদুর্ভোগ লাঘব, রায়তদের অবস্থার উন্নতি এবং জনপ্রশাসনের প্রতি তাদের আস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সুলতান কৃষকদের সরকারি বকেয়া ঋণ মওকুফ করেন। তিনি প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'দার উশ শেফা', 'বিমারিস্তান', বা 'শিফাখানা' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এসব দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, এমনকি দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে ঔষুধও সরবরাহ করা হতো।

পরিশেষে বলা যায়, ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন প্রজাহিতৈষী শাসক। তিনি রাজ্য এবং রাজ্যের প্রজাদের বৈষয়িক উন্নয়নে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রফিক সাহেব 'ক' ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কিছু ব্যতিক্রম ও নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার ৫টি পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থানান্তর এবং বিশেষ এলাকার লোকদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য। তার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ হওয়া সত্ত্বেও সময়ের তুলনায় অগ্রবর্তী হওয়ায় সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। *[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. পানিপথের ২য় যুদ্ধের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রফিক সাহেবের পরিকল্পনাগুলো তোমার পঠিত শাসকের কোন পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি তোমার পঠিত শাসকের ক্ষেত্রে কতটুকু যথাযথ? মূল্যায়ন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান বাহলুল লোদি।

খ পানি পথের প্রথম যুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় যুদ্ধও ছিল চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ।

১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর ও আফগান সেনাপতি হিমুর মধ্যে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হয়। ফলে মুঘলরা পুনরায় ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে অধিষ্ঠিত হয়।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে একদিকে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে মুঘল-আফগান সংঘর্ষের অবসান হয়, অন্যদিকে আফগান শক্তি ধূলিসাৎ হয়। এ যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া এ যুদ্ধের ফলে মুঘলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক সাহেবের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও উন্নততর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিক সাহেব সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নতর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকও এমন প্রেক্ষাপটে কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রাজধানী স্থানান্তর ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি এমনই দুটি পরিকল্পনা।

সহজতর নজরদারি, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীকালে রাজধানীর নাম রাখেন দৌলতাবাদ। কিন্তু তার এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রাজভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি দোয়াবে কর বৃদ্ধি করেন। কারণ দোয়াব ছিল দিল্লি সালতানাতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এ ভূভাগে পানির অভাব না থাকায় এখানে শস্যের ফলন সর্বদা ভালো হতো। দিল্লির সুলতানরা সুযোগ বুঝে সর্বদা তিনি দোয়াবে কর বৃদ্ধি করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দোয়াবে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ বা অর্ধেক কর ধার্য করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এতেও দোয়াবের রায়তদের কোনো অসুবিধা হতো না, কারণ দোয়াব সত্যিই উর্বর ছিল। তবে তুঘলকের এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত করদানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক ক্লেশ বৃদ্ধি এবং সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ঘ মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ তৎকালীন যুগের থেকে অগ্রবর্তী হওয়ায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনাকে অনেকে এক স্বৈরাচারী শাসকের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত নিষ্ফল কাজ এবং কেউ কেউ "অসাবধানী পরিকল্পনা" বলে অভিহিত করেছেন। লেনপুলের মতে, "দৌলতাবাদ ছিল ভ্রান্তপথে পরিচালিত উদ্যমের কীর্তিস্তম্ভ।" সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু সুলতানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তিনি যদি কেবল তার দরবার ও প্রশাসনিক দপ্তর স্থানান্তর করে ক্ষান্ত হতেন, তবে সুলতানের পরিকল্পনাটি সংগত ও বাস্তবে পরিণত হতো। কিন্তু তা না করায় মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দোয়াব অঞ্চলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। আর ঠিক এ সময়ে বর্ধিত হারে রাজস্ব আরোপের ফলে কৃষকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বিদ্রোহ করে এবং অনেকে নিজ খামারের শস্য পুড়িয়ে ফেলে ও কৃষিকাজ ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। জীবন-ধারণের প্রয়োজনে অনেকে দস্যুতার পথ বেছে নেয়। ঐতিহাসিক বারানীর মতে, 'কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।' তিনি বলেন, সুলতানের উৎপীড়নে রায়তরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সুলতান দোয়াবে বিভীষিকা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। ফলে সুলতানের কর বৃদ্ধির পরিকল্পনাটিও ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহম্মদ বিন তুঘলকের অপরিণামদর্শিতার কারণে তার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৬

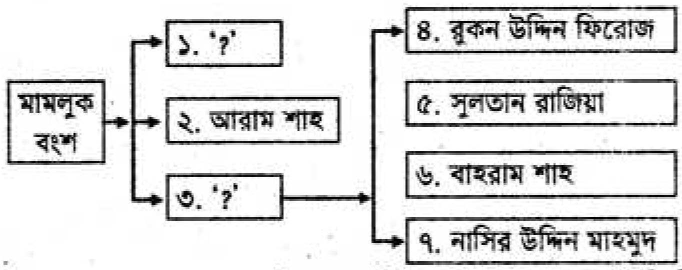

[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. 'সুলতানি আমলের আকবর' বলা হয় কাকে? ১
খ. রেশনিং ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রদত্ত ছকে ১নং '?' চিহ্নিত স্থানে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ৩নং '?' চিহ্নিত স্থানে নির্দেশিত শাসককে কি উক্ত বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতানি আমলের আকবর বলা হয় সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে।

খ রেশনিং ব্যবস্থা বলতে পণ্য বরাদ্দ নির্ধারণকে বোঝায়।
রেশনিং ব্যবস্থা সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মহান উদ্ভাবিত একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী একটি পরিবার সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারত। এ ব্যবস্থার ফলে দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি।

গ ১নং '?' চিহ্নিত স্থানে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কথা বলা হয়েছে প্রদত্ত ছকে।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, একজন ক্রীতদাস একসময় একটি অঞ্চলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ক্রীতদাস ছিলেন বলে তার প্রতিষ্ঠিত বংশকে দাস বংশ বলা হয়। প্রদত্ত ছকের ১নং চিহ্নিত স্থানে মামলুক বংশের প্রথম শাসককে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে মূলত কুতুবউদ্দিন আইবেকের কথা বলা হয়েছে। তিনি প্রাথমিক জীবনে একজন ক্রীতদাস হয়েও পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাতের শাসকের মর্যাদা লাভ করেন। আর তার প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশকে মামলুক বা দাসবংশ বলা হয়। তিনি সৎ চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী এবং অত্যধিক কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।
ঈশ্বরী প্রসাদ কুতুবউদ্দিন আইবেক সম্পর্কে বলেন, 'আইবেক ছিলেন ক্ষমতাধর এবং সুযোগ্য শাসক, তিনি সর্বদা উচ্চস্তরের চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রাখতেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন। তবে তার মধ্যে পরধর্মসহিষ্ণুতার অভাব ছিল না। তিনি ছিলেন স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তনকারী। সেনানায়ক হিসেবেও তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। আবার তিনি একজন যোগ্য শাসক হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। তার রাজত্বকালে জননিরাপত্তার কোনো অভাব ছিল না। চোর ও চৌর্যবৃত্তি প্রশ্নাতীত ব্যাপার ছিল বলে ঐতিহাসিক হাসান নিযামী উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া দিল্লির কুয়াত উল ইসলাম মসজিদ, আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া' মসজিদ ও কুতুবমিনার তার শিল্প-সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের নিদর্শন বহন করে। সুতরাং বলা যায়, কুতুব উদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন অসীম সাহসী সেনাপতি। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ও প্রজাতজ্ঞক শাসক।

ঘ ৩নং '?' স্থানে নির্দেশিত শাসককে অর্থাৎ শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশকে মামলুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।
প্রদত্ত ছকের ৩নং '?' স্থানে নির্দেশিত সুলতান ইলতুৎমিশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্যকে কণ্টকমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। তিনি সকল গোলযোগ ও সংকট দূর করে দিল্লি সালতানাতে পূর্বের গৌরব ফিরিয়ে আনেন। সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে বিচলিত না হয়ে একজন বাস্তববাদী শাসক হিসেবে তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলায় অগ্রসর হন। তিনি সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যা, বারানসি, বাদাউন, সিওয়ালিকসহ দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন।
কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সুযোগে ক্ষমতালোভী অভিজাতবর্গ, আমির-মালিক এবং প্রদেশপালদের বিদ্রোহ শুরু হয়। এছাড়া সিন্ধু, বাংলা, রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়র ইত্যাদির স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে ভারতে তুর্কি আধিপত্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ইলতুৎমিশ সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে সাহস, দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করে দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। একই সাথে সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিতও করেন। মূলত তার দৃঢ়তা ও উদ্যমশীল কর্মপ্রচেষ্টা ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্য দিল্লি সালতানাতকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অঙ্কুরে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন ▶ ১৭ 'আর কে ক্যাবল' কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মিনহাজ মাহতাব প্রথম জীবনে শ্রমিক ছিলেন। বিশ্বস্ততা, নিরলস পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে তিনি প্রভুর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন। প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া তিনি স্মৃতিবিজড়িত সৌধ ও মসজিদ কোম্পানি প্রাজ্ঞণে নির্মাণের কাজ শুরু করেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা গরিব-দুঃখীদের মাঝে দান করতেন তাই তাকে দানেশ বলা হতো। তিনি প্রশাসনিক কাজে খুব দক্ষ ছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের গৌরবময় দিক তুলে ধরার জন্য স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের কাজ শুরু করেন যা খুব প্রশংসিত হয়।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের শাসক ছিলেন? ১
খ. জয় চাঁদ কেন পৃথ্বিরাজ্যের সাথে যোগ দেয়নি? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিনহাজ মাহতাব এর কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে সালতানাতে কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কারণ ছাড়াও সালতানাতের স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের আরও কারণ ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ গজনি রাজ্যের শাসক ছিলেন।

খ জয়চাঁদের কন্যাকে অপহরণ করার কারণে রাজা জয়চাঁদ পৃথ্বিরাজের সাথে যোগ দেয়নি -
কনৌজ বংশের শেষ রাজা জয়চাঁদ। তার কন্যাকে অপহরণ করায় পৃথ্বিরাজের সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ফলে মুহাম্মদ ঘূরীর ভারত আক্রমণকালে তিনি পৃথ্বিরাজের জোটে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মিনহাজ মাহতাব এর কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে কুতুবউদ্দিন আইবেকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।
ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তি সামান্য ক্রীতদাস থেকে একটি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছেন কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রাথমিক জীবনে মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস ছিলেন। তবে তিনি তার স্বীয় গুণাবলির বদৌলতে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন। উদ্দীপকে অনুরূপ একজন শাসকের প্রতিচ্ছবি লক্ষণীয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'আর কে ক্যাবল' কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মিনহাজ মাহতাব প্রথম জীবনে শ্রমিক ছিলেন। বিশ্বস্ততা, নিরলস পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া তিনি স্মৃতিবিজড়িত সৌধ ও মসজিদ কোম্পানি প্রাজ্ঞণে নির্মাণের কাজ শুরু করেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা গরিব-দুঃখীদের মাঝে দান করতেন বলে তাকে দানেশ বলা হতো। অনুরূপভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রথম জীবনে দাস হলেও স্বীয় যোগ্যতায় মুহাম্মদ ঘুরীর প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। ১১৯২ সালের তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করলে মুহাম্মদ ঘুরী তাকে দিল্লির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরী তাকে রাজদণ্ড প্রদান ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। গজনির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে তিনি দিল্লি

Teachingbd24.com

সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। সালতানাতের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও প্রজাকল্যাণ নিশ্চিতকরণে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ও তার তীব্র অনুরাগ ছিল। কুয়াত উল ইসলাম মসজিদ এবং আজমীরের আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া মসজিদ তার স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি দিল্লিতে বিখ্যাত কুতুব মিনার নামক বিজয় স্মৃতিস্তম্ভটির নির্মাণ কাজ সূচনা করেছিলেন। অসীম উদারতা ও দানশীলতার জন্য তিনি 'লাখবক্স' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের মিনহাজ মাহতাব এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধের নির্মাণের কারণ ছাড়াও সালতানাতের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আরও কারণ ছিল।

কুতুবমিনার ছিল কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। ১১৯২ সালে রাজ্য বিজয়ের স্মারক এবং ইসলামের বিজয়গাঁথা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে তিনি দিল্লিতে এই মিনারটির নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং তা সম্পন্ন করেন পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ। এটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার।

কুতুবমিনার নামক বিজয় স্মৃতিস্তম্ভটি কুতুবউদ্দিন আইবেকের স্থাপত্য কীর্তির প্রকৃষ্ট নজির। দূর থেকে মিনারটি অবলোকন করলে একে বৃহদাকার কারখানার চিমনি অথবা বাতিঘরের মতো মনে হয় এবং কাছ থেকে লোহিত শিলা ও মর্মর পাথরে তৈরি ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যাওয়া বাশির আকৃতির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মিনারটি ৪ তলা বিশিষ্ট এবং ৪৭ ফুট ব্যাসের বুনিয়াদের ওপর নির্মিত। এর বারান্দা সমকোণ বিশিষ্ট পাথরের দ্বারা নির্মিত। সাতটি স্তরে বিভক্ত মিনারটির উপরের দুটি স্তর ভেঙে গিয়েছে। তবে অক্ষত অবস্থায় এর উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট। বর্তমানে এটির উচ্চতা ২২০ ফুট। সর্বোচ্চ স্তরে গমনের জন্য ইমারতের ভেতরে ৩৭৯টি ধাপবিশিষ্ট একটি ঘোরানো সিঁড়ি রয়েছে এবং সিঁড়ির গায়ে কুরআনের আয়াত খোদাই করা আছে। ইসলামের বিজয়গাঁথা বিশ্ব দরবারের উপস্থাপনের লক্ষ্যে এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আইবেক এটি নির্মাণ করেন। এটি আজানের জন্য ব্যবহৃত হতো।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের বিজয়গাঁথা উপস্থাপনের পাশাপাশি ধর্মীয় উদ্দেশ্যেও কুতুবমিনার নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ক্ষমতায় এসেই 'X' সরকার তাদের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী কৃষকদের ঋণ মওকুফ করেন। ভূমিকরের পরিমাণ হ্রাস করেন। রাজ্যের আয় বৃদ্ধির জন্য ১২০০ বাগান নির্মাণ ও সংস্কার করেন। তাছাড়া জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে দালান কোঠা তৈরি, সেতু ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন, হাসপাতাল নির্মাণ বিধবা ও এতিম মেয়েদের বিবাহ দান ও বেকারদের জন্য কাজের ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. সুলতান রাজিয়া কে ছিলেন? ১

খ. তরাইনের ২য় যুদ্ধে ঘুরীর জয়লাভের কারণ কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের সরকারের ন্যায় দিল্লি সালতানাতের কোন সরকার রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকদের প্রতি সদয় ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত সুলতানের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লি সালতানাতের প্রথম নারী শাসক।

খ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী (ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকারী) ও তার বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে। পৃথ্বিরাজ (দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত এবং চৌহান বংশের রাজা) ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। ফলে ভারতীয় রাজ্যগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের সরকারের ন্যায় দিল্লি সালতানাতের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকদের প্রতি সদয় ছিলেন।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা প্রজাকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এরা জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা তৎপর থেকে তাদের সার্বিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' সরকার এবং দিল্লি সালতানাতের ফিরোজ শাহ তুঘলক জনকল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে খ্যাত হয়ে আছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ক্ষমতায় এসেই 'X' সরকার তাদের নির্বাচিত ইশতেহার অনুযায়ী কৃষকদের ঋণ মওকুফ করেন। ভূমিকর হ্রাস করেন। রাজ্যের আয় বৃদ্ধির জন্য ১২০০ বাগান নির্মাণ ও সংস্কার করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও ক্ষমতায় আরোহণ করে কৃষকদের বকেয়া ঋণ (তাকাভি) মওকুফ করেন। পূর্ববর্তী সময়ে কৃষকদের ওপর যে সকল অবৈধ ও নিপীড়নমূলক কর ধার্য করা হয়েছিল তা বাতিল করেন। রাজস্ব প্রশাসনের দুর্নীতি রোধে সুলতান রাজস্বকর্মীদের হয়রানি বন্ধ এবং তাদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শতদ্রু থেকে ঘাগরা পর্যন্ত ৬ মাইল এবং যমুনা থেকে হিসার পর্যন্ত দেড়শ মাইল দীর্ঘ দুটি খাল খননের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া সেচ সুবিধার জন্য বহু কূপ খনন ও ৫০টির মতো বাঁধ নির্মাণ করেছিল। ফলে অনেক পতিত জমি চাষের আওতায় আসে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে ও সুলতান আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্কসহ নানা প্রকার প্রান্তিক কর বিলোপ করে বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সরকারের মতো সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকদের উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত সুলতান তথা সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

কোনো এলকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অপরিহার্য। সালতানাতের সুলতানগণ এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। এক্ষেত্রে ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন অগ্রগণ্য।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক জনদরদি শাসক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। প্রজাদের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ। তিনি দুস্থ, দরিদ্র ও অনাথদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে 'দারুস শিফা' নামক একটি বিখ্যাত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও ওষুধ সরবরাহ করা হতো। এছাড়া প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি বেশ কিছু জনকল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি দরিদ্র প্রজাদের সাহায্যে ও তাদের কন্যাদের বিবাহদান এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য দেওয়ান-ই-খয়রাত বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য চাকরি দপ্তর স্থাপন করেন। তাছাড়াও তিনি প্রজাদের কল্যাণে সরাইখানা এবং নলকূপ স্থাপন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। তার এসব জনদরদি কর্মকাণ্ড ইতিহাসে 'মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা' নামে পরিচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনকল্যাণমূক ব্যবস্থাকে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ওয়ার্শি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েই অনন্য আনোয়ার নিজের দলের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজের উন্নয়ন ও তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য 'সবুজসংঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। উক্ত সংগঠন তাঁর আমলে ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সংগঠনের সদস্যদের ব্যক্তিগত লোভ ও অভ্যন্তরীণ কলহের কারণে তারা উগ্র হয়ে ওঠে। তাদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্য পরবর্তী চেয়ারম্যান সেলিম সাহেব অতি নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে দমনসহ উক্ত সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটান। ফলে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শান্তি ও উন্নতি অব্যাহত থাকে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. খলজিদের আদিবাস কোথায়? ১

খ. দিল্লি সালতানাতের পতনে সুলতানদের নৈতিক অধঃপতন দায়ী— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সবুজ সংঘের সাথে ইলতুৎমিশের কোন সংঘের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সেলিম সাহেবের পদক্ষেপ সুলতান বলবনের কঠোর নীতিরই প্রতিচ্ছবি— মূল্যায়ন কর। ৪

https://teachingbd24.com

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলজিদের আদিবাস তুর্কিস্তানে।

খ দিল্লি সালতানাতের পতনে সুলতানদের নৈতিক অধঃপতন একটি অন্যতম কারণ।
দিল্লির শেষ সুলতানদের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। তারা মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন এবং উপপত্মী রাখতেন। সুলতানরা নিজে মদ্যপান করে হেরেমে নারীবেষ্টিত থেকে শাসনকার্য উজিরদের হাতে ছেড়ে দিতেন। অনেক সম্রাট দাসদের প্রতি এত নির্ভরশীল ছিলেন যে তারা অনেকেই শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। তাই দিল্লি সালতানাতের পতনে সুলতানদের নৈতিক অধঃপতন অনেকাংশেই দায়ী।

গ কর্মকাণ্ডগত দিক দিয়ে বন্দেগান-ই-চেহেলেগানের সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত সবুজ সংঘের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।
সুলতান ইলতুৎমিশের শাসনামলে তুর্কি অভিজাতরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। এরাই 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনও এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইলতুৎমিশ-পরবর্তী দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে এ গোষ্ঠী প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতিতে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। মাঝে মধ্যে তারা শাসকদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধেও এ চক্র শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা নানা ধরনের অপকর্ম করে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। উদ্দীপকের সবুজ সংঘের মধ্যেও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ওয়ার্শি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েই অনন্য আনোয়ার নিজের দলের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজের উন্নয়ন ও তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য 'সবুজসংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সংগঠন তাঁর আমলে ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। বন্দেগান-ই-চেহেলেগানও সুলতান ইলতুৎমিশের সময়ে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি তুর্কি ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে ৪০ জনের সমন্বয়ে একটি চক্র গড়ে তোলেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর এরা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের সবুজ সংঘের মধ্যে বন্দেগান-ই-চেহেলেগানের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সেলিম সাহেবের গৃহীত উদ্যোগে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' দমনে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপের প্রতিফলন ঘটেছে।
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে 'বন্দেগান-ই-চেহেলেগান' নামক তুর্কি অভিজাতদের অপকর্মের দৌরাত্ম্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সুলতান তাদের অপরাধ চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তাদের পদোন্নতি বন্ধ করে দেন এবং বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদের জনসমক্ষে শাস্তি দেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের উদ্যোগ লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি কর্মকর্তাদের বদলির আদেশ দেন। একইভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবনও দুর্নীতিবাজ বন্দেগান-ই-চেহেলেগানদের শাস্তি দেন। তিনি অপরাধীদের চিহ্নিত করে যেমন জনসমক্ষে বিচার করতেন তেমনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একই ধরনের বাস্তবধর্মী ও নিরপেক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গিয়াসউদ্দিন বলবনের বন্দেগান-ই-চেহেলেগানদের দমনের ফলেও সাম্রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান বলবন এ চক্রের প্রভাব খর্ব করে সাম্রাজ্যে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবধর্মী এবং কার্যকর হওয়ায় উভয়ই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। তাদের পদক্ষেপগুলো পরস্পরের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶২০ সুলতানের সুযোগ্য কোনো পুত্র না থাকায়, তিনি জীবিত থাকতেই তার কন্যা নাদিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে গিয়েছেন। সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে নাদিয়ার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র শুরু হয়, তবুও তিনি দৃঢ়তার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. "বন্দেগান-ই-চেহেলগান" বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নাদিয়ার শাসনব্যবস্থায় ইতিহাসের কোন শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. নাদিয়া শান্তিতে রাজ্য শাসন করতে পারলেন না- মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ইলতুৎমিশ।

খ 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান'-এর অর্থ চল্লিশ আমির দল। সুলতান ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের যোগ্য শাসকদের ধারাবাহিক আগমন নিশ্চিতকরণের জন্য ৪০ জন সাহসী, যোগ্য ও দূরদর্শী ক্রীতদাসকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন, যা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নাদিয়ার শাসনব্যবস্থায় ইতিহাসের সুলতান রাজিয়ার শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে।
সুলতান ইলতুৎমিশ পুত্রদের তুলনায় কন্যা রাজিয়াকে সালতানাত পরিচালনায় অধিক যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি কন্যা রাজিয়াকে দিল্লি সালতানাতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। রাজিয়া দিল্লি সালতানাতের দায়িত্ব নিলে তার কাছের মানুষেরা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাদের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করলে রাজিয়াকে ক্ষমতা হারাতে হয়। উদ্দীপকেও এ ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সুলতানের সুযোগ্য কোনো পুত্র না থাকায় তিনি জীবিত থাকতেই তার কন্যা নাদিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছেন। সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে নাদিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তবুও তিনি দৃঢ়তার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। সুলতান রাজিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে সুলতান রাজিয়াকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে অভিজাত আলমে-উলেমা এবং আত্মীয়রা নানা ধরনের বিরোধিতা করেন। ভিন্ন সাম্রাজ্যের সাথে বিরোধ থাকলে অথবা প্রতিযোগিতা থাকলে তাতে জয় লাভ করা যায়। কিন্তু নিজের অভিজাতদের মধ্যে শত্রুতা থাকলে তা অনেক সময় পরাজয় ডেকে আনে। এজন্য দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করার পরেও তিনি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে পারেনি। ফলে তার পতন ঘটে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের নাদিয়া এবং সুলতান রাজিয়া একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকের নাদিয়ার মতো সুলতান রাজিয়াও সকল বাধা দূর করে শান্তিতে রাজ্য শাসন করতে পারেন নি।
ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী একজন নারী। এ বি এম হাবিবুল্লাহর মতে, সাহসিকতা ও অদম্য দৃঢ়তাই ছিল রাজিয়ার আদর্শ। চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। সুলতান রাজিয়া তার প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন। অশ্বারোহণে জনসম্মুখে বের হন এবং প্রকাশ্যে দরবার পরিচালনা করেন। এত কিছুর পরও তিনি শাসক হিসেবে ব্যর্থ হন। তিনি সাম্রাজ্যের সকল বাধা অতিক্রম করে সফলতা আনতে পারেননি। শক্তিশালী পুরুষ আমির-উমরাহগণ একজন নারী কর্তৃক শাসিত হতে অপমানবোধ করে তার উৎখাত সাধনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সুলতান রাজিয়া এদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে, তুর্কি অভিজাতদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। মূলত তুর্কিদের এই ষড়যন্ত্রের ফলেই সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটে।
পরিশেষে বলা যায় যে, নানাবিধ গুণাবলি ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাজিয়া সকল বাধা অতিক্রম করে সফলতার শিখরে আরোহণ করতে পারেননি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২১ অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে দেখলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আমলা শ্রেণি তৈরি করা হয়েছিল তারাই এখন প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচরণ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি সিন্ডিকেটভিত্তিক অফিসিয়াল কার্যাদি পরিচালনা করত। এমতাবস্থায় চেয়ারম্যান প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সিন্ডিকেটদের কঠোরভাবে দমন-বদলি, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ফলে ইউনিয়ন পরিষদে সুশাসন ও সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*

ক. সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন? ১

খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমলা সিন্ডিকেটদের সাথে বন্দেগান-ই-চেহেলগানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ গজনির শাসনকর্তা ছিলেন।

খ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী (ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকারী) ও তার বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে। পৃথ্বিরাজ (দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত এবং চৌহান বংশের রাজা) ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। ফলে ভারতীয় রাজ্যগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২২ জাহীন সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে রাষ্ট্রপ্রধান হন। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি দেশের বিধবা, এতিম, বয়স্কদের মাসিক ভাতা চালু, কৃষিঋণ মওকুফ, ব্যবসার উন্নতি করেন। পানি শোধনাগার নির্মাণ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। জনগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে সালতানাত যুগের সূচনা হয়? ১

খ. ইব্রাহিম লোদির কঠিন শাসনের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. জাহীন সাহেব দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ড তোমার রাষ্ট্রে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে সালতানাত যুগের সূচনা হয়।

খ ইব্রাহিম লোদি খুব কঠোর ও রূঢ় স্বভাবের শাসক ছিলেন।

ইব্রাহিম লোদি ১৫১৭ সালে সিকান্দার শাহ লোদির মৃত্যু হলে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি আফগান ও অন্যান্য অভিজাতবর্গকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবহীন ও ক্ষমতাহীন করার নীতি অনুসরণ করেন। তার রূঢ় শাসননীতির জন্য তিনি ক্রমেই আফগান অভিজাতবর্গের সহায়তা হারান এবং তারা বিদ্রোহী হয়ে তার আনুগত্য অস্বীকার করে। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খানের পুত্র দিলওয়ার খানের প্রতি সুলতান ইব্রাহিম লোদির দুর্ব্যবহার সকলের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জাহীন সাহেব দিল্লি সালতানাতের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন প্রজারঞ্জক ও জনহিতৈষী শাসকদের মধ্যে অন্যতম। প্রজাপীড়ন নয় বরং তাদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করাই তার শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। তার এ শাসনব্যবস্থা প্রতিটি প্রজাহিতৈষী শাসকের নিকট অনুকরণীয়। উদ্দীপকের শাসকও ফিরোজ শাহ তুঘলকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাহীন সাহেব দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের বিধবা, এতিম, বয়স্কদের মাসিক ভাতা চালু, কৃষিঋণ মওকুফ, ব্যবসায় উন্নতি করেন। পানি শোধনাগার নির্মাণ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণ করে জনগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জনগণের কল্যাণার্থে তিনি নতুন কয়েকটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দরিদ্র মুসলমান কন্যাদের বিবাহের জন্য এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে 'দিওয়ান-ই-ইস্তহক' প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষিব্যবস্থায় ও বাণিজ্যে উন্নতি সাধনের জন্য তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর পূর্ববর্তী সুলতানদের দেওয়া ঋণ মওকুফ করেন। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য চাকরি দফতর স্থাপন করেন। দিল্লিতে 'বিমারিস্তান' নামে একটি বিরাট হাসপাতাল নির্মাণ করেন, যেখানে গরিবদের বিনা খরচে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র প্রদান করা হতো। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্দীপকের জাহীন সাহেব তার শাসনকার্য পরিচালনায় সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের নীতি-আদর্শই অনুসরণ করেছেন।

ঘ উক্ত শাসকের অর্থাৎ ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ড আমার রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর জনকল্যাণমুখিতা। যে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় জনকল্যাণের প্রতি যত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, সে রাষ্ট্র তত উন্নত। কেননা একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু জনগণ। তাই জনগণের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য।

একটি রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান জনসংখ্যা। নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগণ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। অনুরূপ দায়িত্ব সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক পালন করেছেন। তিনি দরিদ্র, অনাথ, বিধবাদের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বেকার সমস্যা সমাধান, কৃষি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং স্বাস্থ্য সেবায় উন্নতি বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার এ সকল প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ড প্রতিটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য। বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নতিকল্পে প্রতিটি রাষ্ট্রেরই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করাও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও বেকার সমস্যার সমাধান হলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জনগণের জীবনমান উন্নত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ফিরোজশাহ তুঘলকের জনহিতৈষী কর্মকাণ্ড আমার রাষ্ট্রে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶২৩

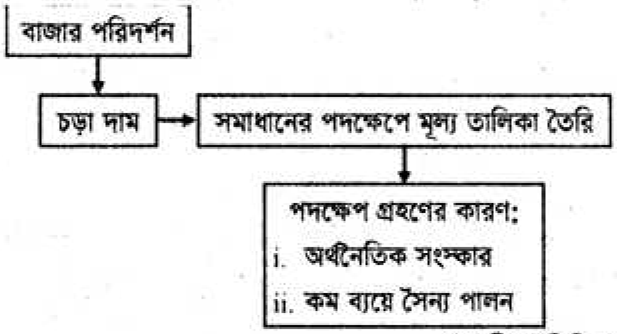

[গাজীপুর সিটি কলেজ]

ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ১

খ. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপরিউক্ত ছকের বিষয়ে কোন সুলতানের মূল্যতালিকার চিত্র ফুটে উঠেছে? তিনি কেন এ পদক্ষেপ নিয়েছেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মূল্য তালিকা বাস্তবায়নে উক্ত সুলতান কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? ৪

https://teachingbd24.com

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক কাফুর ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

খ মুহম্মদ বিন তুঘলকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিকল্পনা হলো দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করা।
দেবগিরি থেকে দিল্লি, গুজরাট, লক্ষ্মণাবতী, সাওগাঁও, সোনারগাঁ, তেলেঙ্গানা, মালাবার প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত ছিল। দেবগিরিকে মোঙ্গল উপদ্রব এবং আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ মনে করা হয়েছিল। কিন্তু ১০ বছর অবস্থানের পর সুলতান সকলকে দিল্লিতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। কারণ দেবগিরি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এবং ঐ অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে আমির-ওমরাহগণ খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। তাই তার রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

গ উপরিউক্ত ছকের বিষয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য তালিকার চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি অর্থনৈতিক সংকট মোচন এবং স্বল্প বেতনে সৈন্য পোষণের জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজির প্রবর্তিত ও সংস্কার সমূহের মধ্যে ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত তিনিই একমাত্র শাসক যিনি বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সংস্কার করে ইতিহাসে অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন। মূলত তিনি তার বিশাল সেনাবাহিনী স্বল্প বেতনে পোষণ এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। উপরিউক্ত ছকে এ ব্যবস্থারই প্রতিফলন লক্ষণীয়।
ছকে বাজার পরিদর্শন, চড়া দাম এবং তা সমাধানে মূল্য তালিকা তৈরির বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ছকে পদক্ষেপ গ্রহণের কারণগুলো অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্কার ও কম ব্যয়ে সৈন্য পালনের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়গুলির সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই সাদৃশ্যপূর্ণ। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য গঠিত বিশাল সেনাবাহিনীকে স্বল্প বেতনে পোষণের জন্য সুলতান মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রবর্তন করেন। দাক্ষিণাত্য হতে প্রচুর অর্থসম্পদ লাভের ফলে উত্তর ভারতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এ অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি ছিল। এছাড়া খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, পশু এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক। এসকল দিক বিবেচনা করে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ মূল্য তালিকা বাস্তবায়নে উক্ত সুলতান অর্থাৎ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি অনেকগুলো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।
একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শাসক হিসেবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, নিরাপত্তা ও সংহতি বিধান এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য তিনি যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।
আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য পণ্য বাজার স্থাপন করা হয়। 'মান্ডি' নামে দিল্লিতে প্রধান ও কেন্দ্রীয় শস্য বাজার বসানো হয়। ঔষধপত্র, কাপড়, শুকনোফল, জ্বালানি তেল প্রভৃতির বাজার বসানো হয় দিল্লির বাদাউন তোরণে। এছাড়া অন্যান্য পণ্যের জন্য আলাদা বাজার স্থাপন করা হয়। পণ্যবাজার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দুইজন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া পণ্যের মূল্য, ওজন, পরিমাপ ও ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা তদারকির জন্য সুলতান গুপ্তচর নিয়োগ করেন। তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যও যেমন: গম, বার্লি, মাখন, চিনি, আটা, ডাল, তেল প্রভৃতির মূল্য নির্ধারণ করে দেন। তিনি দ্রব্যাদির চাহিদা অনুসারে সরবরাহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। খাদ্য ঘাটতি পূরণে তিনি শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলেন এবং মজুতদারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুলতান দ্রব্যাদির সরবরাহ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন।
সর্বোপরি বলা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর নজরদারি, কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এবং জনগণের সহযোগিতায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶২৪

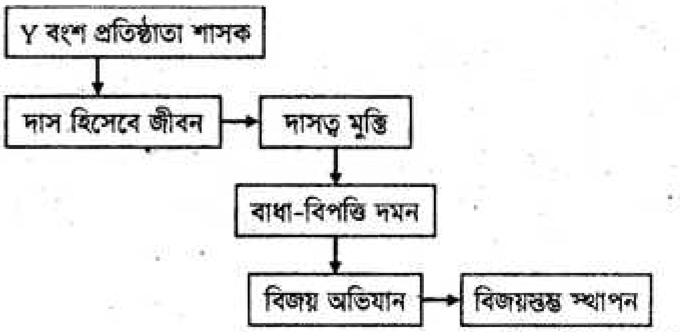

[গাজীপুর সিটি কলেজ]

ক. মুহাম্মদ ঘুরী কে ছিলেন? ১
খ. নারী হওয়াই ছিল তার সাফল্যের একমাত্র অন্তরায়- উক্তিটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে? ২
গ. উপর্যুক্ত ছকে পাঠ্যবইয়ের যে শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে লেখ। ৩
ঘ. ছকের বিজয় স্তম্ভের সাথে উক্ত শাসকের সাদৃশ্যপূর্ণ বিজয় স্তম্ভের সম্পর্কে তোমার মন্তব্য লিখ। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

খ নারী হওয়াই ছিল তার সাফল্যের একমাত্র অন্তরায়-এ উক্তিটি দ্বারা সুলতান রাজিয়ার পতনের অন্যতম কারণ তার নারীত্বকে বোঝানো হয়েছে।
নানারকম যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও সুলতান রাজিয়া তার শাসনকালকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি। ভারতীয় ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন, 'নারীত্বই (Womenhood) ছিল তার প্রধান অযোগ্যতা।' শক্তিশালী আমির-উমরাহগণ একজন নারী কর্তৃক শাসিত হতে অপমানবোধ করায় তারা তার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে সুলতান রাজিয়ার অনিবার্য পতন ঘটে।

গ উপর্যুক্ত ছকে ইঙ্গিতকৃত পাঠ্যবইয়ের শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রাথমিক জীবনে দাস ছিলেন।
ভারতে দাসবংশ ও দিল্লি সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবেক। প্রাথমিক জীবনে একজন দাস হয়েও তিনি তার যোগ্যতা বলে দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হন। উপর্যুক্ত ছকে অনুরূপ শাসকেরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।
ছকে উল্লিখিত 'Y' বংশ প্রতিষ্ঠাতা শাসক দাস হিসেবে জীবন শুরু করেন। তিনি দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ এবং অনেক বাধাবিপত্তি দমন করেন। বিজয় অভিযানে সফলতা অর্জন করে তিনি একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। একইভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন ক্রীতদাস হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর অধীনে জীবন শুরু করেন। স্বীয় মেধা এবং অধ্যবসায়ের অতি অল্প সময়ে মুহাম্মদ ঘুরীর অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। ক্রমে তিনি আমিন-ই-আখুর বা অশ্বশালার প্রধান পদে উন্নীত হন। মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর ঘুরী তাকে বিজিত অঞ্চলের শাসনভার দান করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরমান দ্বারা তাকে দাসত্বমুক্ত করেন এবং সুলতান উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস থাকার কারণে তার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ভারতের প্রথম রাজবংশ তথাকথিত দাসবংশ নামে পরিচিত। তাই বলা যায়, ছকে উল্লিখিত শাসক এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক এক ও অভিন্ন।

ঘ ছকের বিজয়স্তম্ভের সাথে উক্ত শাসকের তথা কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাদৃশ্যপূর্ণ বিজয়স্তম্ভ হল কুতুবমিনার।
কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি হলো কুতুবমিনার। ১১৯৯ সালে রাজ্য বিজয়ের স্মারক এবং ইসলামের বিজয়গাঁথা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লিতে এই মিনারটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে সুলতান ইলতুৎমিশ এটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। প্রখ্যাত সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এ মিনারটি 'কুতুব মিনার' নামে নামকরণ করা হয়। কুতুবমিনার ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার। দূর থেকে মিনারটি

https://teachingbd24.com

দেখলে একে বৃহদাকার কারখানার চিমনি অথবা বাতিঘরের মতো মনে হয় এবং কাছ থেকে একে লোহিত শিলা ও মর্মর পাথরে তৈরি ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যাওয়া বাঁশির আকৃতির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মিনারটি ৪ তলাবিশিষ্ট এবং ৪৭ ফুট বাসের বুনিয়াদের ওপর নির্মিত। এর বারান্দা সমকোণবিশিষ্ট পাথরের দ্বারা নির্মিত। মিনারটি আজানের জন্য ব্যবহৃত হতো। সাতটি স্তরে বিভক্ত মিনারটির উপরের দুটি স্তর ভেঙে গিয়েছে। তবে অক্ষত অবস্থায় এর উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট, বর্তমানে ২২০ ফুট। সর্বোচ্চ স্তরে গমনের জন্য ইমারতের ভেতরে ৩৭৯টি ধাপবিশিষ্ট একটি ঘোরানো সিঁড়ি রয়েছে এবং সিঁড়ির গায়ে কুরআনের আয়াত খোদাই করা আছে। মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে তৈরি মিনারটি মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে আজও সবার কাছে সমাদৃত।

প্রশ্ন ▶২৫ দ্বিজ বংশীয় রাজা মুকুল বসু সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। এ উপজাতিগুলো রাজা মুকুল বসুর সীমান্তে ঢুকে লুটতরাজ করত। সাম্রাজ্যবিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রও রাজাকে বেকায়দায় ফেলে দেয় এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে। *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক. দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বন্দেগান-ই-চেহেলগান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের রাজা মুকুল বসু যে শাসকের চরিত্র বহন করেন তার মোঙ্গল নীতির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর সাম্রাজ্য বিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ উক্ত শাসকের শাসনে বাধা সৃষ্টি করেছিল? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান ইলতুৎমিশ দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

খ সৃজনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের রাজা মুকুল বসু সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের চরিত্র বহন করে। তিনি মোঙ্গলদের প্রতিহত করার জন্য কঠোর মোঙ্গল নীতি গ্রহণ করে।

দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা ছিল দিল্লি সালতানাতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে বার বার আক্রমণ করত। সিন্ধু ও মুলতান তাদের উপর্যুপরি আক্রমণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষা এবং মোঙ্গল আক্রমণ হতে দিল্লি সালতানাতকে নিরাপদ রাখার লক্ষে গিয়াসউদ্দিন বলবন কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। যেটি উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত দ্বিজ বংশীয় রাজা মুকুল বসু সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। গিয়াসউদ্দিন বলবনও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হিসেবে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করেন। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রসমূহে নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরোনো দুর্গ সংস্কার করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন। মোঙ্গল আক্রমণকারীদের গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য তিনি সীমান্ত অঞ্চলে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করেন। সুলতান সামানা, মুলতান ও দিপালপুরকে নিয়ে সীমান্তবর্তী প্রদেশ গঠন করেন এবং সুদক্ষ শাসনকর্তা নিয়োগ দেন। নতুন রাজ্য বিস্তারনীতি পরিহার করে দূরবর্তী প্রদেশে যুদ্ধাভিযান বন্ধ করেন। এছাড়া সর্বদা রাজধানীতে অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন। মোঙ্গলরা পাঞ্জাব আক্রমণ করলে সুলতান সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে লাহোর উদ্ধার করেন।

পরিশেষে বলা যায়, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মোঙ্গল নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যকে শত্রুমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছিলেন।

ঘ হ্যাঁ, সাম্রাজ্য বিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ উক্ত শাসক তথা সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনে বাঁধা সৃষ্টি করেছিল বলে আমি মনে করি।

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন একজন ক্ষমতাধর শাসক। দিল্লি সালতানাতের এক চরম সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় পূর্ববর্তী সুলতানের অযোগ্যতার কারণে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। তদুপরি আমির-ওমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব-কলহ ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে তার শাসনামল সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহণ করে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হন। এ সময় সুলতান ইলতুৎমিশের উত্তরাধিকারী সুলতানদের দুর্বলতার কারণে তুর্কি আমির-উমরাহ ও তুর্কি অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা, দ্বন্দ্ব-কলহ ও ষড়যন্ত্রের ফলে দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয় পূর্ববর্তী সুলতানদের অযোগ্যতার কারণে সুলতানের মর্যাদারও অবনতি ঘটে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রতি অশ্রদ্ধার ফলে সর্বত্র বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার দেখা দেয়। তুর্কি অভিজাতগণও এ সকল বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায়। তারা সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালেই প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। এ অভিজাতদের একটি চক্র 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। ইলতুৎমিশের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে রাজ্যপ্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এরা সর্বেসবা হয়ে ওঠে। বলবন নিজেও এ চক্রের সদস্য ছিল। এদের ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি মোঙ্গলদের বিদ্রোহ, মেওয়াটি দস্যুদের চরম উৎপাত, জাঠ-পার্বত্য উপজাতিদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যকে দুর্বিষহ করে তোলে। এরকম পরিস্থিতিতে গিয়াসউদ্দিন বলবন কঠোর নীতি গ্রহণ করে দিল্লি সালতানাতের সংহতি আনয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসন ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ বিঘ্ন ঘটিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶২৬ আজ বাজারে গিয়ে তাহের সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত। প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। স্ত্রীর হাতে বাজারের ব্যাগ দিতে গিয়ে বললেন বাজারের জিনিসপত্রের দামের ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ মধ্যযুগে আলাউদ্দিন খলজি নামে একজন শাসক মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সফলতার সাথে বাজার দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। *[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]*

ক. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কী? ১

খ. আলাউদ্দীন খলজির আমলে বাজার তদারককারী কর্মকর্তা কে ছিলেন? ২

গ. আলাউদ্দীন খলজির আমলে বাজার দাম নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা কী ছিল? ৩

ঘ. আলাউদ্দীন খলজির আমলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলাউদ্দিন খলজি বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য যে অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত।

খ আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজারে ক্রয় ও বিক্রয় ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য যে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো তার পদবি ছিল 'শাহানা-ই-মান্ডি' ও দিওয়ান-ই-রিয়াসত। শাহানা-ই-রিয়াসত ছিলেন বস্ত্র ও সাধারণ বাজারের তত্ত্বাবধায়ক।

গ আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার দাম নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম।

অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজির প্রবর্তিত সংস্কারসমূহের মধ্যে ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আর্থিক স্থিতিশীলতা, জনসাধারণের সুবিধা এবং সাম্রাজ্যের সর্বাধিক উন্নতির জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার দর নির্দিষ্ট হারে বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য সুলতান যে বিশাল সেনাবাহিনী সংগঠন করেন তাদের স্বল্প বেতনে পোষণের জন্যও মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। দাক্ষিণাত্য হতে প্রচুর অর্থসম্পদ লাভের ফলে উত্তর ভারতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ অর্থনৈতিক

https://teachingbd24.com

সংকট মোচনের ক্ষেত্রে সুলতানের গৃহীত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়া খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, পশু এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খলজির প্রবর্তিত মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক। এ সকল দিক বিবেচনা করে বলা যায়, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি কর্তৃক প্রবর্তিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম।

ঘ সৃজনশীল ২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রাজা শামসের সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নতর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শুভ উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত তার এসব পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]

ক. ইবনে বতুতা কে ছিলেন? ১

খ. আলাউদ্দীন খলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযানের উদ্দেশ্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন কোন পরিকল্পনার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতার কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবনে বতুতা ছিলেন মরক্কোর পর্যটক।

খ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ফলে তিনি তার রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রেরণ করেন। এ ছাড়া অগণিত ধন-রত্নও সুলতানকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। সর্বোপরি সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তার উচ্চাভিলাষ পূরণ করার মানসে দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা শামসেরের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও উন্নততর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা শামসের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকও এমন প্রেক্ষাপটে কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রাজধানী স্থানান্তর ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি এমনই দুটি পরিকল্পনা।

সহজতর নজরদারি, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীকালে রাজধানীর নাম রাখেন দৌলতাবাদ। কিন্তু তার এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রাজভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি দোয়াবে কর বৃদ্ধি করেন। কারণ দোয়াব ছিল দিল্লি সালতানাতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এ ভূভাগে পানির অভাব না থাকায় এখানে শস্যের ফলন সর্বদা ভালো হতো। দিল্লির সুলতানরা সুযোগ বুঝে সর্বদা দোয়াবে কর বৃদ্ধি করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দোয়াবে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ বা অর্ধেক কর ধার্য করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এতেও দোয়াবের রায়তদের কোনো অসুবিধা হতো না, কারণ দোয়াব সত্যিই উর্বর ছিল। তবে তুঘলকের এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত করদানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক ক্লেশ বৃদ্ধি এবং সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘ উক্ত পরিকল্পনাগুলো বলতে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহকে বোঝায়। নানা কারণে পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনাকে অনেকে এক স্বৈরাচারী শাসকের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত নিষ্ফল কাজ এবং কেউ কেউ "অসাবধানী পরিকল্পনা" বলে অভিহিত করেছেন। লেনপুলের মতে, "দৌলতাবাদ ছিল ভ্রান্তপথে পরিচালিত উদ্যমের কীর্তিস্তম্ভ।" সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু সুলতানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তিনি যদি কেবল তার দরবার ও প্রশাসনিক দপ্তর স্থানান্তর করে ক্ষান্ত হতেন, তবে সুলতানের পরিকল্পনাটি সংগত ও বাস্তবে পরিণত হতো। কিন্তু তা না করায় মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির পরিকল্পনাটি ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। আর ঠিক এ সময়ে বর্ধিত হারে রাজস্ব আরোপের ফলে কৃষকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বিদ্রোহ করে এবং অনেকে নিজ খামারের শস্য পুড়িয়ে ফেলে ও কৃষিকাজ ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। জীবন-ধারণের প্রয়োজনে অনেকে দস্যুতার পথ বেছে নেয়। ঐতিহাসিক বারানির মতে, 'কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।' তিনি বলেন, সুলতানের উৎপীড়নে রায়তরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সুলতান দোয়াবে বিভীষিকা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। ফলে সুলতানের কর বৃদ্ধির পরিকল্পনাটিও ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহম্মদ বিন তুঘলকের অদূরদর্শিতার কারণে তার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৮ এলিনা খান জাতীয় উন্নয়নের জন্য নারীদের ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই বলে উল্লেখ্য করেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবে নারীর ঐতিহ্য শীর্ষক এক সভায় বক্তব্যদানকালে নারীর ক্ষমতার কিছু অতীত স্মৃতি তুলে ধরেন, যার একাংশ হলো- একজন শাসকের অপসারণের পর ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মহীয়সী এক নারী তার দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তার পূর্ববর্তী শাসকের কুশাসনজনিত বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. ইলতুৎমিশ রাজ্যজয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বুঝিয়ে— লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মহীয়সী নারীর বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত সাধিত হয়েছিল— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভারতবর্ষে এ ধরনের একজন নারীর চরিত্রে বিভিন্ন গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল- মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশ।

খ রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন অসীম সাহসের অধিকারী।

ইলতুৎমিশ দাস কুতুবউদ্দিন আইবেকের অধীনে থাকা অবস্থায় ধনুর্বিদ্যা ও সামরিকবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। আরাম শাহকে পরাজিত করে তিনি সিংহাসনে আসেন। দিল্লির মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজপুত শক্তির প্রভাব সব সময়ই ছিল। কিন্তু তিনি তাদের প্রতিহত করে রাজ্য জয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রণথম্ভোর, মান্দাওয়ার, গোয়ালিয়র, ভিলসা দুর্গ ও উজ্জয়িনী দখল করেন। এভাবে তিনি সাহসিকতার সাথে রাজ্যজয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মহীয়সী নারীর সাথে পাঠ্যবইয়ের সুলতান রাজিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে। তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

সুলতান রাজিয়া রুকনউদ্দিন ফিরোজকে অপসারণের পর ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান রাজিয়া ক্ষমতায় আরোহণ করার সাথে সাথে একটি গোলযোগপূর্ণ প্রশাসন লাভ করেন। তিনি তার পূর্ববর্তী শাসকের কুশাসনজনিত বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন। উদ্দীপকেও এ দিকটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সুলতান রাজিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্র ও অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রথম সূচনা হয়। সুলতান রাজিয়া পুরুষের পোশাক পরিধান করতেন। এজন্য অনেকে তাকে ধর্মবিরোধী বলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কারামাতিয়া ও মুলাহিদ সম্প্রদায়ের লোকজনও তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কবির খান সর্বপ্রথম রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উজির মুহাম্মদ জুনাইদি ও বদায়ুন, লাহোর, বাংলা হান্সি এবং মুলতানের শাসনকর্তাগণ সুলতান হিসেবে রাজিয়ার মনোনয়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং

teachingbd24.com

ষড়যন্ত্র করেন। তারা রাজিয়ার পতনের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে একযোগে দিল্লি আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুলতান রাজিয়া একজন নারী হওয়ায় গোঁড়া মুসলমানরা তাকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে তারা সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করে। এভাবে সুলতান রাজিয়া নানা চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের উক্ত নারীর মতো ভারতবর্ষের সুলতান রাজিয়ার চরিত্রে বিভিন্ন গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়াই একমাত্র মহিলা যিনি দিল্লি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে নারী হয়েও তিনি অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাজকীয় অনন্য গুণাবলির পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুলতান রাজিয়া সিংহাসন আরোহণ করে উত্তরাধিকারসূত্রে বিশৃঙ্খল ও গোলযোগপূর্ণ প্রশাসন লাভ করেন। তুর্কি অভিজাতগণ শুরুতেই সুলতান রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা, কৌশলী চিন্তা-চেতনা, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রথম ধাক্কা সামলিয়ে ওঠেন। তিনি ন্যায়বিচারক, দক্ষ প্রশাসক, সুনিপুণ মানসিক ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যোৎসাহী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে নিজে নেতৃত্বদান করেন। বস্তুত সুলতান রাজিয়া একজন শাসক হিসেবে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। সুলতান রাজিয়া সাহিত্যিক ও বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও চমৎকার ভঙ্গিসহ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে রাজার প্রয়োজনীয় গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও পুরুষের চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী, তার ঐসব গুণ ছিল মূল্যহীন। পরিশেষে বলা যায়, সুলতান রাজিয়া ভারতের ১ম মুসলিম নারী শাসক হিসেবে ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করে আছেন।

প্রশ্ন ▶২৯ মধ্যযুগে বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে বাংলা সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। তার শাসনামলে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। তার একজন কর্মকর্তা যশরাজ খান কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। তাছাড়া গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে নির্মিত স্থাপত্যকর্মের অনন্য নিদর্শন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেছিলেন কে? ১

খ. সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? ২

গ. সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাথে তোমার পঠিত সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

খ সংকটময় মুহূর্তে সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করায় সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর (১২১০ খ্রি.) পর দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কারণ তার পরবর্তী সুলতান আরাম শাহের অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে দিল্লি সালতানাত গভীর সংকটের মুখে পড়ে। তার দুর্বল শাসনের সুযোগে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠে। এ সময় ক্ষমতা গ্রহণ করে (১২১১ খ্রি.) সুলতান ইলতুৎমিশ দায়িত্ব নিয়ে এসব বিদ্রোহ দমন করে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন। এ কারণেই তিনি দিল্লি সালতানাতের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা।

গ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাথে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো তারা দুজনেই ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক।

শিল্প-সংস্কৃতি মানুষের শিল্প মননের প্রতিনিধিত্ব করে। ইতিহাসে অনেক শাসককেই দেখা গেছে, শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তারা নিজেদের মন-মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়েছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এবং পাঠ্যবইয়ে আলোচিত সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক এমনই দুজন প্রখ্যাত শাসক। শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তারা দুজনেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

উদ্দীপক থেকে জানা যায়, বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। কারণ তিনি সাহিত্যের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তার আমলে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ এবং কিছু বৈষ্ণব পদ রচিত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করে স্থাপত্য শিল্পে অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে, সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির অনুরাগী একজন শাসক। তার কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্তদের মধ্যে ঐতিহাসিক ও গ্রন্থাকার ফখরই মুদাব্বির ও কবি হাসান নিযামীর নাম উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য শিল্পেও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কুতুবমিনার নামের বিজয় স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ তিনিই সূচনা করেছিলেন। সুতরাং, শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাথে তার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্রের মাধ্যমে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের একটি মাত্র দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ কারণে উদ্দীপকটিতে সুলতানের কৃতিত্বের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব মূল্যায়নে চারটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তিনি দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয়ত, তিনি একজন দক্ষ সেনানায়ক। তৃতীয়ত, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসক এবং চতুর্থত, তিনি ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এ চারটি বিষয়ের মধ্যে উদ্দীপকে কেবল শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার দিকটিই পরিলক্ষিত হয়।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মাধ্যমেই ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন হয়েছিল। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তিনি গজনির কর্তৃত্ব থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি একজন সফল সেনানায়ক হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর যোগ্য সহচর হয়েছিলেন। শাসনক্ষমতা গ্রহণের পরে তিনি শাসক হিসেবেও সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সালতানাতের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাকল্যাণ নিশ্চিতকরণে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। উদ্দীপকে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের এই দিকগুলোর কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ কেবল কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের আংশিক চিত্র মাত্র। তাই উদ্দীপকটি সুলতানের কৃতিত্বের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না।

প্রশ্ন ▶৩০ টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়ে, জনাব মিরন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে দেন। এ তালিকায় সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয় ১১০ টাকা প্রতি লিটারের দাম; কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখা যায় সয়াবিন তেলসহ অন্যান্য দ্রব্যের দাম অনেক বেশি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে। দোকানদাররা এর জন্য যোগানের স্বল্পতা মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি গুদামের অভাব ও অসাধু ব্যবসায়ীদের অপতৎপরতাকে দায়ী করেন। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ]*

ক. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিরক্ষার্থে ফিরোজশাহের গড়ে তোলা শহরটির নাম কী? ১

খ. বলবনের মোঙ্গলনীতি কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মেয়র মিরন সাহেবের দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে তোমার পঠিত কোন শাসকের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা কার্যকর করতে মেয়র মিরন কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিরক্ষার্থে গড়ে তোলা শহরটির নাম জৌনপুর।

খ মোঙ্গলদের প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নীতিই মোঙ্গল নীতি নামে পরিচিত।

মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বলবন সেনাবাহিনী পুনর্গঠন এবং তাদেরকে সামরিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত করেন। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সুলতান নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। মোঙ্গলদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদা রাজধানীতে অবস্থান করতেন। মূলত বলবন নতুন রাজ্য বিজয়ে উৎসাহিত না হয়ে রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যকে শঙ্কামুক্ত রাখতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতের জন্য বেশি সচেষ্ট ছিলেন।

গ সৃজনশীল ১২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যগুলোর মধ্যে চীনের প্রাচীর বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীনকালে মঙ্গোলিয়ার যাযাবর দস্যুরা চীনের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ করতো এবং লুটতরাজ চালাতো। ফলে দস্যুদের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য সম্রাট কিং সি হুয়াং এ প্রাচীর নির্মাণ করেন। পাশাপাশি সীমান্তের দুর্গগুলো সংস্কার করে দক্ষ সামরিক নেতাদের সেখানে নিয়োগ করেন। এভাবে সম্রাট সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে চীনকে বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন।

[সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. কার নামে কুতুবমিনারের নামকরণ করা হয়? ১

খ. সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্রাটের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের পদক্ষেপের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসক কীভাবে তার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে কুতুবমিনারের নামকরণ করা হয়।

খ সংকটময় মুহূর্তে সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করায় সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর (১২১০ খ্রি.) পর দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কারণ তার পরবর্তী সুলতান আরাম শাহের অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে দিল্লি সালতানাত গভীর সংকটের মুখে পড়ে। তার দুর্বল শাসনের সুযোগে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠে। এ সময় ক্ষমতা গ্রহণ করে (১২১১ খ্রি.) সুলতান ইলতুৎমিশ দায়িত্ব নিয়ে এসব বিদ্রোহ দমন করে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন। এ কারণেই তিনি দিল্লি সালতানাতের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্রাটের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে আমার পঠিত সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পদক্ষেপের সামঞ্জস্য রয়েছে।

গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ বারবার ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে হামলা পরিচালনা করে সুলতানকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যকে বিপদমুক্ত করার সাথে সাথে সুলতান মোঙ্গলদের আক্রমণ হতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি গ্রহণ করেন, যা মোঙ্গল নীতি নামে পরিচিত। যেটি উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাটের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রাচীনকালে মঙ্গোলিয়ার যাযাবর দস্যুরা চীনের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ করতো এবং লুটতরাজ চালাতো। ফলে দস্যুদের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য সম্রাট কিং সি হুয়াং চীনের প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং সীমান্ত দুর্গগুলো সংস্কার করে সেখানে দক্ষ সামরিক নেতাদের নিয়োগ দেন। অনুরূপভাবে মোঙ্গলরা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পথে ভারত বারবার আক্রমণ করত। মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও তাদের দমন করার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রথমে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠনের স্বার্থে বৃদ্ধ সৈনিকদেরকে ক্রমান্বয়ে ছাঁটাই করেন। তাদেরকে উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত করেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সুলতান নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। সুলতান মুলতান সীমান্তবর্তী প্রদেশ গঠন করে সুদক্ষ শাসনকর্তাদের ওপর সেগুলোর শাসনভার অর্পণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সম্রাটের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোরই মিল পাওয়া যায়।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সামরিক বাহিনীর সংস্কার ও কঠোর নীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন।

দিল্লি সালতানাতের সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ভারতবর্ষ তথা ইসলামের ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করেন। সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে যারা স্বীয় মেধা ও দক্ষতা বলে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছেন বলবন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় করার নিমিত্তে রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। উদ্দীপকেও এ শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি শক্তিশালী ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করে দিল্লি সালতানাতের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সুদৃঢ় করার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি মেওয়াটবাসীদের বিদ্রোহ, দোয়াবের বিদ্রোহ ও উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং চল্লিশ চক্রের বিলোপ সাধন করেন। তিনি তার সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর দ্বারা ভারতবর্ষকে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। তার সময়ে দিল্লি নগরী মুসলিম কৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি তুর্কি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে নবজীবন দান করেন; সালতানাতের গৌরব পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; সাম্রাজ্যের সর্বত্র অব্যাহত শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে মোঙ্গল হামলা থেকে নিরাপত্তা বিধানকল্পে এক নতুন নীতির প্রবর্তন করেন। এসব দিক পর্যালোচনা করলে বলবনকে 'সালতানাতের প্রকৃত সংরক্ষণকারী' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩২ একটি পাঁচ টাকা কয়েন গলিয়ে ২টি চা চামচ তৈরি করে তা দশ টাকায় বিক্রি করার ফলে হঠাৎ করে 'ক' দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। অভাব মোকাবিলায় সরকার উর্বর দক্ষিণ অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করে। ওদিকে ব্যবসায়ীরা মুদ্রার অভাবে সিলযুক্ত কাগজের স্লিপ ব্যবহার করতে থাকে; কিন্তু অসাধু ব্যক্তিরা এসব জাল করে দেশের অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. কারাচিল কোথায় অবস্থিত? ১

খ. মুহাম্মদ বিন তুঘলককে 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' কেন বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উর্বর দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ভারতে কোন অঞ্চলের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রা ব্যবস্থার মতোই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 'প্রতীকী তাম্রমুদ্রা' পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারাচিল হিন্দুস্থান ও চীনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

Teachingbd24.com

খ ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে মুহাম্মদ বিন তুঘলক মধ্যযুগীয় বিশ্বের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি ছিলেন বলে তাকে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ বলা হয়। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মধ্যে পাণ্ডিত্য, মানসিক উৎকর্ষ, উন্নত রুচিবোধ, উচ্চ নৈতিক আদর্শ, সমদর্শিতা, ধর্মপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। অন্যদিকে আবেগপ্রবণতা, অস্থিরতা, একগুঁয়েমি, অপরিণামদর্শিতা, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ইত্যাদি দোষ-ত্রুটিও তার চরিত্রকে ম্লান করেছিল। তাই তাকে বিপরীত বৈশিষ্ট্যাবলির সংমিশ্রণ অর্থাৎ 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করা হয়।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মুহাম্মদ তকি ক্রীতদাস থেকে শাসক হয়েছিলেন। এরপর থেকে তার দেশে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজবংশ দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করে। তাদের শাসনকালে নানা উত্থান-পতন ঘটে। কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। প্রতিজন শাসকের মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্রকারী অমাত্যবর্গ রাজপরিবারের একাধিক সদস্যকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে সমর্থন দান করে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতেন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. সৈয়দ বংশের প্রথম শাসকের নাম কী? ১

খ. লোদি বংশের শাসকদের মধ্যে সিকান্দর লোদি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সুলতান— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে, তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়াও দিল্লি সালতানাত পতনের আরও কারণ আছে— মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৈয়দ বংশের প্রথম শাসকের নাম খিজির খান।

খ লোদি বংশের শাসকদের মধ্যে সিকান্দার লোদি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সুলতান। বাহলুল লোদির মৃত্যুর পর ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র 'নিজাম খান' সিকান্দার শাহ উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২৯ বছর সগৌরবে রাজত্ব করার পর ১৫১৭ সালে তিনি আগ্রাতে পরলোকগমন করেন। সিকান্দার লোদি দৃঢ়চেতা ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি কখনো মদ্যপান করতেন না। প্রতি বছর সাম্রাজ্যের গরিব ও দুস্থদের তালিকা করে তাদের ৬ মাসের রেশন দানের ব্যবস্থা করেন। তিনি ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রা নগরীর গোড়াপত্তন করে। দিল্লি হতে প্রশাসনিক দপ্তর সেখানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি ত্রিহুত, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। তাই তাকে লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী সুলতানদের স্বৈরশাসনের কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরশাসন ছিল দিল্লি সালতানাত যুগের শাসকদের প্রধান শাসননীতি। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, একনায়কতন্ত্র জনগণের জন্য সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই এর বিরুদ্ধে সব সময়ই বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। দিল্লি সালতানাতের পতন এবং উদ্দীপকের মুহাম্মদ তকির ক্ষেত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেক বছর ধরে একটি রাজবংশ একনায়কতন্ত্রের নীতিতে শাসন করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের কাছে রাজবংশটির পতন ঘটে। অনুরূপ ফলাফল ঘটেছিল দিল্লি সালাতানাতের ক্ষেত্রেও। দিল্লি সালতানাত ছিল ব্যক্তিনির্ভর একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসন। এতে সমগ্র ক্ষমতার উৎস ছিলেন স্বয়ং সুলতান। সুলতানের নিজস্ব ক্ষমতার ওপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল ছিল। রূঢ় হলেও সত্য যে দিল্লি সালতানাতের তিনশ বছরে সুলতান ইলতুৎমিশ, গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছাড়া প্রায় সকল শাসকই অযোগ্য ছিলেন। ব্যক্তিনির্ভর একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এসব দুর্বল ও অযোগ্য সুলতানদের আমলে সর্বত্র বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে উদ্দীপকের রাজবংশের ন্যায় দিল্লি সালতানাতের পতনও অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য দুটি প্রেক্ষাপটেই পতনের কারণ হিসেবে স্বৈরশাসন ক্রিয়াশীল।

ঘ উদ্দীপকে দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণ হিসেবে শাসকদের স্বৈরশাসনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, যা সালতানাত পতনের একমাত্র কারণ নয়।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবেকের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দিল্লি সালতানাতের উত্থান ঘটেছিল। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবরের সাথে ইব্রাহিম লোদির পানিপথের যুদ্ধের মাধ্যমে এ সালতানাতের পতন ঘটে এবং মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতিহাসবিদদের মতে, একটি রাজবংশ মাত্র ১০০ বছর শৌর্যবীর্যে টিকে থাকতে পারে। এরপর অনিবার্যভাবে তার পতন ঘটবে। তাই মামলুক, খলজি, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদি রাজবংশ স্বাভাবিকভাবে তাদের স্থিতিকাল অতিক্রম করায় তাদের পতন ঘটেছে। এছাড়া দিল্লি সালতানাত যুগে ইলতুৎমিশ, গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি ছাড়া আর কোনো যোগ্য শাসক কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো সুদৃঢ় করতে পারেননি। সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির ফলে এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা খুব কঠিন ছিল। একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র দিল্লি সালতানাত পতনের আরেকটি কারণ। দিল্লি সালতানাত ছিল সামরিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য বা জাতীয়তাবোধের ওপর নয়। তাই সালতানাতের নিরাপত্তার ব্যাপারে জনগণের কোনো আগ্রহ ছিল না। অধিকাংশ সুলতান ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমগণ সর্বদাই সালতানাতের ধ্বংস কামনা করত। বাহ্যিক কিছু কারণ যেমন— মোঙ্গল আক্রমণ, তৈমুর লঙের আক্রমণ ও বাবরের আক্রমণের ফলে দিল্লি সালতানাতের পতনের পথ সুগম হয়। এভাবেই বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে দিল্লি সালতানাতের পতন ত্বরান্বিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ সারা তার বাবার মুখে ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তির গল্প শুনছিল। এই মহান ব্যক্তি চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি ছিলেন তুর্কি। বাল্যকালে ক্রীতদাসরূপে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে একজনের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই মহান শাসকই ভারতবর্ষে এক স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. সুলতান মাহমুদ কোথাকার শাসক ছিলেন? ১

খ. 'চল্লিশ চক্র' কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহান শাসকের পরিচয় তুলে ধর। ৩

ঘ. ভারতবর্ষে এক স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠায় উক্ত মহান শাসকের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ গজনির শাসক ছিলেন।

খ সুলতান ইলতুৎমিশের ক্রীতদাসের মধ্যে যে চল্লিশজন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য ক্রীতদাস ছিল। তাদের নিয়ে গঠিত চক্রকে চল্লিশ চক্র বলা হয়। ইলতুৎমিশের সময় এ চল্লিশ জনকে নিয়ে গঠিত হয় 'বন্দেগান-ই চেহেলগান'। ইলতুৎমিশের সময় তারা শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা ইলতুৎমিশের দুর্বল উত্তরাধিকারী সুলতানদের শাসনামলে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

গ উদ্দীপকে কুতুবউদ্দিন আইবেককে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তি সামান্য ক্রীতদাস থেকে ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেন তাদের মধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবেক অন্যতম। তিনি বাল্যকালে মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাসরূপে জীবন শুরু করে স্বীয় যোগ্যতা ও গুণাবলির দ্বারা ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক মহান ব্যক্তি চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনি জাতিতে তুর্কি। বাল্যকালে ক্রীতদাসরূপে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে একজনের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষে এক স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তার নাম রাখা হয় আইবেক। আইবেকের আদি নিবাস তুর্কিস্তানে। শৈশবে আইবেক পারস্যের একজন দাস ব্যবসায়ীর হাতে পড়েন। উক্ত পারস্যিক দাস ব্যবসায়ী তাকে

Teachingbd24.com

নিশাপুরের কাজী ফখরুদ্দিন আব্দুল আজিজ কুফীর নিকট বিক্রি করে দেন। কাজীর মৃত্যুর পর তার পুত্রগণ তাকে একজন দাস ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করেন এবং পরে তিনি তাকে গজনির মুহাম্মদ ঘুরীর নিকট বিক্রি করে দেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, দূরদৃষ্টি এবং সমরকুশলতার গুণে আইবেক মুহাম্মদ ঘুরীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হন। ভারত অভিযানকালে তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি হিসেবে নিজ দক্ষতার পরিচয় দেন। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করলে মুহাম্মদ ঘুরী তাকে ভারতবর্ষে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ঘুরী মৃত্যুবরণ করলে তিনি ভারতে স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে কুতুবউদ্দিন আইবেকেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ ভারতবর্ষে এক স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠায় উক্ত মহান শাসক তথা কুতুবউদ্দিন আইবেকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি তার স্বীয় গুণাবলির বদৌলতে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীন সুলতান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যেমনটি উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার অধীন কর্মকর্তাদের মধ্যে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ, নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক সার্বভৌম ক্ষমতা দখলে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ তিন জনের মধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মুহাম্মদ ঘুরীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত। ঘুরী তার জীবদ্দশাতেই কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতের বিজিত অঞ্চলের রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ ও 'মালিক' উপাধি দেন।

মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর তিন মাস পর ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন লাহোরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরী কুতুবউদ্দিনকে রাজদণ্ড প্রদান ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'দাসত্ব মুক্তি সনদ' দান করেন। আর এভাবেই আইবেক স্বাধীন দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, কুতুবউদ্দিন আইবেক স্বীয় কৃতিত্ব বলে স্বাধীন দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ মাহিম খুব ভাগ্যবান। বাল্যকালে তাকে ইসফান সাহেব এতিমখানা থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসেন। নিজের সন্তানদের সাথে তাকে সব রকম শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন। মাহিম স্বীয় মেধা ও অধ্যবসায়ের বলে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. কুতুবমিনার কোথায় অবস্থিত? ১

খ. কুতুবউদ্দিনকে 'আইবেক' বলা হয় কেন? ২

গ. মাহিমের সাথে দাস বংশের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত দাস বংশের উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুতুবমিনার দিল্লিতে অবস্থিত।

খ কুতুবউদ্দিন জাতিতে তুর্কি এবং তিনি তুর্কিস্থানের অধিবাসী ছিলেন। তুর্কি ভাষায় 'আইবেক' শব্দের অর্থ চন্দ্র দেবতা। স্যার ডব্লিউ হেগ এর মতে, চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মগ্রহণ করায় সম্ভবত তিনি এ নামে অভিহিত হয়েছেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, কুতুবউদ্দিনের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি ভাঙা ছিল বলে তাঁকে আইবেক বলা হয়। তবে তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তুর্কিস্থানের আইবেক পরিবারের লোক ছিলেন বলে আইবেক নামে পরিচিত হন।

গ সৃজনশীল ৩৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ অটোমান সুলতান বায়েজিদ অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তিনি জনকল্যাণকর কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যের বিধবা, এতিম, বয়স্কদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ধাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেন। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ভারতের 'তোতা পাখি' কাকে বলা হয়? ১

খ. 'কিতাব-উল-হিন্দ' পুস্তকটি বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের শাসকের কার্যক্রমের যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমীর খসরুকে ভারতের 'তোতা পাখি' বলা হয়।

খ আল বিরুনির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো কিতাবুল হিন্দ। কিতাবুল হিন্দ প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের ইতিহাস জানার জন্য অতি মূল্যবান একটি গ্রন্থ। আল বিরুনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে এ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, সভ্যতা, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করেন। তার এ গবেষণালব্ধ তথ্যাদি কিতাবুল হিন্দে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

গ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের কর্মকাণ্ড সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কোনো এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অপরিহার্য। দিল্লি সালতানাতের সুলতানগণ এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ছিলেন। উদ্দীপকে বর্ণিত অটোমান সুলতান বায়েজিদের গৃহীত পদক্ষেপে সুলতান ফিরোজ শাহের কাজেরই প্রতিফলন রয়েছে।

সুলতান বায়েজিদ রাজ্যের বিধবা, এতিম ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও অনুরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনদরদি শাসক হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। প্রজাদের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি দুস্থ, দরিদ্র ও অনাথদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে 'দারুস শিফা' নামক একটি বিখ্যাত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও ওষুধ সরবরাহ করা হতো। এছাড়া প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি বেশ কিছু জনকল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি দরিদ্র প্রজাদের সাহায্যে ও তাদের কন্যাদের বিবাহদান এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য দেওয়ান-ই-খয়রাত বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য চাকরি দপ্তর স্থাপন করেন। তাছাড়াও তিনি প্রজাদের কল্যাণে সরাইখানা এবং নলকূপ স্থাপন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। তার এসব জনদরদি কর্মকাণ্ড ইতিহাসে 'মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকের সুলতান এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক একই ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান।

জনগণের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা প্রত্যেক শাসকেরই কর্তব্য। ফিরোজ শাহ তুঘলক এক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মানবদরদি শাসক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি প্রজাদের স্বার্থে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর। উদ্দীপকের শাসকও জনহিতকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তবে কিছু কিছু কর্মকাণ্ডে দুজন শাসকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের অটোমান সুলতান বায়েজিদ রাজ্যের বিধবা, এতিম, বয়স্কদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। ফিরোজশাহ তুঘলকও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান বায়েজিদ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক শিক্ষা ক্ষেত্রে সেরকম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যেটি উভয়

https://teachingbd24.com

শাসকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। ফিরোজ শাহ তুঘলক উদ্দীপকের শাসকের থেকে আরো বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চাকরি দফতর স্থাপন করেন। তিনি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসুলভ করার উদ্দেশ্যে ৩৬টি শিল্পকারখানা গড়ে তোলেন। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে দিওয়ান-ই-ইস্তহক প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্ববর্তী সময়ের সুলতানদের দেওয়া ঋণ মওকুফ করে দেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি বহু সংখ্যক সেচখাল খনন করেন। কৃষি ব্যবস্থায় ও বাণিজ্যে উন্নতি সাধনের জন্য আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে ফিরোজশাহ তুঘলকের কর্মকাণ্ডের যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ রাজা শামসির সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নততর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শুভ উদ্দেশ্য ও উচ্চাদর্শ থাকা সত্ত্বেও নিজের ধৈর্য ও মাত্রাবোধের অভাবে শামসিরের জীবন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. মালিক কাফুর সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শামসিরের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন দুটি পরিকল্পনার সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতার কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক।

খ মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দিনে খলজির দক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

আলাউদ্দিন খলজির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নির্ভীক সেনাপতি মালিক কাফুর ছিলেন একজন খোঁজা হিন্দু। সুলতান তার গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে 'মালিক-তাজ-উল-মালিক কাফুরি' উপাধিতে ভূষিত করেন। এক হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে ক্রয় করা হয়েছিল বলে তাকে হাজার দিনারি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা শামসিরের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও উন্নততর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা শামসির সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নতর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকও এমন প্রেক্ষাপটে কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রাজধানী স্থানান্তর ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি এমনই দুটি পরিকল্পনা।

সহজতর নজরদারি, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীকালে রাজধানীর নাম রাখেন দৌলতাবাদ। কিন্তু তার এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রাজভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি দোয়াবে কর বৃদ্ধি করেন। কারণ দোয়াব ছিল দিল্লি সালতানাতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এ ভূভাগে পানির অভাব না থাকায় এখানে শস্যের ফলন সর্বদা ভালো হতো। দিল্লির সুলতানরা সুযোগ বুঝে সর্বদা দোয়াবে কর বৃদ্ধি করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দোয়াবে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ বা অর্ধেক কর ধার্য করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এতেও দোয়াবের রায়তদের কোনো অসুবিধা হতো না, কারণ দোয়াব সত্যিই উর্বর ছিল। তবে তুঘলকের এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত করদানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক ক্লেশ বৃদ্ধি এবং সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উদ্দীপকে উক্ত পরিকল্পনা দুটিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ২৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ খুব কম বয়সেই ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল 'ক'; কালক্রমে নিজের যোগ্যতা ও মেধাগুণে নিজ দেশের শাসক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি। একসময় তিনি একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দানশীলতার জন্য তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি। এ বংশের মোট এগারো জন শাসক ছিলেন। তবে এদের সবাই দাস ছিলেন না। *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক কে ছিলেন? ১

খ. কুতুবউদ্দিন আইবেককে 'লাখবক্স' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' এর কৃতিত্বের সাথে তোমার পঠিত দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের কৃতিত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাজার কৃতিত্বের তুলনায় তোমার পঠিত শাসকের কৃতিত্ব অধিক প্রশংসার দাবিদার— যুক্তি দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা।

খ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা জনগণের মাঝে দান করতেন বলে তাকে লাখবক্স বা লক্ষ টাকা দানকারী বলা হয়।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন এক মহানুভব শাসক। তার বদান্যতা কিংবদন্তির পর্যায়ভুক্ত ছিল। আর দানশীলতায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। প্রতিদিন তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা জনগণের মাঝে দান করতেন। বদান্যতায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হাতেম।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর কৃতিত্বের সাথে দিল্লি সালতানাতের শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জনাব 'ক' একজন ক্রীতদাস ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের অবস্থানকে সুসংহত করতে তিনি বিভিন্ন শক্তিধর ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। দানশীলতার জন্য তিনি বিশেষ উপাধিও পান। সুলতান কুতুবউদ্দিনের জীবনেও এরূপ ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক নিজ যোগ্যতাবলে সুলতানের ঘোড়াশালের দায়িত্ব পান। ভারত বিজয়ের সময় তিনি ঘুরীর অন্যতম সেনাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। ১২০৬ সালে মুহাম্মদ ঘুরী মৃত্যুবরণ করলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কুতুবউদ্দিনকে দাসত্বের ছাড়পত্রসহ দিল্লির স্বাধীন সুলতানের স্বীকৃতি দেন। কুতুবউদ্দিন নিজের অবস্থানকে সুসংহত করার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি এবং কিরমানের শাসনকর্তা ইলদুজের ভগ্নিকে বিয়ে করেন। তিনি নিজের ভগ্নিকে সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচার সাথে বিবাহ দেন। উপরন্তু তিনি ইলতুৎমিশের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এছাড়া তার উদারতা, দানশীলতা এবং বদান্যতা সম্পর্কে সমকালীন ঐতিহাসিকগণ প্রশংসিত হয়ে তাকে 'লাখ-বক্স' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের 'ক' শাসক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাথে তুলনীয়।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' রাজা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ছিলেন। কিন্তু কুতুবউদ্দিন আইবেক বিজেতা ও ন্যায়বিচারক হিসেবে একজন সফল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই 'ক' শাসকের চেয়ে তিনি অধিক কৃতিত্বের দাবিদার বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, 'ক' রাজা একজন ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও প্রভুর মন জয় করে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তার ব্যর্থতা তার সফলতাকে মলিন করে দেয়। অপরদিকে, একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ও বিজেতা হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে একাধিক রাজ্য বিস্তৃতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের সামরিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে। তিনি দিল্লি, মিরাট, রণথম্ভোর, হানসি, বাদাউন ও কনৌজ দখল করে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। উপরন্তু তিনি বারানসি, কালিঞ্জর ও মাহোবা দখল করে তার সামরিক প্রতিভা ও সাহসিকতার অসামান্য পরিচয় প্রদান করেন। তার অসামান্য সামরিক প্রতিভার বলেই তিনি বিশ বছরের মধ্যে সিন্ধু থেকে গঙ্গা এবং হিমালয় থেকে বিন্ধ্যা পর্বত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র

https://teachingbd24.com

অধিপতি হতে সক্ষম হন। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক এবং ন্যায়বিচারক। রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালনের কৃতিত্ব তার অপরাপর গুণাবলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।
পরিশেষে বলা যায়, সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন সফল শাসক, বিজেতা ও ন্যায়বিচারক হিসেবে উদ্দীপকের 'ক' শাসক অপেক্ষা অনেক এগিয়ে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ সুলভ জেনারেল স্টোরের' ব্যবস্থাপনা ক্রেতাদের মুগ্ধ করে। এ দোকানে সকল পণ্য নির্ধারিত দামে বিক্রি হয়। দোকানের প্রবেশ পথের একধারে বড় একটি চার্টে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের মূল্য দেওয়া আছে। মূল্য তালিকার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য
আটা	প্রতি কেজি	৫.০০
সিদ্ধ চাল	প্রতি কেজি	৭.০০
ডাল দেশি	প্রতি কেজি	২০.০০
তেল সয়াবিন (বোতলজাত)	প্রতি লিটার	১০.০০

[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার তদারককারী কর্মকর্তার পদবি কী ছিল? ১
খ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুলভ জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা দেশের সবাই উপকৃত হয়েছিলেন? যুক্তি দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার তদারককারী কর্মকর্তার পদবি ছিল শাহানা-ই-রিয়াসত।

খ আলাউদ্দিন খলজি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে যে নীতি গ্রহণ করেন, ইতিহাসে সেটিই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নামে পরিচিত।
সুলতান আলাউদ্দিন খলজি অল্পবেতনে সৈন্য পোষণের লক্ষ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ ব্যবস্থায় তিনি পণ্যের বাজারদর নির্ধারণ করেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য তিনি পণ্য বাজার স্থাপন, বাজার পরিদর্শন ব্যবস্থা, নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করা এবং মজুদ নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

গ সুলভ জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনার সাথে পাঠ্যবইয়ের আলাউদ্দিন খলজির খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের জন্য মূল্য তালিকা নির্ধারিত রয়েছে। পাশাপাশি এই মূল্য তালিকা কার্যকর হচ্ছে কি না তার তদারকির জন্য সুব্যবস্থাও করা হয়েছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থা সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলেও বিদ্যমান ছিল।
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি। এ জন্য তাকে 'মহান রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুলতান দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, যেমন: গম, বার্লি, চাল, আটা, ডাল, তেল, সোডা ইত্যাদির মূল্য বেঁধে দেন। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ও বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ করেন। পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা সবাইকে দিল্লির সেহরা আদল নামক স্থানে বস্ত্র আমদানি করতে হতো। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সুলতান বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্ধারিত দামে দোকানদাররা বিক্রি করছে কি না তা নজরদারি করতেন। সুলতান তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম সকল ব্যবসায়ীকে রাষ্ট্রীয় দপ্তরে নাম রেজিস্ট্রি করার নির্দেশ দেন। সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়া ব্যবসায়ীদের কৃষকদের কাছ থেকে শস্যক্রয় নিষিদ্ধ করা ছাড়াও কঠোর হস্তে চোরা কারবার দমনের ব্যবস্থা করেন।

ঘ সুলতান আলাউদ্দিন খলজির উক্ত মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা দেশের সবাই উপকৃত হয়নি।
সুলতানের মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ওপর নয়, বরং ভয়ভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু সেনাবাহিনী ছাড়া জনগণের উন্নতি সাধিত হয়নি। মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শুধু দিল্লি ও তার আশপাশের এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যের সব অঞ্চলে এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়নি। দিল্লির সকল নাগরিক এ ব্যবস্থা দ্বারা উপকৃত হলেও খাদ্যশস্যের মূল্য নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছিল। ফলে সুলতানের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ব্যবস্থার অপমৃত্যু হয়। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তার এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রশংসা করেছে। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রশংসা করে বাজারে শস্যের অপরিবর্তিত মূল্যকে সে যুগের অন্যতম বিস্ময় বলে মনে করেন। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, আলাউদ্দিন খলজির বাজার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মধ্যযুগে রাষ্ট্রনীতি অঙ্গনে অন্যতম বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। তাই বলা যায়, আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সব ক্ষেত্রে রাজ্যের সবাই উপকৃত না হলেও প্রত্যেক প্রজাই কোনো না কোনো দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছিল। কেননা এই ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছিল, খাদ্য সমস্যার সমাধান ও জনগণের জীবনমানের উন্নতি সাধিত হয়েছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বসাধারণের উপকার সাধিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৪০ 'S' প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ে জানতে পারে যে, তুঘলক বংশের একজন শাসনকর্তা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কিছু উচ্চাভিলাষী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষে উক্ত শাসক রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। বিদ্রোহীদের দমন করতে খোরাসান, কারাচিলে (চীন) অভিযান প্রেরণ এবং তাম্রমুদ্রার প্রচলন, কর বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগী হন। বস্তুত দিল্লির সুলতানের মধ্যে তিনি সর্বাধিক বিদ্বান ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কুতুবমিনার কোথায় অবস্থিত? ১
খ. প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'S' ভারতের ইতিহাসের কোন শাসনকর্তা সম্পর্কে জানতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসনকর্তার গৃহীত মহাপরিকল্পনাসমূহ দিল্লির সালতানাতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল? মতামত দাও। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুতুবমিনার দিল্লিতে অবস্থিত।

খ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রচলিত সোনা ও রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে যে নতুন মুদ্রা প্রচলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেটিই তাম্রমুদ্রা প্রচলন পরিকল্পনা নামে পরিচিত।
মুহাম্মদ বিন তুঘলক তার রাজকোষের ঘাটতি দূর করা, চতুর্দশ শতকে ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাব, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং লেনদেন ও বিনিময় সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ন্যায় তাম্রমুদ্রাকেও বিনিয়োগ প্রতীকী মুদ্রা বলে ঘোষণা করেন। তবে প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের ফলাফল ছিল মারাত্মক। এ ব্যবস্থায় জনগণ প্রচুর জালমুদ্রা তৈরি করে সেগুলো দিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে থাকে। ফলে মুদ্রার মান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

গ উদ্দীপকের 'S' প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উচ্চাভিলাষী শাসনকর্তা মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে জানতে পারেন।
উদ্দীপকের 'S' ইতিহাস অধ্যয়ন করে একজন তুঘলক শাসকের কিছু উচ্চাভিলাষী মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন। উক্ত শাসক শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। তাছাড়া তিনি বিদ্রোহ দমনে অভিযান প্রেরণ করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পদক্ষেপ নেন। এ সকল তথ্য মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসননীতির সাথে সম্পর্কিত।
মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করেই রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেছিলেন। দেবগিরিকে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে পরিবার-পরিজন, আমির-ওমরাহ, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং দিল্লির জনগণসহ দেবগিরিতে গমন করেন। তিনি রাজ্যবিস্তারের

https://teachingbd24.com

উদ্দেশ্যে খোরাসান ও কারাচিলে অভিযান পরিচালনা করেন। তার এ দুটি অভিযানই ছিল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তাছাড়া সুলতান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। অবশ্য প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি; বরং এর ফলে মুদ্রার মান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এই ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং শাসনব্যবস্থাকে সুগঠিত ও কার্যক্ষম করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানই ছিল এই কর বৃদ্ধির কারণ। উদ্দীপকে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের এ কার্যক্রমগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ দিল্লি সালতানাত পতনের জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক গৃহীত মহাপরিকল্পনাসমূহ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অপরিকল্পিত উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ এবং সাম্রাজ্য শাসনে অক্ষমতা দিল্লি সালতানাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা ও শিথিলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অরাজকতা ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সালতানাতের ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে ওঠে। এসময়ে ক্রমাগতভাবে সালতানাতের সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সালতানাতের পতনোন্মুখতা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে, এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় বিভিন্ন কারণেই, যেমন দিল্লির জনগণ নতুন পরিবেশে ও দেবগিরির আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি, দিল্লির মুসলমানদের হিন্দু অধ্যুষিত দেবগিরিতে বসবাসে অসম্মতি ছিল এবং মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় উত্তর ভারতে সুলতানের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা এবং তদাঞ্চলে সুলতানের আধিপত্যের শিথিলতা। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মোরল্যান্ডের বলেন, তার কার্যসমূহ ছিল একটি অসংগতির স্তূপ।

নিরপেক্ষ বিচারে দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলককে বিশেষভাবে দায়ী করা অনৈতিহাসিক প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। কেননা তার রাজত্বকালে বিভিন্ন বিদ্রোহ সংঘটিত হয় সত্য, তবে প্রজাসাধারণ তার প্রতি পুরোপুরি বিরূপ ছিল তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন ▶ ৪১ এশিয়া মাইনরে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের হত্যা ও লুটতরাজ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এশিয়া ইউরোপের মধ্যকার ব্যবসায়-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে ইংল্যান্ড রাজ রিচার্ড গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে দমন করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে রাজা রিচার্ড মোঙ্গলদের সাথে যৌথভাবে গুপ্তঘাতক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বহুলাংশে সফল হন। গুপ্তঘাতকদের সাথে রিচার্ডের সন্ধি স্থাপনের ফলে তারা ঐ অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি পরিচালনা থেকে বিরত থাকে।

[ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

ক. দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. চল্লিশ চক্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের সাথে বলবনের শাসনামলের কোন সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইংল্যান্ড রাজা রিচার্ডের অভিযানের ফলাফলের সাথে বলবনের দস্যু বিরোধী অভিযানের ফলাফলের বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।

খ সৃজনশীল ৩৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের সাথে বলবনের শাসনামলের মেওয়াটি দস্যু সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকত, যা কিনা অনেকটা মেওয়াটি দস্যুদের চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ। মেওয়াটের পার্বত্য অধিবাসী দস্যুরা দিল্লি ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে লুটতরাজ, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদি শুরু করলে জনজীবনে মারাত্মক আতঙ্ক দেখা দেয়। এসময় ব্যবসায়ী ও পথচারী কেউই নিরাপদ বোধ করত না। ঈশ্বরী প্রসাদের বর্ণনা মতে, তাদের ঔদ্ধত্য এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আসর নামাজের পর রাজধানী দিল্লির পশ্চিম ফটক বন্দ করে দেওয়া হতো। বলবন জনগণের জানমাল ও দিল্লির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেওয়াটি দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। দস্যুদের অভয়ারণ্য দিল্লির আশপাশের বড় বড় জঙ্গলগুলো কেটে পরিষ্কার করা হয়। দিল্লির চতুর্পাশে সুরক্ষিত সামরিক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ভবিষ্যতে তাদের উপদ্রব রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থানে পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হয়। অনেক মেওয়াটি দস্যুকে হত্যা করা হয়। এভাবে বলবন কঠোর হস্তে মেওয়াটি পার্বত্য দস্যুদের দমন করেন, যা উদ্দীপকের গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের দমনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ইংল্যান্ড রাজা রিচার্ডের অভিযানের ফলাফলের সাথে বলবনের দস্যু বিরোধী অভিযানের ফলাফলের বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মেওয়াটি দস্যুদের দমনে অন্য কোনো শক্তির সাহায্য কামনা করেননি। বলবনের Blood and Iron Policy এর মতোই তিনি দস্যুদের প্রতি নমনীয় হননি এবং কোন সন্ধি করেননি। বলবন অসংখ্য মেওয়াটি দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করেন। প্রচুর পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন ও কঠোর নীতির মাধ্যমে তিনি দস্যুদের দমন করেন। যা উদ্দীপকের গৃহীত পদক্ষেপ থেকে কিছুটা ভিন্ন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে– এশিয়ার মাইনরে (বর্তমান তুরস্ক) গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের হত্যা ও লুটতরাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের প্রতিকারকল্পে ইংল্যান্ড রাজা রিচার্ড মোঙ্গলদের সাথে যৌথভাবে গুপ্তঘাতক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বহুলাংশে সফল হন।

গুপ্তঘাতকদের সাথে রাজা রিচার্ডের সন্ধি স্থাপনের ফলে তারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে (এশিয়া মাইনর) দস্যুবৃত্তি পরিচালনা থেকে বিরত থাকে। অপরদিকে মেওয়াটি দস্যুদের প্রতি কঠোর নীতির কারণে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, মধ্যযুগের গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় এর বিস্তৃতি ছিল এশিয়া ও ইউরোপ এর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। তাদের কর্মতৎপরতাও বহু বছর টিকে ছিল। কিন্তু মেওয়াটি দস্যুদের কর্মতৎপরতা অত দীর্ঘ হতে পারেনি। বলবন তাদের অঙ্কুরেই বিনাশের পন্থা অবলম্বন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৪২ বিদেশ থাকা বন্ধু জিম তার বন্ধু সিমুদের বাড়িতে এসে তার সাথে পাইকারি বাজারে যায়। বাজারে প্রবেশ মুখেই তার চোখে পড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্বলিত একটি তালিকা বোর্ড। তালিকা অনুযায়ী চালের মূল্য ৩০ টাকা কেজি হওয়াসত্ত্বেও বাজারে চালের মূল্য ৪০ টাকা। বিস্মিত হয়ে জিম খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সরকারের সার, বীজ ইত্যাদিতে ভর্তুকির পরিমাণ কম হওয়ায় চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম তালিকা থেকে অনেক বেশি।

[ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

ক. লাখবক্স কার উপাধি ছিল? ১
খ. সুলতান রাজিয়া কে ছিলেন? ২
গ. জিমের দেখা মূল্য তালিকার সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সিমুদের দেশের সরকার কীভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক এর উপাধি ছিল লাখ বক্স।

খ সুলতান রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের কন্যা।

ইলতুৎমিশের পুত্রদের কেউই সুলতান পদের যোগ্য ছিলেন না এজন্য সুলতান তাঁর কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তুর্কি আমিরদের এটা পছন্দ ছিল না। তাই তারা ইলতুৎমিশের পুত্র ফিরোজকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু দিল্লির অধিবাসীদের সমর্থনে রাজিয়া ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করে ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি বাহরামের সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পলায়নকালে জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্তৃক ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের দিল্লি সালতানাতের সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই নানামুখী সংস্কার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কার্যগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। মূলত আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতি বিধানের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকে একটি বাজারের দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিশীল অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে না। এ রকম অবস্থার প্রেক্ষিতেই সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আলাউদ্দিন খলজি খাদ্যশস্য সুলভমূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন— গম, বার্লি, চাল, চিনি, আটা, ডাল, তৈল, সোডা ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করে দেন। এছাড়া তিনি বস্ত্র, পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যের তালিকা করে দেন। আলাউদ্দিন খলজি কেবল দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি দ্রব্যাদির চাহিদা অনুসারে সরবরাহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে খাদ্যঘাটতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লির উপকণ্ঠে এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলেন। তিনি লোভী ব্যবসায়ীদের মজুদদারি নিরোধে তাদের নামের তালিকা করে জরিমানা ও পণ্য বাজেয়াপ্ত করাসহ নানা ধরনের শাস্তিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বস্ত্র, পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যের তালিকা করে দেন। উদ্দীপকে এরকমই একটি মূল্য তালিকার কথা বলা হয়েছে, যা আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত বহন করছে।

ঘ উদ্দীপকে সিমুদের সরকারকে আলাউদ্দিন খলজির মতো মুদ্রাস্ফীতি রোধ, গুদামঘর নির্মাণ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দমনের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণে পণ্য বাজার স্থাপন, বাজার পরিদর্শন ব্যবস্থা, নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করা, মজুত নিরোধব্যবস্থা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। উদ্দীপকের সিমুদের সরকারও এরূপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সফল হতে পারেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণে সিমুদের সরকারকে প্রথমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এছাড়া খাদ্যঘাটতি পূরণ করার জন্য শস্যাগার বা গুদামঘর নির্মাণ করার মাধ্যমে তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা যাতে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তারা লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধের মাধ্যমেও এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারে। পণ্যদ্রব্য যাতে সময়মতো ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা যায় সেজন্য পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া বাজারের ফটকা ব্যবসায়ীদের দমন করে সিমুদের সরকার এ নীতি কার্যকর করতে পারেন। পণ্যদ্রব্য মজুত করে মজুতদাররা যাতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যও তারা কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে সিমুর দেশের সরকারকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতোই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েই ফায়িম সাহেব সমাজ উন্নয়ন ও তাকে সহযোগিতার জন্য নিজ বংশ ও দলের যোগ্য কতিপয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি 'আত্মীয় সভা' নামক সংগঠন তৈরি করেন। উক্ত সংগঠনটি তার আমলে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সংগঠনটির সদস্যদের ব্যক্তিগত লোভ ও অভ্যন্তরীণ কলহের কারণে তারা উগ্র হয়ে ওঠে। তাদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্য পরবর্তী চেয়ারম্যান রেজাউল হক অতি নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের দমনসহ উক্ত সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটান। ফলে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শান্তি ও উন্নতি অব্যাহত থাকে। *[ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]*

ক. কুতুব মিনার কার নামে নির্মিত হয়? ১

খ. বন্দেগান-চেহেলগান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আত্মীয় সভার সাথে ইলতুৎমিশের যে সংগঠনের মিল আছে তার স্বরূপ তুলে ধর। ৩

ঘ. রেজাউল সাহেবের পদক্ষেপ সুলতান বলবনের কঠোর নীতিরই প্রতিচ্ছবি— মূল্যায়ন কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুতুব মিনার প্রখ্যাত সাধক কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামে নির্মিত হয়।

খ 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' অর্থ চল্লিশ আমির দল।

সুলতান ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের যোগ্য শাসকদের ধারাবাহিক আগমন নিশ্চিতকরণের জন্য ৪০ জন সাহসী, যোগ্য ও দূরদর্শী ক্রীতদাসকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন, যা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। গিয়াসউদ্দিন বলবন এর সদস্য ছিলেন।

গ সৃজনশীল ১৯ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ আমাদের দেশে সামাজিক অপরাধের ধারা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। যেমন— শিশু ও নারী নির্যাতন, গৃহপরিচারিকা নির্যাতন, মাদকসক্ত, মাদক ব্যবসা ইত্যাদি দেশে আইন রয়েছে তা প্রয়োগে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অথচ দিল্লির এক সুলতান এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যে, তার সামনে কেউ চাকরের গায়েও হাত তোলার সাহস পেতনা। উক্ত সুলতান রাজ দরবারের অমাত্য কর্মচারীদের প্রভাব বিনষ্ট করেছিলেন। তাদের গতিবিধির উপর কড়া নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। তার Blood & Iron Policy ইতিহাস খ্যাত নীতি ছিল। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. চল্লিশ চক্র কে গঠন করেন? ১

খ. Blood & Iron Policy কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে দিল্লির কোন সুলতানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অপরাধ দমন ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় উক্ত সুলতানের গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসার দাবিদার— উক্তিটির পক্ষে মতামত দাও। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান ইলতুৎমিশ 'চল্লিশ চক্র' গঠন করেন।

খ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন Blood & Iron Policy গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে তুর্কি অভিজাতদের ষড়যন্ত্র এবং বহিরাক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সুলতান বলবন ষড়যন্ত্রপরায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও শত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে আলোচ্য বিষয়ে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক শাসকের অস্তিত্ব রয়েছে। যারা ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে নিজের যোগ্যতায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। তারা শাসন ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রের প্রভাবশালীদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল অনিয়ম দূর করে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করেছেন। এমনই একজন শাসক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। উদ্দীপকেও তার এ বিষয়গুলোর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলবনের কথা বলা হয়েছে যিনি রাজদরবারের অমাত্য কর্মচারীদের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করে তাদের গতিবিধির ওপরও কড়া নজরদারী ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। কেননা তিনিই অভিজাতদের চক্র অর্থাৎ চল্লিশ চক্র কে দমন করেন। ইলতুৎমিশের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে রাজ্য প্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এরা

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। বলবন তাদের দমন করার উদ্দেশ্যে তাদের বিশেষ সুবিধা বাতিল, অবাধ মেলামেশা বন্ধ, রাজদরবারে হাসি-ঠাট্টার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুলতান তাদের জায়গিরদারি বাতিল করে এবং সামান্য অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে তাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলোর ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ অপরাধ দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় উক্ত সুলতান অর্থাৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রশংসার দাবিদার— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দিল্লির একজন শাসকের কথা বলা হয়েছে, যার সমানে কেউ চাকরের গায়েও হাত তোলার সাহস পেত না। এখানে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এখানে সুলতানের ন্যায়বিচারের দিকটিই ফুটে উঠেছে। কেননা তার ন্যায়বিচারের জন্য লোকে এত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকত যে, ভৃত্য ও ক্রীতদাসের প্রতিও কেউ দুর্ব্যবহার করতে সাহস পেত না। এ বিষয়টি ছাড়াও তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সুলতান বলবন সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার অরাজকতা ও বিদ্রোহ দমনে তৎপর ছিলেন। তার শাসনামলের প্রথম দিকে মেওয়াটি নামক রাজপুত দস্যুগণ পথিকদের সর্বস্ব অপহরণ, পাইকারিভাবে নরহত্যা, লুটতরাজ এবং অত্যাচার কার্য চালিয়ে জনজীবন বিপন্ন করে তোলে। এ কারণে সুলতান শত-সহস্র মেওয়াটিদের হত্যা করে রাজধানী দিল্লি এবং তার উপকণ্ঠে শান্তি স্থাপন করেন। এ সময় দোয়াবের হিন্দুরাও দোয়াব অঞ্চলে বেআইনি কার্যকলাপ পরিচালনা করে জনজীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। এ অবস্থার নিরসনে বলবন কাম্পিল, পাতিওয়ালা ও ভোজপুরে অবস্থিত তাদের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো দখল করে সেখানে দুর্গ তৈরি করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করেন। এছাড়াও তিনি উপজাতীয়দের বিদ্রোহ দমনসহ অন্যান্য ছোটখাটো বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলাও যথাসময়ে দমন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের অপরাধ দমন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রশংসার দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ শাসক ইসমাইল গাজী আদর্শবাদী সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সেই সাথে তিনি ছিলেন দার্শনিক, ন্যায়বিচারক, দয়ালু, উদার, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান ও সম্প্রসারণ এবং সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন। *[সরকারি আকবর আলী কলেজ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ]*

ক. ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১
খ. 'চল্লিশ চক্র' বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক ইসমাইল গাজীর শাসনব্যবস্থায় সুলতানি আমলের একজন শাসকের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে তা মূল্যায়ন কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের শাসনকালে তাঁর রাষ্ট্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হয়েছে— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক।

খ সুলতান ইলতুৎমিশের সময়কার (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) ক্রীতদাসদের মধ্যে যে চল্লিশজন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য ক্রীতদাস ছিল তাদের নিয়ে গঠিত চক্রকে চল্লিশ চক্র বলা হয়।

ইলতুৎমিশের সময় এ চল্লিশ জনকে নিয়ে গঠিত হয় 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান'। ইলতুৎমিশের সময় তারা শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইলতুৎমিশ পরবর্তী দুর্বল সুলতানদের (রুকন উদ্দিন ফিরোজ শাহ, মইজউদ্দিন বাহরাম প্রমুখ) শাসনামলে তারা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ইসমাইল গাজীর শাসনব্যবস্থায় সুলতানি আমলের শাসক শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ইসমাইল গাজী এমন একজন শাসক যিনি ধার্মিক, ন্যায়বিচারক, দয়ালু, উদার, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান ও সম্প্রসারণ ছাড়াও তিনি তার রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুলতানি আমলের শাসক ইলতুৎমিশও এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

ইলতুৎমিশ এক অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন। তবে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতেও তিনি বিচলিত হননি। তিনি আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল দলনেতা চেঙ্গিস খানের আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে দিল্লি সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিশই সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি বিদ্রোহ দমন ও সামরিক অভিযান নিয়ে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকলেও শিল্প ও ললিতকলার প্রতি তার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রে সুষ্ঠু, নির্ভীক ও ন্যায়ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের ন্যায় ইলতুৎমিশও একটি কার্যকর শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান ইলতুৎমিশকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি' বলাকে আমি সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক বলে মনে করি।

১২১১ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ 'শামসুদ্দিন' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লি সালতানাতের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও ইলতুৎমিশকে নিঃসন্দেহে প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের 'সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি' বলা যেতে পারে।

উক্ত শাসক তথা সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশের শাসনকালে তার রাষ্ট্র সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল।

ইলতুৎমিশ শিল্পসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি সামরিক অভিযান ও বিদ্রোহ দমনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করলেও শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ও জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর এবং দরবারে আশ্রয়দান করতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

সুলতান ইলতুৎমিশের রাজসভায় বহু কবি, সাহিত্যিক, বিদ্বান ও সাধক-তাপসেরা সমবেত হতেন। জমিউল হিকায়েতের রচয়িতা নূর উদ্দীন মাহমুদ উফী এ সময়ে দিল্লিতে ছিলেন। মিনহাজ উস সিরাজের বর্ণনায় জানা যায় যে, সুলতান ধার্মিক, দয়াবান ও জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ঐতিহাসিক আল বেরুনির মতে, তার রাজত্বকাল সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবময় ছিল। তার সময় একটি কলেজসহ অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। তিনি একজন উদার সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং তার শাসনামলে রাজধানী দিল্লি সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হয়। মুসলিম ও ভারতীয় শিল্পকলার সংমিশ্রণে তার সময় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি কুতুব মিনার নির্মাণসহ অনেক মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একজন উদার সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বস্তুত দিল্লি সালতানাতের চরম সংকটকালে ইলতুৎমিশের ন্যায় সুযোগ্য শাসকের আবির্ভাব না হলে দিল্লি সালতানাত টিকত কি না সন্দেহ ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইলতুৎমিশ সংস্কৃতিমনা শাসক হিসেবে সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যা ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ সুলতানা নাসরিন বানু একজন বিদুষী মহিলা। বিশ্ব ইতিহাসে তিনিই সর্ব প্রথম মুসলিম নারী শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এতে তিনি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও রাজ কর্মচারীদের বিরাগভাজন হন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. সুলতান রাজিয়ার পিতার নাম কী? ১
খ. কুতুবমিনার কোথায় এবং কার নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতান নাসরিন বানুর সাথে তোমার পঠিত কোন নারী শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থান করো। ৩
ঘ. 'তুমি কি মনে কর উক্ত নারী শাসক তাঁর যুগ অপেক্ষা অনেক উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

https://teachingbd24.com

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতানা রাজিয়ার পিতার নাম ইলতুৎমিশ।

খ কুতুবমিনার দিল্লিতে অবস্থিত কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি।
১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। এটি তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার। মিনারটি ইসলামের বিজয়গাঁথা বিশ্বদরবারে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়।

গ উদ্দীপকে সুলতান নাসরিনের সঙ্গে দিল্লির সালতানাতের শাসক সুলতান রাজিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে।
পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা চিরকালই অবহেলিত হয়ে আসছে। এই অবহেলার মাঝেও নারীরা স্বীয় যোগ্যতাবলে সমাজের উন্নয়নে অংশীদার হয়েছে। নানা বাধার সম্মুখীন হয়েও তারা সফল হয়েছে; সকল সমালোচনার উচিত জবাব দিয়েছে। উদ্দীপকের সুলতান নাসরিন এবং সুলতান রাজিয়া এমনই দুজন নারী ব্যক্তিত্ব।
সুলতান রাজিয়া ছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী শাসক। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তুর্কি অভিজাত শ্রেণির সমালোচনার মুখোমুখি হন। তারা নারী বলে তাকে শাসনকার্যে অনুপযোগী ও অদক্ষ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু নিজ মেধা-গুণ, তেজস্বিতা আর কর্মদক্ষতার গুণে তিনি সকল বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রতিহত করে রাজ্যের উন্নতি সাধন করেন। সুলতান রাজিয়া একইভাবে ১২৩৬ থেকে ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সিংহাসনে বসে সুলতানি শাসন পরিচালনা করেন। তার ৪ বছরের রাজত্বকাল মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ প্রতিহত করেন। তিনি উপমহাদেশের ইতিহাসে শুধু প্রথম মহিলা শাসনকর্তা নন বরং তার সাহসিকতা, দক্ষতা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তুর্কি জাতির সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। তার উদার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বস্তুত মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকে সুলতান রাজিয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত নারী শাসক অর্থাৎ সুলতান রাজিয়া তার যুগ অপেক্ষা অনেক উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন।
ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র নারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। শাসনকার্যে চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। তিনি তার প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুর্কি অভিজাত শ্রেণি নারী বলে সুলতান রাজিয়ার এ সকল কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সুলতান রাজিয়া তার কর্মকাণ্ডে প্রমাণ করে গেছেন যে তিনি তার যুগ অপেক্ষা উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন।
সালতানাতের এক সংকটকালে সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উস-সিরাজের হিসেব মতে, ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একজন নারী। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেন। মিনহাজ উস সিরাজ তাকে মহান নৃপতি, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও মহানুভব বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সার্বভৌম নৃপতির প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এ.বি.এম. হবিবুল্লাহর মতে, সাহসিকতা ও অদম্য দৃঢ়তাই (Courage and unflincing determination) ছিল রাজিয়ার আদর্শ। চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও যোগ্যতাই তার ক্ষমতা ও অস্তিত্বের চাবিকাঠি ছিল। সুলতান রাজিয়া প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন, অশ্বারোহণে জনসমক্ষে বের হন এবং প্রকাশ্যে দরবার পরিচালনা করেন। অধ্যাপক কে.এ. নিজামী যথার্থই বলেছেন, "অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, তিনি ছিলেন ইলতুৎমিশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যোগ্যতম।"
পরিশেষে বলা যায়, সুলতান রাজিয়া ছিলেন অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি ই-কমার্স কোম্পানি হচ্ছে amazon.com ওয়াশিংটনের সিয়াটলে এরসদর দপ্তর অবস্থিত। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ইন্টারনেটভিত্তিক খুচরা বিক্রেতা। এখানে যাবতীয় খাদ্যশস্য যেমন: খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, আসবাবপত্র, গয়না, যাবতীয় ইলেকট্রনিকস গুডস প্রভৃতির মূল্যের একটি তালিকা ট্যাকিং করা আছে। ক্রেতা তাঁর ইচ্ছামতো তালিকায় প্রদর্শিত মূল্য পরিশোধ করে পছন্দের দ্রব্যটি ক্রয় করে থাকে। ফলে ওয়াশিংটনের সরকারি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সমস্যা সমাধান এবং জনগণের জীবন মানের উন্নতি বিধানে সক্ষম হয়েছে।

[লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, লক্ষ্মীপুর]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে খলজি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. খলজিদের পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থার ফলাফল এবং উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ডের ফলাফল একই ছিল? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে খলজি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ তুর্কি মামলুক শাসনের অবসানের পর ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে যে রাজবংশের শাসনকাল শুরু হয় সেটাই খলজি বংশ নামে পরিচিত।
খলজিদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য বিদ্যমান। ভি.এ. স্মিথের মতে, খলজিরা আফগান বংশোদ্ভূত। তবে অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন খলজিরা আফগান নয়, বরং তুর্কি। তুর্কিরা জাতিতে তুর্কি এবং ইলবারি তুর্কিদের ন্যায় তাদের এ আদি নিবাস তুর্কিস্থান। মিনহাজ উস সিরাজ খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালাল উদ্দিন খলজিকে চেঙ্গিস খানের জামাতা কালিজ খানের উত্তর পুরুষ বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, এ কালিজ থেকে খলজি নামের উৎপত্তি।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থার ফলাফল এবং উক্ত শাসক অর্থাৎ আলাউদ্দিন খলজি প্রবর্তিত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফল একই ছিল।
আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন মহান রাজনৈতিক ও অর্থনীতিবিদ। তার প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। আর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল সুলতানের শাসন ব্যবস্থার দক্ষতার প্রতীক। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুলতান তার বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণের ব্যবস্থা করেন।
উদ্দীপকের ই-কমার্স কোম্পানির দ্রব্যমূল নিয়ন্ত্রণের ও পরিচালনার মাধ্যমে ওয়াশিংটনের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। খাদ্যদ্রব্যের সমস্যা সমাধান এবং জনগণের জীবন-মানের উন্নতি বিধান করেছে। অনুরূপভাবে আলাউদ্দিন খলজি কঠোর নজরদারি, কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এবং জনগণের সহযোগিতায় তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করেন। রাজ্যের খাদ্যসমস্যার সমাধান এবং জনগণের জীবনমানের উন্নতি বিধান করেন। সর্বোপরি সুলতানের পক্ষে অল্প বেতনে এক বিশাল বাহিনী প্রতিপালন করতে সক্ষম হন।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ই-কমার্স কোম্পানির মূল্য ব্যবস্থার ফলাফলের ন্যায় আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফলও একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ সিরাজ সাহেব হাশিমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে সম্প্রতি দায়িত্ব নিয়ে কয়েকটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিকল্পনা হলো প্রশাসনিক কেন্দ্র যাদবপুর থেকে গয়েশপুরে স্থানান্তর, ইদ্রাকপুরে বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, অতিরিক্ত কর ধার্য, পার্শ্ববর্তী চেয়ারম্যানের সাথে প্রতিযোগিতা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার নতুন পদ্ধতি প্রচলন। তার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ থাকা সত্ত্বেও সময়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী ও অগ্রবর্তী হওয়ায় তা ব্যর্থ হয়।

[চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]

https://teachingbd24.com

ক. সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১
খ. তৈমুর লঙ কে ছিলেন? ২
গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাগুলো তোমার পঠিত কোন শাসকের পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের যেকোনো একটি পরিকল্পনা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খ ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি গোত্রের বারলাম শাখায় মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার কেশের (সেবজার) নামক স্থানে তৈমুর লঙ জন্মগ্রহণ করেন।

তৈমুর লঙের পিতা আমির তুরগে (Turgay) প্রখ্যাত চাঘতাই তুর্কি উপজাতি বারলাম শাখার দলপতি ছিলেন। তিনি সিস্তানের শাসনকর্তা জালালউদ্দিন মাহমুদের বিশ্বাসঘাতকতায় একটি পা ও একটি হাত হারান। তাই ইতিহাসে তিনি খোঁড়া তৈমুর নামেও পরিচিত। তৈমুর ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করে আমির উপাধি গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে (১৪০৫) তিনি অন্তত ২৭টি রাজ্য (মধ্য এশিয়া, পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, ভারতবর্ষ, অটোমান সাম্রাজ্য, রাশিয়া প্রভৃতির বিস্তীর্ণ অঞ্চল) স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

গ সৃজনশীল ১৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ জনাব মহিউদ্দিন একজন জনদরদি শাসক ছিলেন। প্রজা সাধারণের জীবনযাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য তিনি একটি অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। এ কারণে তাকে মহান রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ বলা হয়। তাঁর এ সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। দ্রব্যমূল্যের দাম সঠিক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি বাজার পরিদর্শক নিয়োগ দেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি।
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

ক. খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. দিল্লি সালতানাতের পতনের দুটি কারণ উল্লেখ করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে ভারতবর্ষের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতাই তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির ব্যর্থতার জন্য দায়ী— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি।

খ দিল্লি সালতানাতের পতনের পেছনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় কারণই দায়ী ছিল।

দিল্লি সালতানাতের পতনের অন্যতম কারণ ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের শিথিলতা। বিশাল দিল্লি সালতানাতে প্রদেশগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় শাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্যদিকে সুলতান ইব্রাহীম লোদির প্রশাসনিক দুর্বলতা, আফগান আমিরদের ক্ষমতা খর্ব করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি কারণে বীতশ্রদ্ধ অভিজাতবর্গের আমন্ত্রণে বাবর দিল্লি আক্রমণ করলে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি পরাজিত হন এবং দিল্লি সালতানাতের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে ভারতবর্ষের শাসক আলাউদ্দিন খলজির মিল রয়েছে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা, জনসাধারণের সুবিধা এবং সাম্রাজ্যের সর্বাধিক উন্নতির জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খলজি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পাশাপাশি দ্রব্যাদির বাজার দরও নির্দিষ্ট হারে বেধে দেন। এ ধরনের উদ্যোগ ব্যবসায়ীদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের পথকে বন্ধ করে এবং প্রজাসাধারণের জন্য সুফল বয়ে আনে; যার প্রতিফলন উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনদরদি শাসক জনাব মহিউদ্দিন ব্যবসায়ীদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অসৎ উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করতে দ্রব্যমূল্যের তালিকা তৈরি করে বিভিন্ন স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। যার ফলে প্রজাসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে শুরু করে। একইভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা এবং কম বেতনে সেনাবাহিনী পোষণসহ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সকল খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। তিনি দ্রব্যাদির চাহিদা অনুসারে সরবরাহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। সুলতান খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে বস্ত্র, পশু এবং অন্য দ্রব্যাদির মূল্যও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার সাথে আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার সুস্পষ্ট মিল রয়েছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ আলাউদ্দিন খলজির দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের দুর্বলতাই তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির ব্যর্থতার জন্য দায়ী— কথাটি যথার্থ নয়।

আলাউদ্দিন খলজির শাসনব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে সম্ভবত তিনিই একমাত্র শাসক, যিনি একটি বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। তবে এ ব্যবস্থা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। উদ্দীপকের মহিউদ্দিনের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের শাসক মহিউদ্দিন প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য তিনি একটি অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। যা আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একটি কালোত্তীর্ণ ব্যবস্থা হলেও এটা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়নি। এ ব্যবস্থা ভয়-ভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অধ্যাপক শ্রীরাম শর্মা ও সরণের মতে, তার এ মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পতন ঘটে। অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেন্দ্রের ন্যায় ব্যবস্থা কার্যকরী হতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে দাম নির্ধারিত করে দেয়ায় কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তার দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের অসফলতার ফলে নয়, বরং সর্বসাধারণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায় এ নীতি সফল হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৫০ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ক্লাসে দিল্লি সালতানাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সায়েদুর স্যার এমন একজন শাসকের কথা উল্লেখ করেন যিনি শৈশবে দাস হিসেবে বিক্রি হয়েও নিজ যোগ্যতা ও গুণাবলির দ্বারা পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাতের শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর গৌরবের সাথে রাজত্ব করেন। তিনি নিজেকে 'আল্লাহর বান্দাদের সাহায্যকারী' বলে মনে করতেন। স্যার আরও বলেন, "তিনিই ছিলেন মূলত দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা"।
[মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়]

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. দেওয়ান-ই-বন্দেগান কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সায়েদুর স্যার যে শাসকের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন দিল্লির সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে তার অবদান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সায়েদুর স্যারের শেষোক্ত উক্তির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুব উদ্দিন আইবেক।

খ দিওয়ান-ই-বন্দেগান হলো দাস-দাসীদের কল্যাণের জন্য সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্ত্রণালয়।

সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের শাসনামলে দাস প্রথার বিস্তার ঘটে। এর মধ্যে ৪০,০০০ হাজার জন রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত ছিল। এ বিশাল দাস-বাহিনীর তদারকির জন্য তিনি দিওয়ান-ই-বন্দেগান নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

https://teachingbd24.com

গ সায়েদুর স্যার যে শাসকের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন তিনি সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ। দিল্লির সালতানাত সুদৃঢ়করণে তার অবদান সর্বাধিক।
ইলতুৎমিশ প্রাথমিক জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের পর দিল্লি সালাতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের মধ্যেও এ প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে।
সায়েদুর স্যার এমন একজন শাসকের কথা বলেন যিনি ক্রীতদাস হয়েও নিজ বুদ্ধি দ্বারা সিংহাসনে আরোহণ করেন। একইভাবে শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশও ছিলেন যুদ্ধবিদ্যাসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পাঞ্জাবের খোকার বিদ্রোহ দমনে মুহাম্মদ ঘুরীকে প্রভূত সহায়তার পুরস্কার হিসেবে সুলতানের নির্দেশে আইবেক তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন এবং 'আমির উল উমারাহ' পদবি প্রদান করে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যা, বারানসি, বাদাউন সিওয়ালিকসহ দিল্লিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের আক্রমণকে প্রতিহত করে তিনি দিল্লি সালতানাতকে বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর সাহায্যকারী মনে করতেন। তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে ইলতুৎমিশের ২৫ বছর রাজত্ব করেন। উদ্দীপকে সুলতান এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই বলা হয়েছে।।

ঘ হ্যাঁ সায়েদুর স্যারের শেষোক্ত উক্তি— "সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা" এর সাথে আমি একমত।
১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কুতুবউদ্দিনের ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে মাত্র দু দশকের মধ্যে ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন ইলতুৎমিশ। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি ছিলেন সুচতুর, নির্ভীক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। একমাত্র আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষা করেন। তিনি সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ভিত্তিও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন।
সুলতান ইলতুৎমিশ বন্দেগান-ই চেহেলগান নামক রাজকর্মচারী নিযুক্ত করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ভিতকে শক্তিশালী করেন। অন্যদিকে বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে দমন করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তি দান করেন। এ কারণে তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। 'বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আদর্শ জনগণের তথা শাসকগোষ্ঠীর মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে, ইলতুৎমিশের পরেও ত্রিশ বছর ধরে তার বংশধরেরাই সিংহাসনে বসার একমাত্র অধিকারী বলে বিবেচিত হয়েছিল। ইলতুৎমিশ বিরুদ্ধবাদী আমিরগণকে তার কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করেন এবং তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ ও নাসিরউদ্দিন কুবাচার দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি কঠোর হস্তে বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, '১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী দিল্লির তুর্কি সালতানাতে প্রাথমিক যুগের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিশকে ন্যায়সংগতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলে গণ্য করা যেতে পারে।'
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইলতুৎমিশই ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন ▶ ৫১ রংপুরের রাহুল তার ঢাকার বন্ধু রাতুলের বাসায় বেড়াতে এসে একদিন কাওরান বাজারে বেড়াতে যান। বাজারে ঢোকার পথেই তার চোখে পড়ে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্বলিত একটি মূল্য তালিকা বোর্ড। তালিকায় চাল, ডাল, আটা, চিনি, লবণ, তেলসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য দেওয়া আছে। উল্লিখিত দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য একটি কমিটি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির জরিমানাসহ কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।
[গাজীপুর সরকারী মহিলা কলেজ]

ক. আলাউদ্দিন খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১
খ. মালিক কাফুর কে ছিলেন? তাকে 'হাজর দিনারি' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দ্রব্য মূল্য নির্ধারণের সাথে আলাউদ্দিন খলজির দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ন্যায় আলাউদ্দিন খলজির বাজার তত্ত্বাবধানে 'শাহানা-ই-মান্ডি' ও 'দেওয়ান-ই-রিয়াসতে'র কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনের আরোহণ করেন।

খ মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।
আলাউদ্দিন খলজির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নির্ভীক সেনাপতি মালিক কাফুর ছিলেন একজন খোজা হিন্দু। সুলতান তার গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে 'মালিক-তাজ-উল-মালিক কাফুরী' উপাধিতে ভূষিত করেন। এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছিল বলে তাকে হাজার দিনারি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাওরান বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্বলিত মূল্য তালিকা বোর্ড এর সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার বিষয়টির মিল রয়েছে।
সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই নানামুখী সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কার্যগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। তিনি মূলত সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনীর বেতন পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকেও তার এ ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষণীয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, কাওরান বাজারে প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পণ্যের সঠিক ওজন ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও তার শাসনামলে খাদ্যশস্য সুলভ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। সুলতান কেবল দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত কাওরান বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্বলিত একটি মূল্য তালিকা বোর্ডের সুলতান আলাউদ্দিন খলজির এ কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের ন্যায় আলাউদ্দিন খলজির বাজার তত্ত্বাবধানে শাহানা-ই-মান্ডি ও দেওয়ান-ই-রিয়াসতের কর্মকাণ্ড অনেক বিস্তৃত ও বহুমুখী।
আলাউদ্দিন খলজির প্রবর্তিত সংস্কারসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য তিনি যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাতে ফলপ্রসু হয় সেজন্য তিনি বাজার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য শাহানা-ই-মান্ডি এবং দেওয়ান-ই-রিয়াসত নামক দুইজন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারা এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে সর্বদা তৎপর ছিলেন।
শাহানা-ই-মান্ডি এবং দেওয়ান-ই-রিয়াসত অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করেন। শাহানা-ই-মন্ডি ছিলেন শস্যের বাজারের তত্ত্বাবধায়ক। অন্যদিকে দেওয়ান-ই-রিয়াসত বস্ত্র ও সাধারণ বাজারের দেখাশুনা করতেন। মালিক কাফুর 'শাহানা-ই-মান্ডি' হিসেবে দায়িত্বপালন করতেন। তার কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তার জন্য বহু অধঃস্তন কর্মচারি ছিল। দোকানীরা যাতে নিয়মিত শস্য বাজারে নিয়ে আসে, নির্দিষ্ট দরে বিক্রয় করে এবং কোনোরূপ চোরাকারবার না করে, তার প্রতি নজর রাখা ছিল তার কর্তব্য। ইয়াকুব দেওয়ান-ই-রিয়াসত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ব্যবসায়ীদের নাম সংবলিত একটি তালিকা রাখতেন। পণ্য হিসেবে যে পরিমাণ শস্য বাজারে আনা হত, তা তালিকায় লিখা হতো।
পরিশেষে বলা যায় যে, 'শাহানা-ই-মান্ডি' এবং 'দেওয়ান-ই-রিয়াসত' এর কর্মকাণ্ড ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্যকরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫২ জনাব হেকমত চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে শুধুমাত্র নিজের কাজের সুবিধার্থে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় দুর্গাপুর হতে ইউনিয়নের এক প্রান্তে নিজের গ্রাম মনিপুরে স্থানান্তর করেন। ফলে অধিকাংশ জনগণের রোষানলে পড়েন এবং বাধ্য হয়ে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসেন। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়। এ জন্য চেয়ারম্যান জনগণের ওপর অধিক হারে ট্যাক্স ধার্য করেন। কিন্তু জনগণের বিরোধিতার কারণে তা ব্যর্থ হয়।

[গাজীপুর সরকারী মহিলা কলেজ]

ক. ফিরোজশাহ তুঘলকের পিতার নাম কী? ১

খ. 'মাতামহী সুলভ' ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় স্থানান্তরের সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যানের ট্যাক্স নির্ধারণের সাথে মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের দোয়াবে কর বৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফিরোজ শাহ তুঘলকের পিতার নাম মালিক রজব।

খ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত কতগুলো মানবীয় সংস্কার ইতিহাসে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা নামে পরিচিতি।

ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে বসে দরিদ্র অসহায় মুসলমান মেয়েদের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-খায়রাত' নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করেন। বেকারদের চাকরি প্রদানের জন্য চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। অসুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র প্রদানের জন্য দিল্লিতে 'বিমারিস্তান' বা দারুল শিফা নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। আর উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের দুর্গাপুর হতে ইউনিয়ন পরিষদ মনিপুরে স্থানান্তরের সাথে আমার পঠিত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার (১৩২৫ খ্রি.) প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অন্যতম শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ ছিল দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, জনাব হেকমত জনগণের মতামত উপেক্ষা করে ইউনিয়ন পরিষদ দুর্গাপুর হতে ইউনিয়নের এক প্রান্তে নিজের গ্রামে মনিপুরে স্থানান্তর করে। অনুরূপভাবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকও কতগুলো যৌক্তিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের অন্যতম কারণ ছিল এর ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব। দেবগিরি বিশাল দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় কৌশলগত ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কেন্দ্রভূমিতে রাজধানী স্থাপন অধিক যৌক্তিক বলে সুলতান মনে করেছিলেন। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের পটভূমিতে দিল্লি অপেক্ষা দেবগিরি ছিল অনেক বেশি নিরাপদ। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের ওপর নজরদারি ও এর ধনৈশ্বর্য নিয়ন্ত্রণ ও সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন অধিক সমীচীন ছিল। এ সকল কারণেই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করা হয়, যা উদ্দীপকের ইউনিয়ন স্থানান্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যানের ট্যাক্স নির্ধারণের সাথে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির পদক্ষেপের মিল পরিলক্ষিত হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি তার রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শাসন ব্যবস্থাকে কার্যক্ষম করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। উদ্দীপকে হেকমত চেয়ারম্যানের কাজেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় হেকমত ইউনিয়ন দুর্গাপুর হতে মনিপুরে স্থানান্তর করেন। এর ফলে বিপুল অর্থের অপচয় হয়। এজন্য তিনি জনগণের ওপর অধিক ট্যাক্স ধার্য করেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চলে দোয়াবে কর বৃদ্ধি করে। দিল্লি সালতানাতের 'শস্য ভান্ডার' নামে খ্যাত এ দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি ছিল মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা। রাজধানী স্থানান্তর খোরাসান ও কারাচিল অভিযান এবং মুদ্রা প্রবর্তনের পরিকল্পনা ব্যর্থতার ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়লে তিনি এ অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দোয়াব অঞ্চলে বিত্তবানদের বিদ্রোহ, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এবং দুর্ভিক্ষের কারণে সুলতানের কর বৃদ্ধির এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায় যে, জনাব হেকমত-এর অধিক ট্যাক্স ধার্য ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কর বৃদ্ধির ঘটনা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ জনাব আজমল একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন- তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে সর্বদা গুরু-গম্ভীর আচরণ করেন এবং কোনো শিক্ষক তাঁর সামনে চেয়ারে বসতে বা একে অপরের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে পারেন না। এক কথায় তিনি অন্য শিক্ষকদের ওপর লৌহ কঠিন আচরণ করেন।

[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. আইবেক অর্থ কী? ১

খ. বন্দেগান-ই চেহেলগান কাকে বলে? ২

গ. জনাব আজমলের সাথে কোন সুলতানের মিল পাওয়া যায়? তাঁর "Blood and Iron Policy" আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের মোঙ্গল নীতি আলোচনা কর। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইবেক শব্দের অর্থ চন্দ্র দেবতা।

খ সৃজনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কঠোর নীতির সাথে সালাতানাতের শাসক গিয়াসউদ্দিন বলবনের কঠোর নীতির মিল রয়েছে।

দিল্লি সালতানাতের সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ভারতবর্ষ তথা ইসলামের ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করেন। সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে যারা স্বীয় মেধা ও দক্ষতা বলে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছেন, বলবন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় করার নিমিত্তে রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। উদ্দীপকেও এ শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জনাব আজমল তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার সামনে চেয়ারে বসতে বা এতে অপরের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে পারতেন না। তিনি লৌহ কঠিন আচরণ করেন। অনুরূপভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবনও দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় করণ ও স্বীয় ক্ষমতার ভিতকে মজবুত করতে যাবতীয় কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানকে আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদায় ভূষিত করেন। ফলে তিনি পারসিক আদব-কায়দায় সিজদাহ ও পাইবস রীতি প্রবর্তন করেন এবং রাজদরবারের গাম্ভীর্য রক্ষার জন্য সুলতান লঘু চপলতা, হাসিঠাট্টা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। এছাড়া বলবন চল্লিশচক্রের সকল সুযোগ-সুবিধা নিষিদ্ধ করে এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানের নীতি গ্রহণ করেন। যদিও বলবন নিজেই চল্লিশচক্রের একজন সদস্য ছিলেন। এভাবে বলবন দিল্লি সালতানাতকে শক্তিশালীকরণ ও স্বীয় ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য কঠোর নীতি গ্রহণ করেন, যা উদ্দীপকের জনাব আজমলের গৃহীত কঠোর নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

ঘ উক্ত শাসকের অর্থাৎ গিয়াসউদ্দিন বলবনের মোঙ্গল নীতি ছিল অত্যন্ত কার্যকর।

গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ বারবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হামলা পরিচালনা করে সুলতানকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যকে বিপদমুক্ত করার সাথে সাথে সুলতান মোঙ্গলদের আক্রমণ হতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি গ্রহণ করেন, যা মোঙ্গল নীতি নামে পরিচিত।

গিয়াসউদ্দিন বলবন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও তাদেরকে দমন করার জন্য প্রথমে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠনের স্বার্থে বৃদ্ধ সৈনিকদেরকে ক্রমান্বয়ে ছাঁটাই করেন। অন্যদেরকে উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত করেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সুলতান নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। সুলতান মুলতান সীমান্তবর্তী প্রদেশ গঠন করে সুদক্ষ শাসনকর্তাদের ওপর সেগুলোর শাসনভার অর্পন করেন। বলবন নতুন রাজ্য বিজয়নীতি পরিহার করেন এবং কখনো দূরবর্তী এলাকায় যুদ্ধাভিযান পরিচালনা না করে রাজনীতিতেই অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বলবন মোঙ্গল আক্রমণের গতি-প্রকৃতি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার অথবা নতুন রাজ্য বিজয়ে উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে মোঙ্গল হামলা মোকাবিলার জন্য বেশি সচেষ্ট হয়ে যাবতীয় নীতি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ জমিদার বুধাই মণ্ডল মৃত্যুর পূর্বে তার বিদূষী ও বুদ্ধিমতি কন্যা গোলাপিকে তার বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেন। আপনজনদের নানামুখী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তাকে জমিদারি হারাতে হয়েছিল। কিন্তু শত্রুদের হাতে তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি জমিদারি ফিরে পান। সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারীসুলভ দুর্বলতার কারণে তিনি নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. আইবেক শব্দের অর্থ কী? ১

খ. রক্তপাত ও কঠোর নীতি কে কেন গ্রহণ করেছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের কন্যার সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গোলাপি ও উক্ত নারী শাসকের ব্যর্থতার কারণ একই সূত্রে গাঁথা— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আইবেক' শব্দের অর্থ চন্দ্রদেবতা।

খ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে তুর্কি অভিজাতদের ষড়যন্ত্র এবং বহিরাক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সুলতান বলবন ষড়যন্ত্রপরায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও শত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের কন্যার সাথে দিল্লি সালতানাতের সুলতান রাজিয়ার মিল রয়েছে।

সুলতান ইলতুৎমিশ পুত্রদের তুলনায় কন্যা রাজিয়াকেই সালতানাত পরিচালনায় অধিক যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি কন্যা রাজিয়াকে দিল্লি সালতানাতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। রাজিয়া দিল্লি সালতানাতের দায়িত্ব নিলে তার কাছের মানুষেরা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাদের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করলে রাজিয়াকে ক্ষমতা হারাতে হয়। উদ্দীপকেও এ ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বুধাই মণ্ডলের মৃত্যুর পর তার যোগ্য কন্যা জমিদারি লাভ করলে আপনজনরা বিরোধিতা করে। এ ধরনের আপন লোকেরাই সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটিয়েছিল। সুলতান হিসেবে রাজিয়াকে নানা বাধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। রাজিয়াকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে অভিজাত আলেম-উলেমা এবং আত্মীয়রা নানা ধরনের বিরোধিতা করেন। ভিন্ন সাম্রাজ্যের সাথে বিরোধ থাকলে অথবা প্রতিযোগিতা থাকলে তাতে জয় লাভ করা যায়। কিন্তু নিজের অভিজাতদের মধ্যে শত্রুতা থাকলে তা অনেক সময় পরাজয় ডেকে আনে। উদ্দীপকের গোলাপি ও দিল্লি সালতানাতের রাজিয়ার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে।

ঘ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু নারীত্বের কারণেই গোলাপি ও সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটেছিল।

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র নারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। শাসনকার্যে চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। তিনি তার প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুর্কি অভিজাত শ্রেণি নারী বলে সুলতান রাজিয়ার এ সকল কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেন। অভিজাত শ্রেণির এ বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের ফলেই তার পতন হয়। গোলাপির ব্যর্থতার পেছনেও এ ধরনের বিষয় প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, গোলাপি জমিদারি গ্রহণ করে সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারীসুলভ দুর্বলতার কারণে নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। ঠিক একইভাবে সুলতান রাজিয়াও সিংহাসনে আরোহণ করার পর শাসন ক্ষেত্রে নানাবিধ গুণাবলি ও যোগ্যতার প্রমাণ দিলেও ব্যর্থ হন। মূলত নারীত্বই ছিল তার প্রধান অযোগ্যতা। ভি.ডি মহাজন বলেন, 'যদি রাজিয়া একজন নারী না হতেন তাহলে তিনি ভারতের অন্যতম সফলতম শাসক হতেন।' শক্তিশালী পুরুষ আমির-উমরাহগণ একজন নারী কর্তৃক শাসিত হতে অপমান বোধ করে তার উৎখাত সাধনে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। তাছাড়া রাজিয়ার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কঠিন হস্তে শাসন পরিচালনা সুলতানি সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কি অভিজাতদের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে তুর্কি অভিজাতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটায়।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ সানমুন গার্মেন্টস এর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আঞ্চলিকতা ও স্বার্থের জন্য গার্মেন্টস-এর ভিতরে শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। ফলে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মালিক পক্ষ উক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিচক্ষণ মি. আতিককে পরিস্থিতি মোকাবিলার দায়িত্ব দিলে তিনি অনেক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে নিজ অফিস কক্ষটি জমকালোভাবে সজ্জিত করেন। সেখানে যে কারো প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তিনি অফিসে সার্বক্ষণিক নজরদারিরও ব্যবস্থা করেন। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. আতিকের প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলোর মধ্য দিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোই কি শুধু গিয়াসউদ্দিন বলবনের সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? যুক্তি সহকারে তোমার মতামত দাও। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯১ সালে সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের জনাব আতিকের প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহের মধ্য দিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের চল্লিশচক্র দমন ও সামরিক বাহিনী পুনর্গঠনের নীতি ফুটে উঠেছে।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনারোহণের পর কতিপয় সমস্যার সমাধানকল্পে 'Blood and Iron Policy' অবলম্বন করে দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, সানমুন গার্মেন্টস এর কর্মকর্তাগণ কর্মের খাতিরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মালিকপক্ষের বিশ্বস্ত উক্ত কর্মকার্তাদের মধ্যে বিচক্ষণ জনাব আতিক অনেক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে নিজের নিরাপত্তা জোরদারে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেন। যা গিয়াসউদ্দিন বলবনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তার সময় তুর্কি অভিজাতগণ প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন, যারা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। বলবন নিজেও এ চক্রের অন্যতম সদস্য ছিলেন। সালতানাতের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ়করণে তিনি এ চক্রের ক্ষমতা খর্ব করেন। অন্যদিকে তিনি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিহতকরণে সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন করেন যা উদ্দীপকে আতিকের প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর অনুরূপ পদক্ষেপগুলোই শুধু গিয়াসউদ্দিন বলবনের সালতানাত সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি বরং এক্ষেত্রে তার আরো কিছু পদক্ষেপ ভূমিকা রেখেছিল।

রাজতন্ত্র সুদৃঢ়করণের মধ্য দিয়ে সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বলবন সালতানাত সুদৃঢ়করণে মনোযোগী হন। এ লক্ষ্যে তিনি কতিপয় কঠোর নীতি গ্রহণ করেন যা উদ্দীপকে আতিকের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় আতিক তার কার্যক্ষেত্রে কতিপয় পরিবর্তন এনে তার পূর্ণনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যা বলবনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লির সালতানাত সুদৃঢ়করণে চল্লিশচক্র দমন, সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনসহ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি তার রাজত্বকালে তিনি মেওয়াটি দস্যুদের দমন, দোয়াবের বিদ্রোহ দমন, রোহিলাখণ্ডের বিদ্রোহ দমন, জাঠ উপজাতিদের দমনের মাধ্যমে দিল্লি ও এর আশেপাশের অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করেন। এছাড়া তিনি সাম্রাজ্যে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পুনর্গঠন গোয়েন্দা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিচারব্যবস্থায় কঠোরতা অবলম্বন করেন। তার শাসনামলের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে দিল্লি সালতানাতের নিরাপত্তা বিধান।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সালতানাত সুদৃঢ়করণে গিয়াসউদ্দিন বলবন উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো ছাড়া আরো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ মুক্তি তার ছোট বোন লিপির সাথে বর্তমান দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। মুক্তি বলল, তুঘলক বংশের এক সুলতানের সময়ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ও গণমানুষের কল্যাণের জন্যই এই মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। লিপি বলল, তিনি যে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন, তা মোটামুটি সাফল্যজনক হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. কুতুবউদ্দিনকে ভারত রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন কে? ১

খ. সুলতান রাজিয়া কে ছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের প্রতীকী মুদ্রা প্রবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. লিপির বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দিনকে ভারত রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন।

খ সুলতান রাজিয়া ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশের কন্যা।

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা। সালতানাতের সংকটকালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী নারী সুলতান রাজিয়া ছিলেন তার যুগ অপেক্ষা অগ্রসর। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের তথা সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের কারণ ছিল আর্থিক সংকট মোকাবিলা।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো দেশের প্রচলিত মুদ্রাসমূহের সংস্কার সাধন। ১৩২৯-১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান প্রচলিত সোনা ও রুপার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। দেশের আর্থিক সংকট নিরসনের জন্যই চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান এবং পারস্যের গাইকাতুর খানের প্রতীকী কাগজি মুদ্রার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুলতান প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ও গণমানুষের কল্যাণে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সোনা ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুলতানের উদারতা ও বদান্যতা, দান, দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত, রাজ্যবিস্তারের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ ও অগ্রিম বেতন প্রদান এবং রাজধানী স্থানান্তরে ব্যর্থতাজনিত কারণে রাজকোষে বিরাট ঘাটতি দেখা দেয়। সুলতান এ ঘাটতি পূরণের জন্য মুদ্রা সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে স্বর্ণ ও রুপার প্রতীক হিসেবে তামার নোটের প্রচলন করেন। তাছাড়া চতুর্দশ শতকে ভারতে রুপার অভাব, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং লেনদেন ও বিনিময় সহজলভ্য করার বিষয়টিও সুলতানের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলনের কারণ ছিল। সুতরাং বলা যায়, মুহম্মদ বিন তুঘলকের তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের কারণ ছিল রাজ্যে সৃষ্ট হওয়া আর্থিক সমস্যার সমাধান করা।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী মুদ্রা প্রচলনের পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের পদক্ষেপটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক হলেও এ মুদ্রানীতি কার্যকর করার বিষয়টি ত্রুটিযুক্ত ছিল। প্রবর্তিত তামার নোটের কোনো নিরাপত্তা চিহ্ন না থাকায় এবং কালোবাজারিদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির বিধান না থাকায় সুলতানের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকের মুক্তি তার ছোট বোন লিপির সাথে বর্তমান দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। মুক্তি বলল, তুঘলক বংশের এক সুলতানের সময়ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। লিপি বলল, তিনি যে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন তা মোটামুটি সাফল্যজনক হলেও পরবর্তীতে ব্যর্থতায় পর্যসিত হয়। তার এ বক্তব্যটি সঠিক। কারণ উচ্চাভিলাষী শাসক মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্র মুদ্রার পরিকল্পনায় জাল মুদ্রা নিরোধে সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় অসাধু ব্যক্তিরা অসংখ্য জাল মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। জনগণ জাল মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করায় রাষ্ট্র আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিদেশিরা প্রতীকী মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সুলতান বাধ্য হয়ে বাজার থেকে তামার নোট তুলে নেওয়ার আদেশ জারি করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতীকী তাম্রমুদ্রার পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রবর্তিত প্রতীকী তাম্রমুদ্রা চরমভাবে ব্যর্থ হয়। তাই লিপির বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ মালিক শাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান মুসলিম শাসক। তিনি তার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার আমলে মসজিদ ছাড়াও তিনি অনেকগুলো মিনার, মাদ্রাসা, খানকাহ, দুর্গ, তোরণ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তার আমলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।

[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]

ক. শাহ-ই-বাঙ্গালা কাকে বলা হয়? ১

খ. বখতিয়ার খলজি কেন বঙ্গ বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন? ২

গ. উদ্দীপকের মালিক শাহের কর্মকাণ্ডের মধ্যে তোমার পঠিত বাংলার কোন শাসকের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলার উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ড কী শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাহ-ই-বাঙ্গালা বলা হয় শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে।

খ বখতিয়ার খলজি ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সৈনিক। ফলে বাংলায় দুর্বল সেন শাসনের সুযোগ নিয়ে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বঙ্গ বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

https://teachingbd24.com

উচ্চাভিলাসি বখতিয়ার সামান্য বেতনভোগী সিপাহী হয়ে পরিতৃপ্ত ছিলেন না। ফলে স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী বখতিয়ার ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লুণ্ঠন ও আক্রমণ করতে শুরু করেন। একসময় বাংলায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বাংলায় মুসলমান শাসন তথা তুর্কি শাসন শুরু করেন।

গ উদ্দীপকের মালিক শাহের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমার পঠিত শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেকের প্রতিফলন ঘটেছে।

মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে কুতুব উদ্দিন আইবেক ভারতবর্ষে দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লি সালাতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন নির্ভীক, স্বাধীনচেতা, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শাসক ছিলেন। ইসলামের প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের মালিক শাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান মুসলিম শাসক। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ ছাড়াও তিনি আরো অনেকগুলে মিনার, মাদ্রাসা, খানকাহ, দুর্গ, তোরণ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। যা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলিম। ইসলামের সেবা ও প্রচারের জন্য তিনি দিল্লিতে 'কুয়াত উল ইসলাম নামে একটি মসজিদ স্থাপন করেন। অনুরূপ একটি মসজিদ নির্মিত হয় যা 'আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া নামে পরিচিত। তিনিই ভারতবর্ষের মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন কুতুব মিনারের নির্মাণ শুরু করেন। এগুলো তার স্থাপত্যরীতির প্রকৃষ্ট নজির। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের মালিক শাহ এর কর্মকাণ্ডে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তার কর্মকাণ্ডের পরিধি ছিল আরো বিস্তৃত।

কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর গজনির প্রভুত্ব থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র শাসন কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেন এবং দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। একই সাথে তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন সুদৃঢ় করেন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উদ্দীপকের মালিক শাহ এর কর্মকান্ড বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তার কর্মকান্ড কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ, মিনার, খানকাহ নির্মাণের মধ্যেই সীমাবন্ধ। কিন্তু সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কর্মকাণ্ড শুধমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণেই সীমিত ছিল না। শিল্প, স্থাপত্য, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হবার পাশাপাশি তিনি ছিলেন দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। একজন দক্ষ সেনানায়ক হবার সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন সফল শাসক।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মাধ্যমেই ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন হয়েছিল। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তিনি গজনির কর্তৃত্ব থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি একজন সফল সেনানায়ক হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরীর যোগ্য সহচর হয়েছিলেন। শাসনক্ষমতা গ্রহণের পরে তিনি শাসক হিসেবেও সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সালতানাতের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাকল্যাণ নিশ্চিতকরণে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। উদ্দীপকে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের এই দিকগুলোর কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ কেবল কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের আংশিক চিত্র মাত্র। তাই উদ্দীপকটি সুলতানের কৃতিত্বের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ রানী ইসাবেলা পেরনকে আধুনিক বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট বলা হয়। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দেশ-বিদেশের কতিপয় অভিজাত শ্রেণির সমালোচনার মুখোমুখি হন। সমালোচকগণ নারী বলে রানীকে শাসনকার্যে অনুপযোগী, অদক্ষ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু নিজ মেধা-মননে, তেজস্বিতা, আর কর্মদক্ষতার গুণে রানী ইসাবেলা দেশের সকল বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রতিহত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের উন্নতি করেন। *[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. ইলতুৎমিশ দাস রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রানী ইসাবেলার সঙ্গে দিল্লির সালতানাতের কোন নারী শাসকদের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত নারী শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ইলতুৎমিশ।

খ সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ দাস রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ভারতে তুর্কি আধিপত্য যখন বিপদাপন্ন, সেই সংকটময় মুহূর্তে সুলতান হিসেবে ইলতুৎমিশ দায়িত্ব নিয়ে দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করে দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বলা যায়, দাস রাজাদের মধ্যে ইলতুৎমিশ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

গ সৃজনশীল ৪৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা।

উদ্দীপকের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা পেরন যেমন করে সকল সমালোচনাকে তোয়াক্কা না করে স্বীয় যোগ্যতা বলে রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তেমনি সুলতান রাজিয়াও শাসনকার্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সালতানাতের এক সংকটকালে সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজউস-সিরাজের হিসেব মতে, ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একজন নারী। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেন। মিনহাজ উস সিরাজ তাকে মহান নৃপতি, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও মহানুভব বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সার্বভৌম নৃপতির প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এ.বি.এম. হবিবুল্লাহর মতে, সাহসিকতা ও অদম্য দৃঢ়তাই (Courage and unflincing determination) ছিল রাজিয়ার আদর্শ। চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও যোগ্যতাই তার ক্ষমতা ও অস্তিত্বের চাবিকাঠি ছিল। সুলতান রাজিয়া প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন, অশ্বারোহণে জনসমক্ষে বের হন এবং প্রকাশ্যে দরবার পরিচালনা করেন। অধ্যাপক কে.এ. নিজামী যথার্থই বলেছেন, "অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, তিনি ছিলেন ইলতুৎমিশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যোগ্যতম।"

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান রাজিয়া ছিলেন অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৯ আধুনিক গার্মেন্টিস এর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ আঞ্চলিকতা ও স্বার্থের খাতিরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিকে মালিক পক্ষের বিশ্বস্ত উক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিচক্ষণ জনাব অনুপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে অনেক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে নিজ অফিস কক্ষটি অত্যন্ত জমকালোভাবে সজ্জিত করেন। সেখানে যে কারো প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তিনি অফিসে সার্বক্ষণিক নজরদারিরও ব্যবস্থা করেন। ফলে সব ক্ষেত্রে তার কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। *[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. কুতুবমিনার কার নামানুসারে নির্মাণ করা হয়? ১

খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সামাজিক ফলাফল আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব অনুপ এর প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহের মধ্যদিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোই কি শুধু গিয়াসউদ্দিন বলবনের সালতানাত সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? যুক্তিসহকারে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে কুতুবমিনার নির্মাণ করা হয়।

খ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং দুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বিজিত অঞ্চলে আরব বসতি ও আন্তঃবিবাহের ফলে আরবদের মধ্যে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে সিন্ধুবাসীর জীবনেও অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে। আর্য ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে যে নতুন জাতির উদ্ভব ঘটে তারাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-সারাসেনীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে।

গ সৃজনশীল ৫৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬০ "ইত্যাদি জেনারেল স্টোরের" চমৎকার ব্যবস্থা ক্রেতাদের মুগ্ধ করে। এ দোকানের সকল পণ্য নির্ধারিত দামে বিক্রি হয়। দোকানের প্রবেশ পথের একধারে বড় একটি চার্টে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের মূল্য দেয়া আছে। মূল্য তালিকার অংশ বিশেষ নিম্নরূপঃ

দ্রব্যের নাম	পরিমাপ	মূল্য
আটা	প্রতি কেজি	৩৫ টাকা
সিদ্ধ চাল	" "	৫৫ টাকা
ডাল	" "	১২০ টাকা
সয়াবিন তেল	" "	১০৮ টাকা

দোকান মালিক নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সুপারভাইজার নিয়োগ করেন। *[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. তরিখ ই ফিরোজশাহী গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ২

গ. ইত্যাদি জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনা তোমার পাঠ্য পুস্তকের আলাউদ্দিন খলজির কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা দেশের সবাই উপকৃত হয়েছিলেন? যুক্তি দাও। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থের রচয়িতা জিয়াউদ্দিন বারানী।

খ মালিক কাফুর ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাকে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করেন বলে তাকে 'আলফি' বা 'হাজার দিনারি' বলা হয়। তিনি ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রকে পরাজয়ের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যে অভিযান শুরু করেন। পরে তিনি বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র, হোয়াসল, পান্ড্যরাজ্য প্রভৃতি বিজয় করে দাক্ষিণাত্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন।

গ ইত্যাদি জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনার সাথে পাঠ্যবইয়ের আলাউদ্দিন খলজির খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের মূল্য তালিকা নির্ধারিত রয়েছে। পাশাপাশি এই মূল্য তালিকা কার্যকর হচ্ছে কিনা তার তদারকির জন্য সুব্যবস্থাও করা হয়েছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থা সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলেও বিদ্যমান ছিল।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি। এ জন্য তাকে 'মহান রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুলতান দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, যেমন: গম, বার্লি, চাল, আটা, ডাল, তেল, সোডা ইত্যাদির মূল্য বেঁধে দেন। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ও বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ করেন। পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা সবাইকে দিল্লির সেহরা আদল নামক স্থানে বস্ত্র আমদানি করতে হতো। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সুলতান বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্ধারিত দামে দোকানদাররা বিক্রি করছে কি না তা নজরদারি করতেন। সুলতান তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম সকল ব্যবসায়ীকে রাষ্ট্রীয় দপ্তরে নাম রেজিস্ট্রি করার নির্দেশ দেন সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়া ব্যবসায়ীদের কৃষকদের কাছ থেকে শস্যক্রয় নিষিদ্ধ করা ছাড়াও কঠোর হস্তে চোরা কারবার দমনের ব্যবস্থা করেন। উদ্দীপকে আলাউদ্দিন খলজির গৃহীত উল্লিখিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ সৃজনশীল ৩৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬১ আব্রাহাম লিংকন এক কৃষকের সন্তান ছিলেন। স্বীয় মেধা-দক্ষতা-মননশীলতা ও অধ্যবসায় কাজে লাগিয়ে তিনি পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার আমলেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাস প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ হয়। কৃষক পরিবারের এ সন্তানটিকে অনেক অভিজাত মার্কিন কোনভাবেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে চায় নি। *[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়? ১

খ. বলবনের রক্তপাত ও কঠোরনীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতারোহণের সাথে কুতুবুদ্দিন আইবেকের ক্ষমতারোহণের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট, কুতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্রের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল গণসংবর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

খ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপই রক্তপাত ও কঠোর নীতি (Blood and Iron policy) নামে পরিচিত।

সিংহাসনে আরোহণ করেই বলবন নানা ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আমির-ওমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য, দ্বন্দ্ব-কলহ ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, দিল্লির সন্নিকটস্থ মেওয়াটি দস্যুদের উপদ্রব, উপর্যুপরি মোঙ্গল আক্রমণ প্রভৃতি। এসব সমস্যা সাম্রাজ্যের ভিতকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। তাই নিজের ক্ষমতা সুসংহত করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি গুপ্তচর প্রথা চালু, বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, মোঙ্গল নীতি প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলোই বলবনের 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' হিসেবে স্বীকৃত।

গ উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ক্ষমতারোহণের সাথে কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষমতা গ্রহণ করার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তিত্ব সামান্য ক্রীতদাস থেকে একটি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছেন কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদের মধ্যে অন্যতম। তবে তিনি স্বীয় দক্ষতা, মেধা, মননশীলতা ও অধ্যবসায়

Teachingbd24.com

কাজে লাগিয়ে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, যা উদ্দীপকে আব্রাহম লিংকনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, আব্রাহাম লিংকন একজন কৃষকের সন্তান। স্বীয় মেধা, দক্ষতা, মননশীলতা কাজে লাগিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি দাস প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন। তবে কৃষক পরিবারের এ সন্তানটিকে অনেক অভিজাত মার্কিনি মেনে নিতে চায়নি, যেমনটি কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। সামান্য দাস থেকে তিনি স্বীয় যোগ্যতাবলে ভারতে স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরী তাকে 'দাসত্ব মুক্তির সনদ' দান করেন। এ সময় তাকে আলী মর্দান খলজি, হিন্দু, রাজপুত, তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ প্রমুখ রাজন্যবর্গের বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, আব্রাহাম লিংকনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা ও কতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষমতা গ্রহণ একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কুতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্রের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়– উক্তিটি যথার্থ।
ভারতে দাস বংশ ও দিল্লি সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরী তাকে রাজদণ্ড প্রদান ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন।
উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি একজন কৃষকের সন্তান ছিলেন। স্বীয় যোগ্যতা, মেধা, ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অন্যদিকে কুতুবউদ্দিন ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস। মুহাম্মদ ঘুরী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার অধীন কর্মকর্তাদের মধ্যে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ, নাসির উদ্দিন কুবাচা ও কুতুবউদ্দিনের মাঝে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ তিন জনের মধ্যে কুতুবউদ্দিন ছিলেন সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন। ফলে মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মাহমুদ ঘুরী তাকে 'দাসত্ব মুক্তির সনদ' দান করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে আব্রাহাম লিংকন একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। তিনি দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, প্রেসিডেন্ট আব্রাহম লিংকন কুতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্রের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়।

প্রশ্ন ▶৬২ সীমান্তের ওপারে কাঁচা মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমিন বাজারে ক্ষুদ্র মানের মুদ্রার অভাব দেখা দেয়, ফলে দোকানিরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে ক্রেতাদের সাদা কাগজে পাওনা লিখে স্বাক্ষরযুক্ত স্লিপ দেয়; যা দোকানে দোকানে মুদ্রার বিকল্প হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জাল স্বাক্ষরযুক্ত বহু স্লিপ বাজারে আসতে থাকে। আসল ও নকল স্লিপের পার্থক্য করার ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়েন এবং স্লিপ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবীরতা দেখা দেয়। *[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. ভারতের তোতা পাখি কাকে বলা হয়? ১
খ. মহাকবি ফেরদৌসীর শাহনামার ওপর টীকা লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে মুদ্রার বিকল্প হিসেবে স্লিপ প্রদান সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন পরিকল্পনার অনরূপ?- আলোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত পরিকল্পনার ফলাফলের সাথে জাল স্লিপ প্রদানের ফলাফলের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের তোতা পাখি বলা হয় আমির খসরুকে।

খ শাহনামা ইরানের রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস সংবলিত মহাকবি ফেরদৌসির রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।
দিল্লি সালতানাতের সুলতান মাহমুদের অনুরোধে 'প্রাচ্যের হোমার' নামে খ্যাত এবং জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ফেরদৌসি 'শাহনামা' রচনা করেন। 'শাহনামা' রচনা করার জন্য সুলতান তাকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ৬০,০০০ রৌপ্য মুদ্রা দিতে চাইলে কবি ক্ষুব্ধ হয়ে স্বদেশ খোরাসানে ফিরে যান। পরে সুলতান তার ভুল বুঝতে পেরে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করলেও কবি ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ক্রেতাকে স্লিপ প্রদান পাঠ্যবইয়ের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন পরিকল্পনার অনুরূপ বলে আমি মনে করি।
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো দেশের প্রচলিত মুদ্রাসমূহের সংস্কার সাধন। ১৩২৯-১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান প্রচলিত সোনা ও রূপার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। দেশের আর্থিক সংকট নিরসনের জন্যই চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান এবং পারস্যের গাইকাতুর খানের প্রতীকী কাগজি মুদ্রার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুলতান প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকের আমিন বাজারে ক্ষুদ্রমানের মুদ্রার অভাব দেখা দিলে দোকানিরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে ক্রেতাকে সাদা কাগজে পাওনা লিখে স্বাক্ষরযুক্ত স্লিপ দেয় যা সে বাজারের যে কোনো দোকানে মুদ্রার বিকল্প হিসেবে গৃহীত হয়। ঠিক একইভাবে পাঠ্যবইয়ের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকও সোনা ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুলতানের উদারতা ও বদান্যতা, দান, দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত, রাজ্যবিস্তারের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ ও অগ্রিম বেতন প্রদান এবং রাজধানী স্থানান্তরে ব্যর্থতাজনিত কারণে রাজকোষে বিরাট ঘাটতি দেখা দেয়। সুলতান এ ঘাটতি পূরণের জন্য মুদ্রা সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে স্বর্ণ ও রূপার প্রতীক হিসেবে তামার নোটের প্রচলন করেন। সুতরাং বলা যায়, মুহম্মদ বিন তুঘলকের তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের সাথে উদ্দীপকের কাগজের স্লিপ প্রবর্তনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের পরিকল্পনার ফলাফলের মতোই আমার পাঠ্যবইয়ের মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা নীতির ব্যর্থতা একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।
সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের পদক্ষেপটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক হলেও এ মুদ্রানীতি কার্যকর করার বিষয়টি ছিল ত্রুটিযুক্ত। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতানের অস্থিরতা, তার প্রবর্তিত তামার নোট গ্রহণে জনগণের অনীহা, প্রবর্তিত তামার নোটের কোনো নিরাপত্তা চিহ্ন না থাকা এবং কালোবাজারিদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির বিধান না থাকায় সুলতানের পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উদ্দীপকের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে আমিন বাজারে মুদ্রার বিকল্প হিসেবে কাগজের স্লিপ চালু হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জাল স্বাক্ষরযুক্ত বহু স্লিপ বাজারে আসতে শুরু করে। আসল ও নকল স্লিপের পার্থক্য করার ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্লিপ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। ঠিক একইভাবে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের অল্প দিনের মধ্যেই মুদ্রার জাল নিরোধে সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় অসাধু ব্যক্তিরা অসংখ্য জাল মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। জনগণ জাল মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করায় রাষ্ট্র আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিদেশিরা প্রতীকী মুদ্রা গ্রহণে অসম্মতি জানালে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সরকার বাজার থেকে তামার নোট তুলে নেওয়ার আদেশ জারি করে এবং জনসাধারণকে স্বর্ণ ও রুপার মুদ্রা প্রদানের নির্দেশ দেন। এর ফলে রাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষতি হয়।
পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের ফলাফল ছিল মারাত্মক। এ ব্যবস্থার ফলে মুদ্রার মান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এ ধরনের ব্যর্থতা উদ্দীপকের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৬৩ প্রশাসনে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে দেখলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আমলা শ্রেণি তৈরি করা হয়েছিল তারাই এখন প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচরণ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিসহ সিন্ডিকেটভিত্তিক অফিসিয়াল কার্যাদি পরিচালনা করেন। এমতাবস্থায় মেয়র প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সিন্ডিকেটদের কঠোরভাবে দমন-বদলি, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিধি নিষেধ আরোপ করেন। ফলে সিটি কর্পোরেশনের সুশাসন ও সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ১
খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমলা সিন্ডিকেটদের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন সিন্ডিকেটদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মেয়র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সাথে ইঙ্গিতকৃত সুলতান গৃহীত পদক্ষেপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দিন খলজির দক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

খ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী ও তার বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে। পৃথ্বিরাজ ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। ফলে ভারতীয় রাজ্যগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ একটি পাঁচ টাকার কয়েন গলিয়ে ২টি চামচ তৈরি করে তা দশ টাকায় বিক্রি করার ফলে হঠাৎ করে ক দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। অভাব মোকাবিলায় সরকার উর্বর অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করে। ওদিকে ব্যবসায়ীরা মুদ্রার অভাবে সিলযুক্ত কাগজের স্লিপ ব্যবহার করতে থাকে, কিন্তু অসাধু ব্যক্তিরা এসব স্লিপ জাল করে দেশের অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. কুতুবমিনার-এর নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উর্বর অঞ্চলের কর বৃদ্ধির সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর; উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রাব্যবস্থার মতোই ইঙ্গিতকৃত শাসকের প্রতীক মুদ্রাব্যবস্থার পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়? মতামত দাও। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬৫ আজিজ সাহেব ইব্রাহিমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি তুরাব নামে এক ক্রীতদাসক্রয় করেন। যদিও তুরাব দাস ছিল না, তথাপি ভাইদের ষড়যন্ত্রে সে দাসে পরিণত হয়। দাস হওয়া সত্ত্বেও সুনিপুণ কর্ম ও প্রতিভার গুণে এলাকার মানুষের কাছে তুরাব বেশ পরিচিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া তার প্রতিভা, মেধা ও বিশস্ততার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে চেয়ারম্যান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চেয়ারম্যানের কোন সন্তান না থাকায় তুরাব পরবর্তীতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. ইলতুৎমিশের শৈশব ও কৈশোর জীবন কীভাবে কাটে? ২
গ. তুরাবের চরিত্রের সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক।

খ শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ তুর্কিস্থানের ইলবারি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতৃবিরোধের শিকার হয়ে শৈশবেই তিনি জনৈক ব্যক্তির নিকট দাস হিসেবে বিক্রি হন। পরবর্তীকালে তাকে দিল্লিতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের নিকট বিক্রি করা হয়। মুহাম্মদ ঘুরীকে সহায়তার পুরস্কার হিসেবে কুতুবউদ্দিন তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন।

গ উদ্দীপকে আমার পঠিত দিল্লি সালতানাতের শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।
ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তি সামান্য ক্রীতদাস থেকে একটি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছেন, কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদের মধ্যে অন্যতম। কুতুবউদ্দিন ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। তবে তিনি তার স্বীয় গুণাবলির বদৌলতে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং তিনি স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন।
কুতুবউদ্দিন আইবেক সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর সামান্য ক্রীতদাস থেকে স্বীয় যোগ্যতাবলে প্রথমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পরবর্তীতে মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হিসেবে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরীর নিকট থেকে 'দাস মুক্তি সনদ গ্রহণ করেন এবং কালিঞ্জর, ফররুখাবাদ, বাদাউন, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্য জয়ের মাধ্যমে স্বীয় রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সুতরাং বলা যায়, তুঘরিল বেগ যেন কুতুবউদ্দিন আইবকের যোগ্য প্রতিনিধি।

ঘ উদ্দীপকের চেয়ারম্যান তুরাবের চরিত্রের সাথে ইতিহাসের কুতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।
কুতুবউদ্দিন আইবক ছিলেন একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর গজনির প্রভুত্ব থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র শাসন কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেন এবং দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। একই সাথে তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন সুদৃঢ় করেন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
কুতুবউদ্দিন আইবেক ক্ষমতারোহণের পর নানাবিধ সমস্যায় পরিবেষ্টিত হন। মুহাম্মদ ঘুরীর প্রচেষ্টায় সমগ্র উত্তর ভারত তুর্কিদের পদানত হলেও মুহাম্মদ ঘুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে কালিঞ্জর, বাদাউন, গোয়ালিয়র এসব বিজিত রাজ্যসমূহ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। কুতুবউদ্দিন আইবেক এই সমস্ত প্রাথমিক সমস্যাসমূহ দূরীভূত করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী ছিলেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় তারিখ-ই-মুবারক শাহী ও তাজুল নাসির গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, কুতুবউদ্দিন আইবেক বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই তার শাসকোচিত চরিত্রকে শাণিত করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৬৬ শিমুলিয়ার শাসনকর্তা সিরাজ উদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করে তার রাজবাড়ী স্থানান্তর করেন। স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে কাগজের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুদূর বিহার অধিকার করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। দোলদিয়ার ওপর অতিরিক্ত করারোপ করেন। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]*

ক. তুঘলক বংশের প্রথম সুলতান কে? ১
খ. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরস্পর বিপরীত গুণের মিশ্রণ ঘটেছিল — বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে কোন সুলতানের মিল রয়েছে — তার পরিকল্পনাগুলো লিখ। ৩
ঘ. উক্ত সুলতানের পরবর্তী সুলতানের পিতামহী সুলভ নীতিগুলো দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী ছিল — ব্যাখ্যা কর। ৪

Teachingbd24.com

৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তুঘলক বংশের প্রথম সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক।

খ ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে মুহাম্মদ বিন তুঘলক মধ্যযুগীয় বিশ্বের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি ছিলেন বলে তাকে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ বলা হয়। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মধ্যে পাণ্ডিত্য, মানসিক উৎকর্ষ, উন্নত রুচিবোধ, উচ্চ নৈতিক আদর্শ, ধর্মপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। অন্যদিকে আবেগপ্রবণতা, অস্থিরতা, একগুঁয়েমি, অপরিণামদর্শিতা, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ইত্যাদি দোষ-ত্রুটিও তার চরিত্রকে ম্লান করেছিল। তাই তাকে বিপরীত বৈশিষ্ট্যাবলির সংমিশ্রণ অর্থাৎ 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকের সাথে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মিল রয়েছে। তার পরিকল্পনাগুলো নিম্নরূপ—
সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার সংখ্যা ছিল ৫টি। প্রথমত, তিনি ১৩২৬-২৭ সালে রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করেন। দ্বিতীয়ত, ১৩২৯-৩০ সালে সুলতান সোনা ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। অনেকের মতে, চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান এবং পারস্যের গাইকাতুর খানের প্রতীকী কাগজের মুদ্রার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুলতান প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। তৃতীয়ত, দোয়াবের বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দমন এবং তাদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সুলতান দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। চতুর্থত, আর্থিক সম্পদের হাতছানি এবং কতিপয় খোরাসানি আমিরের পরামর্শে তিনি খোরাসান আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আক্রমণে পিছপা হন। পঞ্চমত, ১৩৩২-৩৩ সালে কারাচিল অভিযান। চীন ও হিন্দুস্তানের মধ্যবর্তী কারাচিলে সুলতানের বাহিনী বেশ কিছু শত্রুঘাঁটি দখল করে এবং পার্বত্য সর্দারদের আনুগত্য ও করদানের স্বীকৃতি আদায় করে অভিযানের সমাপ্তি ঘটান।

ঘ উক্ত সুলতানের পরবর্তী সুলতানের তথা সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পিতামহী সুলভ নীতিগুলো দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী ছিল — বক্তব্যটি যথার্থ।
উক্ত শাসকের সাথে ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাদৃশ্য রয়েছে। অনেকে তার কার্যাবলিকে তুঘলক বংশের পতনের জন্য দায়ী করেন। আমি তাদের সাথে একমত।
ফিরোজ শাহ তুঘলকের মানবীয় সংস্কার ও উদার নীতির মধ্যে তুঘলক বংশের পতনের বীজ নিহিত ছিল। তার কোনো কোনো নীতি ও কার্যাবলি শুধু তুঘলক বংশের নয়, দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্যও দায়ী ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। ড. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'পূর্ববর্তী শাসনকালের বিপরীতে ফিরোজের রাজত্বকালে কোমলতা ও বহু জনহিতকর কাজ পরিদৃষ্ট হলেও তার শাসনকাল অনেকাংশে দিল্লির সালতানাতের ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল।' সুলতান দুর্বল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কঠোরতা প্রদর্শন করে নয়, ক্ষমা ও উদারতা দ্বারা তিনি জনগণের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। রক্তপাত পছন্দ করতেন না বলে তার পক্ষে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এতে তুঘলক বংশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুলতানের জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ ছিল। সুলতানের দুর্বল সেনাবাহিনী তুঘলক বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল। এছাড়া সুলতানের অদূরদর্শী ধর্মীয় নীতিও তুঘলক বংশের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।
পরিশেষে বলা যায় যে, ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসননীতি ও কার্যাবলি তুঘলক বংশের এমনকি সালতানাতের পতনের পথকে সুগম করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬৭ সোনারগাঁওয়ের জমিদার ঈশা খাঁ তার প্রজাদের সুখ-শান্তির জন্য এবং প্রজারা যাতে নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করতে পারেন তাই জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করে দেন এবং উহা বাস্তবায়ন করেন।

[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]

ক. দিল্লির প্রথম খলজি বংশের সুলতান কে ছিলেন? ১
খ. আলাউদ্দিন খলজি কেন নতুন ধর্ম প্রবর্তনের পরিকল্পনা করেছিলেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে কোন সুলতানের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে — আলোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সুলতান তার নীতি বাস্তবায়নের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন— মূল্যায়ন কর। ৪

৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লির প্রথম খলজি বংশের সুলতান ছিলেন জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি।

খ ঐতিহাসিক বারানীর মতে, আলাউদ্দিন খলজির সাফল্য ও উন্নতি তাঁকে উন্মাদনাগ্রস্ত করে তোলে। এ সময় তিনি ভাবেন যে, মুহাম্মদ (স) এর ধর্মমত প্রচারে তাঁর চারজন সহযোগীর অবদান ছিল। কাজেই তিনিও তার চারজন সহযোগির সহায়তায় একটি নতুন ধর্মমত প্রচারে সক্ষম হবেন। সুলতান এ বিষয়ে তার বিশ্বস্ত অনুচর আলা-উল-মুলকের পরামর্শ জানতে চাইলে তিনি আলাউদ্দিন খলজিকে নিরুৎসাহিত করেন। খলজি তার পরামর্শ মেনে নিয়ে ধর্মমত প্রবর্তনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬৮ রাজশাহীর সুলতান বদর উদ্দিন কাজল অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি তার দরবারের প্রভাবশালী বিশজন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল ছিল। যারা সব সময় সুলতানের বিরোধিতা করত। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের দমন করেন। তিনি রাজশাহীকে শক্তিশালী করেন।

[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]

ক. সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকাল লিখ। ১
খ. পাল বংশ নামকরণের সার্থকতা কতটুকু? ২
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন সুলতানের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ৩
ঘ. সাম্রাজ্য দৃঢ়করণে উক্ত সুলতানের গৃহীত পদক্ষেপগুলো লিখ। ৪

৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকাল ১২৩৬ থেকে ১২৪০ সাল পর্যন্ত।

খ 'পাল' শব্দটি প্রাকৃত ভাষার; এর অর্থ রক্ষাকর্তা। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। পরবর্তী সকল শাসকরা নামের শেষে পাল ব্যবহার করতেন। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি শুরু হওয়া এই বংশ প্রায় ৪০০ বছর বাংলা ও বিহার শাসন করে। পাল বংশের শাসকরা সুদীর্ঘ সময় তাদের রাজ্য রক্ষা করে 'পাল' নামকে সার্থক করেছিল বলা যায়।

গ উদ্দীপকের শাসকের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের অভিজাতদের দমন ও সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করণে মিল রয়েছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি তার দরবারে সর্বেসর্বা হয়ে উঠা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামক অভিজাতদের ক্ষমতা নাশ করা প্রয়োজন মনে করেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাদের সামান্য অপরাধে কঠোর শাস্তি দিয়ে জনগণের সামনে হেয় করেন ও বিশেষ সুবিধা বা জায়গীর বাতিল করে তাদের ক্ষমতাহীন করে ফেলেন। তিনি রাজতন্ত্র বা সালতানাতের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে একে শক্তিশালী করেন।
উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাজশাহীর সুলতান বদর উদ্দিন তার দরবারের প্রভাবশালী বিশজন ব্যক্তিকে কঠোরভাবে দমন করেন। এর সাথে বলবনের চল্লিশ চক্র' দমনের মিল আছে। এছাড়া সুলতান বদরের মত সুলতান বলবনও তার রাজ্যকে শক্তিশালী করেন।

ঘ সাম্রাজ্য দৃঢ়করণে উক্ত সুলতান তথা সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:
একটি শক্তিশালী ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করে দিল্লি সালতানাতের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সুদৃঢ় করার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি মেওয়াটবাসীদের বিদ্রোহ, দোয়াবের বিদ্রোহ ও উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং চল্লিশ চক্রের বিলোপ সাধন করেন। তিনি তার সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর দ্বারা ভারতবর্ষকে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। তার সময়ে দিল্লি নগরী মুসলিম কৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি তুর্কি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে নবজীবন দান করেন; সালতানাতের গৌরব পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; সাম্রাজ্যের সর্বত্র অব্যাহত শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে মোঙ্গল হামলা থেকে নিরাপত্তা বিধানকল্পে এক নতুন নীতির প্রবর্তন করেন। এসব দিক পর্যালোচনা করলে বলবনকে 'সালতানাতের প্রকৃত সংরক্ষণকারী' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্কারের ফল বলবনের সংস্কারের ফলাফলের অনুরূপ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৬৯ পিতার মৃত্যুর পর শাহবাজ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে কতকগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যা ছিল যুগের অগ্রগামী। যুগোপযোগী না হওয়ায় পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। জনসাধারণ অনেক দুর্ভোগের শিকার হয়।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ১
খ. কুতুব মিনার নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থার সাথে কোন শাসকের কোন ব্যবস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের পরিকল্পনাগুলো যদি ব্যর্থ না হত তাহলে উক্ত শাসকই হতেন শ্রেষ্ঠ শাসক — মূল্যায়ন কর। ৪

৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক কাফুর ছিলেন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের পরিকল্পনার সাথে আমার পঠিত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনার সাদৃশ্য রয়েছে।
মুহাম্মদ বিন তুঘলক চিরাচরিত শাসনপদ্ধতিতে কিছু ব্যতিক্রম ঘটানোর জন্য নতুন নতুন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ থাকা সত্ত্বেও অবাস্তব ও যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়ার জন্য তা ব্যর্থ হয়। ঐতিহাসিকগণ তার এ পকিল্পিনাসমূহকে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে শাহবাজ খান পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন সিংহাসনে আরোহণের পর কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকও তার রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার পরিকল্পনাগুলো হলো দিল্লি হতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন, খোরাসান অভিযান, প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলন, কারাচিল অভিযান এবং দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি। সাম্রাজ্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও উদ্দীপকের ন্যায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলো যদি ব্যর্থ না হত তাহলে তিনিই হতেন শ্রেষ্ঠ শাসক। উক্তিটি যথার্থ।
সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার (১৩২৫ খ্রি.) প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অন্যতম শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ ছিল দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন উৎসাহী সংস্কারক। উদ্ভাবন ও অভিনবত্ব ছিল তার প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি তার গৃহীত মহাপরিকল্পনাসমূহের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ়করণেও নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এসব পরিকল্পনার মধ্যে সুলতানের আধুনিক ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁর পরিকল্পনাগুলো সার্থক হয়নি। এ ব্যর্থতার পেছনে সুলতানের নিজস্ব দায় যেমন ছিল, তেমনি পারিপার্শ্বিক নানা কারণও ছিল। দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ, আলেম-উলেমাসহ রক্ষণশীল জনগণের অনুদার ও বিরূপ মনোভাব এবং কর্মচারীদের সহযোগিতা ইত্যাদি ছিল পারিপার্শ্বিক কারণসমূহের অন্যতম। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতানের সদিচ্ছার অভাব ছিল না সত্য, তবে তাঁর অনভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও কার্যপদ্ধতির ত্রুটির কারণে তিনি সফলকাম হতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিতে সুলতান ছিলেন তাঁর নিজ সময় ও সমাজ হতে অনেক অগ্রসর। তাঁর পরিকল্পনাসমূহ ছিল সমকালীন বাস্তবতা থেকে অনেকটা অগ্রগামী। দেশের সাধারণ জনগণ সুলতানের যুগধর্মের অগ্রবর্তী পরিকল্পনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে অনেকেই এর বিরোধিতা করে।
পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ না হলে তিনিই হতেন শ্রেষ্ঠ শাসক।

প্রশ্ন ▶ ৭০ অনলাইন শপিং এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষের ব্যস্ততা ও কর্মপরিধি বাড়তে থাকায় তারা আজ বাজারে যাবার পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে না। তাছাড়া প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারিত থাকায় সঠিক ওজন ও পণ্যের গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করায় এবং শপিং ব্যবস্থার ওপর ক্রেতার আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্রব্য সামগ্রীর বিপুল সমাহার ও বৈচিত্র্য থাকায় অনলাইন শপিং মানুষের সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় করছে।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

ক. মামলুক শব্দের অর্থ কী? ১
খ. জায়গির প্রথার প্রবর্তন ফিরোজ শাহ তুঘলকের বড় ভুল হিসাবে চিহ্নিত করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনার সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর অনলাইন শপিং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মতো সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও উক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মামলুক শব্দের অর্থ দাস।

খ জায়গির প্রথার প্রবর্তন তুঘলক বংশের পতনের অন্যতম কারণ হওয়ায় তা ফিরোজ শাহ তুঘলকের বড় ভুল বলে চিহ্নিত করা হয়।
ফিরোজ শাহ তুঘলক জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করলে জায়গির প্রাপ্ত অভিজাতবর্গ নিজ নিজ এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণও শিথিল হয়ে পড়ে। এর ফলে তুঘলক বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭১ ফ্রান্সের রাজা ওয়াটসন একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার রাজনৈতিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। একমাত্র আত্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য তিনি একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ সকল কৃতিত্বের জন্য তাকে ফ্রান্সের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. দিল্লির কোন সুলতান রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগ করেন? ১
খ. মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের বর্ণনা দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যপুস্তকের যে শাসকের কৃতিত্বের মিল রয়েছে তা মূল্যায়ন কর। ৪

৭১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লির সুলতান গিয়াউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগ করেন।

খ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত কতগুলো মানবীয় সংস্কার ইতিহাসে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা (Grandmotherly Legislating) নামে পরিচিতি।
ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে বসে দরিদ্র অসহায় মুসলমান মেয়েদের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-খায়রাত' নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করেন। বেকারদের চাকরি প্রদানের জন্য চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। অসুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র প্রদানের জন্য দিল্লিতে 'বিমারিস্তান' বা দারুল শিফা নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। আর উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা দিল্লি সালতানাতের সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে।

https://teachingbd24.com

ইলতুৎমিশ প্রাথমিক জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের পর দিল্লি সালাতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা ওয়াটসনের মধ্যেও এ প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে।

ওয়াটসন একজন ক্রীতদাস হয়েও রাজনৈতিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ফ্রান্সকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। একইভাবে শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশও ছিলেন যুদ্ধবিদ্যাসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পাঞ্জাবের খোক্কার বিদ্রোহ দমনে মুহাম্মদ ঘুরীকে প্রভৃত সহায়তার পুরস্কার হিসেবে সুলতানের নির্দেশে আইবেক তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন এবং 'আমির উল উমারাহ' পদবি প্রদান করে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি ১২১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যা, বারানসি, বাদাউন, সিওয়ালিকসহ দিল্লিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের আক্রমণকে প্রতিহত করে তিনি দিল্লি সালতানাতকে বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেন। তার এসব দূরদর্শী কর্মকাণ্ড রাজা ওয়াটসনের কাজেও পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যপুস্তকের শাসক সুলতান ইলতুৎমিশের কৃতিত্বের মিল রয়েছে।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কুতুবউদ্দিনের ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে মাত্র দু দশকের মধ্যে ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন ইলতুৎমিশ। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি ছিলেন সুচতুর, নির্ভীক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। একমাত্র আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষা করেন। তিনি সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ভিত্তিও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন।

'বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আদর্শ জনগণের তথা শাসকগোষ্ঠীর মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে, ইলতুৎমিশের পরেও ত্রিশ বছর ধরে তার বংশধরেরাই সিংহাসনে বসার একমাত্র অধিকারী বলে বিবেচিত হয়েছিল। ইলতুৎমিশ বিরুদ্ধবাদী আমিরগণকে তার কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করেন এবং তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ ও নাসিরউদ্দিন কুবাচার দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি কঠোর হস্তে বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, '১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী দিল্লির তুর্কি সালতানাতে প্রাথমিক যুগের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিশকে ন্যায়সংগতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলে গণ্য করা যেতে পারে।'

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইলতুৎমিশ উদ্দীকের শাসক ওয়াটসনের মতই কৃতিত্ববান ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৭২ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ছোটবেলা থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হন। অতঃপর হুসামউদ্দিনের সান্নিধ্যে আসলে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে শুরু করে। ইখতিয়ার উদ্দিন স্বীয় মেধা আর যোগ্যতা দ্বারা বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করে পরবর্তীতে এখানে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। *[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. দিল্লির খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. দিল্লির সৈয়দ বংশের পতন ঘটে কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইখতিয়ার উদ্দিন ও উক্ত শাসক উভয় যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ — উক্তিটি যথার্থতা যাচাই কর। ৪

৭২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লির খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি।

খ সালতানাতে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলার ফলে অবশেষে বাহলুল লোদির হাতে দিল্লির সৈয়দ বংশের পতন ঘটে।

এ বংশের পতনের নেপথ্যে বিদ্যমান কারণগুলো ছিল রাজ দরবারে আমির ওমরাহদের প্রভাব, সুলতানের অযোগ্যতা, উপযুক্ত সামরিক বাহিনীর অনুপস্থিতি, শাসকদের সালতানাত সম্পর্কে উদাসীনতা। যার ফলশ্রুতিতে বাহলুল লোদি এ সকল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সৈয়দ বংশের ধ্বংসলীলার ওপর লোদি বংশের গোড়াপত্তন করেন।

গ উদ্দীপকে দিল্লি সালতানাতের শাসক কুতুবউদ্দিন আইবকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তি সামান্য ক্রীতদাস থেকে একটি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছেন কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদের মধ্যে অন্যতম। কুতুবউদ্দিন ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। তবে তিনি তার স্বীয় গুণাবলির বদৌলতে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং তিনি স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন।

উদ্দীপকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের কথা বলা হয়েছে যিনি স্বীয় যোগ্যতাবলে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর সামান্য ক্রীতদাস থেকে স্বীয় যোগ্যতাবলে প্রথমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পরবর্তীতে মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হিসেবে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী সুলতান মাহমুদ ঘুরীর নিকট থেকে দাস মুক্তির সনদ গ্রহণ করেন এবং কালিঞ্জর, ফররুখাবাদ, বাদাউন, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্য জয়ের মাধ্যমে স্বীয় রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সুতরাং বলা যায়, তুঘরিল বেগ যেন কুতুবউদ্দিন আইবকের যোগ্য প্রতিনিধি।

ঘ উদ্দীপকের ইখতিয়ার উদ্দিন ও উক্ত শাসক অর্থাৎ কুতুবউদ্দিন আইবেক যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ — উক্তিটি যথার্থ।

কুতুবউদ্দিন আইবেক স্বীয় যোগ্যতা ও মেধার দ্বারা গজনির প্রভুত্ব থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে দাস বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। যা উদ্দীপকে ইখতিয়ার উদ্দিন এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের বখতিয়ার খলজি ছোটবেলা থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। হুসামউদ্দিনের সান্নিধ্যে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার দ্বারা তিনি বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন এবং লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষেত্রেও দ্রষ্টব্য। তার প্রাথমিক জীবন সুখের ছিল না। ভাগ্য পরিক্রমায় গজনির মুহাম্মদ ঘুরীর তাকে ক্রয় করেন। এ সময় তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে ভারত শাসন ও রাজ্য বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তিনি ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে ভারতে স্বাধীন দিল্লি সালতানাত ও দাস বংশের শাসনের গোড়াপত্তন হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইখতিয়ার খলজি ও সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭৩ ঈদের কেনাকাটা করতে গিয়ে জাফর সাহেব কাপড় চোপড়ের দামের ব্যাপক গড়মিল ও উর্ধ্বগতিতে বাচ্চাদের পছন্দের পোশাক কিনতে না পেরে হতাশায় পড়লেন। কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের দোকানে গিয়ে তিনি এর ব্যতিক্রম লক্ষ করে ভাবলেন যদি সব জিনিসের দাম এভাবে নির্ধারণ করা থাকত তাহলে সাধারণ জনগণ ভীষণভাবে উপকৃত হতো। যদিও রমজান উপলক্ষে কাঁচা বাজারে কিছুটা দাম বেঁধে দেয়া পদ্ধতি ইতিপূর্বে সরকার চালু করেছে কিন্তু কার্যকর তদারকির অভাবে তা কেবল কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ রয়ে যায়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. 'ভারতের তোতা পাখি' কাকে বলা হয়? ১

খ. বন্দেগান-ই-চেহেলগান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় আলাউদ্দিন খলজীর গৃহীত পদক্ষেপটির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আইন প্রণয়নের চেয়ে বাস্তবায়ন করাই কঠিন উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কবি আমীর খসরুকে ভারতের তোতা পাখি বলা হয়।

খ সৃজনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় আলাউদ্দিন খলজির গৃহীত পদক্ষেপটি হলো মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই নানামুখী সংস্কারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কার্যগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। তিনি মূলত সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশলিতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনীর বেতন পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকেও তার এ ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাফর সাহেব ঈদের কেনাকাটা করতে গিয়ে দামের গড়মিল ও উর্ধ্বগতিতে পছন্দের পোশাক কিনতে পারেননি। একটি বিশেষ ধরনের দোকানে তিনি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেন এবং ভাবলেন যদি সব জিনিসের দাম এভাবে নির্ধারণ থাকত তাহলে সাধারণ জনগণ ভীষণভাবে উপকৃত হত। দাম নির্ধারণ করার এই পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজি প্রবর্তন করেন।

সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ আইন প্রণয়নের চেয়ে তা বাস্তবায়ন করাই কঠিন — উক্তিটি যথার্থ।

আইন প্রণয়ন করা যতটা সহজ তা বাস্তবায়ন করা ততটাই কঠিন। শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হয় না। আইনটিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়। কেননা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আইনটি তৈরি স্বার্থক হয়। আইন তৈরির চেয়ে বাস্তবায়ন করা যে কতটা কঠিন তা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের সরকারের দাম বেধে দেয়া পদ্ধতিটি আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুরূপ। উদ্দীপকের সরকার কার্যকর তদারকির অভাবে তা কেবল কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তিনি সেটিকে বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তবে আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করার জন্য তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। এ পদ্ধতি তত্ত্বাবধানের জন্য সুলতানকে শাহানা-ই-মান্ডি এবং দিউয়ান-ই-রিয়াসত নামে দুজন কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হয়েছিল। শাহানা-ই-মান্ডি নামক কর্মচারী শস্যের বাজারের তত্ত্বাবধান করতেন। দিউয়ান-ই-রিয়াসত বস্ত্র ও বাজারের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন। এ দুজন কর্মকর্তা মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাতে বাস্তবায়িত হয় সেজন্য ঘুরে ঘুরে বাজার পরিদর্শন করতেন। কেউ দাম বৃদ্ধি করলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। কেউ দাম বৃদ্ধির আশায় গুদাম করে রাখলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। ওজন পরিমাপে কারচুপির জন্যও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এ সকল কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অনেক সহজেই গ্রহণ করেছিলেন, তবে এ ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করতে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭৪ রহমান সাহেব সমাজের একজন প্রগতিশীল মানুষ। তিনি সমাজের তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় ও বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিচলিত হয়ে তাদের নিয়ে 'যুব সংঘ' নামের একটি সংগঠন তৈরি করেন। এখানে তিনি বেকার ও অসহায় যুবকদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মানবসম্পদে পরিণত করেন এবং বিদেশী একটি এনজিও-র সহায়তায় তাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ফলে উক্ত ক্লাবটি স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. কুতুব মিনার কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্লাবটির সাথে ফিরোজ শাহ তুঘলকের যে প্রতিষ্ঠানের মিল আছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত ক্লাবের চেয়ে ফিরোজ শাহের প্রতিষ্ঠানটির পরিধি আরো ব্যাপকতর ও বাস্তবধর্মী ছিল — বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

খ কুতুব মিনার হলো সুলতান ইলতুৎমিশের অন্যতম স্থাপত্য কৃতিত্ব। ইলতুৎমিশের স্থাপত্য কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকলার মধ্যে কুতুব মিনার একটি। কুতুব মিনার তার অবিনাশী স্থাপত্য শিল্প নিয়ে আজও বিদ্যমান। এটি ভারতবর্ষের একটি সাংস্কৃতিক স্থাপত্য শিল্প। কুতুব মিনারের উচ্চতা ১২০ মিটার। ইটের তৈরি এ মিনারটি পৃথিবীর উচ্চতম মিনারের মধ্যে অন্যতম। এটি ভারতের দিল্লিতে অবস্থিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্লাবটির সাথে ফিরোজ শাহ তুঘলকের দিওয়ান-ই-বন্দেগান' প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে।

ফিরোজ শাহ তুঘলক শাসক ও সংস্কারক হিসেবে ছিলেন দিল্লির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি ছিলেন একজন জনদরদি শাসক। তিনি জনকল্যাণার্থে কয়েকটি নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' যেটির প্রতিচ্ছবি উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমান সাহেব সমাজের তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় ও বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিচলিত হয়ে তাদের নিয়ে 'যুবসংঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এ সংঘের মাধ্যমে তিনি বেকার ও অসহায় যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করেন এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক ও অনুরূপ একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি 'দেওয়ান-ই-বন্দেগান' নামে পরিচিত। বিশাল দাস বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য সুলতান এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিওয়ান-ই-বন্দেগানের মাধ্যমে সুলতান যুবকদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং চাকুরির সুবন্দোবস্ত করতেন। বেকার ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব ছিল দিল্লির কোতোওয়ালের ওপর। সুলতান নিজে তাদের অবস্থা এবং গুণাবলি পরীক্ষা করে উপযুক্ত চাকুরিতে নিয়োগ করতেন। সুলতানের 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যের অনেক বেকার তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এ বিভাগটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

সুতরাং বলা যায়, ফিরোজ শাহ তুঘলকের 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' এবং উদ্দীপকে বর্ণিত ক্লাবটি এক ও অভিন্ন।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ক্লাবের চেয়ে ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রতিষ্ঠানটির পরিধি আরো ব্যাপক ও বাস্তবধর্মী ছিল মন্তব্যটি যৌক্তিক।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা প্রজাকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দিল্লি সালতানাতের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক জনকল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছেন। তার প্রতিষ্ঠিত 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' বিভাগটি ছিল জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থারই একটি সম্প্রসারিত রূপ। সুলতানের সকল জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডই ছিল মানবতার এবং বাস্তবধর্মী।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রতিষ্ঠিত 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' বিভাগটির কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের ক্লাবটির চেয়েও বিস্তৃত এবং বাস্তবধর্মী। কেননা উদ্দীপকের ক্লাবটি শুধু অসহায় এবং বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। সুলতানের 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' বিভাগটি উদ্দীপকের ক্লাবের এ কর্মকাণ্ডের মতো বেকারদের চাকরির সুবন্দোবস্ত করে। তবে এর পাশাপাশি আরো কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। এ বিভাগটি সাম্রাজ্যের বেকার যুবকদের খুঁজে বের করত। এজন্য কোতোওয়াল নামে একজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। বেকার যুবক এবং দাসদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করত। যোগ্যতা অনুসারে তাদের চাকরিতে নিয়োগ করা হত। সুলতান নিজেই তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা নিতেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সুলভ করার জন্য এ বিভাগটির পাশাপাশি সুলতান ৩৬টি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাও গড়ে তুলে ছিলেন। সুলতানের এ সকল উদ্যোগের ফলে সাম্রাজ্যে বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের ক্লাবের চেয়ে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান'-এর পরিধি আরো ব্যাপক এবং বাস্তবধর্মী।

প্রশ্ন ▶ ৭৫ সিস্তানে অ্যাসাসিন সম্প্রদায়ের হত্যা ও লুটতরাজ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, উক্ত এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে সরকার প্রধান উক্ত সম্প্রদায়কে দমন করে। পরবর্তীকালে যৌথ অভিযানের মাধ্যমে অ্যাসাসিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বহুলাংশে সফল হলেও তাদের সাথে সরকারের সন্ধি স্থাপনের ফলে তারা ঐ অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি থেকে বিরত থাকে। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. কিতাবুল হিন্দ কে রচনা করেন? ১
খ. মুহাম্মদ-বিন-কাসিমের মৃত্যু কাহিনী বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে বলবনের শাসনামলের কোন সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সরকারের অভিযানের ফলাফলের সাথে বলবনের দস্যু বিরোধী অভিযানের ফলাফলের সাদৃশ্য পর্যালোচনা কর। ৪

৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিতাবুল হিন্দ আল বিরুনী রচনা করেন।

খ খলিফা সুলায়মানের নিকট সিন্ধুর রাজা দাহিরের দুই কন্যা সূর্য দেবী ও পরিমল দেবীর পেশকৃত তাদের শ্লীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত ও হত্যা করে তার দুই কন্যাকে বন্দি করে খলিফা সুলায়মানের নিকট প্রেরণ করেন। সুলায়মানের নিকট তারা কাসিমের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগ করে। এতে সুলায়মান ক্ষিপ্ত হয়ে কাসিমকে লবণ মাখানো গরুর চামড়ায় আবদ্ধ করে দামেস্কে (সিরিয়ায় অবস্থিত) আনার নির্দেশ দেন এবং এভাবে নেওয়ার সময় দামেস্কের পথেই তিনি মারা যান।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনামলের মেওয়াটি দস্যুদের মিল রয়েছে।

মেওয়াটি দস্যুরা সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল। তারা সুলতানের শাসনামলে জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। তারা ছিল মেওয়াটের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। উদ্দীপকে অনুরূপ সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডই লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিস্তানে অ্যাসাসিন সম্প্রদায়ের হত্যা ও লুটতরাজ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে উক্ত এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে সরকার উক্ত সম্প্রদায়কে দমন করেন। সিস্তানের অ্যাসাসিন সম্প্রদায়ের সাথে মেওয়াটি দস্যুরা সাদৃশ্যপূর্ণ। মেওয়াটি পার্বত্য অধিবাসি দস্যুরা দিল্লি ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে চরম উৎপাত, লুটতরাজ ও নির্দয় হত্যাযজ্ঞ চালাত। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, 'তাদের ঔদ্ধত্য এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আছর নামাজের পর রাজধানী দিল্লির পশ্চিম ফটক বন্ধ করে দিতে হতো। দুর্ধর্ষ মেওয়াটি দস্যুরা প্রকাশ্য দিবালোকে পথচারীদের স্বর্বস্ব লুটে নিত। বিদ্রোহীরা নিরীহ পল্লিবাসীর ওপর বর্বর উৎপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়ে সমগ্র মেওয়াটি অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে সুলতান বলবনের রাজত্বকালের মেওয়াটি দস্যুদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সরকারের অভিযানের ফলাফলের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের দস্যু বিরোধী ফলাফল সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের অন্যতম কৃতিত্ব মেওয়াটি দস্যুদের দমন। মেওয়াটি দস্যুদের হত্যা ও লুটতরাজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য সুলতান তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে সুলতান সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। উদ্দীপকের সরকারের অভিযানের অনুরূপ ফলাফল বিদ্যমান।

উদ্দীপকে বর্ণিত সরকার যৌথ অভিযানের মাধ্যমে অ্যাসাসিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। বহুলাংশে সফল হলেও সরকার তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি বন্ধ করেন। উদ্দীপকের সরকারের মতো সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মেওয়াটি দস্যুদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন নি। তবে সুলতান মেওয়াটি দস্যুদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতান জনগণের জানমাল ও দিল্লির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেওয়াটি দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। সুলতানের নির্দেশে দস্যুদের অভয়ারণ্য দিল্লির আশেপাশের বড় বড় জঙ্গলগুলো কেটে পরিষ্কার করা হয়। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতান মেওয়াটিদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করে তোলেন। তারা যাতে আবার গোলযোগ করতে সমর্থ না হয় সেজন্য সুলতান প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করেন। সহস্র মেওয়াটির পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করেন। এভাবে কঠোর হস্তে সুলতান দুর্ধষ পার্বত্য অধিবাসীদের দমন করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও শান্তি স্থাপন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের সরকারের অভিযানের ফলে যেমন দস্যুবৃত্তি বন্ধ হয়েছিল, তেমনি সুলতান বলবনের মেওয়াটিদের দমনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭৬ সমীর সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান। তাঁর বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠা পরিচালনার জন্য যোগ্য পুত্র না থাকায় তিনি রফিক সাহেবকে দত্তক নেন এবং তাকে সন্তান স্নেহে লালন-পালন করেন। রফিক সাহেবের মেধা ও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সমীর সাহেব নিজ কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেন। এক সময় সমীর সাহেব মৃত্যুবরণ করলে তার অযোগ্য পুত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল ধরেন। কিন্তু তার খামখেয়ালীতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ কর্মকর্তার অনুরোধে রফিক সাহেব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সমীর সাহেবের কিছু আত্মীয় ও অনুগত কর্মচারী রফিক সাহেবের বিরোধিতা করতে থাকে। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে রফিক সাহেব তাদের কঠোরভাবে দমন করে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। রফিক সাহেবের দক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি শক্তিশালী ও একক লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। *[বিএ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভারতের তোতা পাখি কাকে বলা হয়? ১
খ. তারিখ-ই-ফিরোজশাহী এর ওপর একটি টীকা লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের রফিক সহেবের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে ইলতুৎমিশের ক্ষমতা গ্রহণের কি মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতান ইলতুৎমিশের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কবি আমীর খসরুকে ভারতের তোতা পাখি বলা হয়।

খ জিয়াউদ্দিন বারানী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
ফিরোজ শাহ তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতায় জিয়াউদ্দিন বারানী 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটিতে জিয়াউদ্দিন বারানী ফিরোজ শাহ এর শাসনামলের অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই ফিরোজ শাহের শাসনামলের ইতিহাস জানার জন্য এ গ্রন্থটি অতি মূল্যবান।

গ উদ্দীপকের রফিক সাহেবের সাথে সুলতানি আমলের শাসক শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশের মিল রয়েছে।
শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ তুর্কিস্তানের অভিজাত ইলবারি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের শিকার হয়ে তিনি দাস হিসেবে প্রাথমিক জীবন পার করেন। পরবর্তীতে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে দিল্লি সালতানাতের শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। উদ্দীপকের রফিক সাহেবের জীবনেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে।
রফিক সাহেবকে সমীর সাহেব দত্তক নেন। পরবর্তীতে রফিক সাহেব নিজ যোগ্যতাবলে সমীর সাহেবের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পর রফিক সাহেব ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন। ঠিক একইভাবে ইলতুৎমিশ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ভ্রাতৃবিরোধের শিকার হয়ে শৈশবেই জনৈক ব্যক্তির নিকট দাস হিসেবে বিক্রি হন। পরবর্তীতে তাকে দিল্লিতে এনে কুতুবউদ্দিন আইবেকের নিকট দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়। ইলতুৎমিশের প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে কুতুবউদ্দিন স্বীয় কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্দেশে তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আইবেকের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিশ দিল্লির সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন। উদ্দীপকে এ দৃশ্যপটেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ পাঠ্যপুস্তকের শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশের কর্মকাণ্ডের সাথে রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।
সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কেননা তিনি সকল গোলযোগ ও সংকট দূর করে দিল্লি সালতানাতের পূর্বের গৌরব ফিরিয়ে আনেন। সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে বিচলিত না হয়ে বরং একজন বাস্তববাদী ব্যক্তি হিসেবে ইলতুৎমিশ অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলায় অগ্রসর হন। তিনি সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যা, বারানসি, বাদাউন, সিওয়ালিকসহ দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সুযোগে ক্ষমতালোভী অভিজাতবর্গ, আমির-মালিক এবং প্রদেশ পালদের বিদ্রোহ শুরু হয়। এছাড়া সিন্ধু, বাংলা, রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে ভারতে তুর্কি আধিপত্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ইলতুৎমিশ সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে সাহস, দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করে দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। একই সাথে সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিতও করেন। মূলত তার দৃঢ়তা ও উদ্যমশীল কর্মপ্রচেষ্টা ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্য দিল্লি সালতানাতকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অঙ্কুরে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। ঠিক একইভাবে উদ্দীপকের রফিক সাহেবও কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ গ্রহণ করে কোম্পানীর বিশৃঙ্খলা দূর করে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।
পরিশেষে বলা যায়, সুলতান ইলতুৎমিশের মতোই রফিক সাহেব তার কোম্পানীর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন।

প্রশ্ন ▶ ৭৭ আবদুর রহমান একটি দেশের একজন দক্ষ শাসক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী না থাকলে রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করা যায় না। তাই নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করতে মনোযোগী হন। তিনি নিজের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং বিভিন্ন বাহিনীকে নতুনভাবে গঠন করে তার পরিচালনার ভার সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতির হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি তাদের পদমর্যাদা, বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করেন। এভাবে আবদুর রহমান তার সৈন্যবাহিনীকে দক্ষ ও শক্তিশালী রূপে গঠন করতে সক্ষম হন। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ভারতবর্ষে 'তুর্কি' শাসন পদ্ধতির প্রবর্তক বলা হয় কাকে? ১
খ. বন্দেগান-ই-চেহেলগান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে গিয়াস উদ্দিন বলবনের কোন সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত সংস্কারের ফলাফল বলবনের উক্ত সংস্কারের ফলাফলের অনুরূপ – বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষের তুর্কি শাসনের প্রবক্তা বলা হয় সুলতান শাসুউদ্দিন ইলতুৎমিশকে।

খ সৃজনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে গিয়াসউদ্দিন বলবনের সামরিক সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে।
শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রয়োজনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এজন্য উদ্দীপকের আবদুর রহমান একজন দক্ষ শাসক হিসেবে সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছেন। দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে গিয়াসউদ্দিন বলবনও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বিশ্বাস করতেন, শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সেনাবাহিনী ছাড়া রাজশক্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ষড়যন্ত্র নির্মূল, বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একটি শক্তিশালী ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন। সেনাবাহিনীর আনুগত্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি জায়গির প্রথার পরিবর্তে নগদ অর্থে বেতন প্রদানের নিয়ম চালু করেন। বলবন সামরিক বাহিনীতে কর্তব্য পালনে উপযোগী লোকদের নিয়মিত বাহিনীতে ভর্তি করান। তিনি তাদের আকর্ষণীয় বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। বলবন

teachingbd24.com

সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আমিরদের ওপর পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গঠনে সুলতানের এ সকল পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের শাসক আবদুর রহমানের কার্যক্রমের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারের ফলাফলের সাথে গিয়াসউদ্দিন বলবনের সংস্কারের ফলাফলের সাদৃশ্য রয়েছে।

যেকোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সুদক্ষ, প্রশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর কোনো বিকল্প নেই। উদ্দীপকের শাসক আবদুর রহমানও দক্ষ ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে তার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করতে সমর্থ হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি যে সামরিক সংস্কার করেছেন তা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়েছে। গিয়াসউদ্দিন বলবনের সামরিক সংস্কারের ফলাফলও এরূপ সফল হয়েছিল।

একটি শক্তিশালী ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করে দিল্লি সালতানাতের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সুদৃঢ় করার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি মেওয়াটবাসীদের বিদ্রোহ, দোয়াবের বিদ্রোহ ও উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং চল্লিশ চক্রের বিলোপ সাধন করেন। তিনি তার সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর দ্বারা ভারতবর্ষকে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। তার সময়ে দিল্লি নগরী মুসলিম কৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি তুর্কি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে নবজীবন দান করেন; সালতানাতের গৌরব পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; সাম্রাজ্যের সর্বত্র অব্যাহত শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে মোঙ্গল হামলা থেকে নিরাপত্তা বিধানকল্পে এক নতুন নীতির প্রবর্তন করেন। এসব দিক পর্যালোচনা করলে বলবনকে 'সালতানাতের প্রকৃত সংরক্ষণকারী' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্কারের ফল বলবনের সামরিক সংস্কারের ফলাফলের অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ৭৮ ওয়াটসন একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার রাজনৈতিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। একমাত্র আত্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য তিনি একটি ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সকল কৃতিত্বের জন্য তাঁকে ফ্রান্সের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ]*

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. 'চল্লিশের চক্রের ক্ষমতা' কে কীভাবে ধ্বংস করেন? ২

গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ড দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের ন্যায়বিচার ও মুদ্রা সংস্কার উচ্ছসিত প্রশংসা অর্জন করে — পাঠ্য বইয়ের আলোকে লেখ। ৪

৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক।

খ সুলতান বলবন চল্লিশ চক্রের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

সুলতান ইলতুৎমিশের গঠিত চল্লিশ চক্র তার মৃত্যুর পর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের আমলে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। তখন বলবন তাদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে বিশেষ সুবিধা বাতিল করেন এবং অবাধ মেলামেশা, রাজদরবারের হাসি-ঠাট্টার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। জনগণের মন থেকে চল্লিশ গোষ্ঠীর প্রভাব দূর করার জন্য তিনি সামান্য অপরাধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবন চল্লিশ চক্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গ সৃজনশীল ৭১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের ন্যায়বিচার ও মুদ্রা সংস্কার প্রভৃত প্রশংসা লাভ করে।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ ছিলেন দিল্লি সালাতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান হিসেবে ইলতুৎমিশ দায়িত্ব নিয়ে দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করে দিল্লি সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শাসক হিসেবে তার সংস্কার কার্যক্রমসমূহ ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের ওয়াটসনসহ তার রাজনৈতিক প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ফ্রান্সে সিংহাসনারোহণ করেন। শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য তিনি ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। যার ফলে তাকে ফ্রান্সের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দেওয়া হয়। যা আমরা সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের ক্ষেত্রেও পাই। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই প্রথম শাসক যিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় সুলতান দরবারে একটি শিকল বাঁধা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এটি বাজিয়ে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া ইলতুৎমিশই প্রথম আরবীয় রীতিতে রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর আরবীয় মুদ্রায় আরবিতে আল্লাহর নাম খচিত ছিল। একটি সঠিক পরিমাপের রূপাইয়ার ওজন ছিল ১৭৫ গ্রাম। তাঁর মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফার নাম অঙ্কিত ছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিভিন্ন সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের সংস্কার কার্যক্রমগুলোর আলোকে ডব্লিউ হেগ তাঁকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই দাস বংশের শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৭৯ চাচাত ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় বাধ্য হয়েই সামিউলকে ভাইয়ের বিশাল তালুকের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয়। তিনি ছিলেন সুবিচারক এবং উদার শাসক। শাসন ব্যবস্থাকে তিনি জনকল্যাণমুখী এবং উদার করেছিলেন। তিনি তার প্রজাদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বেকার, হত দরিদ্র, অসহায় ও বালিকা শিশুদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া নানা রকম সংস্কার করেও তিনি সুনাম অর্জন করেন। *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ]*

ক. ফিরোজ শাহ তুঘলক কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১

খ. তৈমুর লঙ এর ভারত আক্রমণের ফলাফল কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের সামিউলের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের কাজের মিল লক্ষ করা যায়? তাঁর জনহিতকর পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবৃত কর। ৩

ঘ. তোমার জানামতে শাসকের কোন কোন কাজের জন্য তাঁকে সালতানাতের পতনে আংশিকভাবে দায়ী করা যায়? তুমি কি সেগুলো সমর্থন কর। ৪

৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খ তৈমুর লঙ ১৩৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

তৈমুরের ভারত আক্রমণ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি স্মরণীয় ঘটনা। দিল্লি সালতানাত যখন পতনোন্মুখ ঠিক সেই সময়েই মধ্য এশিয়ার দুর্ধষ সমর নেতা আমির তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেন। তিনি বর্ণনাতীত নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন করে দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেন।

গ উদ্দীপকের সামিউলের সাথে আমার পঠিত শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনকল্যাণকর কাজের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন প্রজারঞ্জক সুলতান ছিলেন। মানবকল্যাণমূলক কার্যাবলির জন্য ইতিহাসে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমনটি উদ্দীপকের সামিউলের কর্মকাণ্ডেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, চাচাত ভাইয়ের মৃত্যুর পর সামিউলকে তালুকের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয়। তিনি ছিলেন সুবিচারক ও উদার শাসক। শাসনব্যবস্থাকে জনকল্যাণমুখী করতে তিনি তার প্রজাদের জন্য নানা কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের কর্মকাণ্ডেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

Teachingbd24.com

ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রজাহিতৈষণামূলক কয়েকটি পদক্ষেপ ইতিহাসে 'মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য দিকের মধ্যে ছিল বিবাহ দপ্তর এবং চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা। বিবাহ দপ্তরের মাধ্যমে গরিব ও অনাথ মেয়েদের সরকারি খরচে বিয়ে এবং বেওয়ারিশ লাশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের ব্যবস্থা করা হতো। 'দিওয়ান-ই-ইস্তহক' নামক দপ্তর থেকে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো। প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুলতান 'দার উস শেফা' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য শহরে এরকম আরও ৪টি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। সুলতান ৩৬টি ক্ষুদ্র ও শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিলেন। কৃষিকাজের উন্নতির জন্য খাল খনন করেন এবং প্রায় ১২০০ উদ্যান নির্মাণ করে আয়ের টাকা দিয়ে খাদ্যঘাটতি পূরণ করেন। এভাবে সুলতান জনমঙ্গলকর কাজের দ্বারা তার শাসনব্যবস্থাকে স্মরণীয় করে রাখেন।

ঘ বেশ কিছু অদূরদর্শী কার্যকলাপের ফলে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলককে সালতানাতের পতনে আংশিকভাবে দায়ী করা যায়।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের মানবীয় সংস্কার ও উদার নীতির মধ্যে তুঘলক বংশের পতনের বীজ নিহিত ছিল। তার কোনো কোনো নীতি ও কার্যাবলি শুধু তুঘলক বংশের নয়, দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্যও দায়ী ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, পূর্ববর্তী শাসন কালের বিপরীতে ফিরোজের রাজত্বকালে কোমলতা ও বহু জনহিতকর কাজ পরিদৃষ্ট হলেও তার শাসনকাল অনেকাংশে দিল্লির সালতানাতের ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল। সুলতান দুর্বল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কঠোরতা প্রদর্শন করে নয় ক্ষমা ও উদারতা দ্বারা তিনি জনগণের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। রক্তপাত পছন্দ করতেন না বলে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এতে তুঘলক বংশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুলতানের জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ ছিল। সুলতানের দুর্বল সেনাবাহিনী তুঘলক বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল। এছাড়া সুলতানের অদূরদর্শী ধর্মীয় নীতিও তুঘলক বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসননীতি ও কার্যাবলি তুঘলক বংশের এমনকি সালতানাতের পতনের পথকে সুগম করেছিল। আর পি ত্রিপাঠী যথার্থই বলেছেন, "ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, যেসব গুণাবলি ফিরোজকে জনপ্রিয় করেছিল, সেগুলো বিশেষভাবে দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্বকে দুর্বল করে ফেলেছিল।"

প্রশ্ন ▶৮০ আজগর আলী মেঘনা গ্রুপের এমডি হিসেবে সম্প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রতিষ্ঠানের চিরাচরিত কার্যক্রমের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ৫টি প্রধান পরিকল্পনা ছিল। এগুলো আজগর আলীর মহাপরিকল্পনা নামে খ্যাত। তার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ থাকা সত্ত্বেও সময়ের তুলনায় তা ছিল ব্যতিক্রমী ও অগ্রবর্তী ধ্যান ধারণা। ফলে পরিকল্পনাগুলো চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ]

ক. কুতুব উদ্দিন আইবেক কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১

খ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে কী জান? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্য বই এর কোন ঘটনার মিল লক্ষ করা যায়? সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের 'তাম্রমুদ্রা প্রচলন' পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ ও ব্যর্থতা লিখ। ৪

৮০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খ মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজির একটি অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা। পণ্য সামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুদ্রাস্ফীতির কারণে মুদ্রার দৃশ্যমান হ্রাস পেলেও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে এ ব্যবস্থায় সামরিক বেসামরিক নির্বিশেষে প্রজা সাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে সুলতান খাদ্য দ্রব্যসহ নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন।

গ উদ্দীপকের পরিকল্পনার সাথে আমার পঠিত মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনার সাদৃশ্য রয়েছে।

মুহাম্মদ-বিন-তুঘলক চিরাচরিত শাসনপদ্ধতিতে কিছু ব্যতিক্রম ঘটানোর জন্য নতুন নতুন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ থাকা সত্ত্বেও অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তা ব্যর্থ হয়। ঐতিহাসিকগণ তার এ পকিল্পনাসমূহকে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

আজগর আলী মেঘনা গ্রুপের এমডি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর কিছু নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ৫টি প্রধান পরিকল্পনা ছিল প্রধান প্রশাসনিক দফতর মতিঝিল থেকে মিরপুরে স্থানান্তর, তেজগাঁয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের এমডির সাথে প্রতিযোগিতা এবং জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় নতুন পদ্ধতি প্রচলন। যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকও তার রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার পরিকল্পনাগুলো হলো দিল্লি হতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন, খোরাসান অভিযান, প্রতীক তাম্রমুদ্রা প্রচলন, কারাচিল অভিযান এবং দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি। সাম্রাজ্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও উদ্দীপকের ন্যায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

ঘ উক্ত শাসকের অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 'তাম্রমুদ্রা প্রচলন' ছিল যুগের প্রয়োজনে ও বাস্তবতার নিরিখে। কিন্তু যথাযথ আইনের প্রয়োগের অভাবে তা ব্যর্থ হয়।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের পদক্ষেপটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক হলেও এ মুদ্রানীতি কার্যকর করার বিষয়টি ত্রুটিযুক্ত ছিল। প্রবর্তিত তামার নোটের কোনো নিরাপত্তা চিহ্ন না থাকায় এবং কালোবাজারিদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির বিধান না থাকায় সুলতানের পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুলতান যুগের প্রয়োজনে ও বাস্তবতার নিরিখে ধাতব মুদ্রা চালু করলেও সুবিধাবাদিদের স্বার্থপরতা ও অসহযোগিতার কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উচ্চাভিলাষী শাসক মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রতীকী তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জাল মুদ্রা নিরোধে সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় অসাধু ব্যক্তিরা অসংখ্য জাল মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। জনগণ জাল মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করায় রাষ্ট্র আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। 'বিদেশিরা প্রতীকী মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সুলতান বাধ্য হয়ে বাজার থেকে তামার নোট তুলে নেওয়ার আদেশ জারি করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতীকী তাম্র মুদ্রার পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতীকী তাম্র মুদ্রা চরমভাবে ব্যর্থ হয়। তা উদ্দীপকের ধাতব মুদ্রার ব্যর্থতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৮১ মি. 'ক' সর্বপ্রথম বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করতে সফলকাম হন। বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি ইসলামের প্রচার ও সমাজ ব্যবস্থাকে সুদূরপ্রসারী করেন। ইরানী বংশোদ্ভুত মি. ক একজন তেজস্বী ও রণকুশলী যোদ্ধা ছিলেন। বাংলা জয়ের পর মাত্র ১৫ জন অশ্বারোহীর নিকট একটি অগ্রগামী দলের অধিনায়ক হয়ে অতর্কিত আক্রমণে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজাকে রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করেন। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*

https://teachingbd24.com

ক. কত সালে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১
খ. ইবনে বতুতা সম্পর্কে যা জান লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের বিজেতা মি. 'ক' এর সাথে বাংলার কোন শাসকের মিল আছে? ৩
ঘ. উক্ত বিজেতার বঙ্গ বিজয়ের সম্পর্কে তোমার ধারণা নিরূপণ কর। ৪

৮১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ ইবনে বতুতা ছিলেন মরক্কোর অধিবাসী ও একজন পর্যটক।
ইবনে বতুতা মাত্র একুশ বছর বয়সে বিশ্বভ্রমণে বের হন এবং উত্তর-আফ্রিকা, আরব, পারস্য, কনস্টান্টিনোপল, ভারত ও বঙ্গাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ১৩৩০ সালে মতান্তরে ১৩৩২ সালে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি দিল্লির প্রধান কাজি হিসেবে ৮ বছর সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার ভ্রমণ কাহিনি 'রিহালা-ই-ইবনে বতুতা' ইতিহাসের একটি অমূল্য উপাদান।

গ উদ্দীপকের বিজেতা মি. 'ক'-এর সাথে বাংলা বিজয়ী মুসলমান শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মিল রয়েছে।
ভাগ্য সব সময় মানুষের অনুকূলে থাকে না। তবে প্রচেষ্টা থাকলে শেষ পর্যন্ত সফলতা অনিবার্য। বখতিয়ার খলজিও প্রথম জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি নিজ প্রচেষ্টায় সকল ব্যর্থতাকে পাশ কাটিয়া সফলতাকে ছিনিয়ে আনেন। এমনকি তিনি মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, মি. 'ক' সর্বপ্রথম বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করতে সফলকাম হন। বাংলা জয়ের পর তিনি মাত্র ১৫ জনের অশ্বারোহী একটি অগ্রগামী দলের অধিনায়ক হয়ে অতর্কিত আক্রমণে পাশ্ববর্তী রাজ্যের রাজাকে রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করেন। অনুরূপভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক যখন উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত তখন তার সুদক্ষ তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি পূর্বভারতের বিহার ও বাংলা অধিকার করেন। ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিহারের উদন্তিপুর দখল করেন। এরপর ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাত্র ১৭/১৮ জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেন এবং নদীয়ার সেন বংশের রাজা লক্ষণ সেনকেও রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। উদ্দীপকেও এ শাসকের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত বিজেতা অর্থাৎ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয় ইতিহাসের অন্যতম চমকপ্রদ ঘটনা।
যেকোনো কাজে সফলতা লাভের জন্য পরিকল্পনা ঠিক করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা যত সূক্ষ্ম ও যথাযথ হবে ততই সফলতা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। উদ্দীপকের মি. 'ক' অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষ দলের দুর্বলতা চিহ্নিত করে কৌশলে অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তার এরূপ কৌশল বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়ের কৌশলের সাথে প্রায় মিলে যায়।
বখতিয়ার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাংলার সেন রাজা লক্ষ্মণ সেন এ সময় দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়াতে অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার বুঝেছিলেন যে, স্বাভাবিক কারণেই লক্ষ্মণ সেন বাংলায় প্রবেশের একমাত্র পথ তেলিয়াগরিতে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। তাই তিনি বাংলা আক্রমণের জন্য বেছে নিলেন ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল। তিনি তার সেনাবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করেন। সতেরো সৈন্যের প্রথম দলের অগ্রভাগে ছিলেন বখতিয়ার খলজি। অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে তারা বিনা বাধায় লক্ষ্মণ সেনের নদীয়ার রাজপুরীতে চলে আসেন। মধ্যাহ্ন দুপুরে লক্ষ্মণ সেনের অপ্রস্তুত প্রহরীদের সহজেই তিনি পরাজিত করলেন। এভাবে সহজেই কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি জয়লাভ করলেন।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ যেন উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক'-এর জয়েরই প্রতিরূপ।

প্রশ্ন ▶৮২ শ্বশুর যে সব কাজ করতে সক্ষম হয়নি, জামাতা ইয়াহিয়া ঐ সব কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইয়াহিয়া তার শাসনাধীন এলাকায় মুসলিম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক একটি মিনার নির্মাণ করে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। ইয়াহিয়াকে অপূর্ব নকশাকৃত সমাধিতে সমাহিত করা হয়।

[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]

ক. আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদ কোথায় অবস্থিত? ১
খ. 'ইলতুৎমিশ সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইয়াহিয়ার মতো পাঠ্যপুস্তকের একজন শাসকের রাজ্য সম্প্রসারণের ইতিহাস বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ইয়াহিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের মত সংগঠক। – মূল্যায়ন কর। ৪

৮২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদ আজমিরে অবস্থিত।

খ সুলতান ইলতুৎমিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল রৌপমুদ্রার প্রচলন।
উপমহাদেশের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান ইলতুৎমিশ সর্বপ্রথম 'রূপাইয়া' নামক রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তন করেন। এ মুদ্রায় বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার নামের সাথে 'বিশ্ববাসীদের নেতার সাহায্যকারী' হিসেবে নিজের নাম উৎকীর্ণ করা হয়।

গ ইয়াহিয়ার মতো পাঠ্যপুস্তকের একজন শাসক হলেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ। তিনি রাজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী, দুর্দমনীয় সাহসী ও তেজস্বী, রণনিপুণ যোদ্ধা সুলতান ইলতুৎমিশ রাজ্য সম্প্রসারণকারী হিসেবেও সমকালীন ইতিহাসে অনন্য খ্যাতির অধিকারী ছিলেন।
নবজাত তুর্কি সালতানাতের অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধান ও সংহতি বিধানের পর সুলতান ইলতুৎমিশ বিদ্রোহ দমন ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে দিল্লি সালতানাতের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করেন। ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে রণথম্ভোর এবং ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে মান্দাওয়ার তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি চৌহান রাজ্য জালোয়ারও জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়ার পুনরুদ্ধার করেন। ভিলসা এবং মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীও ইলতুৎমিশের পদানত হয়। এছাড়াও বাদাউন, বেনারস, কনৌজ, দোয়াব এবং অযোধ্যা পর্যন্ত দিল্লি সালতানাতের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। আর এ সকল অঞ্চল নিজ শাসনাধীন আনার মাধ্যমে সুলতান ইলতুৎমিশ তার সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় দেন।

ঘ ইয়াহিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের মতো সংগঠক উক্তিটি যথার্থ।
উদ্দীপকের ইয়াহিয়ার কর্মকাণ্ডে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই ইয়াহিয়াও ইলতুৎমিশের মতোই সংগঠক হবেন।
সুলতান ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে দিল্লি সালতানাতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ কাজটি করতে গিয়ে তাকে বহুমুখী গুণাবলির পরিচয় দিতে হয়েছে। তার এ বহুমুখী গুণাবলির মধ্যে একটি হলো সাংগঠনিক দক্ষতা। তার এ গুণগুলোর মাধ্যমে তিনি বিরুদ্ধবাদী আমিরগণকে কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করেন এবং কঠোর হস্তে বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। রাজপুতদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্বক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ও খাওয়ারিজমের শাহকে রাজ্যে আশ্রয় প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং সর্বোপরি, নতুন রাজ্য জয়ের মাধ্যমে দিল্লিতে সুদৃঢ় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যের সকল বিদ্রোহ দমন করে সকলকে একই পতাকাতলে সমবেত করেন। আর এ বিষয়গুলো তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটায়।
সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন একজন দক্ষ ও সফল সংগঠক। উদ্দীপকের ইয়াহিয়াও এ গুণের অধিকারী বলে বিবেচ্য।

https://teachingbd24.com

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়-৩: ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসন (১৫২৬—১৮৫৮ খ্রি.)

প্রশ্ন ▶১ খলিফা আল হাকিম তাঁর রাজ্যের সকল ধর্মাবলম্বীকে একই পতাকাতলে আনার জন্য একটি ধর্মমত প্রচলন করেন। কিন্তু এ ধর্মমতটি জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে না পারায় তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এর ইতি ঘটে। *[ঢা. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭]*

ক. 'পানিপথের প্রথম যুদ্ধ' কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. 'মনসবদারি প্রথা' কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে কোন মুঘল শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মুঘল শাসকের রাজপুত নীতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ সালে সংঘটিত হয়।

খ সম্রাট আকবর সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের অব্যবস্থা দূর করার লক্ষ্যে ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খানকে মীর বকশী (সামরিক বাহিনীর প্রধান) নিয়োগ করে যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তাই মনসবদারি প্রথা নামে পরিচিত।

'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা মর্যাদা। এ পদের অধিকারীকে 'মনসবদার' এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে 'মনসবদারি প্রথা' বলা হয়। এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদারের মোট দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে ১০ জন সৈন্য সংরক্ষণের নিয়ম ছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফা আল হাকিমের সাথে মুঘল সম্রাট জালালউদ্দিন আকবরের মিল রয়েছে।

মুঘল সম্রাট আকবর ছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তাই নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সব ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তিনি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দূর করার মাধ্যমে নিজেকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে একটি নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। এটি 'দীন-ই-এলাহী' নামে পরিচিত। তবে উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে তার এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি, যেমনটি খলিফা আল হাকিমের প্রবর্তিত ধর্মমতের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

খলিফা আল হাকিম রাজ্যের সকল ধর্মাবলম্বীকে একই পতাকাতলে সমাসীন করতে একটি নতুন ধর্মমত চালু করেন। কিন্তু এটি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। একই পরিস্থিতি সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমতের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। মুঘল সম্রাট আকবরও সুলহী-ই-কুল (ধর্মীয় সহিষ্ণুতা) নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের বুকে 'দীন-ই-এলাহী' নামক একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক বাদাউনী এটিকে তৌহিদ-ই-এলাহী বা ঐশী একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে অভিহিত করেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'সব ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত এটি একটি সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম।' বস্তুত এটিকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই সমীচীন। এই মতবাদের অনুসারীবৃন্দকে সম্রাটের নামে তাদের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম এই চারটি জিনিস উৎসর্গ করতে হতো। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী সম্রাটকে সিজদাহ করতে হতো। তবে মাত্র ১৮ জন এ ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। আর সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধর্মমতের বিলোপ ঘটে। সুতরাং বলা যায়, আল হাকিমের সাথে সম্রাট আকবরের মিল রয়েছে।

ঘ উক্ত সম্রাটের অর্থাৎ সম্রাট আকবরের 'রাজপুত নীতি' ছিল তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এক অনন্য পরিচায়ক।

সম্রাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী করতে হলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী রাজপুতদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন অপরিহার্য। এ জন্য তিনি রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপন করেন। এভাবে তিনি রাজপুতদের বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি লাভে সক্ষম হন। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়; আকবর রাজপুতদের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদগুলোতে নিযুক্ত করে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেন। আবার, বিজিত রাজ্যগুলোর শাসনভার রাজপুতদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের ভিতকে শক্তিশালী করেন।

রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস এক নবযুগের সূচনা করে। এর ফলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনের ব্যাপারে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে হিন্দু তথা রাজপুতরা অনস্বীকার্য অবদান রাখে। রাজপুতদের প্রতি আকবরের উদার আচরণের ফলে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজাতি আকবরকে বিদেশি শাসক বলে মনে করেনি। তাদের সাহায্যেই আকবর বিস্তীর্ণ মেবার অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং রাজপুত সেনানিদের সাহায্যেই আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর কখনই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিংবা ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে রাজপুতনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবর সমস্ত রাজপুতদের নিজ রাজ্যের অংশীদার করে নেওয়ায় সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে পড়েছিল। রাজপুত নীতিই আকবরকে মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে উদারতার এক মূর্ত বিগ্রহে পরিণত করেছে। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি 'মহামতি' আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট যে, সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ও শতাধিক বছর স্থায়ী হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶২ মাহমুদা আক্তারের স্বামী একটি বেসরকারি কোম্পানির মালিক। কোম্পানির বিভিন্ন কাজে মাহমুদা তার স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি তার দুই ভাইকে কোম্পানির উচ্চপদে বসান। এক পর্যায়ে মাহমুদার প্রভাবের কারণে তার স্বামী কোম্পানির নামমাত্র মালিকে পরিণত হন। *[ঢা. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭]*

ক. কোন সম্রাট তাজমহল নির্মাণ করেন? ১

খ. সম্রাট আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপীর' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মাহমুদা আক্তারের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চারিত্রিক মিল থাকলেও উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তার এবং পাঠ্যবইয়ের নূরজাহানের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন—ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেন।

খ ইসলামি অনুশাসনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হওয়ার কারণে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপীর বলা হতো।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন খাঁটি সুন্নি মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চললেও তিনি পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের শাসনামলে যে ধর্মের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল আওরঙ্গজেব তা পুনরুজ্জীবিত করেন। এটা করতে গিয়ে হিন্দুদের কাছে তিনি অপ্রিয় হলেও মুসলমানদের নিকট হতে 'জিন্দাপীর' উপাধি লাভ করেন।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তারের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তারের দিকটি ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত মাহমুদা আক্তার স্বামী ও স্বামীর কোম্পানির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি তার ভাইকে কোম্পানির উচ্চপদে বসিয়েছেন। কোম্পানির নানা কাজে মাহমুদার পরামর্শ ও প্রভাবের কারণে তার স্বামী কোম্পানির নামমাত্র মালিকে পরিণত হন। তার মতো মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানেরও স্বামীর ওপর অপরিসীম প্রভাব ছিল। নূরজাহান অসামান্য রূপলাবণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তার গুণে গুণান্বিত ছিলেন বলে রাজ পরিবারের সর্বত্রই তার অপরিসীম প্রভাব ছিল। জাহাঙ্গীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তিনি তার আত্মীয়স্বজন ও দলীয় লোকদের রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তার পিতা এবং ভ্রাতাকে জাহাঙ্গীরের উজির নিযুক্ত করেন। নূরজাহান সাম্রাজ্যে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মুদ্রায়ও সম্রাটের নামের সাথে তার নাম অঙ্কিত হতো। তার ক্ষমতা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে জাহাঙ্গীর একজন নামমাত্র সম্রাটে পরিণত হয়েছিলেন। উদ্দীপকে মাহমুদা আক্তার মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর এ একক কর্তৃত্ববাদীর গুণটিই ধারণ করেছে।

ঘ চারিত্রিক মিল থাকলেও উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তার এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন— উক্তিটি যথার্থ।
মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের প্রেম-প্রণয় ও প্রভাব বিস্তার মুঘল ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের উন নিসা। তার পিতা পারস্যের অধিবাসী মির্জা গিয়াস বেগ ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আগমন করেন। নানা ঘটনাপ্রবাহে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহান পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি জাহাঙ্গীরের ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যার দরুন অনেকে বলতে বাধ্য হন যে জাহাঙ্গীর নয়, নূরজাহানই সম্রাজ্ঞী ছিলেন।
নূরজাহানের চরিত্রের সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত মাহমুদা আক্তারের মিল থাকলেও তাদের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। মাহমুদা আক্তারকে শুধু কোম্পানির ক্ষমতা দখল করতে দেখা যায়। কিন্তু নূরজাহান তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও আকর্ষণীয় গুণাবলি দ্বারা সম্রাটের মনের ওপরও প্রভাব ফেলেছিলেন। তিনি বিয়ের পর থেকে ১৫ বছর সাম্রাজ্যে প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অসামান্য রূপ ও অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন এই নারী। সর্বগুণে গুণান্বিত নূরজাহানের ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রগাঢ় সাধারণ জ্ঞান এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ আকর্ষণ। তার এ সকল গুণাবলি একদিকে যেমন মুঘল দরবারকে গৌরবান্বিত করে, অন্যদিকে তিনি রাজপরিবার ও রাজ্যের মানুষের কাছে ছলনাময়ীরূপে পরিচিতি লাভ করেন, যা মাহমুদা আক্তারের মধ্যে দেখা যায় না।
উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, চারিত্রিক মিল থাকলেও উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তার এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶ ৩ আকরাম সাহেব একটি বিখ্যাত কোম্পানির মালিক। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে কোম্পানির মালিকানা নিয়ে তার চারপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পিতার মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। পরবর্তীকালে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। *[ঢা. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭]*

ক. মুহাম্মদ বিন তুঘলক কয়টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন? ১
খ. আইন-ই-আকবরী কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব কোন মুঘল সম্রাটের সময়ের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত দ্বন্দ্বে সম্রাটের কোন পুত্র সফলতা লাভ করেছিল এবং কেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ বিন তুঘলক পাঁচটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

খ আইন-ই-আকবরী হচ্ছে আবুল ফজলের রচিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আবুল ফজল উল্লিখিত গ্রন্থটি সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থটিতে মুঘল সম্রাট আকবর এবং তার সাম্রাজ্য সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবুল ফজলের রচিত আইন-ই-আকবরীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

গ আমার পাঠ্যবইয়ের সম্রাট শাহজাহানের আমলের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বন্দ্বের মিল রয়েছে।
১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসকগণ তার জীবনের আশা ছেড়ে দিলে তার চারপুত্র দারাশিকো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহাসন লাভের জন্য আত্মঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এছাড়া সম্রাট শাহজাহান নিজেও জানতেন, পুত্রদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি দারার প্রতি অন্ধস্নেহে আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন এবং বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অভিযানে নিষিদ্ধ করেন। এরূপ দুর্ব্যবহার ভ্রাতৃ সংঘাতকে প্রকট করে তোলে। অধিকন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র দারার কুপরামর্শে সম্রাট-পুত্রদের পরস্পরের প্রতি উসকানিমূলক পত্র প্রেরণ পরিস্থিতি দুর্বল করে তোলে। উপর্যুক্ত কারণে আওরঙ্গজেব, সুজা ও মুরাদের মধ্যে, ত্রি-শক্তিজোট গঠিত হয়। ফলে শাহ সুজা নিজেকে সম্রাট ঘোষণার কারণে দারার নিকট বাহাদুর গড়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করল। আর আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সম্মিলিত বাহিনী ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করে এবং কৌশলে মুরাদকে পরাজিত করে আওরঙ্গজেব সিংহাসন অধিকার করেন।
সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যকার এই দ্বন্দ্বই উদ্দীপকে আকরাম সাহেবের চার পুত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্বে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেব সফলতা লাভ করেছিলেন।
সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব সব দিক থেকে উপযুক্ত ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বিদের এমন কেউই ছিলেন না যিনি কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সেনাপতিত্বে আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন।' এছাড়া দারার সেনাবাহিনী অপেক্ষা আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী ছিল রণনিপুণ এবং সুশৃঙ্খল। তার সেনাপতিরাও দারার সেনাধ্যক্ষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। মীর জুমলা, শায়েস্তা খান নিঃসন্দেহে দারার সেনাপতি খলিলুল্লাহ খান, যশোবন্ত সিংহ ও রুস্তম খানের তুলনায় আওরঙ্গজেবের অস্ত্রশস্ত্র তার ভ্রাতাদের চেয়ে উন্নত ছিল। এমনকি সম্রাট আওরঙ্গজেবের গোলাবারুদ, কামান, গোলন্দাজ বাহিনী তার ভ্রাতাদের তুলনায় উন্নত ছিল। তাছাড়া দারা শিয়া মতালম্বী ও হিন্দুদের প্রতি অনুরাগী হওয়ায় আওরঙ্গজেব সুন্নি জনগণের সমর্থন লাভ করেন। তারা আওরঙ্গজেবকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে মনে করে তাকে সমর্থন জানান। অধিকন্তু শাহজাহানের পক্ষপাতিত্ব নীতি ও দারার প্রতি মাত্রাধিক দুর্বলতা উত্তরাধিকারী দ্বন্দ্বের সময় অসুস্থতার জন্য নির্লিপ্ত থাকা প্রভৃতি আওরঙ্গজেবের বিজয়কে সহায়তা করেছিল।
পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত কারণে আওরঙ্গজেব তার ভ্রাতাদের সঙ্গে উত্তরাধিকার সংগ্রামে সফলতা লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৪ হায়দার গ্রুপের স্বত্বাধিকারী আলী হায়দার উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি পিতার মতো সৌখিন, রুচিশীল ও স্থাপত্যের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তিনি বসবাসের জন্য একটি বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করেন। অফিসে বসার জন্য একটি মণিমুক্তা খচিত চেয়ার তৈরি করেন। তিনি তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। শোকাহত আলী হায়দার তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য অনেক টাকা খরচ করে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হয়েও সন্তানদের সংঘাতের কারণে তার শেষ জীবন সুখের হয়নি। *[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭]*

ক. কোন সালে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. রাজপুত নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আলী হায়দার কর্তৃক স্ত্রীর স্মরণে নির্মিত সমাধিসৌধের সাথে মুঘল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত কোন স্থাপত্য কীর্তির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত আলী হায়দারের সন্তানদের মতো উক্ত সম্রাটের সন্তানগণও উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।' বক্তব্যটি কি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৫২৬ সালে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ মুঘল সম্রাট আকবর রণদক্ষ ও নির্ভীক উত্তর ভারতের রাজপুত জাতির সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সুচিন্তিত ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাই রাজপুত নীতি নামে পরিচিত।

সম্রাট আকবরের অর্ধ শতাব্দী রাজত্বকালে তার গৃহীত উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহের মধ্যে রাজপুত নীতি অন্যতম। তিনি রাজপুত বংশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজপুতদের দেশের সামরিক ও উচ্চপদে নিয়োগের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য লাভ করেন। তিনি হিন্দু ও রাজপুতদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে জিজিয়া ও তীর্থকর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেন। সম্রাট আকবরের রাজপুতদের প্রতি গৃহীত এ সকল উদার নীতিই হলো রাজপুত নীতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আলী হায়দার কর্তৃক স্ত্রীর স্মরণে নির্মিত সমাধি সৌধের সাথে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহলের সাদৃশ্য রয়েছে। সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শিল্পীমনের মানুষ। স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান অপরিসীম। তার স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তিনি তার স্ত্রী মমতাজমহলের স্মৃতি রক্ষার্থে এ স্থাপত্যটি নির্মাণ করেন। উদ্দীপকের স্থাপত্য কীর্তির সাথে সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত এ তাজমহলের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের আলী হায়দারের স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। শোকাহত আলী হায়দার তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য অনেক টাকা খরচ করে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজমহল সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। প্রিয়তম স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি শোকে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি তার স্ত্রীর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তার সমাধির ওপর তাজমহল নামক স্থাপত্যকর্মটি নির্মাণ করেন। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এক শিল্পকর্ম। ১৬৩৩ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০ হাজার কারিগর দীর্ঘ ২২ বছর পরিশ্রম করে তৎকালীন তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। উদ্দীপকের সমাধির মধ্যে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত এ তাজমহলেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ আলী হায়দারের সন্তানদের মতো উক্ত সম্রাটের অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের সন্তানগণও উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে— এ বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হয়েও সন্তানদের সংঘাতের কারণে আলী হায়দারের শেষ জীবন সুখের হয়নি। অর্থাৎ আলী হায়দারের সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পুত্ররাও একে অপরের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল।

১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন এ সুযোগে তার চারপুত্র দারাশিকো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহাসন লাভের জন্য আত্মঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পুত্রদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। এটি জানা সত্ত্বেও সম্রাট দারার প্রতি অন্ধস্নেহে আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন এবং তার বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অভিযান নিষিদ্ধ করেন। এরূপ দুর্ব্যবহার ভ্রাতৃসংঘাতকে প্রকট করে তোলে। অধিকন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র দারার কুপরামর্শে সম্রাট-পুত্রদের পরস্পরের প্রতি উসকানিমূলক পত্র প্রেরণ পরিস্থিতি দুর্বল করে তোলে। উপর্যুক্ত কারণে আওরঙ্গজেব, সুজা ও মুরাদের মধ্যে ত্রি-শক্তিজোট গঠিত হয়। ফলে শাহ সুজা নিজেকে সম্রাট ঘোষণার কারণে দারার নিকট বাহাদুরগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। আর আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনী ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করে এবং সুকৌশলে আওরঙ্গজেব মুরাদকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের আলী হায়দারের পুত্রদের মতো, সম্রাট শাহজাহানের পুত্ররাও এর রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। সম্রাটের পুত্রদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক এ দ্বন্দ্ব সম্রাটের শেষ জীবনকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫ সুলতান সুলেমান সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসনে পুরাতন ধ্যান-ধারণার সংস্কার করেন। তিনি প্রশাসন, বিচার ও সৈন্য বাহিনীর জন্য আলাদা বিভাগ ও পদ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রত্যেকের পদ মর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা ও অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। এতে উচ্চ রাজ কর্মকর্তাগণের মধ্যকার মর্যাদার বিরোধ নিরসন হয়। ফলে সাম্রাজ্য শাসনে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তবে তার এ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭; আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. 'দীন-ই-এলাহী' এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থাটি মুঘল সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত কোন পদক্ষেপকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'অনেক উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থার মতো সম্রাট আকবরের উক্ত পদক্ষেপও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না।'— বক্তব্যটি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের প্রকৃত নাম আরজুমান্দ বানু বেগম।

খ ভারতের মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য হিন্দু-মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাই ছিল 'দীন-ই-এলাহী' এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হলো সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমত প্রচার। সম্রাটের এ ধর্মমত প্রচারের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা তিনি মনে করেন যে, হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য উদার ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করা উচিত। তাই তিনি তার সাম্রাজ্যের সকলকে একটি কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। এটি ছিল 'দীন-ই-এলাহী' প্রবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থাটি মুঘল সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত মনসবদার প্রথাকে নির্দেশ করে।

'মনসব' শব্দের অর্থ হলো পদ বা মর্যাদা। আর এ পদের অধিকারীকে মনসবদার বলা হতো। মুঘল সম্রাট আকবর তার সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও দক্ষতার অভাব লক্ষ করে তার আশু সংস্কারের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, ইতিহাসে তাই মনসবদারি প্রথা নামে পরিচিত। উদ্দীপকের সামরিক ব্যবস্থাও সম্রাটের এ প্রথাকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, সুলতান সুলেমান সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসনে পুরাতন ধ্যান-ধারণার সংস্কার করেন। তিনি বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা ও অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। অনুরূপভাবে সম্রাট আকবর সেনাবাহিনীর তথা সামরিক ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মনসবদারি প্রথা চালু করেন। আবুল ফজলের মতে, সাম্রাজ্যে সর্বমোট ৩৩ এবং কোনো কোনো তথ্য মতে, ৬৬টি মনসব ছিল। এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদারের অধীনে মোট দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে ১০ জন সৈন্য থাকার নিয়ম ছিল। একজন ব্যক্তির সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সম্রাট তাকে মনসবদার হিসেবে নিয়োগ দিতেন। মনসবদারদের 'জাত' ও

https://teachingbd24.com

'সওয়ার' নামক দুটি মর্যাদা ছিল। তাই বলা যায়, সুলতান সুলেমানের সামরিক সংস্কারের মধ্যে সম্রাট আকবরের এ মনসবদার প্রথারই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সমর্থন করি।
সম্রাট সুলেমানের সামরিক সংস্কারের ফলে সাম্রাজ্যের উচ্চ রাজ কর্মকর্তাগণের মধ্যকার মর্যাদার বিরোধ নিরসন হয় ও সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তবে তার এ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। একইভাবে মুঘল সম্রাট আকবর তার গৃহীত মনসবদারি প্রথার মাধ্যমে সামরিক সংস্কার সাধন করে। এ ব্যবস্থার অনেক সুবিধা থাকলেও অনেক কুফলও ছিল। প্রতিটি নীতি ও ব্যবস্থাপনারই কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থাকে। মনসবদারি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। মনসবদারি ব্যবস্থায় কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই সরকার একটি বৃহৎ সেনাদলের অধিকারী হয়েছিল। কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই প্রাদেশিক সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার মনসবদারদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন ও অন্যান্য সংকট মোকাবিলা করতে পারত। এ ব্যবস্থায় গুণ ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হতো বলে মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সকল সুবিধা থাকলেও মনসবদারি প্রথার অনেকগুলো অসুবিধাও ছিল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ের সেনাবাহিনী গঠিত হওয়ায় এতে ঐক্য ও সংহতির অভাব দেখা দিয়েছিল। সেনাবাহিনী মনসবদারদের অধীনে প্রতিপালিত হওয়ায় তাদের আনুগত্য ছিল মনসবদারদের প্রতি, সম্রাটের প্রতি নয়। আবার কেন্দ্র হতে দূরবর্তী স্থানে মনসবদারদের অবস্থান থাকায় তাদের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল শিথিল। এছাড়াও মনসবদারগণ প্রায়ই প্রতারণা করতেন। তাদের যে সংখ্যক সৈন্য প্রতিপালনের কথা থাকত তারা তা করতেন না। তবে এসব সীমাবদ্ধতা থাকলেও সম্রাটের গৃহীত এ ব্যবস্থা ভারতের সামরিক ইতিহাসে অভিনব সংযোজন ছিল।
সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, অনেক উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও উদ্দীপকের সুলতান সুলেমানের সামরিক ব্যবস্থার মতো সম্রাট আকবরের মনসবদারি প্রথাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না।

প্রশ্ন ▶ ৬ সরাইল উপজেলার চেয়ারম্যান পদে বহু বছর ধরে সামাদ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি কদম আলী পরিবার ভাগ্যান্বেষণে সরাইলে এসে বসতি স্থাপন করে। কদম আলীর সহজ-সরল জীবনযাপন, সাহসিকতা, নীতি-নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য উপজেলাবাসীর নজর কাড়ে। ফলে নির্বাচনে সরাইল উপজেলার চেয়ারম্যান পদে কদম আলী বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি উপজেলার অভাবনীয় উন্নয়ন করেন। উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা, সুশাসন, জননিরাপত্তা, বিচার ও সালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাজস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন করেন, যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো চেয়ারম্যানই করতে পারেন নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি সামাদ পরিবারের হাতে চলে যায়।

[সকল বোর্ড ২০১৬; আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. বাবরনামা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কদম আলীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে কোন আফগান শাসকের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন- বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০)।

খ বাবরনামা হলো তুর্কি ভাষায় রচিত মুঘল সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।
তুযুক-ই-বাবরী বা বাবরনামা গ্রন্থটি ইতিহাস অধ্যয়নে একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। চমৎকার রচনাশৈলী, ভাষার মাধুর্য ও কারুকাজ, উন্নত বর্ণনা রীতি এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার জন্য এ গ্রন্থটি পাঠক সমাজের প্রশংসা লাভ করেছে। এ গ্রন্থে এশিয়া ও আফগানিস্তান বিশেষ করে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এ গ্রন্থে বাবর তার ব্যক্তিজীবনের নানা দিক, যেমন: দোষ-গুণ, দূরদর্শিতা, সীমাবদ্ধতা, সুখ-দুঃখ এবং সাফল্য-ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কদম আলীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের আফগান শাসক শেরশাহের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল পাওয়া যায়।
মুঘল শাসনের ধারাবাহিকতায় একটি ছেদ টেনে শেরশাহ ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আফগান তথা শূর বংশের শাসনের সূত্রপাত করেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে তিনি নিজ প্রতিভা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সামান্য অবস্থা থেকে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উদ্দীপকের কদম আলীর ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সরাইল উপজেলার চেয়ারম্যান পদে সামাদ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে বহু বছর ধরে নির্বাচিত হয়ে আসছে। হঠাৎ করে কদম আলী পরিবার ভাগ্যান্বেষণে সরাইলে এসে বসতি স্থাপন করে। কদম আলীর সহজ-সরল জীবনযাপন, সাহসিকতা, নীতি-নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য উপজেলাবাসীকে আকৃষ্ট করে। স্থানীয় জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে তাকে বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। সামাদ পরিবারের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল পরিবার বংশানুক্রমিক ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল। আর কদম আলী পরিবারের মতোই শেরশাহও ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভাগ্যান্বেষণে ভারতীয় উপমহাদেশের আগ্রায় আসেন এবং মুঘল সম্রাট বাবরের অধীনে চাকরি নেন। পূর্বাঞ্চল অভিযানে বাবরকে সহায়তা করে তিনি মুঘল সম্রাটের বিশেষ প্রীতিভাজন হন। পরবর্তীতে তিনি ভারতবর্ষ থেকে মুঘলদের বিতাড়িত করতে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন শেষ পর্যন্ত মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে প্রথমে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্রি.) এবং পরে কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রি.) পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে তিনি ভারতবর্ষে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কদম আলীর মতো শেরশাহও তার তীক্ষ্ণ মেধা, অপরিমিত সাহস, আত্মবিশ্বাস ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

ঘ উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক অর্থাৎ শেরশাহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন— উক্তিটি যথার্থ।
উদ্দীপকের কদম আলী উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা, সুশাসন, জননিরাপত্তা, বিচার ও সালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাজস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কদম আলীর এ সকল কর্মকাণ্ডের চেয়ে আফগান শাসক শেরশাহ আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। কেননা তিনি তার প্রশাসন ব্যবস্থায় উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের পাশাপাশি শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করতে আরও বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দেন।
উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শেরশাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসনপ্রণালির শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করে একটি যুগোপযোগী ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিউয়ান-ই-উযারত, (সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ), দিউয়ান-ই-আরজ, (সেনাবাহিনী তত্ত্বাবধান) দিউয়ান-ই-রিসালাত (পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ তদারকি) এবং দিউয়ান-ই-ইনশা (সরকারি আদেশ-নির্দেশ জারি ও যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজ)-এ চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন। এছাড়া শাসনকাজের সুবিধার জন্য প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে 'সরকার' নামক ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন। প্রতিটি সরকারকে তিনি কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করেন। এভাবে শেরশাহ সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী

https://teachingbd24.com

প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আর এ বিষয়গুলো উদ্দীপকের কদম আলীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।
উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, শেরশাহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে অনেক বেশি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ 'সর্বধর্ম' মতবাদের প্রবক্তা শ্রী আনন্দ স্বামী। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগনার কালিকচ্ছ গ্রামে এক কৌলিন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারের দায়িত্ব পালনকালে প্রজাদের ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও আন্তঃধর্মবিবাদ তাঁকে চিন্তামগ্ন করে তোলে। ধর্ম নিয়ে হত্যা, হানাহানি, রক্তপাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ইসলাম, সনাতন ও খ্রিষ্টধর্মের সমন্বয়ে 'সর্বধর্ম' মতবাদ প্রবর্তন করতে সক্রিয় হন। তার এ 'সর্বধর্ম' মতবাদে প্রকৃত মানবতার আহ্বান থাকলেও তিনি ধর্মভীরু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। তবে এর মাধ্যমে তিনি সকল শ্রেণির মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনন্দ স্বামীর সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের কোন নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? উক্ত নীতির মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তন ও সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা।

খ কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত্ব (অধিকার) রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সম্রাট শেরশাহের (১৪৭২-১৫৪৫) প্রবর্তিত এক অভিনব ব্যবস্থাকে বোঝায়।
পাট্টা ছিল জমির অধিকার সংক্রান্ত দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে সরকারের পক্ষ হতে পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রদেয় করসহ ভূমিতে নিজের দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে কৃষক রাষ্ট্রকে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আনন্দ স্বামীর সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' নামক ধর্মীয় নীতির সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধর্মমতে সব ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল।
সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'দীন-ই-এলাহী' নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এটি ছিল সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম। সকল ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালা নিয়ে এ ধর্মমত গঠিত হয়েছিল। এ ধর্মমতে কোনো নবি বা দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল না। তবে একেশ্বরবাদের ধারণা ছিল প্রবল। এ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারীকে সম্রাটের নামে ৪টি স্তরে তার জীবন, ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতে হতো।
উদ্দীপকের আনন্দ স্বামী ধর্ম নিয়ে হত্যা, হানাহানি, রক্তপাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম, সনাতন ও খ্রিষ্টধর্মের সমন্বয়ে সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তন করেন। তার এ সর্বধর্ম মতবাদের মূলকথা ছিল মানবতাবাদ। একইভাবে মুঘল সম্রাট আকবরও সকল ধর্মের সারাংশ নিয়ে 'দীন-ই-এলাহী' নামের সর্বেশ্বরবাদী ধর্মীয় নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমতের অনুসারীদেরকে 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়া আকবর খলিফাতুল্লাহ' এ কথাটি পাঠ করতে হতো। এ ধর্মের অনুসারীদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতে একজনকে 'আল্লাহু আকবর' বলে সম্ভাষণ করতে হতো এবং অন্যজনকে 'জাল্লেজালালুহু' বলে উত্তর দিতে হতো। এ ধর্মে আগুনকে পবিত্র বলে সম্মান করা হতো। এর অনুসারীদের অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমিষ জাতীয় খাবার (মাংস, মাছ, ডিম, ডাল প্রভৃতি) গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হতো। তাছাড়া তাদেরকে জন্মদিন উদযাপন করে ঐদিন দানখয়রাতসহ স্বধর্মীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হতো। তাদেরকে মৃত্যুর পূর্বেই ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হতো। এছাড়া এ ধর্মের অনুসারীদের ভিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হতো। কসাই, ধীবর, ব্যাধ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির লোকেরা জীব হত্যা করত বলে তাদের সাথে ওঠা-বসা নিষিদ্ধ ছিল। উল্লিখিত বিধি-নিষেধ আরোপ করে সম্রাট আকবর 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমতের প্রবর্তন করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা।
ষোড়শ শতাব্দী ছিল বিশ্বব্যাপী এক ধর্মীয় আন্দোলনের যুগ। তখন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কিংবা ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় দেশে-দেশে, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ পর্যন্ত লেগে যেত। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ এবং স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের মধ্যে সংঘটিত আর্মাডার যুদ্ধের (১৫৮৮) কথা উল্লেখ করা যায়। এমন ধর্মীয় কোন্দলের যুগে সম্রাট আকবর ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে উদারতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃহৎ মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তার স্থায়িত্ব বিধানই ছিল তার উদার ধর্মমত প্রবর্তনের একমাত্র কারণ। কেননা হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে তাদের প্রতি উদার ও সহনশীল হওয়া ছাড়া সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করা কোনোভাবেই সম্ভবপর ছিল না। অন্যদিকে উদ্দীপকের শ্রী আনন্দ স্বামী সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রবর্তন করেন।
উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রী আনন্দ স্বামী সর্বধর্ম মতবাদের প্রবক্তা। তিনি জমিদারের দায়িত্ব পালনকালে ধর্ম নিয়ে হত্যা, হানাহানি, রক্তপাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম, সনাতন ও খ্রিষ্টধর্মের সমন্বয়ে সর্বধর্ম মতবাদ প্রবর্তন করেন। অন্যদিকে সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নিজের স্বীকৃতি লাভ। ভারতে মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলা আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যেই সম্রাট ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করে 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের আনন্দ স্বামীর নতুন ধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সম্রাট আকবরের নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় ক্ষমতাকে সুসংহত করা।

প্রশ্ন ▶ ৮ উসমানের পূর্বপুরুষরা গোবি মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। সেখানে শত্রুপক্ষের শক্তির কারণে সুবিধা করতে না পেরে তারা এশিয়া মাইনরে চলে আসেন। এশিয়া মাইনরে বহুদিন ধরে সেলজুকরা শাসন করলেও উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশ কিছু স্বাধীন ও শক্তিশালী গ্রিক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। উসমান শেষ সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের পতন ঘটিয়ে সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শক্তিশালী গ্রিক রাজাদেরও পরাজিত করে যে বিশাল উসমানীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. পানিপথের ১ম যুদ্ধে বাবরের জয় লাভের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উসমানীয়দের এশিয়া মাইনরে গমনের সাথে বাবরের ভারতে আগমনের সামঞ্জস্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উসমানের কৃতিত্বের আলোকে সম্রাট বাবরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাবর' শব্দের অর্থ সিংহ।

খ ভারত উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের অদম্য স্পৃহা ও অসামান্য নির্ভীকতা বাবরের জয় লাভের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।
তৎকালীন ভারত উপমহাদেশে ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা তাকে সহজেই সাফল্য এনে দেয়। চীন দেশে আবিষ্কৃত

Teachingbd24.com

বারুদের সাহায্যে বাবরের বাহিনী কামান ও গাদা বন্দুকের ব্যবহার করে সাফল্য নিশ্চিত করে। সর্বোপরি বাবর ছিলেন একজন বিজ্ঞ ও সুনিপুণ রণসেনানী। তার সৈন্যবাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল, যা ইব্রাহিম লোদির বিশৃঙ্খল বাহিনীর বিরুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত উসমানীয়দের এশিয়া মাইনরে গমনের সাথে বাবরের ভারতে আগমনের সামঞ্জস্যের দিক হলো উভয়েই শত্রুপক্ষের কবলে পড়ে এলাকা ত্যাগ করেছিলেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত উসমান পূর্ব পুরুষের রাজ্য গোবি মরুভূমিতে শত্রুপক্ষের শক্তির কারণে সুবিধা করতে না পেরে এশিয়া মাইনরে চলে আসেন। একইভাবে ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বাবর। সিংহাসন লাভের পরপরই তিনি আত্মীয়-স্বজন ও উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ১৪৯৭ সালে তিনি সমরখন্দ দখল করেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে পতিত হয়ে সমরখন্দ হারান। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফারগানা হস্তচ্যুত হয়। তিনি আবার ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ফারগানা এবং ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে সমরখন্দ অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ১৫০৩ সালে সাইবানি খানের কাছে পরাজিত হয়ে ফারগানা ও সমরখন্দ থেকে বিতাড়িত হন। এর ফলে তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। ১৫২৬ সালে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি খানুয়ার যুদ্ধে ও গোগরার যুদ্ধে জয়লাভ করে তার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

তাই বলা যায়, উসমানের এ ঘটনার সাথে বাবরের ভারতে আসার ঘটনার মিল বিদ্যমান।

ঘ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উসমানের কৃতিত্বের মতোই সম্রাট বাবরও অগাধ কৃতিত্বের অধিকারী।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্রাট বাবর তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পিতৃরাজ্য ফারগানা ও বিজিত সমরখন্দ হতে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেও তিনি কখনো হতাশ হননি। অজেয় মনোবল, দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও নির্ভীক সাহসিকতার সাথে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। উদ্দীপকের উসমানের ক্ষেত্রেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উসমান নিজ ভূ-খণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে এশিয়া মাইনরে এসে সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের পতন ঘটিয়ে সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ অঞ্চলের উত্তরের শক্তিশালী গ্রিক রাজাদের পরাজিত করে যে বিশাল উসমানীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী ছিল। একইভাবে সম্রাট বাবরও প্রাথমিক জীবনে শত্রুদের বিরোধের কারণে নিজ ভূখণ্ড ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ভারতে লোদি সুলতানদের পতন ঘটিয়ে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজ্যের দুর্গ, ভেরা, কুশাব চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল, কান্দাহার লাহোর, দিপালপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এ সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাবরকে ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা একই শাসক গোষ্ঠীর পথ উন্মুক্ত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৯ ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার চরিত্রে দোষ ও গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করেন এবং ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার শাসনামলে তার স্ত্রী ইমেলদা এতই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে, সমস্ত প্রশাসনযন্ত্র তাকে প্রেসিডেন্টের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করে।

[সকল বোর্ড ২০১৫; বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম; সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল; ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কী ছিল? ১

খ. সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম সেলিম রাখার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের তুলনা করা যায়? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমেলদার কার্যাবলির সাথে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নূরজাহানের প্রকৃত নাম ছিল মেহের-উন-নিসা।

খ বিখ্যাত সাধক শেখ সেলিম চিশতির নামানুসারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম সেলিম রাখা হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন সম্রাট আকবরের পুত্র। একাধিক শিশু সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় উত্তরাধিকার হিসেবে পুত্রসন্তান লাভের আশায় সম্রাট আকবর প্রতি বছর আজমিরে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির দরগাহ জিয়ারত করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। একই উদ্দেশ্যে সম্রাট প্রতি সপ্তাহে ফতেহপুর সিক্রির বিখ্যাত সাধক শেখ সেলিম চিশতির খানকাহতে যেতেন। পরবর্তী ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট রানি যোধবাঈ-এর গর্ভে এক সন্তানের জন্ম হয়। বহু সাধনার পর পুত্রের জন্ম হওয়ায় তাকে '*A Child of Many Prayers*' বলা হয়।

গ উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের সাথে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের তুলনা করা যায়।

উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের চরিত্রে দোষ ও গুণের সংমিশ্রণ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক একইভাবে জাহাঙ্গীরের চরিত্রেও বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

ঐতিহাসিকগণও কেউ প্রশংসা, আবার কেউ তীব্র সমালোচনা করেছেন। ঈশ্বরী প্রসাদ জাহাঙ্গীরের প্রশংসা করে বলেন, 'মুঘল ইতিহাসে একটি অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র হচ্ছে জাহাঙ্গীর।' আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগপ্রবণ, মহানুভব, নির্যাতনের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা এবং সুবিচারের প্রতি প্রগাঢ় মোহ তার চারিত্রিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার তার চরিত্রের তীব্র সমালোচক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, 'জাহাঙ্গীরের চরিত্রে নমনীয়তা ও নৃশংসতা, সুবিচার ও খামখেয়ালিপনা, রুচিবোধ, বর্বরতা সুবুদ্ধি ও জ্ঞানসুলভ গুণাবলির সমাবেশ দেখা যায়। তাকে একদিকে যেমন অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলে অভিহিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রজাদের মঙ্গলার্থে ১২টি প্রজামঙ্গলকর আইন প্রণয়ন করে তিনি জনকল্যাণকর শাসক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। অত্যধিক আফিম ও মাদকাসক্তি ছিল তার চরিত্রের বড় ত্রুটি। অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া তার চরিত্রের অন্যতম দোষ ছিল।' তাই বলা যায়, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের চরিত্রে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ইমেলদার কার্যাবলির সাথে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কার্যাবলির অনেক মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের স্ত্রী ইমেলদা তার শাসনামলে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত প্রশাসন যন্ত্রের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য হতে থাকেন। একইভাবে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর এর শাসনামলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজ নামের সাথে নূরজাহানের নাম মুদ্রায় অঙ্কিত করেছিলেন। নূরজাহান জাহাঙ্গীরের ওপর ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তার করে সার্থকতার সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ফলে সম্রাট তার হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন।

নূরজাহান তার পিতাকে 'ইতিমাদউদ্দৌলা' উপাধিসহ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং ভ্রাতা আসফখানকে 'খান-ই-সামান' পদে উন্নীত করেন। তাদের সাহায্যে দরবারে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহরিয়ারের সাথে পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা লাডলী বেগমকে বিয়ে দিয়ে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারিণী হন। কথিত আছে যে, রাজকীয় ফরমানসমূহ নূরজাহানের দস্তখত ব্যতীত মূল্যহীন বলে পরিগণিত হতো। এ প্রসঙ্গে মুতামাদ খান বলেন,

https://teachingbd24.com

'অবশেষে তার ক্ষমতা এরূপ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, রাজা শুধু নামেমাত্র থাকলেন।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের ইমেলদার মতো সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও শাসনব্যবস্থায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶১০ কীর্তিপাশার জমিদার দেবী রায় চৌধুরী খুবই রুচিবান ও শৌখিন মানুষ ছিলেন। তিনি জমিদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি জাঁকজমকপূর্ণ দরবার হল নির্মাণ করেছিলেন। পাশাপাশি তার নির্মিত কাচারি বাড়ি, নায়েব মহল আজও স্ব-মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। একই সময়ে নির্মিত নাট মন্দিরটি এখনও ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। তার স্ত্রী কৃষ্ণ কুমারী দেবী অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদুষী রমণী ছিলেন। জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় পড়ে কৃষ্ণ কুমারী অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন। তিনি স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে সৌধটি নির্মাণ করেন, আজও তা বিদ্যমান রয়েছে। *(সকল বোর্ড ২০১৫)*

ক. সম্রাট শাহজাহানের পিতার নাম কী? ১
খ. সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষ্ণ কুমারী দেবীর সাথে সম্রাট শাহজাহানের কোন মহীয়সীর সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের আলোকে সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্য কীর্তির মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট শাহজাহানের পিতার নাম ছিল নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

খ শাহজাহানের জীবদ্দশায় তার চার পুত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তার প্রথম কারণ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব।
বলাবাহুল্য যে, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে সিংহাসন লাভ ও সংরক্ষণ করতে হয়েছিল। শাহজাদা সেলিম ও শাহজাদা খুররম মুঘল সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার পূর্বে তাদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুতরাং সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব অথবা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণ সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষ্ণ কুমারী দেবীর সাথে সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের সামঞ্জস্য রয়েছে।
উদ্দীপকের জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর স্ত্রী কৃষ্ণ কুমারী দেবীও ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদুষী রমণী। জমিদার দেবী রায়ের স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। এক দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী কৃষ্ণ কুমারী অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুষড়ে পড়েন এবং স্ত্রীর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি সৌধ নির্মাণ করেন, যা আজও বিদ্যমান। ঠিক একইভাবে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলও ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। তিনি আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বামী শাহজাহানের অন্তর জয় করেছিলেন। সম্রাট তাকে মালিকা-ই-জাহান উপাধি দেন। ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন সন্তান প্রসবকালে মহীয়সী মমতাজ মহল বুরহানপুরে ইন্তেকাল করেন। প্রিয়তমা পত্নীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে সম্রাট শাহজাহান বেদনাকাতর হয়ে পড়েন। শোকাতুর সম্রাট এতটাই মুষড়ে পড়েছিলেন যে, তিনি সাত দিন ঝারোকায় দর্শন দেননি। এমনকি রাজকাজেও অংশ নেননি। প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সম্রাট মমতাজের সমাধির ওপর তাজমহল নির্মাণ করেন, যা বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি। এটি পত্নীপ্রেমেরও এক উজ্জ্বল নিদর্শন। উদ্দীপকেও পত্নীপ্রেমের এমন নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের মতোই সম্রাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।
ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন। উদ্দীপকের জমিদার দেবী রায় চৌধুরী স্থাপত্য ক্ষেত্রে যে অবদান রাখেন তা হলো কাচারি বাড়ি, নায়েব মহল, জাকজমকপূর্ণ দরবার হল, নাট নামক একটি মন্দির এবং স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থব্যয়ে একটি সৌধ নির্মাণ করেন যা আজও বিদ্যমান। তার এ কর্মকাণ্ডে সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পে অবদানেরই প্রতিফলন ঘটেছে।
সম্রাট শাহজাহান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের আরেকটি অপূর্ব নিদর্শন হলো 'ময়ূর সিংহাসন'। সম্রাট শাহজাহান আগ্রা দুর্গে দেওয়ান-ই-আমের উত্তরে শ্বেতপাথর দ্বারা মতি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি আরও নির্মাণ করেন, দিল্লিতে সুরক্ষিত লাল কেল্লা। দিল্লির জামে মসজিদ তার অন্যতম এক কীর্তি। সম্রাট শাহজাহানের সময় নির্মিত শিশমহল ও জুঁইমহল ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত রাজকীয় আবাসগৃহ। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি সুসাম্মাম বুরুজ নামে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করেন। তাছাড়া সম্রাট শাহজাহান আরও অন্যান্য স্থাপত্য দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, কাবুল, কাশ্মির, আজমির ও আহমদাবাদের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তৈরি করেন। এছাড়া নিজামউদ্দিন আউলিয়া মাজার, লওখাল, খাওয়ারগাহ, শালিমার উদ্যান প্রভৃতি তার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন তার এ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষতার কারণে তার রাজত্বকালকে ঐতিহাসিকগণ মুঘল শাসনের 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, জমিদার দেবী রায় চৌধুরীর নির্মিত সৌধটির মতো সম্রাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পেও অনন্য অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶১১ বীরগঞ্জের জায়গিরদার মি. শ্যামল নিজ দক্ষতা ও মেধা খাটিয়ে শফিগঞ্জের শাসক মি. রিয়াদের দুর্বলতার সুযোগে নিজ বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের শাসন ১৫ বছর টিকলেও তার শাসনকাল ছিল মাত্র ৫ বছর। তার এ পর্যায়ে আসতে তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্যের খুঁটিনাটি পরিদর্শন করতেন। *(গাজীপুর সিটি কলেজ, গাজীপুর)*

ক. মনসব কী? ১
খ. 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমত ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মি. শ্যামলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের উত্থান পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. শ্যামলের শাসনব্যবস্থা কি উক্ত শাসকের শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ? তোমার মতের পক্ষে বর্ণনা দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনসব হলো পদ বা পদমর্যাদা।

খ 'দীন-ই-এলাহী' মুঘল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত এক নতুন ধর্মের নাম।
সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'দীন-ই-এলাহী' নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এটি ছিল একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। সকল ধর্মের ভালো ও উৎকৃষ্ট নীতিগুলো এতে সমন্বিত হয়েছিল। আকবরের প্রবর্তিত 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমতে কোনো নবি বা দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি রোববার সম্রাট নির্দিষ্ট আসনে বসে আগ্রহীদের দীক্ষা দিতেন। এ সময় দীক্ষা গ্রহণকারীক সম্রাটের নামে ৪টি স্তরে ব্যক্তির জীবন, ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতে হতো।

গ উদ্দীপকে মি. শ্যামলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হলেন শেরশাহ। মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে তার উত্থান এক চমকপ্রদ ঘটনা।
উদ্দীপকের মি. শ্যামল নিজ দক্ষতা ও মেধা খাটিয়ে ত্রিপুরার মি. রিয়াদের দুর্বলতার সুযোগে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। মি. শ্যামলের এ বিষয়গুলোর মধ্যে শেরশাহের ক্ষমতা গ্রহণ ও তার শাসনের প্রতিফলন ঘটেছে।

https://teachingbd24.com

শেরশাহ জনদরদি ও প্রজাহিতৈষী শাসক হলেও তাকে দিল্লির শাসন গ্রহণ করতে হয়েছিল যুক্তি নয়, শক্তির জোরে। তিনি ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সাসারামের জায়গির নিযুক্ত হন এবং ১৫১৭ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে বহরখান লোহানীর মৃত্যুর পর তিনি তার পুত্র জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৫৩০ সালে শের খান চুনার দুর্গের অধিপতি বিধবা লাদ মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গ লাভ করেন। তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ক্রোধান্বিত হয়ে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে তার সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ১৫৩৪ ও ১৫৩৬ সালে বাংলায় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং ১৫৪০ সালে বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে তিনি দিল্লির মসনদে বসেন। আর এভাবেই তার উত্থান ঘটে।

ঘ মি. শ্যামলের শাসন ব্যবস্থা যেন শেরশাহের শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, শ্যামল ত্রিপুরার ক্ষমতা গ্রহণের পর শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি নিজে শাসনকার্যের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জেনে বাস্তব উপযোগী ও ন্যায়নিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। মি. শ্যামলের শাসন কার্যাবলির মধ্যে মূলত শেরশাহের শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

সম্রাট শেরশাহ তার মাত্র ৫ বছরের শাসনকালের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার এবং শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করে তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা, কর্মনৈপুণ্য ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসনপ্রণালির শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করে স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতার সাহায্যে একটি আধুনিক ও যুক্তিসংগত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তার রাজস্বনীতি যেমন ছিল বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি ছিল জনকল্যাণকর। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবর তার নীতি অনুসরণ করেই অধিকতর কার্যকর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। স্যার ডব্লিউ হেইগ বলেন,'শেরশাহ ভারতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহ এর শাসনব্যবস্থা উদ্দীপকের মি. শ্যামলের শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶ ১২ আকরাম সাহেব একটি বিখ্যাত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্তি নিয়ে তার চারপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পিতার কান বিষাক্ত ও মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। পরবর্তীকালে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক. পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. তুযুক-ই-বাবরী সম্পর্কে কী জান? ২

গ. তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সম্রাটের আমলের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বন্দ্বের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত দ্বন্দ্বে শাসকের কোন পুত্র সফলতা লাভ করেছিল এবং কেন? মূল্যায়ন কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ সালে সংঘটিত হয়েছিল।

খ তুযুক-ই-বাবরী বা বাবুরনামা হলো তুর্কি ভাষায় রচিত মুঘল সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

তুযুক-ই-বাবরী বা বাবুরনামা গ্রন্থটি ইতিহাস অধ্যয়নে একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। চমৎকার রচনাশৈলী, ভাষার মাধুর্য ও কারুকাজ, উন্নত বর্ণনা রীতি এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার জন্য এ গ্রন্থটি পাঠক সমাজের প্রশংসা লাভ করেছে। এ গ্রন্থে এশিয়া ও আফগানিস্তান বিশেষ করে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এ গ্রন্থে বাবর তার ব্যক্তিজীবনের নানা দিক, যেমন: দোষ-গুণ, দূরদর্শিতা, সীমাবদ্ধতা, সুখ-দুঃখ এবং সাফল্য-ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ তালাত সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে তার এলাকার সংসদ নির্বাচিত হন। সংসদ নির্বাচিত হতে পেরে তিনি তার এলাকার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট তৈরি করাসহ রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া গরিব ও দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য তিনি এলাকার বিভিন্ন স্থানে হোটেল নির্মাণ করেন। অনেক সময় এখানে গরিব মিসকিনদের খাবার ব্যবস্থা করা হয়। তার এই জনহিতকর কাজের জন্য এলাকার সবাই তাকে ভালোবাসে। *[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]*

ক. গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড নির্মাণ করেন কে? ১

খ. শের শাহকে শাসক হিসেবে সম্রাট আকবরের অগ্রদূত বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের তালাত সাহেবের সাথে শুর-বংশের কোন শাসকের সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে তালাত সাহেবের সাথে উক্ত শাসকের অসামঞ্জস্য রয়েছে"— উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেরশাহ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন।

খ শাসক হিসেবে শেরশাহ সম্রাট আকবরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হলেও আকবরের পথ প্রদর্শক ছিলেন।

পূর্ববর্তী সম্রাটদের শাসনের মূলনীতিগুলো সংগ্রহ করে নিজ প্রতিভা দ্বারা শেরশাহ আধুনিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আকবর তাকে অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক, রাজস্ব বিভাগ, সামরিক বিভাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তার এসব কর্মকাণ্ড মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। এ জন্য শেরশাহকে আকবরের পথপ্রদর্শক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে তালাত সাহেবের সাথে শুর বংশের শাসক শেরশাহের সাদৃশ্য রয়েছে।

শেরশাহ এর বাল্যনাম ফরিদ খান শুর। পাঞ্জাবে ১৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে তার জন্ম হয়। মধ্যযুগীয় ভারতের শাসনব্যবস্থায় শেরশাহ অক্ষয়কীর্তি রেখে গিয়েছেন। তিনি যে শুধু মহান বিজেতা ছিলেন তা নয়। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মাত্র ৫ বছরের শাসনামলে মঙ্গলজনক সংস্কারের ফলে মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে তিনি বিচক্ষণতা ও প্রজাহিতৈষণার দৃষ্টান্ত রেখে যান। তিনি দুস্থ ও অসহায়দের মুক্তহস্তে দান করতেন। তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়মিত ভাতা, লাখেরাজ ভূমি মঞ্জুরির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুস্থদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক লঙ্গরখানা স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণসহ পথিকদের সুবিধার্থে রাস্তার পাশে বহু সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন।

উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায় যে, তালাত সাহেব সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকায় অসংখ্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি গরিব, দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য এলাকায় বিভিন্ন স্থানে হোটেল নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। এ ঘটনার মধ্যে শেরশাহের কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে তালাত সাহেবের সাথে উক্ত শাসকের অমিল রয়েছে— উক্তিটি যথার্থ।

শেরশাহ সেলিম সাহেবের ন্যায় জনদরদি ও প্রজাহিতৈষী শাসক হলেও তাকে দিল্লির শাসন গ্রহণ করতে হয়েছিল যুক্তি নয়, শক্তির জোরে। শেরশাহ উদ্দীপকে তালাত সাহেবের মতো জনগণের ভোটে নির্বাচিত হননি। তিনি প্রথমে ১৪৯৭ সালে সাসারামের জায়গির নিযুক্ত হন এবং

https://teachingbd24.com

১৫১৭ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে বহর খান লোহানীর মৃত্যুর পর তিনি তার পুত্র জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৫৩০ সালে শের খান চুনার দুর্গের অধিপতি বিধবা লাদ মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গ লাভ করেন। তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে তার সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ১৫৩৪ ও ১৫৩৬ সালে বাংলায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং ১৫৪০ সালে বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে দিল্লির মসনদে বসেন। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের শাসক ও শেরশাহ ভিন্ন পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ করে।
পরিশেষে বলা যায়, শেরশাহ ও তালাত সাহেবের মধ্যে জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সম্রাট বকুল মাত্র এগারো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজ্য জয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সুলতান মনিরের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। সম্রাট বকুল যুদ্ধে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করেন। সুলতান মনিরের ৫০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধে মনিরের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং সুলতানি বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১
খ. 'দীন-ই-এলাহী' বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত সম্রাটই ভারতবর্ষের মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা? যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পাঠ্যবইয়ের পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মিল রয়েছে।
ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অন্যতম। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উত্তর প্রদেশের হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে এ যুদ্ধ হয়েছিল বলে এটি পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। উদ্দীপকে এ যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট বকুল মাত্র এগারো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজ্য জয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সুলতান মনিরের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। সম্রাট বকুল এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করে। সুলতান মনিরের ৫০ হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে সুলতানী বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুঘল সম্রাট বাবরও মাত্র এগারো বছর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দিগ্বিজয়ী এই শাসক রাজ্য জয় ও ধনসম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হলে সুলতান ইব্রাহীম লোদির বাধার সম্মুখীন হন। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল বাবর তার সাথে ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। এদিন দুপক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বাবর সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার করেন। অভিজ্ঞ ও সুশৃঙ্খল মুঘল বাহিনীর কামান ও আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে ইব্রাহীম লোদির বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বীরত্বের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও ইব্রাহীম লোদি পরাজিত ও নিহত হন। ফলে বাবর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, যাকে পরবর্তীতে তার প্রপৌত্র আকবর সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উক্ত সম্রাটই অর্থাৎ সম্রাট বাবরই ভারতবর্ষে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা।
ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্রাট বাবর তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পিতৃরাজ্য ফারগানা ও বিজিত সমরখন্দ হতে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেও তিনি কখনো হতাশ হননি। অজেয় মনোবল, দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও নির্ভীক সাহসিকতার সাথে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।
মুঘল সম্রাট বাবর ছিলেন এক নতুন সাম্রাজ্যের স্থপতি ও নবযুগের স্রষ্টা। তিনি ছিলেন সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও সেনানায়ক। তিনি প্রাথমিক জীবনে শত্রুদের বিরোধের কারণে নিজ ভূখণ্ড ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ভারতে লোদি সুলতানদের পতন ঘটিয়ে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর ভেরা, কুশাব, চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল, কান্দাহার, লাহোর, দিপালপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এ সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুঘল সম্রাট বাবরই ভারতবর্ষে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এজন্য তিনি ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সম্রাট ফিরোজের রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে সরকারে বিভক্তকরণ, ভূমি জরিপ তথা সামরিক, বেসামরিক, পুলিশসহ সর্বক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে। তিনি শাসনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। *[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]*

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মনসবদারী প্রথা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সম্রাট ফিরোজের কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গৃহীত পদক্ষেপ আধুনিক শাসন ব্যবস্থার সাথে কতটুকু সজ্ঞাতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাবর' শব্দের অর্থ সিংহ।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট ফিরোজের কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ।
মুঘল শাসনের ধারাবাহিকতায় একটি ছেদ টেনে শেরশাহ ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আফগান তথা শূর বংশের শাসনের সূত্রপাত করেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে তিনি নিজ প্রতিভা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সামান্য অবস্থা থেকে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ও সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকের সম্রাট ফিরোজের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট ফিরোজের রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সাম্রাজ্যকে বিভক্তকরণ, ভূমি জরিপ, সামরিক বেসামরিক, পুলিশসহ সর্বক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। সম্রাট ফিরোজের মতো শেরশাহের রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসন প্রণালীর শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করে একটি যুগোপযোগী ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য তিনি প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে 'সরকার' নামক ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন। আইনের শাসন বলবৎ রাখার জন্য তিনি পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা জোরদার করেন। তিনি আলাউদ্দিন খলজির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজান। এছাড়া ভূমিরাজস্ব, বিচারব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে রাজ্যে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সম্রাট ফিরোজ এবং শেরশাহ এক ও অভিন্ন।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শেরশাহের গৃহীত পদক্ষেপগুলো আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সু-শৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা যে শাসনব্যবস্থায় একটি রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার বিধানের প্রতি যত বেশি নজর দেয়া হয় সে শাসনব্যবস্থা তত উন্নত। ফলে আধুনিক শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন সর্বপ্রথম বিবেচিত হয়। কেননা, একটি শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু জনগণ। তাই জনগণের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক শাসনব্যবস্থায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে একটি রাষ্ট্রের সর্বত্র ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ক্ষমতার এ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি শের শাহের শাসনব্যবস্থায়ও লক্ষণীয়। তিনি শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছিল মূলত জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। যেটি আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শেরশাহের সুষ্ঠু ভূমি জরিপ ব্যবস্থার ফলে কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ সাধিত হয়। এছাড়া তার প্রবর্তিত পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে জননিরাপত্তা সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, 'শেরশাহের পুলিশি ব্যবস্থা সনাতনি হলেও ছিল শক্তিশালী ও উন্নত ধরনের।

পরিশেষে বলা যায়, শেরশাহের শাসনব্যবস্থা আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶১৬ মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন তোরাব আলী। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি দুই চাচা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরোধিতার মুখে পড়েন। তোরাব আলীর চরিত্র ও মানস গঠনে এবং সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তার মাতামহীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। *[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]*

ক. মোঙ্গল শব্দের উদ্ভব হয়েছে কোন শব্দ থেকে? ১
খ. মুঘলদের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুরূপ শাসকের প্রাথমিক জীবন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শাসকের শাসনকাল আলোচনা কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মোঙ্গ' শব্দ থেকে মোঙ্গল কথাটির উদ্ভব হয়েছে।

খ মুঘলদের আদি নিবাস ছিল মোঙ্গলিয়ায়।

মোঙ্গলিয়া হতে চলে এসে এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর হতে মোঙ্গলরা মুঘল নামে অভিহিত হতে থাকে। অনেকে বলেন, গোবি মরুভূমির উত্তরে এবং বৈকাল হ্রদের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ চারণ ভূমিতে এদের বাস ছিল। তারা মোঙ্গলিয়া ছেড়ে মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করার পর থেকে 'মুঘল' (মোগল) নামে অভিহিত হতে থাকে। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা ভারতে স্থায়ী মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

গ উদ্দীপকে তোরাব আলীর জীবনের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল শাসক সম্রাট বাবরের জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে।

জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ওমর শেখ মির্জা এবং মা কুতলুঘ নিগার খানম। তিনি পিতার দিক থেকে চাঘতাই তুর্কি বীর তৈমুর লঙ এবং মাতার দিক থেকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। শৈশবে বাবর বিদুষী মাতামহী আয়সন দৌলত বেগম এবং গৃহশিক্ষক শেখ মজিদের নিকট তুর্কি, আরবি ও ফারসি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

উদ্দীপকে তোরাব আলী মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেই পিতৃব্য আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হন। একইভাবে সম্রাট বাবরও ১১ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি যখন ফারগানার দায়িত্ব লাভ করেন তখন ফারগানা রাজ্য চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করে বাবর মধ্য এশিয়ায় পূর্বপুরুষ তৈমুরের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি পরপর দুবার সমরখন্দ দখল করে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও সাহস হারাননি। ১৫০৪ সালে তিনি খোরাসানের রাজার সহায়তায় হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কাবুল ও গজনি দখল করেন। উদ্দীপকের তোরাব আলীর মতোই সম্রাট বাবরও তার মাতামহীর সাহচর্যে সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের তোরাব আলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মুঘল সম্রাট বাবরের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বাবর তার সৈনিক ও শাসক গুণাবলির দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রাজ্য জয় করে শাসন প্রতিষ্ঠা করা তার নেশায় পরিণত হয়। তিনি ১৫০৪ সালে কাবুল ও গজনি অধিকার করেন। তিনি ১৫২০ সালে শিয়ালকোট ও কান্দাহার দখল করেন।

সম্রাট বাবর ছিলেন মূলত ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কষ্টসহিষ্ণু, আত্মবিশ্বাসী এবং সমরকুশলী। তিনি বাল্যকাল হতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। পূর্ব পুরুষদের বাসভূমি মধ্য এশিয়ায় সুবিধা করতে না পেরে তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। ভারত উপমহাদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে অনৈক্য ও রাজনৈতিক কোন্দল এবং তাদের সামরিক দুর্বলতা দেখে সাম্রাজ্যবাদী বাবর নিজের সাফল্যের সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। চূড়ান্তভাবে ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করার পূর্বে বাবর পর্যবেক্ষণমূলক অভিযানে প্রবৃত্ত হন। তার এ ধরনের অভিযানের অংশ হিসেবে তিনি ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু নদ অতিক্রম করে বজৌর দুর্গ এবং ঝিলাম নদীর তীরস্থ 'ভেরা' অঞ্চল বিনা বাধায় অতিক্রম করেন। ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাদাখশান এবং ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার জয় করেন। এ সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা তাকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি দিল্লির দিকে দৃষ্টি দেন এবং ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে খানুয়ার এবং ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোগরার যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুঘল সম্রাট বাবরের শাসনকাল ছিল যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶১৭ বাবর মধ্য এশিয়ায় বার বার পরাজিত ও ব্যর্থ হয়ে বিফল মনোরথ না হয়ে অসীম মনোবল ও ধৈর্য নিয়ে কঠোর সংগ্রাম করেন। তার সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল স্বীকৃতি ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি উপমহাদেশে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস নেন। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. নূর জাহান কে ছিলেন? ১
খ. মুঘলদের পরিচয় দাও। ২
গ. শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নূরজাহান ছিলেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী এবং মুঘল অমাত্য মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা।

খ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এক নতুন এবং গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে লোদি বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর বাবর এই নতুন রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। ইতিহাসে বাবর প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশটি 'মুঘল' রাজবংশ নামে পরিচিত।

গ শাসক হিসেবে বাবর ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। মাত্র ১১ বছর বয়সেই তিনি শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। শাসক হিসেবে তার কৃতিত্ব ছিল অতুলনীয়।

https://teachingbd24.com

১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বাবর। সিংহাসন লাভের পরপরই তিনি আত্মীয়-স্বজন ও উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ১৪৯৭ সালে তিনি সমরখন্দ দখল করেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে পতিত হয়ে সমরখন্দ হারান। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফারগানা হস্তচ্যুত হয়। তিনি আবার ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ফারগানা এবং ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে সমরখন্দ অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ১৫০৩ সালে সাইবানি খানের কাছে পরাজিত হয়ে ফারগানা ও সমরখন্দ থেকে বিতাড়িত হন। এর ফলে তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। ১৫২৬ সালে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি খানুয়ার যুদ্ধে ও গোগরার যুদ্ধে জয়লাভ করে তার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

উদ্দীপকের সুলতান জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব হলো ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, যা শাসক হিসেবে তার কৃতিত্বকেই তুলে ধরে। তাই বলা যায়, শাসক হিসেবে বাবর ছিলেন একজন সফল শাসক।

ঘ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সম্রাট বাবরের কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাবর ছিলেন অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। মধ্যযুগের ইতিহাসে বাবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নরপতি। কৃতিত্ব ও চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কালী কিংকর দত্ত যথার্থই বলেন, "Babar is one of the most romantic and interesting personalities in the History of Asia." জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর মাত্র ১১ বছর বয়সে নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হন। শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি প্রথমে কাবুল এবং পরে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। শুধু প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, তার ভিত্তি সুদৃঢ় করে একে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

লেনপুল বলেন, তার ভারত বিজয় তাকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিয়েছে, যা একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়। বাবর প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে ওয়ালি, একজন দিওয়ান, শিকদার এবং কোতোয়াল নিয়োগ করেন। তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৫ মাইল অন্তর ডাক চৌকির ব্যবস্থা করেন। তিনি দিল্লি ও আগ্রার ২০টি উদ্যান, বহু পাকা নর্দমা, সেতু, অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বাবর একজন সুসাহিত্যিক, নিপুণ সমালোচক ও হস্তশিল্প বিশারদ হিসেবে কৃতিত্বের দাবিদার। 'বাবুরনামা' তার গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাশব্রুক উইলিয়াম বাবরের চরিত্রের আটটি মৌলিক গুণের উল্লেখ করেন। যেমন– নিখুঁত বিচারবুদ্ধি, উচ্চাভিলাষ, যুদ্ধনৈপুণ্য, সুদক্ষ শাসন-কৌশল, প্রজাহিতৈষীপনা, উদার প্রশাসনিক আদর্শ, সৈন্যদের মন জয় করার ক্ষমতা এবং ন্যায়বিচারের মানসিকতা।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাবর নিজেকে একজন দক্ষ শাসক হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ টেকনাফ উপজেলার চেয়ারম্যান পদে চৌধুরী পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছে। আনোয়ার পরিবার ভাগ্যান্বেষণে টেকনাফে এসে বসতি স্থাপন করে। আনোয়ার এর সহজ-সরল জীবনযাপন, সাহসিকতা, নীতি, নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য উপজেলাবাসীর নজর কাড়তে সক্ষম হয়। টেকনাফ উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচনে আনোয়ার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি উপজেলার অভাবনীয় উন্নয়ন করেন। উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা, সুশাসন, জননিরাপত্তা, বিচারশালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাজস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন করেন। যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো চেয়ারম্যানই করতে পারেননি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি চৌধুরী পরিবারের হাতে চলে যায়।

[কক্সবাজার সিটি কলেজ]

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন ন্যায়বিচারক — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনোয়ারের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে কোন আফগান শাসকের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আনোয়ারের চেয়ে উক্ত আফগান শাসক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন – বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাবর' শব্দের অর্থ সিংহ।

খ সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন ন্যায়বিচারক— উক্তিটি যথার্থ।

সম্রাট জাহাঙ্গীর মজলুম প্রজাদের অভিযোগ শুনে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আগ্রা দুর্গের শাহ বুরিজি থেকে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত একটি প্রস্তর স্তম্ভের ৩০ গজ লম্বা একটি ঘণ্টাযুক্ত 'ন্যায় শৃঙ্খল' টানিয়ে দেন। যে কোনো ব্যক্তি এই শিকল টেনে অভিযোগ বিষয়ে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সম্রাট তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব গালিব দেশের শাসনকর্তা, তিনি বুঝতে পেরেছেন নিজ ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি যদি কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় তবে রাজ্য শাসনে শান্তি বিরাজ করবে না, তাই তিনি সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করেছিলেন।

[কক্সবাজার সিটি কলেজ]

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দাগ ও হুলিয়া বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব গালিবের মধ্যে আকবরের যে নীতির প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. জনাব গালিবের মতো আকবরও কী একই উদ্দেশ্যে ধর্মমত প্রচার করেন– তোমার সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা।

খ যুদ্ধসংশ্লিষ্ট ঘোড়াকে চিহ্নিত করার এক অভিনব পদ্ধতি হলো দাগ এবং সৈন্যদের বিস্তারিত বিবরণমূলক তালিকা পদ্ধতি হলো হুলিয়া।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সর্বপ্রথম দাগ এবং হুলিয়া প্রথা প্রবর্তন করেন। পরে তার অনুকরণেই শেরশাহ সেনাবাহিনীর দুর্নীতি হ্রাসে এ দুটি প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন। অশ্বচিহ্নিতকরণ পদ্ধতি অর্থাৎ দাগ এবং সেনাদের বিস্তারিত বিবরণ পদ্ধতি হুলিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমে শেরশাহ সামরিক বাহিনীতে দুর্নীতি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গ সৃজনশীল ৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ রাজশাহীর জমিদার শহীদ চৌধুরী খুবই রুচিবান ও সৌখিন মানুষ ছিলেন। তিনি জমিদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি জাকজমকপূর্ণ দরবার হল নির্মাণ ছিলেন। পাশাপাশি তার নির্মিত কাচারি বাড়ি, নায়েব মহল আজও স্ব-মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। তার স্ত্রী সাহেদা অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদূষী রমণী ছিলেন। জমিদার শহীদ চৌধুরীর স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে সাহেদা অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুষড়ে পড়ে ছিলেন। তিনি স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে সৌধটি নির্মাণ করেন আজও বিদ্যমান আছে।

[কক্সবাজার সিটি কলেজ]

ক. সম্রাট শাহজাহানের পিতার নাম কী? ১

খ. সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সাহেদার সাথে সম্রাট শাহজাহানের কোন মহীয়সীর সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

https://teachingbd24.com

ঘ. উদ্দীপকের জমিদার শহীদ চৌধুরীর কর্মকান্ডের আলোকে সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্য কীর্তির মূল্যায়ন কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট শাহজাহানের পিতার নাম ছিল নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

খ সৃজনশীল ১০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সাহেদার সাথে সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের সামঞ্জস্য রয়েছে।

উদ্দীপকের জমিদার শহীদ চৌধুরীর স্ত্রী সাহেদাও ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদুষী রমণী। জমিদার চৌধুরীর স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। এক দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী সাহেদা অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুষড়ে পড়েন এবং স্ত্রীর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি সৌধ নির্মাণ করেন, যা আজও বিদ্যমান। ঠিক একইভাবে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলও ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। তিনি আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বামী শাহজাহানের অন্তর জয় করেছিলেন। সম্রাট তাকে মালিকা-ই-জাহান উপাধি দেন। ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন সন্তান প্রসবকালে মহীয়সী মমতাজ মহল বুরহানপুরে ইন্তেকাল করেন। প্রিয়তমা পত্নীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে সম্রাট শাহজাহান বেদনাকাতর হয়ে পড়েন। শোকাতুর সম্রাট এতটাই মুষড়ে পড়েছিলেন যে, তিনি সাত দিন ঝারোকায় দর্শন দেননি। এমনকি রাজকাজেও অংশ নেননি। প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সম্রাট মমতাজের সমাধির ওপর তাজমহল নির্মাণ করেন, যা বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি। এটি পত্নীপ্রেমেরও এক উজ্জ্বল নিদর্শন। উদ্দীপকেও পত্নীপ্রেমের এমন নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের জমিদার শহীদ চৌধুরীর কর্মকান্ডের মতোই সম্রাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন। উদ্দীপকের জমিদার শহীদ চৌধুরী স্থাপত্য ক্ষেত্রে যে অবদান রাখেন তা হলো কাচারি বাড়ি, নায়েব মহল, জাকজমকপূর্ণ দরবার হল, নাট নামক একটি মন্দির এবং স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থব্যয়ে একটি সৌধ নির্মাণ করেন যা আজও বিদ্যমান। তার এ কর্মকাণ্ডে সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পে অবদানেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

সম্রাট শাহজাহান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের আরেকটি অপূর্ব নিদর্শন হলো 'ময়ূর সিংহাসন'। সম্রাট শাহজাহান আগ্রা দুর্গে দেওয়ান-ই-আমের উত্তরে শ্বেতপাথর দ্বারা মতি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি আরও নির্মাণ করেন, দিল্লিতে সুরক্ষিত লাল কেল্লা। দিল্লির জামে মসজিদ তার অন্যতম এক কীর্তি। সম্রাট শাহজাহানের সময় নির্মিত শিশমহল ও জুঁইমহল ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত রাজকীয় আবাসগৃহ। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি সুসাম্মাম বুরুজ নামে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করেন। তাছাড়া সম্রাট শাহজাহান আরও অন্যান্য স্থাপত্য দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, কাবুল, কাশ্মির, আজমির ও আহমদাবাদে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তৈরি করেন। এছাড়া নিজামউদ্দিন আউলিয়া মাজার, লওখাল, খাওয়ারগাহ, শালিমার উদ্যান প্রভৃতি তার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন তার এ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষতার কারণে তার রাজত্বকালকে ঐতিহাসিকগণ মুঘল শাসনের 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শহীদ চৌধুরীর নির্মিত সৌধটির মতো সম্রাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পে অনন্য অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পদ ও পদমর্যাদায় বিভিন্ন ধাপ সৃষ্টি করে বেতন-ভাতাদি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স জারি করা হয়। এ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পেছনে উদ্দেশ্য হলো প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাজে শৃঙ্খলার বিভিন্ন ধাপ ও স্তর সৃষ্টি করে সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় করা এবং একটি দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কোন মুঘল শাসকের সময় সংঘটিত হয়? ১

খ. দীন-ই-এলাহী কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' এর অনুরূপ সম্রাট আকবর কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' জারি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সম্রাট আকবরের সামরিক প্রশাসনের বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬) মুঘল সম্রাট আকবরের সময় সংঘটিত হয়েছিল।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'-এর অনুরূপ সম্রাট আকবর মনসবদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের অব্যবস্থা দূর করার লক্ষ্যে সম্রাট ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খানকে মীর বকশি নিয়োগ করে স্বয়ং একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সম্রাটের এই পরিকল্পনাই ইতিহাসে 'মনসবদারি প্রথা' নামে পরিচিত। উদ্দীপকের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' এর কার্যক্রমে আকবরের প্রবর্তিত এ প্রথার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পদ ও পদমর্যাদার বিভিন্ন ধাপ সৃষ্টি করে বেতন-ভাতাদি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' জারি করা হয়। একইভাবে সম্রাট আকবর মুঘল সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও দক্ষতার অভাব লক্ষ করে এর সংস্কারের জন্য মনসবদারি ব্যবস্থা চালু করেন। সম্রাট আকবরের সামরিক সংস্কারের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'মনসবদারি প্রথা'। 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা। এ পদের অধিকারীকে 'মনসবদার' এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে 'মনসবদারি প্রথা' বলা হয়। সম্রাট আকবর ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে এ প্রথা চালু করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, সাম্রাজ্যে সর্বমোট ৩৩ প্রকারের মনসব ছিল। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার মোট দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে ১০ জন সৈন্য নিজেদের অধীনে রাখতে পারত। তাই বলা যায়, সম্রাট আকবরের মনসবদারি প্রথা উদ্দীপকে বর্ণিত 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' জারি করার মতোই সম্রাট আকবরও তার সামরিক বিভাগকে বিভিন্ন ধাপ ও স্তরে বিভক্ত করেন।

সম্রাট আকবরের পূর্বে সাম্রাজ্যের স্থায়ী কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। জায়গিরদারগণ প্রয়োজনের সময় সৈন্য সরবরাহ করতেন। এতে অনেক সময় নানা অসুবিধা হতো। সম্রাট আকবর ক্ষমতা গ্রহণ করে মনসবদারি পদ্ধতিতে সামরিক বাহিনী এ সমস্যা দূরীকরণে গড়ে তোলেন, যা উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির প্রতিচ্ছবি।

প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাজে শৃঙ্খলার বিভিন্ন ধাপ ও স্তর সৃষ্টি করে সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন দপ্তরে কাজের মধ্যে সমন্বয় করা এবং একটি দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে সম্রাট আকবরও মনসবদারি প্রথা গড়ে তুলে মুঘল সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। সম্রাটের সেনাবাহিনীতে পদাতিক বাহিনীর ভূমিকা ছিল গৌণ। অন্যদিকে, অশ্বারোহী বাহিনী ছিল মুঘল সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ। তার গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিল মীর-ই-আতিশ এবং নৌবাহিনীর প্রধান আমির-ই-বহর। সম্রাট নিজেই ছিলেন সাম্রাজ্যের

https://teachingbd24.com

প্রধান সেনাপতি। কেন্দ্রে মীর বকশি এবং প্রদেশে বকশির তত্ত্বাবধানে সকল প্রশাসন পরিচালিত হতো।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স' এর অনুরূপ ব্যবস্থার মতো মুঘল সম্রাট আকবর তার প্রতিষ্ঠিত মনসবদারির মাধ্যমে সামরিক প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ২২ তাজমহলের পাথর দেখিয়াছ?
দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী
বাহিরেতে শাহজাহান।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. তাজমহল কোথায় অবস্থিত? ১
খ. কোন সম্রাটের আমলে মুঘল স্থাপত্য স্বর্ণযুগে উপনীত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তাজমহল কোন সম্রাটের শাসন আমলে নির্মিত? স্থাপত্যটি সম্পর্কে তোমার অনুভূতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ময়ূর সিংহাসন তার শাসনামলের অন্যতম অবদান— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাজমহল আগ্রার যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

খ সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে মুঘল স্থাপত্য স্বর্ণযুগে উপনীত হয়।
'স্থাপত্যের রাজপুত্র' হিসেবে খ্যাত সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলেই মুঘল স্থাপত্য শিল্প সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উন্নীত হয়। কেননা শাহজাহানই জগদ্বিখ্যাত আগ্রার তাজমহল, মতি মসজিদ, জামে মসজিদ ময়ূর সিংহাসন, আগ্রার খাস মহল, শীশমহল, দিল্লির দিওয়ান-ই-আম, দিল্লির দিওয়ান-ই-খাস এবং দিল্লির উপকণ্ঠে শাহজানাবাদ নগরী নির্মাণ করেন। অন্য কোনো মুঘল শাসকের শাসনামলে এতো বেশি স্থাপত্য নির্মিত হয়নি। তাই বলা যায়, শাহজাহানের শাসনামলেই মুঘলদের স্থাপত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তাজমহল মুঘল সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে নির্মিত হয়েছে, যা আমাকে পত্নী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
সম্রাট শাহজাহানের অনবদ্য, অমর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত তাজমহল। এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম। জনৈক পারসিক ওস্তাদ ঈশা খাঁ ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত তাজমহলের স্থপতি। যে স্থাপত্যশিল্প পত্নীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে আজও কোটি মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। উদ্দীপকে এ তাজমহলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে নির্দেশকৃত স্থাপত্য শিল্প হলো তাজমহল, যেটি সম্রাট শাহজাহান তার প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের নামানুসারে তার সমাধির ওপর নির্মাণ করেন। এটি সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। এ তাজমহল শুধু মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন নয় বরং পত্নীপ্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও স্বীকৃত। ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে এটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রায় তিন কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। তবে তাজমহল শুধুমাত্র ইট-পাথরে নির্মিত এক স্থাপত্য নয় বরং এটি আজও মানুষকে পত্নীপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে। তাই বলা যায়, তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের পত্নীপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘ ময়ূর সিংহাসন তার অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলের অন্যতম অবদান- উক্তিটি যথার্থ।
ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীমনের মানুষ। তার নির্মিত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করলেও ময়ূর সিংহাসনও ছিল তার এক অনবদ্য স্থাপত্যকীর্তি।
পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির অন্যতম। শিল্পী বেকদাল খানের তত্ত্বাবধানে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছরে এ সিংহাসনটি নির্মিত হয়েছিল। সিংহাসনের স্বর্ণ নির্মিত চারটি স্তম্ভের ওপর একটি কারুকার্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপ ছিল। প্রতিটি স্তম্ভ শীর্ষে মুখোমুখি বসানো একজোড়া ময়ূর স্থাপন করা হয়েছিল। এদের মাঝখানে ছিল বহু মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত ফলবান বৃক্ষ।
সিংহাসনে ওঠার জন্য মণিমুক্তাখচিত তিন ধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ি ছিল। অনিন্দ্যসুন্দর ও মূল্যবান এ ময়ূর সিংহাসনটি সম্রাট শাহজাহানের সৌন্দর্য জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণকালে ময়ূর সিংহাসনটি নিয়ে যান। বর্তমানে তা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট শাহজাহানের অনেক স্থাপত্যশিল্প থাকলেও সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে ময়ূর সিংহাসন ছিল অন্যতম।

প্রশ্ন ▶ ২৩ হীরা মুক্তা মানিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
শুধু থাক,
এক বিন্দু নয়নের জল,
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল।

[নেত্রকোণা সরকারি কলেজ, নেত্রকোণা]

ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উল্লিখিত কবিতাংশটুকু কোন মুঘল সম্রাটের কথা মনে করিয়ে দেয়? নিরূপণ কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উল্লিখিত কবিতাংশটুকু উক্ত শাসকের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিক তুলে ধরে? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০)।

খ কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত্ব (অধিকার) রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সম্রাট শেরশাহের (১৪৭২-১৫৪৫) প্রবর্তিত এক অভিনব ব্যবস্থাকে বোঝায়।
পাট্টা ছিল জমির অধিকার সংক্রান্ত দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে সরকারের পক্ষ হতে পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রদেয় করসহ ভূমিতে নিজের দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে কৃষক রাষ্ট্রকে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

গ উল্লিখিত কবিতাংশটুকু মুঘল সম্রাট শাহজাহানের কথা মনে করিয়ে দেয়।
সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীমনের মানুষ। স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান অপরিসীম। তার স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তার নির্মিত এ স্থাপত্য শিল্পটি তাকে অমর করে রেখেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে সম্রাট শাহজাহানের এ স্থাপত্য কীর্তিরই উল্লেখ রয়েছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত
'এক বিন্দু নয়নের জল,
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাংশ মুঘল সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি তাজমহলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি এ তাজমহল। সম্রাট তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধির ওপর জগদ্বিখ্যাত এ ইমারতটি নির্মাণ করেন। এটি শুধু মুঘল স্থাপত্য নিদর্শনই নয় বরং পত্নীপ্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও স্বীকৃত। বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগরের বাইশ বছরের পরিশ্রমের ফসল তাজমহলের স্বপ্নদ্রষ্টা সম্রাট নিজেই। এর মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন শিল্পী ইসফানদিয়ার রুমী এবং প্রধান স্থপতি ইরানের ওস্তাদ ঈসা সিরাজী। মর্মর পাথরে নির্মিত

teachingbd24.com

তাজমহলকে ঐতিহাসিক হ্যাভেল, ভারতের 'ভেনাস দ্য মিলো' বলে অভিহিতি করেছেন। আর উদ্দীপকে এ তাজমহলেরই গুণকীর্তন করা হয়েছে, যা মূলত মুঘলদের মধ্যে সবচেয়ে শিল্পানুরাগী সম্রাট শাহজাহানের নামটাই আমাদের মানসপটে সমুজ্জ্বল করে তোলে।

ঘ না, উল্লিখিত কবিতাংশটুকু উক্ত শাসকের অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিক তুলে ধরে না বলে আমি মনে করি।
মুঘল সম্রাট শাহজাহান ললিতকলা বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন, যা শুধু তার রাজত্বকালকেই নয় প্রকারান্তরে মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন।
উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতাংশে সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহলের কথা বলা হয়েছে, যা কোনোভাবেই সম্রাটের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিককে তুলে ধরে না। কেননা তাজমহল ছাড়াও স্থাপত্য শিল্পে তার আরও অনেক অবদান রয়েছে। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। রাজধানী আগ্রায় সম্রাট দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, শিশ মহল ইত্যাদি স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে দিওয়ান-ই-খাস ছিল সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য মন্ডিত এবং পাথরখচিত মার্বেলের তৈরি। বহু মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত দিল্লির জামে মসজিদ তার স্থাপত্য অনুরাগের একটি বিশেষ নিদর্শন। পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির মধ্যে অন্যতম। এটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এটি শিল্পী বেবাদাল খানের তত্ত্বাবধানে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছর ধরে নির্মাণ করা হয়। এ সিংহাসনের স্বর্ণনির্মিত চারটি স্তম্ভের ওপর একটি কারুকার্যখচিত চন্দ্রাতপ রয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষে মুখোমুখি বসানো একজোড়া ময়ূর স্থাপন করা হয়েছে।
পরিশেষে বলা যায়, শুধু তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের সমগ্র স্থাপত্য শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান আরও অনেক বেশি। তাই উদ্দীপকের কবিতাংশে তার স্থাপত্যকীর্তির আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶২৪ সম্রাট আকিলের রাজত্বকাল সবদিক দিয়ে উন্নতি লাভ করেছিল। অভাবনীয় উৎকর্ষের জন্য তার রাজত্ব কালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে। আকিল তাঁর মৃত্যুতে সাতদিন রাজকার্য পরিচালনা করেননি, তিনি প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রেমের স্মৃতি হিসেবে ভুবন বিখ্যাত অমর এবং এক সৌধ নির্মাণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষদিকে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. 'শাহজাহাননামা' কে রচনা করেন? ১
খ. কাকে জিন্দাপির বলা হয় এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট আকিলের কর্মকান্ডে মুঘল কোন সম্রাটের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উক্ত সম্রাটের রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।" বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'শাহজাহাননামা' ইনায়েত খান রচনা করেন।

খ ইসলামি অনুশাসনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হওয়ার কারণে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয়।
সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন খাঁটি সুন্নি মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চললেও তিনি পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের শাসনামলে যে ধর্মের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল আওরঙ্গজেব তা জীবিত করেন। এটা করতে গিয়ে হিন্দুদের কাছে অপ্রিয় হলেও মুসলমানদের নিকট হতে তিনি 'জিন্দাপির' উপাধি লাভ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্রাট আকিল কর্তৃক স্ত্রীর স্মরণে নির্মিত সমাধি সৌধের সাথে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহলের সাদৃশ্য রয়েছে।
সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শিল্পীমনের মানুষ। স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান অপরিসীম। তার স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তিনি তার স্ত্রী মমতাজমহলের স্মৃতি রক্ষার্থে এ স্থাপত্যটি নির্মাণ করেন। উদ্দীপকের স্থাপত্য কীর্তির সাথে সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত এ তাজমহলের মিল রয়েছে।
উদ্দীপকের সম্রাট আকিল-এর স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। শোকাহত আলী হায়দার তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য অনেক টাকা খরচ করে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজমহল সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি শোকে হতবিহবল হয়ে পড়েন। তিনি তার স্ত্রীর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তার সমাধির ওপর তাজমহল নামক স্থাপত্যকর্মটি নির্মাণ করেন। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এক শিল্পকর্ম। ১৬৩৩ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০ হাজার কারিগর দীর্ঘ ২২ বছর পরিশ্রম করে তৎকালীন তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। উদ্দীপকের সমাধির মধ্যে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত এ তাজমহলেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত সম্রাট অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহান এর রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে বিশ্লেষণ করা হলো:
নানা কারণে মুঘল সম্রাট শাহজাহান এর সময়কালকে মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুষ্ঠু শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি, শিল্প ও স্থাপত্যের উৎকর্ষতা এর মধ্যে অন্যতম। শাহজাহানের সময় সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর তিনি যে তাজমহল নির্মাণ করেছেন তা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বাপেক্ষা সুন্দর এক স্থাপত্যকর্ম। এছাড়া তিনি দিল্লির দিওয়ান-ই আম ও দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রার জামে মসজিদ ও ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন। তার শাসনামলে মুঘল সাম্রাজ্য বাংলাদেশের সিলেট থেকে সিন্ধু প্রদেশ এবং আফগানিস্তানের বিস্তৃত দুর্গ হতে দক্ষিণে ভারতবর্ষের অউসা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি হুগলী, আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা প্রভৃতি রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্রাট শাহজাহান আকবরের উন্নত নীতি গ্রহণ করেন এবং ন্যায়বিচার ও বদান্যতার জন্য প্রশংসা অর্জন করেন। এসময় রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান ছিল, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রজাবর্গ তুলনামূলক অনেক সুখী ও সমৃদ্ধশালী ছিল। সাহিত্য ও চিত্রকলাও এ সময় বিকশিত হয়েছিল। তার রাজত্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময় ভারতবর্ষ পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সাথে রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করে। সাম্রাজ্যের অর্থদপ্তর প্রাচুর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি বলা যায়, মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ৩০ বছর রাজত্বকালে সমস্ত সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, উক্ত সম্রাটের রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।

প্রশ্ন ▶২৫ আসাদুল্লাহ মাত্র পাঁচ বছর শাসন করে সুষ্ঠু, উদার ও জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। অল্প সময়ে তিনি নানা প্রকার সংস্কার সাধন করেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুগোপযোগী ও উদারনীতি প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের সম্পদ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. আধুলি ও সিকি কী? ১
খ. বিলগ্রামের যুদ্ধ সম্পর্কে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আসাদুল্লাহর শাসনব্যবস্থায় শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শেরশাহের শাসনব্যবস্থা যুক্তিসংগত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও উদারনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল — বিশ্লেষণ কর। ৪

Teachingbd24.com

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রার অর্ধাংশ হলো আধুলি এবং এক-চতুর্থাংশ হলো সিকি।

খ ১৫৪০ সালে শেরশাহ ও হুমায়ুনের মধ্যে কনৌজের কাছে বিলগ্রাম নামক স্থানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাই বিলগ্রামের যুদ্ধ। চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের পর সম্রাট হুমায়ুন হারানো সাম্রাজ্য ফেরত পাবার আশায় ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে শেরশাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। শেরশাহ ১৫,০০০ সৈন্যসহ হুমায়ুন এর মোকাবিলা করেন। এবারও হুমায়ুন পরাজিত হলেন। ফলে তিনি আগ্রার সিংহাসন হারান। অপরদিকে, শেরশাহ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে আফগান রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

গ উদ্দীপকের আসাদুল্লাহর রাজস্ব ব্যবস্থার সাথে শেরশাহের রাজস্ব ব্যবস্থা সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজস্ব সংস্কার শেরশাহের রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পূর্বে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। কানুনগো নামক কর্মচারীদের মৌখিক বিবরণের ওপর ভিত্তি করে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। এতে রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ ছিল। শেরশাহ ভূমি রাজস্ব এবং শুল্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট সংস্কার সাধন করেন।

উদ্দীপকে আসাদুল্লাহ কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেটি সেদেশের রাজস্ব ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে শেরশাহ তার রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করার জন্য নির্ভুল ভূমি জরিপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ খাজনারূপে নির্ধারণ করেন। জনসাধারণ নগদ অর্থে অথবা উৎপাদিত শস্যে খাজনা দিতে পারতো। তিনি চাষযোগ্য জমিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যথা- উর্বর, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর এবং অনুর্বর। এছাড়া শেরশাহ রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন এবং দাম নামে তাম্রমুদ্রারও প্রচলন করেন। ফলে প্রজাসাধারণ খুব সহজেই সরাসরি রাজ কোষাগারে খাজনা জমা দিতে পারত।

এ সংস্কারের ফলে শেরশাহের রাজস্ব প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। যা উদ্দীপকের রাজস্ব সংস্কারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ শেরশাহ তার দূরদর্শী চিন্তা-চেতনা ও অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা একটি যুক্তিসংগত ও আধুনিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

শেরশাহ একজন সুশাসক, যোগ্য ও অভিজ্ঞ সেনাপতি এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি মুঘল রাজাদের অন্তর্বর্তীকালীন আফগান শূর বংশের স্থপতি ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করে তিনি যে সুষ্ঠু, উদার ও জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে তাকে অমরত্ব দান করে।

শেরশাহের শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেও দেখা যায় যে, বিজ্ঞানসম্মত যুগোপযোগী ও উদারনীতি প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের সম্পদ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিলেন। যা পরবর্তীকালেও অনুসৃত হয়েছিল। সম্রাট শেরশাহ অল্প সময়ের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করে তিনি তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা, কর্মনৈপুণ্য ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেছিলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসনপ্রণালির শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করে, স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতার সাহায্যে একটি আধুনিক ও যুক্তিসংগত শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তার রাজস্বনীতি যেমন ছিল বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি ছিল জনকল্যাণকর। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবর তার নীতি অনুসরণ করেই অধিকতর কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। স্যার ডব্লিউ হেইগ বলেন, 'শেরশাহ ভারতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহ একটি আধুনিক যুক্তিসংগত ও আদর্শ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সুলতান সুলেমান সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসনে পুরাতন ধ্যান ধারণার সংস্কার করেন। তিনি প্রশাসন বিচার ও সৈন্যবাহিনীর জন্য আলাদা বিভাগ ও পদ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা ও অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। এতে উচ্চ রাজকর্মকর্তাগণের মাঝে মর্যাদার বিরোধ নিরসন হয়। ফলে সাম্রাজ্য শাসনে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তবে তার এ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. দীন-ই-এলাহী কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থাটি মুঘল সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত কোন পদক্ষেপকে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অনেক উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক ব্যবস্থার মতো সম্রাট আকবরের উক্ত পদক্ষেপও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না।' বক্তব্যটি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ প্রাথমিক জীবনে তৈমুর লং সিস্তান অভিযানকালে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর যখন নিশ্চিন্তে রাজধানীতে বিশ্রামরত তখন সিস্তানের সৈন্যরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এরূপ অতর্কিত আক্রমণে তৈমুর লং পরাজিত হন এবং কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। এমনকি কিছুকালের জন্য তিনি রাজ্যহারা হন। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. হাজার দিনারি কাকে বলা হয়? ১

খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা কী? — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তৈমুর লং এর সিস্তান অভিযান এর সাথে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজার দিনারি বলা হয় মালিক কাফুরকে।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ-এর সিস্তান অভিযানের সাথে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের বাংলা অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মুঙ্গেরের সন্নিকটে সুরজগড়ের যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে আফগান নেতা শেরশাহ সমগ্র বিহার দখল করেন। পরবর্তীতে শেরশাহ বঙ্গদেশে সফল অভিযান পরিচালনা করে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তার এরূপ শক্তি বৃদ্ধিতে হুমায়ুন শঙ্কিত হয়ে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন। তৈমুর লঙ-এর ঘটনায়ও এ অভিযানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

তৈমুর লঙ সিস্তান অভিযানের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর লঙ এর সিস্তান অভিযানের মতো মুঘল সম্রাট হুমায়ুনও শেরশাহের বিরুদ্ধে বাংলায় অভিযান প্রেরণ করেন। হুমায়ুন যখন গুজরাটে বাহাদুর শাহর বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আফগানরা মুঘলদের জন্য প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দেখা দেয়। শেরশাহের বিহার দখল ও বঙ্গদেশে ২টি সফল অভিযান প্রেরণ করার ফলে হুমায়ুন শঙ্কিত হয়ে ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চুনার দুর্গ আক্রমণ ও দখল করেন। এরপর হুমায়ুন গৌড় (১৫৩৮ সালে) অবরোধ করে বাংলা বিজয় সম্পন্ন করে এখানে প্রায় ৬ মাস অলস সময় পার করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ-এর সিস্তান অভিযানে এই ঘটনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের কাছে হুমায়ূনের পরাজয়ের কারণ ছিল সম্রাটের কৌশলগত দুর্বলতা। উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙের সামরিক পরাজয়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রেক্ষাপট পরিলক্ষিত হয়।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গ আক্রমণ ও দখল করে বাংলা বিজয় সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি বাংলায় প্রায় ৬ মাস আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে শেরশাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। তৈমুর লঙ-এর পরাজয়ের ক্ষেত্রেও হুমায়ূনের অদূরদর্শিতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

তৈমুর লঙ সিস্তান দখল করে যখন নিশ্চিন্তে রাজধানীতে বিশ্রামরত ছিলেন, তখন সিস্তানের সৈন্যরা তাকে চারদিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে। ফলে তৈমুর লঙ পরাজিত হন এবং কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। একইভাবে হুমায়ুনও শেরশাহকে চুনার দুর্গে পরাজিত করে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে পড়েন, যা চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) তার পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করে এবং বাংলা জয় করে সেখানে ছয় মাস অতিবাহিত করেন। কৌশলগত দিক থেকে এটি ছিল হুমায়ূনের বিরাট ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা এর ফলে শেরশাহ নিজের ক্ষমতা সুসংহত করার সুযোগ পান এবং বাংলা দখল করেন। এ অবস্থায় হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে গৌড় অবরোধ করেন। কুশলী শের খান মুঘল বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে গৌড় ত্যাগ করেন। হুমায়ুন গৌড় দখল করে সেখানে ছয় মাস আলস্য ও আমোদে সময় কাটান। সে সময়ে শেরশাহ চুনার দুর্গসহ বিহার, বারানসী, জৈনপুর ও কনৌজ দখল করেন। এভাবে হুমায়ূনের আলস্য ও ত্রুটিপূর্ণ কৌশলের কারণে শেরশাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এর ফলে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

পরিশেষে বলা যায়, হুমায়ূনের অলসপ্রবণতা ও দূরদর্শিতার অভাবই চৌসার যুদ্ধে তার পরাজয়ের দৃশ্যপট তৈরি করে রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মধ্য যুগে ইউরোপের কোন এক দেশের দক্ষ ও যোগ্য একজন শাসক তাঁর কৃতিত্ব ও যোগ্যতা বলে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল রাজ্য শাসন করতে সক্ষম হন। তিনি এই দীর্ঘ সময় সিংহাসনে টিকে থাকার জন্য ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবশ্রেণির মানুষের মনতুষ্টির জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এ নীতিগুলোর মধ্যে তাঁর নিজস্ব মনের খেয়ালে নতুন ধর্মমত চালুর পাশাপাশি মিলনাত্মক কিছু নীতিও গ্রহণ করেন। অধিকন্তু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। সারা পৃথিবীতে সেই শাসক একজন শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় আসীন হয়ে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও]*

ক. সম্রাট আকবর কত সালে বাংলা জয় করেন? ১

খ. মনসবদারি প্রথা কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইউরোপের শাসকের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? লেখ। ৩

ঘ. সম্রাট আকবরের নতুন ধর্মনীতি দীন-ই-এলাহী সম্পর্কে যা জান লিখ। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সম্রাট আকবরের শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একটি নতুন ধর্মীয় মতবাদ তথা 'দীন-ই-এলাহী ধর্মমতের প্রচার।

মুঘল সম্রাট আকবর ছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তাই নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সব ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দূর করার মাধ্যমে, নিজেকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে, ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে (সুলহী-ই-কুল নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে) তার নতুন ধর্মমত দীন-ই-এলাহী প্রবর্তন করেন।

দীন-ই-ইলাহী ছিল একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ এই প্রসঙ্গে বলেন, দীন-ই-এলাহী' একটি উদার একেশ্বরবাদী ধর্ম, সকল ধর্মের ভালো ও উৎকৃষ্ট নীতিগুলো এতে সমন্বিত ছিল। এ ধর্মমতে কোনো নবি বা দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল না। এ মতবাদের অনুসারীবৃন্দকে সম্রাটের নামে ৪টি স্তরে ব্যক্তির জীবন, ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতে হতো।

সম্রাট আকবর ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করলেও এটি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মাত্র ১৮ জন এ ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধর্মমতের বিলুপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ বাংলাদেশে প্রতি বছর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়ে আসছে। এ অনুষ্ঠান ধর্ম-বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলে মিলে পালন করে থাকে। মুঘল আমলে এমন একজন শাসক ছিলেন যিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির সমর্থন আদায়ের জন্য বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। *[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. 'বাবরনামা' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন কে? ১

খ. মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বে শেরশাহের সফলতার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুঘল সম্রাটের কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ৩

ঘ. 'উক্ত নীতি গ্রহণের অন্যতম লক্ষ্য হলো সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা' - এর পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাবরনামা' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন লিডেন।

খ মুঘল আফগান দ্বন্দ্বে শেরশাহের সফলতার অন্যতম কারণ তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা।

শেরশাহ ছিলেন সমকালের অন্যতম দূরদশী রাজনীতিবিদ। তিনি হুমায়ুন অপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সামরিক সংগঠনেও তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এছাড়া হুমায়ুনের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে তিনি মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বে জয়লাভ করেন।

গ সৃজনশীল ৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত নীতি অর্থাৎ দীন-ই-ইলাহী গ্রহণের অন্যতম লক্ষ্য হলো সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা - উক্তিটি যথার্থ।

সম্রাট আকবরের দীন-ই-ইলাহী নামক ধর্মনীতির প্রবর্তন তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। তার প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী ছিল একেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্মমতের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে সকল ধর্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করা।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর আবাসস্থল। এই স্থানে সুদৃঢ় সাম্রাজ্য স্থাপনে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এটি সম্রাট আকবর ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব ধর্মাবলম্বীকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসার জন্য দীন-ই-ইলাহী নামে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সম্রাট ভেবেছিলেন এ ধর্মমত প্রবর্তনের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হবেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ভারতে স্থায়ী মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত জরুরি। ভারতে মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের স্বার্থে হিন্দু মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে একটি ঐক্য ও প্রীতির নাগরিকদের মধ্যে একটি ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সম্রাট ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর মি. মজুমদারের মতে, 'আকবরের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার ধর্মচিন্তাকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছিল'। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, আকবরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তার সাম্রাজ্যের সকলকে একটি কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, সম্রাট আকবরের দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩০ কমলগঞ্জের জয়াগিরদার 'ক' নিজ দক্ষতা ও মেধা খাটিয়ে সফিপুরের শাসক 'খ' এর দুর্বলতার সুযোগে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ পর্যায়ে আসতে তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। জনহিতকর কাজের জন্য তিনি খ্যাত হয়েছিলেন।

[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. 'দস্তুরুল আমল' কী? ১

খ. শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংঘর্ষের কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির উত্থান পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসক কোন কোন জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিলেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর শাসন ব্যবস্থায় অনাচার রোধ এবং শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য ১২টি বিধি জারি করেন, যা 'দস্তুরুল আমল' নামে পরিচিত।

খ শাহজাহানের জীবদ্দশায় তার চার পুত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তার প্রথম কারণ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে সিংহাসন লাভ ও সংরক্ষণ করতে হয়েছিল। শাহজাদা সেলিম ও শাহজাদা খুররম মুঘল সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার পূর্বে তাদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুতরাং সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব অথবা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণ সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

গ উদ্দীপকে 'ক' এর সথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হলেন শেরশাহ। মুঘল সাম্রাজ্যে শাসক হিসেবে তার উত্থান এক চমকপ্রদ ঘটনা।

উদ্দীপকের 'ক' নিজ দক্ষতা ও মেধা খাটিয়ে সফিপুরের শাসক 'খ' এর দুর্বলতার সুযোগে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি শাসন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন, যা পরবর্তী শাসকদের জন্য আদর্শ হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। 'ক' এর বিষয়গুলোর মধ্যে শেরশাহের ক্ষমতা গ্রহণ ও তার শাসনের প্রতিফলন ঘটেছে।

শেরশাহ জনদরদি ও প্রজাহিতৈষী শাসক হলেও তাকে দিল্লির শাসন গ্রহণ করতে হয়েছিল যুক্তি নয়, শক্তির জোরে। তিনি ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সাসারামের জায়গির নিযুক্ত হন এবং ১৫১৭ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে বহরখান লোহানীর মৃত্যুর পর তিনি তার পুত্র জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৫৩০ সালে শের খান চুনার দুর্গের অধিপতি বিধবা লাদ মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গ লাভ করেন। তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ক্রোধান্বিত হয়ে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে তার সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ১৫৩৪ ও ১৫৩৬ সালে বাংলায় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং ১৫৪০ সালে বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে তিনি দিল্লির মসনদে বসেন। আর এভাবেই তার উত্থান ঘটে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ শেরশাহ রাজস্ব সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছিলেন।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা সাম্রাজ্যের উন্নয়ন ও প্রজাকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এরা সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা তৎপর থেকে তাদের সার্বিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' এবং শেরশাহ জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে খ্যাত হয়ে আছেন।

সম্রাট শেরশাহ তার মাত্র পাঁচ বছরের শাসনকালের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করে তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা, কর্মনৈপুণ্য ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেন। মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি সুষ্ঠু ও আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শাসনকাজের সুবিধার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যকে ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করে। রাজস্ব সংস্কারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে ন্যায়ানুগ করার উদ্দেশ্যে ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। রাজকার্যে দুর্নীতি হ্রাসের জন্য রাজকর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার প্রসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেন। এমনকি মন্দিরকেও নিয়মিত মঞ্জুরি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সড়ক-ই-আজম নামে সড়ক নির্মাণ ও সড়কের দু'ধারে ছায়াপ্রদ ও ফলদ গাছ লাগান। তাছাড়া তিনি দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লঙ্গারখানা স্থাপন করেন। তার এ সকল জনহিতকর কাজের জন্য পরবর্তী শাসকদের নিকট অনুসরণীয় ও আদর্শ হয়ে আছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত জনহিতকর কাজের জন্য শেরশাহ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩১ সম্রাট নাজির শাহ তাঁর সম্রাজ্যের সকল শ্রেণির জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠির লোকেদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। তিনি নিজে এ গোষ্ঠির রাজকন্যা বিবাহ করেন এবং পুত্রকে উক্ত গোষ্ঠির এক কন্যার সাথে বিবাহ দেন। তিনি উক্ত গোষ্ঠীর লোকেদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে চাকুরি দেন এবং তাদের ওপর নির্ধারিত কর ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন।

[ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

ক. গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড কে নির্মাণ করেন? ১

খ. তাজমহল সম্পর্কে আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট নাজির শাহের সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের কোন নীতির সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সম্রাটের বিশেষ গোষ্ঠির প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও সদাচরণ তার রাজ্যে এ নবযুগের সূচনা করে - উক্ত নীতির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' বা 'সড়ক-ই-আজম' শূর শাসক শেরশাহ নির্মাণ করেন।

খ সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত মুঘল স্থাপত্যশৈলীর আকর্ষণীয় নিদর্শন হলো ভারতের আগ্রায় অবস্থিত তাজমহল।

মমতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নী। কিন্তু মমতাজের আকস্মিক মৃত্যুতে শাহজাহান ভেঙে পড়েন। তিনি তার প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতি মনেপ্রাণে ধরে রাখার জন্য সকল ভালোবাসা দিয়ে যমুনা নদীর তীরে এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এটা মমতাজের সমাধির ওপর নির্মিত হয় ও তার নামানুসারে নামকরণ করা হয় 'তাজমহল'। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাজমহল নির্মাণের কাজ আরম্ভ এবং ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে এর কাজ সমাপ্ত হয়। ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিন কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নাজির শাহের পদক্ষেপের সাথে সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।

আকবরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল তার রাজপুতনীতি। ভারতবর্ষে সকল শ্রেণির জনগণের শুভেচ্ছা, সদিচ্ছা ও সম্প্রীতির ওপর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মানসে সহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের হিন্দু জাগরণের নেতৃত্বদানকারী রণদক্ষ ও নির্ভীক রাজপুতদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে সচেষ্ট হন। সম্রাট আকবর ভারতে বিভিন্ন রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপনে যত্নবান হন। তিনি সর্বপ্রথম অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈকে বিবাহ করেন। ১৫৬৩ সালে তিনি তীর্থযাত্রীদের ওপর অর্পিত কর এবং জিজিয়া কর ব্যবস্থার বিলোপসাধন করেন। এর ফলে রাজপুতদের শুধু নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার ও স্থায়িত্বে রাজপুতদের সহায়তা লাভ সম্ভব হয়।

উদ্দীপকেও নাজির শাহ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রভাবশালী পরিবারগুলোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তার কার্যালয়ে ঐ পরিবারের বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করেন। তাই বলা যায়, সম্রাট নাজির শাহের পদক্ষেপে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ আকবর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে ভারতে নব যুগের সূচনা করেছিলেন।
ঐতিহাসিকরা মনে করেন রাজপুতদের সাথে আকবরের উদার ব্যবহার তার উচ্চ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড বলেন, "এই নীতির ফলে রাজপুতদের অধিকাংশ সুনির্দিষ্টভাবে সম্রাটের অনুগত হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ৫০,০০০ অশ্বারোহী বাহিনীর সেবালাভের অধিকারী হয়েছিলেন।" ভি এ স্মিথ বলেন, "আকবরের বিভিন্ন পদক্ষেপ রাজপুতদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় এবং তারা বাবরের নিকট পরাজয়ের আঘাত সহজেই ভুলে যায়। বিদেশি নয় বরং আকবরকে 'জাতীয় নরপতি' হিসেবে মেনে নিয়ে রাজপুতরা মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে সহযোগিতা করে।"
রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের বন্ধুত্বমূলক মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। এর ফলে রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য শাসন-এর ব্যাপারে এবং এদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে রাজপুতদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে রাজপুতদের প্রতি উদার আচরণের দ্বারাই সম্রাট আকবর প্রজাদের সর্বজনীন আতিথ্য পেয়েছিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করেছিলেন। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি 'মহান' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট আকবর রাজপুত নীতির মাধ্যমে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্কের নতুন যুগের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩২ জহির সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে তার এলাকার সংসদ নির্বাচিত হন। সংসদ নির্বাচিত হতে পেরে তিনি তার এলাকার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি অসংখ্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করাসহ রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া গরিব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য তিনি এলাকার বিভিন্ন স্থানে হোটেল নির্মাণ করেন। অনেক সময় এখানে গরিব মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। তার এই জনহিতকর কাজের জন্য এলাকার সবাই তাকে ভালোবাসে।

[ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

ক. বাবর শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মনসবদারি প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জহির সাহেবের সাথে শূর বংশের কোন শাসকের সামঞ্জস্য রয়েছে? ৩
ঘ. "জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে জহির সাহেবের সাথে উক্ত শাসকের অসমাঞ্জস্য রয়েছে" - উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাবর তুর্কি শব্দ। এর অর্থ সিংহ।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সাফাভী রাজবংশের শাসনামলে পারস্যে স্থাপত্য ও শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। এই বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল ইস্পাহান। ইস্পাহানে তাদের অনুকূল্যে যে সব মনোরম অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল তা অদ্যাবধি স্থাপত্য শিল্পের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে পরিগণিত হয়ে আছে। তৎকালে তাদের উৎসাহে কারিগরি বিদ্যা, শিল্পকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অপরিসীম উন্নতি হয়েছিল। ইস্পাহান নগরীকে কেন্দ্র করে এই অগ্রগতির জন্য পারস্য উপকথায় ইস্পাহানকে 'পৃথিবীর অর্ধাংশ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল]

ক. সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বাল্য নাম কী? ১
খ. সম্রাট জাহাঙ্গীরের ন্যায় বিচার ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে সাফাভী বংশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার ন্যায় তোমার পাঠ্য বইয়ে উল্লিখিত কোন বংশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শিল্প ও স্থাপত্যকলায় উক্ত বংশের যে শাসকের অবদান সবচেয়ে বেশি তার মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বাল্য নাম মেহের-উন-নিসা।

খ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর যে সকল জনকল্যাণকর নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা তার ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। নিরীহ মজলুম প্রজাদের অভিযোগ শুনে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে সম্রাট একটি ঘণ্টাযুক্ত 'ন্যায় শিকল' টানিয়ে দেন। সম্রাটের এই ঘণ্টা 'Bell of Justice' এবং 'Chain of Justice' নামে পরিচিত। যে কোনো ব্যক্তি এই শিকল টেনে অভিযোগ বিষয়ে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সম্রাট তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। এছাড়া শাসন ব্যবস্থায় অনাচার রোধ এবং জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সম্রাট 'দস্তুরুল আমল' নামে ১২টি বিধিও জারি করেন।

গ উদ্দীপকে সাফাভী বংশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার সাথে আমার পাঠ্য বইয়ে উল্লিখিত মুঘল রাজবংশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার উল্লিখিত মুঘল রাজবংশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার মিল রয়েছে।
মুঘল সম্রাটগণ শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের প্রায় দুই শত বছরের শাসনকালে উপমহাদেশে স্থাপত্য শিল্পকলার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। মুঘল আমলে নির্মিত তাজমহল, আগ্রাফোর্ট, লালকেল্লাসহ বিভিন্ন সমাধি, প্রাসাদ, মসজিদ ইত্যাদি আজও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যা উদ্দীপকে সাফাভী বংশের শাসনামলের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের সাফাভী রাজবংশের শাসনামলে পারস্যে স্থাপত্য ও শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তাদের রাজধানী ইস্পাহানে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক মনোরম অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল যা অদ্যাবধি স্থাপত্য শিল্পের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে পরিগণিত হয়ে আছে। যা মুঘল আমলের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সম্রাট আকবরের আমলে ফতেহপুর সিক্রিতে অনিন্দ্যসুন্দর ইমারতগুলো নির্মিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় স্থাপত্যকলার পরিবর্তন আসে, যা সম্রাট শাহজাহানের সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তার শাসনামলে নির্মিত হয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য তাজমহল। ঐতিহাসিক হ্যাভেল এটিকে 'ভেনাস দ্য মিলো' বলে উল্লেখ করেছেন। সমকালীন ইতিহাসে এরূপ স্থাপত্যিক নিদর্শন আর কোথাও দেখা যায় না। পার্সি ব্রাউন বলেন, মুঘল স্থাপত্য শিল্প ভারতীয় মুসলিম শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের সাফাভী বংশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার সাথে মুঘল রাজবংশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার মিল রয়েছে।

ঘ স্থাপত্য ও শিল্পকলায় উক্ত বংশ অর্থাৎ মুঘল বংশের যে শাসকের অবদান সর্বাধিক তিনি হলেন সম্রাট শাহজাহান।
মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল ভারতবর্ষের সার্বিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ সময় স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহান নির্মিত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সর্বশীর্ষে। তবে শাহজাহান তাজমহল ছাড়াও আরো অনেক স্থাপত্য নির্মাণ করেন।
সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে আর্থিক প্রাচুর্য ছিল। আর এ কারণেই সম্রাট ললিত কলা বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার জন্য তাজমহল নির্মাণ করেন। এটি মধ্যযুগীয় পৃথিবীর সপ্তম

https://teachingbd24.com

আশ্চর্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া সম্রাট দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন করে এর শহরতলীতে একটি নগরীর গোড়াপত্তন করে নিজের নামে এর নামকরণ করেন শাহজাহানাবাদ। তাছাড়া দিওয়ান-ই-খাস নামে তিনি একটি স্থাপত্য নির্মাণ করেন। যা মুঘল ঐশ্বর্যের মূর্তপ্রতীক বলে বিবেচিত হয়। আর দিল্লির লাল কেল্লায় নির্মাণ করেন দিওয়ান-ই-আম। তাছাড়া তিনি ময়ূর সিংহাসন নামে একটি স্থাপত্য নির্মাণ করেন তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সিংহাসন হিসেবে খ্যাত। আর মতি মসজিদ, দিল্লির জামে মসজিদ, শিশমহল, জুঁইমহল, আগ্রা মসজিদ, খাস মহল, রংমহল প্রভৃতি স্থাপত্যিক নিদর্শন সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্দেশিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুঘল শিল্প ও স্থাপত্যে সম্রাট শাহজাহানের অবদান সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ সম্রাট 'X' এর রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বছরের। একটি শক্তিশালী রাজবংশের মাঝখানে তিনি ক্ষণিকের জন্য এসে একটি সুন্দর প্রশাসন ব্যবস্থা উপহার দিলেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্তিকরণ, রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে জমিজরিপ, রায়তওয়ারী ব্যবস্থা, কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সড়ক নির্মাণ ও পথচারিদের সুবিধার্থে সরাইখানা নির্মাণ ও ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগান হয়। তাছাড়া দুস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হতো। জনগণ ছিল সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে, আর প্রশাসন ছিল পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয়। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ]*

ক. বাবর শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দীন-ই-ইলাহী বলতে কী বোঝ? ২

গ. সম্রাট 'X' এর কৃষি ও রাজস্ব বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসকের গৃহীত কর্মকাণ্ড কি আধুনিক যুগের শাসন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট 'X' এর কৃষি ও রাজস্ব বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের অন্যতম শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা সাম্রাজ্যের উন্নয়ন ও প্রজাকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এরা সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা তৎপর থেকে তাদের সার্বিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট 'X' এবং শেরশাহ জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে গ্রহণ করে খ্যাত হয়ে আছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট 'X' এর রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বছরের। একটি শক্তিশালী রাজবংশের মাঝখানে তিনি ক্ষণিকের জন্য এসে সুন্দর প্রশাসন ব্যবস্থা উপহার দিলেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্তিকরণ, রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে জমি জরিপ, রায়ত ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সড়ক নির্মাণ ও পথচারীদের সুবিধার্থে সরাইখানা নির্মাণ করেন। শেরশাহেরও রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছরের। শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্যের ছেদ টেনে তিনি মাত্র কয়েক বছরে শাসনকালে একটি সুষ্ঠু ও আধুনিক প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শাসনকাজের সুবিধার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যকে ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন। রাজস্ব সংস্কারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে ন্যায়ানুগ করার উদ্দেশ্যে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। রাজকার্যে দুর্নীতি হ্রাসের জন্য রাজকর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার প্রসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেন। এমনকি মন্দিরকেও নিয়মিত মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সড়ক-ই-আজম নামে সড়ক নির্মাণ ও সড়কের দু'ধারে ছায়াপ্রথ ও ফলদ গাছ লাগান। তাছাড়া তিনি দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লঙ্গারখানা স্থাপন করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সম্রাট এবং শেরশাহ একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক অর্থাৎ আমার পঠিত শাসক শেরশাহের গৃহীত-পদক্ষেপসমূহ আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ।

আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর জনকল্যাণমুখিতা। যে শাসনব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণের দিকে যত বেশি নজর দেওয়া হয় সে শাসনব্যবস্থা তত উন্নত। ফলে আধুনিক শাসনব্যবস্থা মাত্রই এর জনকল্যাণের দিকটি সর্বপ্রথম বিবেচনায় আনা হয়। কেননা, একটি শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জনগণ। ফলে জনগণের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর আধুনিক শাসনব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অন্যতম উপাদান। যা সকল ধর্মের জনগণকে একই শাসনাধীনে সমাসীন করে। ফলে সমাজে শান্তির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা, শিক্ষিতদের দ্বারাই শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধিত হয়। ফলে শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিয়োগ করা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া সমাজের নিপীড়িত, দুস্থ বা আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক প্রশাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিক। শেরশাহ শিল্পখাতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন, নিপীড়িত ও দুস্থদের দান করেন এবং সকল ধর্মের জনগণের প্রতি উদার দৃষ্টি পোষণ করেন। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শেরশাহের শাসনব্যবস্থা আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ চাটগাও এর পাহাড়ি এলাকার একজন জমিদার ছিলেন খানজাহান। তিনি প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে প্রজাদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তিনি বর্গীদের সাথে যুদ্ধ করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করেন। বারবার তাঁকে বর্গী দমন করতে হয়। ফলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দেহ ও মন ভেঙ্গে যায়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে দস্যুদের দমন করতে হয়। এতে রাজ্যের পরিসীমা বৃদ্ধি পেলেও তার সাথে তাঁর কবরও রচিত হয়।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. সম্রাট জাহাঙ্গীর বিচার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য কী করেন? ১

খ. বাবরনামা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের জমিদার খানজাহানের দস্যু দমনের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'তোমার পঠিত 'মুঘল শাসকের এই নীতি তাঁর বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল' - তুমি কি এই উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট জাহাঙ্গীর বিচার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য ৩০ গজ লম্বা একটি ঘণ্টাযুক্ত 'ন্যায়ের শিকল' (Chain of Justice) টানিয়ে দেন।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের জমিদার খান জাহানের দস্যু দমনের সাথে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

মুঘল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। প্রজাবৎসল শাসক হিসেবেও তিনি খ্যাত হয়ে আছেন। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি প্রজাকল্যাণগামী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকের জমিদারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কর্মকাণ্ড লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, চাটগাও এর পাহাড়ি এলাকার জমিদার খানজাহান ছিলেন প্রজাবৎসল শাসক। তিনি বর্গীদের সাথে যুদ্ধ করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করেন। বারবার বর্গীদের দমন করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং তার দেহ ও মন ভেঙ্গে পড়ে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে দস্যুদের দমন করতে হয়। এতে রাজ্যের পরিসীমা বৃদ্ধি পেলেও তার সাথে তার কবরও রচিত হয়। জমিদারের বর্গীয় দস্যু দমনের সাথে সম্রাট আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযান সাদৃশ্যপূর্ণ। সম্রাট দাক্ষিণাত্য অভিযান করে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ অভিযান দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে চলে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের এ দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে

https://teachingbd24.com

সাম্রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা বিধান হয়। তবে দাক্ষিণাত্যে সম্রাট দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ তার স্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বার বার দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করার ফলে তার মন ও ভেঙ্গে পড়ে। দাক্ষিণাত্য অভিযানের মাধ্যমে কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মির থেকে কাবেরী পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই সাথে তার মৃত্যুর ঘণ্টাও বেজে যায়। এ অভিযানের ফলে শারীরিক অবনতি হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ১৭০৭ সালের ৩ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জমিদারের দস্যু দমন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যনীতি একই সূত্রে আবদ্ধ।

ঘ হ্যাঁ, মুঘল শাসকের তথা সম্রাট আওরঙ্গজেবের এই নীতি তার বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল বলে আমি মনে করি।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার গৃহীত দাক্ষিণাত্য নীতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দাক্ষিণাত্য নীতি ছিল তার পূর্ববর্তী শাসকদের অনুসৃত নীতির ধারাবাহিকতা মাত্র। এ নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটলেও মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্রাট আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্য বিস্তারে আপাতত জয়ী হলেও দাক্ষিণাত্য নীতির সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল ভয়ানক। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'আফগান যুদ্ধ রাজকোষকে যেমন ধ্বংস করেছিল, তেমনি এর রাজনৈতিক ফলাফল ছিল আরও অধিক।' এ নীতির ফলে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিকই, কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। উপরন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

দক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দেয়। কৃষিব্যবস্থা বিপর্যস্ত এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের অধঃগতিতে নিপতিত হয়ে যাওয়ায় রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে সৈন্যদের বকেয়া পড়ায় সাম্রাজ্যে সেনা বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এছাড়া উত্তর ভারতে, সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে সম্রাটের প্রভাব হ্রাস পায় এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে উৎসাহিত হয়ে আফগান, শিখ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারিদিক থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। মুঘলদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দেয়। উত্তর ভারতে সম্রাটের অনুপস্থিতিতে বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান, নিষ্কণ্টক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় মুঘল সাম্রাজ্যকে পতনের দিকে ধাবিত করে।

সার্বিক দিক বিবেচনায় বলা যায়, দাক্ষিণাত্য নীতি সম্রাট ও সাম্রাজ্যের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনেনি।

প্রশ্ন ▶৩৬ উসমানের পূর্বপুরুষরা গোবি মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। সেখানে শত্রুপক্ষের শক্তির কারণে সুবিধা করতে না পেরে তারা এশিয়া মাইনরে চলে আসেন। এশিয়া মাইনরে বহুদিন ধরে সেলজুকরা শাসন করলেও উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশকিছু স্বাধীন ও শক্তিশালী গ্রিক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। উসমান শেখ সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের পতন ঘটিয়ে সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শক্তিশালী গ্রিক রাজাদেরও পরাজিত করে যে বিশাল উসমানীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. তাজমহলের প্রধান স্থপতির নাম কী? ১

খ. সম্রাট আকবর রাজপুত নীতি গ্রহণ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উসমানীয়দের এশিয়া মাইনরে গমনের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন শাসকের ভারতে আগমনের সামঞ্জস্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উসমানের কৃতিত্বের আলোকে পঠিত বইয়ের ইঙ্গিতকৃত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাজমহলের প্রধান স্থপতি ইরানের ওস্তাদ ঈসা সিরাজী।

খ সম্রাট আকবর একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজপুত নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

সম্রাট আকবর তার দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে বীর ও স্বজাত্যবোধে সচেতন জাতি রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই তিনি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৭ পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন সংস্কারের কিংবদন্তী বাঘা ত্রিবিজয়। ছেলে বেলায় সে বিমাতার অযত্নে পিতার চক্ষুশূলে পরিণত হয়। যুবক বয়সেই বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নেয়। সেখানে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় জ্ঞানলাভসহ অনেক মূল্যবান পুস্তক অধ্যয়ন করেন। স্থানীয় জায়গীরদারের আনুকূল্য লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জায়গীর লাভ করেন। তার সামরিক নৈপুণ্যের দ্বারা উপজাতীয় আঞ্চলিক রাজার রাজত্ব লাভ করেন। তিনি সেখানে রাজস্ব ব্যাপারে সংস্কার সাধন করে রাজা ও প্রজার মাঝে এক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেন। তাছাড়া সমতলে অবস্থিত রাজপথের সাথে দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ পূর্বক রাজধানীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে উপজাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেন।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. হুমায়ুন কোন শাসকের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন? ১

খ. সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির মূল্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? - ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের শাসন সংস্কার তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুমায়ুন পারস্যের সাফাভী সম্রাট শাহ তাহমাসপের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

খ ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধশালী করে তোলাই ছিল সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির মূল উদ্দেশ্য।

সম্রাট আকবরের লক্ষ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণির প্রজাসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তিনি রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের শূর বংশীয় শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

শেরশাহের বাল্যনাম ফরিদ খান শূর। বিমাতার বিদ্বেষ ও দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বাল্যকালে তিনি গৃহ ত্যাগ করেন। আসাধারণ মেধাবী শেরশাহ জৌনপুরে এসে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি শূর আফগান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যযুগীয় ভারতের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে তিনি অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন। যেমনটি উদ্দীপকের বাঘা ত্রিবিজয় এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের বাঘা ত্রিবিজয় পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন সংস্কারের কিংবদন্তী। ছেলেবেলায় বিমাতার অযত্নে বাধ্য হয়ে তিনি বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে সামরিক নৈপুণ্যের দ্বারা উপজাতীয় আঞ্চলিক রাজার রাজত্ব লাভ করে সেখানে প্রশাসনিক, রাজস্ব ও প্রজাহিতৈষী নানা সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকের উক্ত শাসকের ন্যায় শেরশাহও প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও প্রজাহিতৈষণার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করেন। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর গমনাগমন এবং ডাকব্যবস্থার সুবিধার জন্য তিনি বহু প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। তার নির্মিত রাস্তাসমূহের মধ্যে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড অন্যতম। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের বর্ণনার সাথে পাঠ্য বইয়ের শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ শেরশাহ এর শাসন সংস্কার তাকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে।
শেরশাহ একজন সুশাসক। অভিজ্ঞ সেনাপতি এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। মাত্র ৫ বছরের রাজত্বকালে তিনি যে সুষ্ঠু, উদার ও জনকল্যাণমূলক শাসন সংস্কার বাস্তবায়ন করেছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে তাকে অমরত্ব দান করে। উদ্দীপকের বাঘা ত্রিবিজয়ের মধ্যেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন দেখা যায়।
উদ্দীপকের বাঘা ত্রিবিজয়ের শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, প্রশাসন, রাজস্ব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনয়ন করে তিনি একজন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। অনুরূপভাবে শেরশাহও তার শাসনামলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার, রাজস্ব সংস্কার, ডাক ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি নানা প্রকার শাসন সংস্কার প্রণয়নের মাধ্যমে তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রজাসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ সাধন, শুল্ক ও মুদ্রাব্যবস্থায় সংস্কার, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অসহায় দুস্থদের সাহায্যদান ও লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। এছাড়া সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত করেন। সুলতানি যুগের প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করে তিনি তার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি এবং তাদের মধ্যে স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে তিনি সরকারি কর্মচারীদের বদলির নীতিগ্রহণ করেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহ জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক রীতিনীতির প্রবর্তনের জন্য একজন অনন্য শাসকের কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ অপরূপ সৌন্দর্য খচিত আজ-জাহরা প্রাসাদটি স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান নির্মাণ করেন। তিনি প্রিয়তমা পত্নী আজ-জাহরার প্রতি তার অত্যুজ্জ্বল ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এর নির্মাণ কাজ চলে। আলজেরিয়া ও তারাগোনা থেকে এর প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত হয়। তাছাড়া মূল্যবান দ্রব্যও সরঞ্জামাদি কনস্টান্টিনোপল, রোম, কার্থেজ, স্যাফেক্স, নারবোন ও এ্যাটিকা প্রভৃতি শহর হতে আমদানী করা হয়। প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি শ্বাশত প্রেমের এক নিদর্শন হিসেবে এটির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. কোন সম্রাটকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়? ১
খ. সম্রাট আওরঙ্গজেব এর দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্যে কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের স্থাপত্যের সঙ্গে তোমার বইয়ের কোন বিখ্যাত স্থাপত্যের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সংশ্লিষ্ট নির্মাতা/শাসকের স্থাপত্য শিল্পে অবদান তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

খ সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার তথা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।
আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বিজাপুর, গোলকুণ্ডাসহ দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যসমূহ মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশাপাশি দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। সুতরাং দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল।

গ উদ্দীপকের স্থাপত্যের সংগে আমার পঠিত মুঘল সম্রাট শাহজাহান নির্মিত অনন্য স্থাপত্য 'তাজমহল' এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
সম্রাট শাহজাহানের অনবদ্য, অমর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত তাজমহল। এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম। ওস্তাদ ঈশা খাঁ ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত তাজমহলের স্থপতি। ঐতিহাসিক হামিদ লাহোরের মতে, সম্রাট শাহজাহান ৫০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে দীর্ঘ বারো বছরে এবং ঐতিহাসিক ট্যাভানিয়ারের মতে, ২০ হাজার শিল্পী ও কারিগরের ২২ বছর পরিশ্রমে ৩ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।
উদ্দীপকের স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান তার স্ত্রীর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য প্রয়াসে একটি অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ঠিক একইভাবে সম্রাট শাহজাহানও তার স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মৃতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তার সমাধির উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন যা ইতিহাসে তাকে অমরত্ব দান করেছে। হ্যাভেল বলেন, 'দেশি এবং বিদেশি শিল্পীগণ এ সমাধিসৌধটি নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।' তিনি তাজমহলকে 'ভেনাস দ্য মিলো' বলে আখ্যায়িত করেন। ড. স্মিথের মতে, ইউরোপীয় ও এশিয় শিল্প রীতিতে, পার্সি ব্রাউনের মতে, ইন্দো-পারসিক রীতির সংমিশ্রণে এটি তৈরি হয়। অপরাজেয় ও অনিন্দ্য সৌন্দর্যের আধার তাজমহলকে মধ্যযুগীয় পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য বস্তুসমূহের অন্যতম বলে পরিগণিত করে। আগ্রার এই তাজমহলের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'শাহজাহান' কবিতায় তাজমহল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাজমহলকে হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা উল্লেখ করেছেন। ওপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় উদ্দীপকের স্থাপত্য তথা আজ-জাহরা প্রাসাদের সাথে তাজমহলের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের মতোই সম্রাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।
ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। ঐতিহাসিগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন।
সম্রাট শাহজাহান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্প 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস, অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের আরেকটি অপূর্ব নিদর্শন হলো 'ময়ূর সিংহাসন'। সম্রাট শাহজাহান আগ্রা দুর্গে দেওয়ান-ই-আমের উত্তরে শ্বেতপাথর দ্বারা মতি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি দিল্লিতে সুরক্ষিত লাল কেল্লা নির্মাণ করেন। দিল্লির জামে মসজিদ তার অন্যতম এক কীর্তি। সম্রাট শাহজাহানের সময় নির্মিত শিশমহল ও জুঁইমহল ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত রাজকীয় আবাসগৃহ। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি সুসাম্মাম বুরুজ নামে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করেন। তাছাড়া সম্রাট শাহজাহান আরও অন্যান্য স্থাপত্য দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, কাবুল, কাশ্মির, আজমির ও আহমদাবাদের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা তৈরি করেন। এ ছাড়া নিজামউদ্দিন আউলিয়া মাজার, লওখাল, খাওয়ারগাহ, শালিমার উদ্যান প্রভৃতি তার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। তার এ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষতার কারণে তার রাজত্বকালকে ঐতিহাসিগণ মুঘল শাসনের 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, আজ-জাহরা প্রসাদের নির্মাতা খলিফা আব্দুর রহমানের মতো সম্রাট শাহজাহানও স্থাপত্য শিল্পে অনন্য অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ দিল্লিতে এক সময় শামস্ আফিফ নামক একজন ব্যক্তি ১৪২১ খ্রি: সংঘটিত এক ঐতিহাসিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। *[অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী]*

ক. সম্রাট আকবর কত খ্রি: দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন? ১
খ. তুযুক-ই-বাবর সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের শামস্ আফিফের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শাসক হিসেবে উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন।

https://teachingbd24.com

খ বাবরনামা বা তুযুক-ই-বাবর সম্রাট বাবরের গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি তাঁর জীবনের নানা ঘটনাবলি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এ গ্রন্থে বাবর তৎকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এক মনোমুগ্ধকর বিবরণ প্রদান করেছেন। পরিশেষে বলা যায় যে, তুযুক-ই-বাবর ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪০ আব্দুল মোমিন তালুকদার একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তার ছিল চার পুত্র। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন এ নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফলে এক পর্যায়ে তা গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় এবং আব্দুল মোমিন গৃহবন্দী হন। *[অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী]*

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. The Prince of builders of Engineering king কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল মোমিনের চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মুঘল সম্রাটের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত গৃহযুদ্ধে সম্রাটের কোন পুত্র জয়ী হন এবং সফলতার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

খ স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য সম্রাট শাহজাহানকে The prince of builders or Engineer King বলা হয়।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শৈল্পিক মনের মানুষ। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তার আমলে তাজমহল, মতি মহল, শিশ মহল, দিউয়ান ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, মুসাম্মার বুরুজ প্রভৃতি স্থাপত্য শৈলী নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব স্থাপত্য ছিল কারুকার্যখচিত মূল্যবান শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। তাই তাকে The Prince of builders or Engineer king বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল মোমিনের চরিত্রের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সাদৃশ্য রয়েছে।

সম্রাট শাহজাহান মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শাসক। তার প্রকৃত নাম খুররম। তার শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উত্তরাধিকার সংগ্রাম। ১৬৫৭ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চার পুত্র দারাশিকো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহাসন লাভের জন্য আত্মঘাতী সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল মোমিন তালুকদার একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন এ নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি গৃহবন্দী হন। যা সম্রাট শাহজাহানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি দারার প্রতি অন্ধস্নেহে আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন এবং গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর অভিযানে নিষিদ্ধ করেন। যা ভাতৃদ্বন্দ্বকে প্রকট করে তোলে। ফলশ্রুতিতে আওরঙ্গজেব, দারা ও মুরাদের মধ্যে ত্রি-শক্তিজোট গঠিত হয়। এক পর্যায়ে সম্রাট শাহজাহান গৃহবন্দী হন। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে আব্দুল মোমিনের সাথে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেব সফলতা লাভ করেছিলেন।

সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব সব দিক থেকে উপযুক্ত ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বিদের এমন কেউই ছিলেন না যিনি কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সেনাপতিত্বে আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন।' এছাড়া দারার সেনাবাহিনী অপেক্ষা আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী ছিল রণনিপুণ এবং সুশৃঙ্খল। তার সেনাপতিরাও দারার সেনাধ্যক্ষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। মীর জুমলা, শায়েস্তা খান নিঃসন্দেহে দারার সেনাপতি খলিলুল্লাহ খান, যশোবন্ত সিংহ ও রুস্তম খানের তুলনায় আওরঙ্গজেবের অস্ত্রশস্ত্র তার ভ্রাতাদের চেয়ে উন্নত ছিল। এমনকি সম্রাট আওরঙ্গজেবের গোলাবারুদ, কামান, গোলন্দাজ বাহিনী তার ভ্রাতাদের তুলনায় উন্নত ছিল। তাছাড়া দারা শিয়া মতালম্বী ও হিন্দুদের প্রতি অনুরাগী হওয়ায় আওরঙ্গজেব সুন্নি জনগণের সমর্থন লাভ করেন। তারা আওরঙ্গজেবকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে মনে করে তাকে সমর্থন জানান। অধিকন্তু শাহজাহানের পক্ষপাতিত্ব নীতি ও দারার প্রতি মাত্রাধিক দুর্বলতা উত্তরাধিকারী দ্বন্দ্বের সময় অসুস্থতার জন্য নির্লিপ্ত থাকা প্রভৃতি আওরঙ্গজেবের বিজয়কে সহায়তা করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেব তার সাংগঠনিক দক্ষতাসহ ওপরে আলোচিত কারণে ভ্রাতাদের সঙ্গে উত্তরাধিকার সংগ্রামে সফলতা লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৪১ আলম দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন বটে, সাহিত্য শিল্পের প্রতিও তিনি প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। তার সরলতা, অকৃত্রিমতা নিখুঁত বিচার বুদ্ধি, মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রজাহিতৈষণা ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সবাইকে মুগ্ধ করত। তিনি কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, অতি অল্প বয়সেই তার মধ্যে কাব্য প্রবণতা দেখা দেয়। তিনি একটি বংশের প্রতিষ্ঠাসহ তার আত্মচরিতও রচনা করেন। *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. এই যুদ্ধ কার কার মধ্যে সংঘটিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে আলমের চরিত্রে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আত্মজীবনী সাহিত্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সম্রাট বাবর ও সুলতান ইব্রাহিম লোদির মধ্যে সংঘটিত হয়।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল বাবর ইব্রাহিম লোদির সাথে ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। পানিপথ নামক স্থানটি ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে ৮০ কি.মি. উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। এ যুদ্ধে বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন।

গ উদ্দীপকে আলমের চরিত্রে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

বাবর কেবল একজন শাসক ও সেনাপতিই ছিলেন না— তিনি সুসাহিত্যিক, নিপুণ সমালোচক, অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা ও বিদ্বান ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বিভিন্ন ভাষায় গদ্য ও কাব্য রচনা করেছেন। 'বাবুরনামা', তার গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তুর্কি ভাষায়, তিনি 'দিউয়ান' নামক কাব্য সংকলন রচনা করেন। এছাড়া তিনি 'মুবাইয়া' নামক একটি পদ্যছন্দ ধারার স্রষ্টা। সাহিত্য ছাড়াও বাবর সংগীত, শিল্প ও হস্তলিপির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। একজন সংগীতপ্রেমী হিসেবে তিনি ফারসি ও তুর্কি ভাষায় অনেক সংগীত রচনা করেছিলেন। তিনি একজন উত্তম যন্ত্রশিল্পী ছিলেন। বাঁশি বাজানো তার প্রিয় সখ ছিল। প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব, শিল্পীসুলভ মানসিকতা ও রোমাঞ্চকর জীবন তাকে ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

একইভাবে উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়, আলম সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। তিনি কবি, শিল্পী, সাহিত্যেকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অল্প বয়সেই তার মধ্যে কাব্য প্রবণতা দেখা দেয়। এছাড়া তিনি তার আত্মচরিতও রচনা করেন। তাই বলা যায়, আলমের চরিত্রে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উক্ত আত্মজীবনী অর্থাৎ 'তুযুক-ই-বাবরী' সাহিত্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— উক্তিটি যথার্থ।
মধ্যযুগের ইতিহাসে সম্রাট বাবরের সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুর্কি ভাষায় লিখিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুযুক-ই-বাবরী' সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বাবরের 'তুযুক-ই-বাবরী'। বা বাবরনামা এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্যার-ই-গেনিস রস বাবরের আত্মজীবনীকে সর্বযুগের সাহিত্যের মনোমুগ্ধকর ও রোমাঞ্চকর সৃষ্টিগুলোর অন্যতম বলে মনে করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ মানুষ বাবর এবং সম্রাট বাবর সম্পর্কে সম্যক তথ্য আহরণ করতে পারেন।
এ গ্রন্থে সে যুগের আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাবর তার বর্ণনায় ভারতের শহর ও গ্রামগুলোকে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বলেছেন। পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, ঝরনা ও ফুলের বাগান শোভিত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ কাবুলের তুলনায় তিনি উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সমভূমিকে বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেয়ে বলে বর্ণনা করেছেন। বাবরের রচিত আত্মচরিত এমন একটি উৎকৃষ্ট ও বাস্তবধর্মী সাহিত্য যে এটি পাঠ করলে পাঠকের সম্মুখে আসল ঘটনা ভেসে ওঠে। ঈশ্বরী প্রসাদ যথার্থই বলেছেন 'পূর্বদেশীয় কোনো নৃপতিই বাবরের ন্যায় এরূপ সুস্পষ্ট মনোমুগ্ধকর এবং সত্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী রচনা করেননি।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী 'তুযুক-ই-বাবরী' ভারতবর্ষের এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল।

প্রশ্ন ▶ ৪২ সম্রাট শাহ আলম তার সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণির জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং নিজ পুত্রকে উক্ত গোষ্ঠীর এক কন্যার সাথে বিবাহ দেন। তিনি উক্ত গোষ্ঠীর লোকদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে চাকরি দেন এবং তাদের ওপর নির্ধারিত কর ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। *[রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজ]*

ক. চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১
খ. মনসবদারি প্রথা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট শাহ আলমের সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের কোন নীতির সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সম্রাটের বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও সদাচারণ তার রাজ্যে এক নবযুগের সূচনা করে - উক্ত নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চৌসার যুদ্ধ ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩১ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩

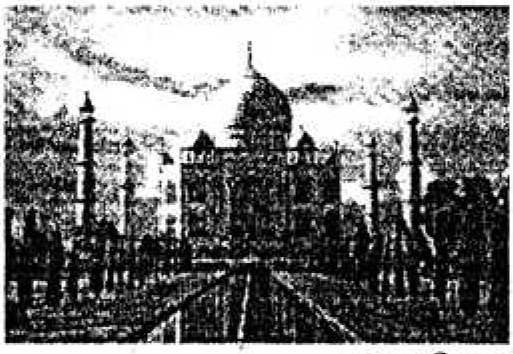

[রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজ]

ক. বাবরের আসল নাম কী? ১
খ. রাজপুত নীতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রটি কোন শাসকের শাসনকাল নির্দেশ করে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসককে 'Prince of Builders' বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাবরের আসল নাম হলো জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি তাজমহলের, যা মুঘল সম্রাট শাহজাহানের শাসনকাল নির্দেশ করে।
সম্রাট শাহজাহানের অনবদ্য, অমর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত তাজমহল। এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম। জনৈক ফরাসি ওস্তাদ ঈশা খাঁ ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত তাজমহলের স্থপতি। যে স্থাপত্যশিল্প পত্নী প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে আজও কোটি মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। উদ্দীপকে এ তাজমহলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে নির্দেশকৃত স্থাপত্য শিল্প হলো তাজমহল। যেটি সম্রাট শাহজাহান তার প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের নামানুসারে তার সমাধির ওপর নির্মাণ করেন। এটি সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপ্যকীর্তি। যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত এ তাজমহল শুধু মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন নয় বরং পত্নীপ্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও স্বীকৃত। ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে এটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রায় তিনি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এর স্থাপত্যিক উপকরণের সুবিন্যাস অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও নৈপুন্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। তবে তাজমহল শুধুমাত্র ইট-পাথরে নির্মিত এক স্থাপত্য নয় বরং এটি আজও মানুষকে পত্নীপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে। তাই বলা যায়, তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের পত্নীপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘ স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করার জন্য শাহজাহানকে The Prince of Builders বলা হয়।
ভারতবর্ষে মুঘল শাসনামলে স্থাপত্যশিল্পে অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়। আর সম্রাট শাহজাহানের সময়ে স্থাপত্যশিল্প উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। এ শিল্পের উন্নতি সাধনের ফলে সমগ্র মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে।
ঐতিহাসিকগণ সম্রাট শাহজাহানকে The Prince of Builders of Engineer King বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত স্থাপত্য শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে এ উপাধি প্রদান করা হয়েছে। তার নির্মিত স্থাপত্যসমূহের মধ্যে তাজমহল সর্বশীর্ষে। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার জন্য তিনি এটি নির্মাণ করেন। তিনি রাজধানী আগ্রায় দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, শিশ মহল ইত্যাদি স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। বহু মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত দিল্লির জামে মসজিদ তার স্থাপত্য অনুরাগের একটি বিশেষ নিদর্শন। পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির অন্যতম একটি নিদর্শন। বর্তমানে যা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। তার এ সকল অনবদ্য অবদান শুধু তার রাজত্বকালকেই নয়, প্রকারান্তরে মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে। আর এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত' বলে অভিহিত করেছেন, যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ সোহেল রানা যুদ্ধের ওপর নির্মিত ছবি দেখতে পছন্দ করেন। এরূপ একটি ছবিতে তিনি দেখলেন এক রাজার অসুস্থতার সুযোগে তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে সবচেয়ে যোগ্যতম পুত্র অন্যান্য ভাইদের পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন এবং পিতাকে নজরবন্দী করেন। তবে তিনি রাজধানীতে অবস্থান করতে পারেননি। সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ ও গোলযোগ দেখা দিলে তিনি সেখানে গমন করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সম্রাট শাহজাহানের পত্নী মমতাজের প্রকৃত নাম কী? ১
খ. সম্রাট শাহজাহানকে 'The Prince of Builder of Engineer King' বলা হয় কেন? ২

TeachingBD24.com

গ. উদ্দীপকের আলোকে উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখলের ঘটনা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির শেষ পরিণতি কী হয়েছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজের প্রকৃত নাম আরজুমান্দ বানু বেগম।

খ স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য সম্রাট শাহজাহানকে The Prince of Builders or Engineer King বলা হয়।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্য পিপাসু এবং শিল্পী মনের মানুষ। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তার আমলে তাজমহল, মতি মহল, শিশ মহল, দিউয়ান ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, মুসাম্মান বুরুজ প্রভৃতি স্থাপত্য শৈলী নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই তাকে The Prince of Builders or Engineer king বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ন্যায় উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখলের একই রূপ বিদ্যমান।

সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব ছিল সবার থেকে যোগ্য। কিন্তু সম্রাট স্নেহের বশে তাকে উপেক্ষা করে দারাকে বেশি প্রাধান্য দেন, যা উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সূচনা করে। এই দ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেব নিজ যোগ্যতাবলে জয়লাভ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক রাজার অসুস্থতার সুযোগে তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ শুরু হলে যোগ্যতম পুত্র অন্যান্য ভাইদের পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। অনুরূপভাবে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি যোগ্যতম পুত্র আওরঙ্গজেবকে বাদ দিয়ে দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তখন দারা সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা চালায়। ফলে আওরঙ্গজেব, শাহ সুজা এবং মুরাদ সম্রাটের এই তিনপুত্র চুক্তিবদ্ধ হয়ে দারাশিকোর বিরুদ্ধে দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু দারাশিকোর পুত্র সুলায়মান শিকো বাহাদুরগড়ের যুদ্ধে সুজাকে পরাজিত করে। এরপর ধর্মাটের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ও মুরাদের যৌথ বাহিনীর নিকট রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হয়। পরবর্তীতে সামুগড়ের যুদ্ধে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের বাহিনীর নিকট দারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুঘল সিংহাসন লাভ নিশ্চিত হয়। এরপর তিনি মুরাদ ও শাহ সুজাকে দমন করেন। এরপর দারাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে আওরঙ্গজেব চূড়ান্তভাবে মুঘল সিংহাসন অধিকার করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সিংহাসনে আরোহণ এবং আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের অধিকার একইরূপ ছিল।

ঘ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি তার দেহ ও সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'আপাত দৃষ্টিতে সকল কিছু লাভ করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সকল কিছুই হারালেন। এ সময় হতেই তার পতনের সূচনা হয়। তার জীবনের মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে।' দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মাধ্যমে ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট কাবুল হতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মির হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিশাল ও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নরপতির মর্যাদা লাভ করেন। এতদসত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাক্ষিণাত্য জয়ের ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দেয়। উত্তর ভারতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে সম্রাটের প্রভাব হ্রাস পায় ফলে আফগান, শিখ, জাঠ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এভাবে সম্রাটের জীবিতাবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয় এবং এ অবস্থার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। দাক্ষিণাত্য নীতির ব্যর্থতার ফলে দুশ্চিন্তায় সম্রাটের মন ও শরীর ভেঙে পড়ে এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য মুঘল সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় দাক্ষিণাত্য সম্রাটের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ জনাব হুরমত আলী সংসদ নির্বাচিত হয়েই তার নির্বাচনী এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং জনহিতকর কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ধর্ম ও দলের লোকদের সহযোগিতা উপলব্ধি করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি অন্যান্য ধর্ম ও দলের লোকদের সাথে মিলনাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখেন এবং জনহিতকর কার্যে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। তার এ পদক্ষেপের ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সম্রাট আকবর কাকে খান বাবা বলে ডাকতেন? ১

খ. মনসবদারি প্রথা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গৃহীত নীতির সাথে সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতির কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সম্রাট আকবরের রাজপুতনীতি কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছিল - বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট আকবর বৈরাম খানকে খান বাবা বলে ডাকতেন।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সবার সহযোগিতা লাভের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে বর্ণিত হুরমত আলীর মিলনাত্মক নীতি এবং সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

সম্রাট আকবর বিচক্ষণতা ও উদারতার সাথে রাজপুতদের ন্যায় এক সংগ্রামশীল জাতিকে মুঘলদের সাথে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সম্রাট আকবর ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈকে বিবাহ করেন। ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিকানির রাজকন্যারও পাণি গ্রহণ করেন। এছাড়া ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের কন্যার সাথে পুত্র সেলিমের বিবাহ দেন। এভাবে আত্মীয়তার বন্ধনে আকবর শক্তিশালী রাজপুতদের সহায়তা লাভ করেন। তাছাড়া তিনি হিন্দুদেরকে তথা রাজপুতদের দেশের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে উচ্চ পদে নিয়োগ করে তাদের আনুগত্য লাভ করেন। ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট তীর্থযাত্রীদের ওপর অর্পিত কর এবং ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জিজিয়া করের বিলোপ সাধন করে রাজপুতদের সাহায্য লাভে সক্ষম হন। তদুপরি সম্রাট রাজপুতদের সাথে মিলনাত্মক নীতি গ্রহণ করলেও তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সহ্য করেননি। প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের মাধ্যমেও আকবর রাজপুত রাজন্যবর্গের নিকট থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। উদ্দীপকের হুরমত আলী সাংসদ নির্বাচিত হয়ে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখেন। তার এরূপ নীতির উদ্দেশ্য ছিল শাসন কাজে সকলের সহযোগিতা লাভ করা।

তাই বলা যায় যে, হুরমত আলীর মিলনাত্মক নীতি এবং আকবরের রাজপুত নীতি শাসন কাজে সহযোগিতা লাভের দিকদিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সম্রাট আকবর নিজ সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেন তন্মধ্যে রাজপুত নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজপুতদের সাথে মিলনাত্মক ও প্রয়োজনে দমনমূলক আবার কখনও সংস্কারমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল নীতি ভারতের আর্থ-সামাজিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মূলত রাজপুতদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে আকবর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করেন। এ নীতির ফলেই মুসলিম বিরোধী রাজপুতরা মুঘল শক্তির গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত হয়। রাজপুতদের

Teachingbd24.com

সহযোগিতায় মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। মুঘলদের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার দিক থেকে রাজপুতগণ ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অধিকন্তু সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য ছিল একাধারে মুঘল শৌর্য-বীর্য, কূটনীতি ও রাজপুতদের বীরত্ব ও কর্ম দক্ষতার ফসল। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া রাজপুতনীতি আকবরকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উদারতার এক মূর্ত প্রতীকে পরিণত করে। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি 'মহান আকবর' উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন।'

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের উৎকর্ষ সাধনে রাজপুত নীতি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ বাংলা একাডেমি প্রতি বছরই ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বই মেলার আয়োজন করে। উক্ত বই মেলায় মতিন একটি বই অনেক মূল্য দিয়ে ক্রয় করেন। মতিনের বন্ধু তুহিন এত বেশি মূল্যে বই কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মতিন উত্তরে বলেন- বইটিতে লেখা রয়েছে একজন শাসকের আত্মজীবনী, যাতে তিনি লিখেছেন নিজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধে জয়-পরাজয়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, দোষ-ত্রুটিসহ তার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ইতিহাস। বইটির সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা আমাকে মুগ্ধ করছে তাই আমি অধিক মূল্য দিয়ে বইটি কিনলাম।

[গাজীপুর সরকারী মহিলা কলেজ]

ক. বাবর শব্দের অর্থ কী? ১
খ. খানুয়ার যুদ্ধকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের বইটি কোন মুঘল সম্রাটের লিখিত কোন গ্রন্থটির ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কতটুকু গুরুত্ব বহন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

খ খানুয়ার যুদ্ধকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা খানুয়ার যুদ্ধ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এ যুদ্ধে রানা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে বাবর রাজপুতদের কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয় এবং ভারতে রাজপুত্র প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিনষ্ট হয়। কে. কে. দত্ত তাই নিশ্চিতভাবে বলেন, 'খানুয়ার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ।'

গ উদ্দীপকের বইটি মুঘল সম্রাট বাবর রচিত 'বাবরনামা' গ্রন্থটির ইঙ্গিত বহন করে।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সম্রাট বাবরের সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুর্কি ভাষায় লিখিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুযুক-ই-বাবরী' সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বাবরের 'তুযুক-ই-বাবরী'। বা বাবরনামা এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্যার-ই-গেনিস রস বাবরের আত্মজীবনীকে সর্বযুগের সাহিত্যের মনোমুগ্ধকর ও রোমাঞ্চকর সৃষ্টিগুলোর অন্যতম বলে মনে করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ মানুষ বাবর এবং সম্রাট বাবর সম্পর্কে সম্যক তথ্য আহরণ করতে পারেন।

এ গ্রন্থে সে যুগের আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাবর তার বর্ণনায় ভারতের শহর ও গ্রামগুলোকে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বলেছেন। পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, ঝরনা ও ফুলের বাগান শোভিত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ কাবুলের তুলনায় তিনি উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সমভূমিকে বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেয়ে বলে বর্ণনা করেছেন। বাবরের রচিত আত্মচরিত এমন একটি উৎকৃষ্ট ও বাস্তবধর্মী সাহিত্য যে এটি পাঠ করলে পাঠকের সম্মুখে আসল ঘটনা ভেসে ওঠে। ঈশ্বরী প্রসাদ যথার্থই বলেছেন 'পূর্বদেশীয় কোনো নৃপতিই বাবরের ন্যায় এরূপ সুস্পষ্ট মনোমুগ্ধকর এবং সত্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী রচনা করেননি।

ঘ মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পানিপথের যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিনের ক্ষমতাসীন লোদি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে ইব্রাহীম লোদি তার বহু সংখ্যক সৈন্যবাহিনীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভের ফলে বাবর দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে লোদি সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর মুঘল বংশের বুনিয়াদ বা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পানিপথের যুদ্ধান্তে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রভুত্ব সম্পূর্ণ রূপে না হলেও আংশিকভাবে বাবরের হাতে চলে যায় এবং তাকে অনুসরণ করেই পরবর্তী মুঘলরা উপমহাদেশে প্রায় দুশ বছরব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেন। পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর বাবর মুঘল বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে ভারতে গোলন্দাজ বাহিনী প্রবর্তন করেন। পানিপথের ১ম যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘলদের উত্থানের পথ উন্মুক্ত হয়। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এ যুদ্ধের ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ সম্রাট আশরাফ ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। তিনি সকল ধর্মের সার্বজনীনতায় ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সব ধরনের সার নিয়ে 'ক' নামক একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। এটি ছিল একটি ধর্মীয় মতবাদ। এ মতবাদ নামাজ, রোজা, হজ, আজান প্রদান, দাড়ি রাখা ও হাদিস শিক্ষা করা ইত্যাদির কোন অবকাশ ছিলনা। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. মমতাজ মহল কে ছিলেন? ১
খ. পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লেখ। ২
গ. সম্রাট আশরাফের 'ক' ধর্মের সাথে সম্রাট আকবরের কোন ধর্মনীতির সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি ছিল ইসলামের প্রতি হুমকি? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মমতাজ মহল ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী।

খ সম্রাট আকবর ও বৈরাম খানের নেতৃত্বে ২,০০০ মুঘল সৈন্য হিমুর গতিকে রোধ করার জন্য ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ইতিহাসে সে যুদ্ধই পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এ যুদ্ধে হিমু পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আকবর দিল্লি ও আগ্রা দখল করে মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন এবং ভারতে দীর্ঘকাল স্থায়ী মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান।

গ উদ্দীপকে সম্রাট আশরাফের 'ক' ধর্মের সাথে সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমতের সামঞ্জস্য আছে।

সম্রাট আকবর ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। কবির, নানক, চৈতন্য প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের ন্যায় আকবরও সকল ধর্মের সর্বজনীনতায় ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক, যিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তৎপর হন। উদ্দীপকে আশরাফ যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সব ধর্মের মূলকথা নিয়ে 'ক' নামক একটি সর্বজনীন ধর্মমত প্রবর্তন করেন, একইভাবে মুঘল সম্রাট আকবরও সুলহি-ই-কুল নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে দীন-ই-এলাহী বা তৌহিদ-ই-ইলাহী (ঐশী একেশ্বরবাদ) নামক ভারতের বুকে একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সব ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত এটি একটি সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম।" বস্তুত এটিকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই সমীচীন। এই মতবাদের অনুসারীবৃন্দকে সম্রাটের নামে তাদের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম এই চারটি জিনিস উৎসর্গ করতে হতো। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী, সম্রাটকে সিজদাহ করতে হতো। তবে এ ধর্মমত মাত্র ১৮ জন গ্রহণ করেছিলেন। আর সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধর্মমতের বিলোপ ঘটে।

Teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি ছিল ইসলামের প্রতি হুমকিস্বরূপ।
মূলত সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্মমতানুসারে সম্রাটের নামে সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম- এ চারটি জিনিস উৎসর্গ করা হতো এবং সম্রাটকে সেজদাহ দিতে হতো, যা ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এছাড়াও দীন-ই-এলাহী ধর্মমতের অনুসারীদের শূকর, কুকুর ইত্যাদি প্রতিপালন এবং সিল্ক ও সোনালি কারুকার্যখচিত পোশাক পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হতো। এ মতবাদে নামাজ, রোজা, হজ, আজান প্রদান, দাড়ি রাখা, কুরআন ও হাদিস শিক্ষা করা ইত্যাদির অবকাশ ছিল না। ফলে এটি ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মমত। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, "আকবর তার পূর্বপুরুষদের এবং প্রথম যৌবনের ধর্মের প্রতি তিক্ত বিরোধিতা প্রদর্শন করেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অবমাননা করেন।" দীন-ই-এলাহী ধর্মমতে বিশ্বাসীগণকে মৃত্যুর পূর্বেই পাথেয় সংগ্রহের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতে হতো। এটি ছিল ইসলামের পরিপন্থি। তথাপি এ ধর্মের অনুসারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে তারা আসসালামু আলাইকুম না বলে 'আল্লাহ আকবর' এবং প্রত্যুত্তরে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' না বলে 'জাল্লা জালালুহু' বলতেন, যা ছিল ইসলাম ধর্মের অবমাননার শামিল।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্মমত ছিল ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রশ্ন ▶৪৮ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন একজন বিখ্যাত শাসক। রাজ্য জয় ছিল তার নেশা। তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। যার জন্য তার এই জয়কে স্পেনীয় ক্ষত বলা হয়। নেপোলিয়ন বলেছিলেন স্পেনীয় ক্ষত আমার ধ্বংস সাধন করেছিল। *[শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, ঢাকা]*

ক. কাকে জিন্দাপির বলা হয়? ১
খ. মুঘল আমলে দেওয়ানের দায়িত্ব কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের স্পেন জয়ের সাথে মুঘল শাসকের দাক্ষিণাত্য জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দাক্ষিণাত্য সম্রাটের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধি ছিল - ঐতিহাসিক স্মিথ-এর উক্তি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয়।

খ মুঘল আমলে দেওয়ানের (রাজস্ব আদায়কারী) দায়িত্ব ছিল সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা।
দেওয়ান ছিলেন সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিষয়ক দপ্তরের প্রধান। দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতার দিক হতে বাদশাহের পর প্রথম ক্ষমতাশালী অফিসার ছিলেন দেওয়ান। তিনি সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বেতন, যুদ্ধসরঞ্জাম ক্রয়, আদায়কৃত ও বকেয়া রাজস্বের হিসাব, সরকারের সাধারণ ব্যয় ইত্যাদি হিসাব রক্ষা করতেন। এছাড়া আমলা বা কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদির দায়িত্বও দেওয়ানকে পালন করতে হতো।

গ উদ্দীপকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের স্পেন বিজয়ের সাথে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।
দাক্ষিণাত্য নীতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের (১৬৫৮-১৭০৭) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে সম্রাট দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যের মারাঠা দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান (১৭০৭)। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর এবং যোগ্য শাসক। তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। নেপোলিয়নের মতো আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তার সময় ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত বেশি হয়েছিল যে এ বিশাল সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। আর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। উপরন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এ বিজয় তার পতনের পথ প্রশস্ত করে। তাই বলা যায়, নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘ দাক্ষিণাত্য সম্রাটের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি ছিল ঐতিহাসিক স্মিথ এর এ উক্তিটি যথার্থ।
আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে সকল কিছু লাভ করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সকল কিছুই হারালেন। এ সময় হতেই তার পতনের সূচনা হয়। তার জীবনের মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে।' দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মাধ্যমে ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট কাবুল হতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মির হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিশাল ও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নরপতির মর্যাদা লাভ করেন। এতদসত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
দাক্ষিণাত্য জয়ের ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দেয়। উত্তর ভারতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে সম্রাটের প্রভাব হ্রাস পায়। ফলে আফগান, শিখ, জাঠ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এভাবে সম্রাটের জীবিতাবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয় এবং এ অবস্থার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। উদ্দীপকে বর্ণিত নেপোলিয়ন বলতেন, 'স্পেনীয় ক্ষত আমার ধ্বংস সাধন করেছিল।' ঠিক তেমনি দাক্ষিণাত্য ক্ষত আওরঙ্গজেবের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। দাক্ষিণাত্য নীতির ব্যর্থতার ফলে দুশ্চিন্তায় সম্রাটের মন ও শরীর ভেঙে পড়ে এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য মুঘল সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, দাক্ষিণাত্য আওরঙ্গজেবের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি ছিল।

প্রশ্ন ▶৪৯ সম্রাট আমানত মুহাম্মদ মুসার রাজত্বকাল ছিল মাত্র ৫ বছর। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর। দয়া দাক্ষিণ্যে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। বিদ্বান ও পণ্ডিতদের তিনি নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য এবং শিক্ষকদের আলাদা বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. কত সালে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ কী? ২
গ. সম্রাট আমানত মুহাম্মদ মুসার কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পঠিত শাসকের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ কী আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সজাতিপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৫২৬ সালে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট সিংহলরাজের প্রেরিত আটটি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়াই ছিল আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ।
অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে সিংহলরাজ আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ আটটি জাহাজে করে খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। রাজা দাহির তা আদায়ে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তিনি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য খলিফার অনুমতি নিয়ে সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করেন।

Teachingbd24.com

গ সম্রাট আমানত মুহম্মদ মুসার কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পঠিত মুঘল যুগের শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূলত ৫ বছরের স্বল্পকালীন রাজত্বকালে শেরশাহ অযথা করারোপ করে অথবা সেনাবাহিনী কর্তৃক উৎপন্ন শস্য নষ্ট করে প্রজাসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙে দেননি। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে শেরশাহ মুক্তহস্তে দান করতেন এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনা তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদারক করতেন।" শেরশাহ মনে করতেন, সাধু ও সাধক পুরুষের ওপরই সাম্রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এ বিশ্বাসে তিনি তাদেরকে নিয়মিত ভাতাদান ও লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমিদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি এবং মসজিদ, মাদ্রাসা এমনকি মন্দিরকেও নিয়মিত মঞ্জুরি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তিনি দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। এভাবে শেরশাহ তার জনহিতকর কার্যাবলির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করেছিলেন।

উদ্দীপকে সম্রাট আমানত মুহম্মদ মুসার কর্মকাণ্ডে মুঘল যুগের শাসক শেরশাহের এ সকল কর্মকাণ্ডই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনিও শেরশাহের মতো তার সাম্রাজ্যের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করেন; বিদ্বান ও পণ্ডিতদের ভাতার ব্যবস্থা করেন, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, শিক্ষকদের বেতন এবং দুস্থদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করেন। আর এগুলোর মধ্যে মূলত শেরশাহের কর্মকাণ্ডের দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক অর্থাৎ আমার পঠিত শাসক শেরশাহের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ।

আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর জনকল্যাণমুখিতা। যে শাসনব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণের দিকে যত বেশি নজর দেওয়া হয় সে শাসনব্যবস্থা তত উন্নত। ফলে আধুনিক শাসনব্যবস্থা মাত্রই এর জনকল্যাণের দিকটি সর্বপ্রথম বিবেচনায় আনা হয়। কেননা, একটি শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জনগণ। ফলে জনগণের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর আধুনিক শাসনব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অন্যতম উপাদান। যা সকল ধর্মের জনগণকে একই শাসনাধীনে সমাসীন করে। ফলে সমাজে শান্তির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা, শিক্ষিতদের দ্বারাই শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধিত হয়। ফলে শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিয়োগ করা আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া সমাজের নিপীড়িত, দুস্থ বা আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক প্রশাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিক। শেরশাহ শিল্পখাতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন, নিপীড়িত ও দুস্থদের দান করেন এবং সকল ধর্মের জনগণের প্রতি উদার দৃষ্টি পোষণ করেন। ফলে শেরশাহের শাসনব্যবস্থা আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, শেরশাহ ছিলেন প্রজারঞ্জক ও জনহিতৈষী শাসকদের মধ্যে অন্যতম।

প্রশ্ন ▶৫০ ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার চরিত্রে দোষ ও গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করেন এবং ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার শাসনামলে তার স্ত্রী ইমেলদা মার্কোস এতই প্রভাবশালী হয়ে উঠেন যে, সমস্ত প্রশাসন যন্ত্র তাকে প্রেসিডেন্টের চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. 'জিন্দাপির' কাকে বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমেলদার কার্যাবলির সাথে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের-উন-নেসা।

খ ইসলামি অনুশাসনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হওয়ার কারণে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হতো।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন খাঁটি সুন্নি মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চললেও তিনি পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের শাসনামলে যে ধর্মের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল আওরঙ্গজেব তা জীবিত করেন। এটা করতে গিয়ে হিন্দুদের কাছে অপ্রিয় হলেও মুসলমানদের নিকট হতে তিনি 'জিন্দাপির' উপাধি লাভ করেন।

গ সৃজনশীল ৯ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫১ ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন তার রাজত্বের শেষের দিকে স্পেন আক্রমণ করে জয় করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্য নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণকে 'স্পেনীয় ক্ষত' বলা হয়। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. শেরশাহ কীভাবে মারা যান? ১

খ. তাজমহলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২

গ. নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের দাক্ষিণাত্য নীতিকে নেপোলিয়নের স্পেনীয় ক্ষতের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৫৪৫ সালের ২২ মে অস্ত্রাগার পরিদর্শনকালে বারুদ বিস্ফোরণে শেরশাহ মারা যান।

খ সৃজনশীল ৩১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫২ সম্রাট 'ফ' তার সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ঐ সম্প্রদায়ের অভিজাত পরিবারের সাথে নিজে ও তার সন্তানকে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ করেন। তাছাড়া তিনি উক্ত গোষ্ঠির লোকদের তার সাম্রাজ্যের সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদান করেন। এর ফলে সাম্রাজ্যে সুবাতাস বইতে থাকে। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১

খ. বাবরনামা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সম্রাট 'ফ' এর সাথে মোগল সম্রাট আকবরের কোন নীতির সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ গোষ্ঠির প্রতি সম্রাট আকবরের বন্ধুত্বমূলক মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে" - বিশ্লেষণ করো। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ সালে সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট 'ফ' এর সাথে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির সামঞ্জস্য রয়েছে।

সম্রাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী করতে হলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী রাজপুত জাতিগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন অপরিহার্য। এ জন্য তিনি রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপন করেন। এভাবে তিনি রাজপুতদের বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি লাভে সক্ষম হন। আবুল ফজলের

https://teachingbd24.com

'আইন-ই-আকবরী' হতে পাওয়া যায় আকবর রাজপুতদের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদগুলোতে নিযুক্ত করে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেন। অপরদিকে, বিজিত রাজ্যগুলোর শাসনভার রাজপুতদের হস্তে ছেড়ে দিয়ে তাদের সহযোগিতা লাভ করে।
উদ্দীপকেও দেখা যায়, সম্রাট 'ফ' একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তিনি নিজে এবং তার পুত্র এই গোষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত গোষ্ঠীর লোকদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে চাকরি দেন এবং তাদের কর ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। তাই বলা যায়, 'ফ' এর এই নীতির মধ্যে সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ গোষ্ঠীর অর্থাৎ সম্রাট আকবরের রাজপুতদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও সদাচরণ তার রাজ্যে এক নব যুগের সূচনা করে— উক্তিটি যথার্থ।
রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের বন্ধুত্বমূলক মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। Muslim Rule in India গ্রন্থে ভি ডি মহাজন বলেন, Thus by a policy of conciliation, Akbar was able to win over the affection of the Rajput and thereby Solidify the foundation of Mughal Empire in the country. রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনের ব্যাপারে এবং এ দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে হিন্দু তথা রাজপুতরা যে অবদান রেখেছেন তা অনস্বীকার্য।
রাজপুতদের প্রতি আকবরের উদার আচরণের ফলে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমগ্র হিন্দুজাতি আকবরের শাসনকে বিদেশি শাসন বলে মনে করেননি। তাদের সাহায্যেই আকবর বিস্তীর্ণ মেবার অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং রাজপুত সেনানিদের সাহায্যেই আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর কখনই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিংবা ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রাজপুতনায় হস্তক্ষেপ করেননি। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবর সমস্ত রাজপুতদের নিজ রাজ্যের অংশীদার করে নেওয়ায় সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে পড়েছিল। রাজপুত নীতিই আকবরকে মধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে উদারতার এক মূর্ত বিগ্রহে পরিণত করেছে। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি মহান আখ্যায় বিভূষিত হয়েছেন।
উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট যে, সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ও শতাধিক বছর স্থায়ী হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶৫৩ সাদিয়া ও মাধুর্য্য মুঘল সাম্রাজ্য নিয়ে কথা বলছিল। সাদিয়া মাধুর্য্যকে জানায় এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'ক' এর সাথে অন্য বংশের শাসক 'খ' এর 'X' নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 'ক' কামান ব্যবহার করেন এবং 'খ' নামক শাসক শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং 'খ' নামক শাসকের বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মাধুর্য্য বিষয়টির সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে এই যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের সূচনা হয়।
[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. দীন-ই-এলাহী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে সাদিয়া কোন যুদ্ধের কথা বলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধুর্য্যর মতামতটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ সালে সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের সাদিয়া পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কথা বলেছে।
১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে পানিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উচ্চাভিলাষী ও সাম্রাজ্যবাদী নরপতি বাবর যখন তার পিতৃপুরুষদের আবাস ভূমি সমরখন্দ বার বার অভিযান চালিয়েও দখল করতে ব্যর্থ হয় তখন দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে আক্রমণ করতে মনস্থির করেন। এছাড়া ভারতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দৌলতখান লোদী ও আলম খান লোদীর আমন্ত্রণ বাবরকে ভারত বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করে।
উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক'-এর সাথে 'খ'-এর যুদ্ধে 'ক' কামান ব্যবহার করে 'খ'-কে পরাজিত করে তার বংশের পতন ঘটায়। অনুরূপভাবে বাবর ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। কিন্তু অভিজ্ঞ ও সুশৃঙ্খল মুঘল বাহিনীর কামান ও আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে ইব্রাহিম লোদীর বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করলেও ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হয়। সুতরাং উদ্দীপকের সাদিয়া পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কথা বলেছে।

ঘ 'এই অর্থাৎ পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের সূচনা হয়।' উদ্দীপকের মাধুর্য্যের মতামতটি যথার্থ।
১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর লোদী বংশের শাসক ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে লোদী বংশের শাসনের অবসান ঘটে। তাই উদ্দীপকে মাধুর্য্যের মতামতটি সেটির প্রতিই ইঙ্গিত করে।
উচ্চাভিলাষী শাসক বাবর মধ্য এশিয়ার সমরখণ্ড দখলে ব্যর্থতা, উজবেকদের আগ্রাসন, সর্বোপরি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বাবরকে ভারত বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া ইব্রাহিম লোদীর চাচা আলম খান লোদী ও পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলতখান লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানায়। এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া না করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে অভিযান চালান। বাবরের সেনাবাহিনী এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম কামান ও গোলার ব্যবহার করে। ফলে ইব্রাহিম লোদীর ১ লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী বাবরের বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। ইব্রাহিম লোদীও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হন। এরই সাথে আফগান লোদী বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের সূচনা হয় বলে মাধুর্য্য যে মতামত পোষণ করেছে তা যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৫৪ প্রাথমিক জীবনে তৈমুর লঙ সিস্তান অভিযানকালে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর যখন নিশ্চিন্তে রাজধানীতে বিশ্রামরত তখন সিস্তানের সৈন্যরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এরূপ অতর্কিত আক্রমণে তৈমুর লঙ পরাজিত হন এবং কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। এমনকি কিছুকালের জন্য তিনি রাজ্যহারা হন। *[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. হাজার দিনারী কাকে বলা হয়? ১
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে তৈমুর লঙ এর সিস্তান অভিযান এর সাথে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজার দিনারী বলা হয় মালিক কাফুরকে।

খ কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত্ব (অধিকার) রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সম্রাট শেরশাহের (১৪৭২-১৫৪৫) প্রবর্তিত এক অভিনব ব্যবস্থাকে বোঝায়।
পাট্টা ছিল জমির অধিকার সংক্রান্ত দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে সরকারের পণ্য হতে পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রদেয় করসহ ভূমিতে নিজের দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে কৃষক রাষ্ট্রকে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ-এর সিস্তান অভিযানের সাথে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের বাংলা অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।
১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুঙ্গেরের সন্নিকটে সুরজগড়ের যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে আফগান নেতা শেরশাহ সমগ্র বিহার দখল করেন। পরবর্তীতে শেরশাহ বঙ্গদেশে সফল অভিযান পরিচালনা করে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তার এরূপ শক্তি বৃদ্ধিতে হুমায়ুন

শঙ্কিত হয়ে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন। তৈমুর লঙ-এর ঘটনায়ও এ অভিযানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

তৈমুর লঙ সিস্তান অভিযানের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর লঙ এর সিস্তান অভিযানের মতো মুঘল সম্রাট হুমায়ুনও শেরশাহের বিরুদ্ধে বাংলায় অভিযান প্রেরণ করেন। হুমায়ুন যখন গুজরাটে বাহাদুর শাহর বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আফগানরা মুঘলদের জন্য প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দেখা দেয়। শেরশাহের বিহার দখল ও বঙ্গদেশে ২টি সফল অভিযান প্রেরণ করার ফলে হুমায়ুন শঙ্কিত হয়ে ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চুনার দুর্গ আক্রমণ ও দখল করেন। এরপর হুমায়ুন গৌড় (১৫৩৮ সালে) অবরোধ করে বাংলা বিজয় সম্পন্ন করে এখানে প্রায় ৬ মাস অলস সময় পার করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙ-এর সিস্তান অভিযানে এই ঘটনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ ছিল সম্রাটের কৌশলগত দুর্বলতা। উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লঙের সামরিক পরাজয়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রেক্ষাপট পরিলক্ষিত হয়।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চুনার দুর্গ আক্রমণ ও দখল করে বাংলা বিজয় সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি বাংলায় প্রায় ৬ মাস আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে শেরশাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। তৈমুর লঙ-এর পরাজয়ের ক্ষেত্রেও হুমায়ুনের অদূরদর্শিতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

তৈমুর লঙ সিস্তান দখল করে যখন নিশ্চিন্তে রাজধানীতে বিশ্রামরত ছিলেন, তখন সিস্তানের সৈন্যরা তাকে চারদিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে। ফলে তৈমুর লঙ পরাজিত হন এবং কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। একইভাবে হুমায়ুনও শেরশাহকে চুনার দুর্গে পরাজিত করে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে পড়েন, যা চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) তার পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করে এবং বাংলা জয় করে সেখানে ছয় মাস অতিবাহিত করেন। কৌশলগত দিক থেকে এটি ছিল হুমায়ুনের বিরাট ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা এর ফলে শেরশাহ নিজের ক্ষমতা সুসংহত করার সুযোগ পান এবং বাংলা দখল করেন। এ অবস্থায় হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে গৌড় অবরোধ করেন। কুশলী শের খান মুঘল বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে গৌড় ত্যাগ করেন। হুমায়ুন গৌড় দখল করে সেখানে ছয় মাস আলস্য ও আমোদে সময় কাটান। সে সময়ে শেরশাহ চুনার দুর্গসহ বিহার, বারানসী, জৌনপুর ও কনৌজ দখল করেন। এভাবে হুমায়ুনের আলস্য ও ত্রুটিপূর্ণ কৌশলের কারণে শেরশাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এর ফলে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

পরিশেষে বলা যায়, হুমায়ুনের অলসপ্রবণতা ও দূরদর্শিতার অভাবই চৌসার যুদ্ধে তার পরাজয়ের দৃশ্যপট তৈরি করে রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫৫

[দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর]

ক. "?" চিহ্নিত স্থানে শাসকের নাম কী? ১

খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে মুঘল সাম্রাজ্যের কোন শাসকের কার্যপ্রণালী উল্লিখিত হয়েছে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আকবরের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনে রাজপুত নীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক '?' চিহ্নিত স্থানের শাসকের নাম আকবর।

খ তরাইনের প্রথম যুদ্ধের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য অদম্য মনোভাবের অধিকারী মুহাম্মদ ঘুরী ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে তরাইনের প্রান্তরে পুনরায় পৃথ্বিরাজের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, যা তরাইনের ২য় যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নিকট পৃথ্বিরাজের সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। পৃথ্বিরাজ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকালে বন্দি ও নিহত হন। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় ভারতে স্থায়ী মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভিত তৈরি করে।

গ উদ্দীপকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক সম্রাট আকবরের কার্যপ্রণালী উল্লিখিত হয়েছে।

সম্রাট আকবর ভারতের মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক লেনপুল তাকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। কেননা মুঘল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করায় সম্রাট আকবরের অবদান সর্বাধিক।

উদ্দীপকেও মহামতি সম্রাট আকবর এর গৃহীত নীতিসমূহেরই আলোকপাত করা হয়েছে। ১৫৫৬ সালে তিনি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তার অর্ধশতাব্দী রাজত্বকালে গৃহীত নীতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজপুত নীতি। মনসবদারি প্রথার প্রচলন ও দীন-ই-এলাহী ধর্ম প্রবর্তন। আকবরের লক্ষ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। উদারপন্থি ও অসাম্প্রদায়িক শাসক আকবর তার দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল করতে হলে রাজপুত সমর্থন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তিনি রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব দেন। এছাড়া সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি 'মনসবদারি' প্রথার প্রচলন করেন। ১৫৮২ সালে তিনি দীন-ই-এলাহী নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। উদ্দীপকে সম্রাট আকবর কর্তৃক গৃহীত এ সকল নীতির উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ উক্ত সম্রাটের অর্থাৎ সম্রাট আকবরের 'রাজপুত নীতি' ছিল তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এক অনন্য পরিচায়ক।

সম্রাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী করতে হলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী রাজপুতদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন অপরিহার্য। এ জন্য তিনি রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপন করেন। এভাবে তিনি রাজপুতদের বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি লাভে সক্ষম হন। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আকবর রাজপুতদের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদগুলোতে নিযুক্ত করে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেন। আবার, বিজিত রাজ্যগুলোর শাসনভার রাজপুতদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের ভিতকে শক্তিশালী করেন।

রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস এক নবযুগের সূচনা করে। এর ফলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনের ব্যাপারে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে হিন্দু তথা রাজপুতরা অনস্বীকার্য অবদান রাখে। রাজপুতদের প্রতি আকবরের উদার আচরণের ফলে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজাতি আকবরকে বিদেশি শাসক বলে মনে করেন নি। তাদের সাহায্যেই আকবর বিস্তীর্ণ মেবার অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং রাজপুত সেনানিদের সাহায্যেই আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর কখনই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিংবা ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে রাজপুতনায় হস্তক্ষেপ করেননি। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবর সমস্ত রাজপুতদের নিজরাজ্যের অংশীদার করে নেওয়ায় সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে পড়েছিল। রাজপুত নীতিই আকবরকে মধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে উদারতার এক মূর্ত বিগ্রহে পরিণত করেছে। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি 'মহামতি' আখ্যায় বিভূষিত হয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট যে, সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ও শতাধিক বছর স্থায়ী হয়েছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৬ সরাইল উপজেলার চেয়ারম্যান পদে সামাদ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছে। কদম আলী পরিবার ভাগ্যান্বেষণে সরাইলে এসে বসতি স্থাপন করে। কদম আলীর সহজ সরল জীবনযাপন, সাহসিকতা, নীতি-নৈতিকতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য উপজেলাবাসীর নজর কাড়তে সক্ষম হয়। সরাইল উপজেলার অভাবনীয় উন্নয়ন করেন। উপজেলার আইন শৃঙ্খলা, সুশাসন, জননিরাপত্তা, বিচার ও সালিশ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাজস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে আসামান্য উন্নয়ন করেন, যা ইতোপূর্বে অন্য কোনো চেয়ারম্যানই করতে পারেনি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি সামাদ পরিবারের হাতে চলে যায়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. ইতিহাসে কাকে জিন্দাপির বলা হয়? ১

খ. সম্রাট শাহজাহানকে 'The Prince of Builders' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কদম আলীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে কোন আফগান শাসকের শাসন ক্ষমতা দখলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কদম আলীর চেয়ে উক্ত আফগান শাসক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন - বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয়।

খ স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য সম্রাট শাহজাহানকে The prince of builders or Engineer King বলা হয়।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শৈল্পিক মনের মানুষ। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তার আমলে তাজমহল, মতি মহল, শিশ মহল, দিউয়ান ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, মুসাম্মার বুরুজ প্রভৃতি স্থাপত্য শৈলী নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব স্থাপত্য ছিল কারুকার্যখচিত মূল্যবান শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। তাই তাকে The Prince of builders or Engineer king বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ আবু ইউসুফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে আমূল পরিবর্তন করেন। শাসনকার্যের সুবিধার্থে তিনি রাজ্যকে ১৫ ভাগে ভাগ করে প্রতি রাজ্যে খাজাঞ্চি, কতোয়াল ও মুন্সেফ নিযুক্ত করেন। কর্মচারীরা যাতে দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পারে সেজন্য ৩ বছর অন্তর তাদের বদলীর ব্যবস্থা করেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তার শাসন সংস্কারের জন্য মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. দীন-ই এলাহী কে প্রবর্তন করেন? ১

খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আবু ইউসুফের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের ভূমিনীতি কেমন ছিল ব্যাখ্যা করো। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীন-ই-এলাহী প্রবর্তন করেন মুঘল সম্রাট আকবর।

খ কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত্ব (অধিকার) রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সম্রাট শেরশাহের (১৪৭২-১৫৪৫) প্রবর্তিত এক অভিনব ব্যবস্থাকে বোঝায়।

পাট্টা ছিল জমির অধিকার সংক্রান্ত দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে সরকারের পক্ষ হতে পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রদেয় করসহ ভূমিতে নিজের দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে কৃষক রাষ্ট্রকে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আবু ইউসুফের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের আফগান শাসক শেরশাহ শূরের মিল রয়েছে।

একজন শাসক হিসেবে শেরশাহ অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে শুধু একটি রাজবংশই প্রতিষ্ঠা করেন নি, মাত্র পাঁচ বছরের শাসনকালে নিজ যোগ্যতা বলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। সুষ্ঠুভাবে রাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত করেন। উদ্দীপকেও শেরশাহের শাসনব্যবস্থার এ দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আবু ইউসুফের তার নির্বাচিত এলাকাকে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করেন এবং উপযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে সেগুলোর কার্যাবলি পরিচালনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অনুরূপভাবে শেরশাহ ও শাসন কাজের সুবিধার জন্য প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তার বিশাল সাম্রাজ্যকে 'সরকার' নামক ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন। সরকারের প্রধান দুজন কর্মকর্তা ছিলেন 'শিকদার-ই শিকদারান' এবং মুনসিফ-ই-মুনসিফান'। সরকারের পরবর্তী প্রশাসনিক ইউনিট ছিল 'পরগনা'। শিকদার ছিলেন পরগনার প্রধান সামরিক অধিকর্তা এবং সর্বোচ্চ বেসামরিক কর্তা ছিলেন আমীন। আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল গ্রাম। গ্রাম প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের ওপর। মুখিয়া ও মুকাদ্দম ছিলেন গ্রাম প্রধান। তাই বলা যায়, আবু ইউসুফের এলাকা বিভাজনের সাথে শেরশাহের প্রাদেশিক শাসন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশকৃত শাসক শেরশাহ ভূমি সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

শেরশাহ এর বাল্য নাম ফরিদ খান শূর। মধ্যযুগীয় ভারতের শাসন ব্যবস্থায় তিনি অক্ষয়কীর্তি রেখে গিয়েছেন। মাত্র ৫ বছরের শাসনামলে মঙ্গলজনক সংস্কারের ফলে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ভূমি রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। তার প্রবর্তিত নীতি পরবর্তীতে অনেক শাসক অনুসরণ করেছিল। উদ্দীপকেও শেরশাহের কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক মাত্র পাঁচ বছর শাসন করলেও তার সংস্কারসমূহ পরবর্তী অনেক শাসক অনুসরণ করেছেন। এই শাসকের সাথে শূর বংশীয় শাসক শেরশাহের কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। শেরশাহ ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্ভাবনী চিন্তার পরিচয় দেন। শেরশাহ ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা পূর্বে এ নীতি প্রচলিত না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে রায়ত অবিচারের সম্মুখীন হতেন। শেরশাহ ফসল বপনের সময় ভূমি জরিপ এবং ফসল কাটার পর শস্যের পরিমাপ করে উৎপাদিত শস্যের গড়পরতা তিন ভাগের একভাগ রাজস্ব ধার্য করেন। রাজস্ব নগদ অর্থ ও শস্যের মাধ্যমে পরিশোধ করা যেত। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল চৌধুরী, মুকাদ্দাম, আমীন, কানুনগো এবং পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীর উপর। অবশ্য কৃষক ইচ্ছা করলে সরাসরি রাজকোষে রাজস্ব জমা দিতে পারত। এভাবে শেরশাহ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ সালমান সাহেব মেম্বার নির্বাচিত হওয়ার পর অনুভব করেন যে, তার চারপাশে শত্রু ভরপুর। সালমান সাহেব অল্প বয়সে মেম্বার হলেও এলাকা সম্পর্কে অনেক উচু ধারণা পোষণ করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে গেলেও বারবার ব্যর্থ হন কিন্তু সফলতাও কম ছিল না। পরবর্তীতে তিনি অন্যত্র গিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেন। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? ১

খ. বাবুরের পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন মুসলিম শাসকের ঘটনার মিল আছে? ৩

ঘ. এলাকা সম্পর্কে উঁচু ধারণা সত্ত্বেও সালমান সাহেব বার বার ব্যর্থ হন কেন? ৪

Teachingbd24.com

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৫৬ সালে।

খ বাবরের পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পিছনে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দায়ী ছিল।

পূর্বপুরুষদের আবাস ভূমি হস্তচ্যুত ও এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হয়। এ কারণে বাবর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য স্থাপনে মন:স্থির করেন। তদানীন্তন পূর্ব ভারতের অনুকূলে রাজনৈতিক অবস্থা এবং কাবুল, কান্দাহারে বাবরের তীব্র সংকট এবং তুর্কি আক্রমণসহ নানা কারণে বাবর পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে মুঘল সম্রাট বাবরের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সালমান সাহেবের অন্যত্র গমনের সাথে বাবরের ভারতে আগমনের সামঞ্জস্যের দিক হলো উভয়েই শত্রুপক্ষের কবলে পড়ে এলাকা ত্যাগ করেছিলেন।

১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে ফারগানার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন বাবর। সিংহাসন লাভের পরপরই তিনি আত্মীয়-স্বজন ও উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ১৪৯৭ সালে তিনি সমরখন্দ দখল করেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে পতিত হয়ে সমরখন্দ হারান। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফারগানা হস্তচ্যুত হয়। তিনি আবার ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ফারগানা এবং ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে সমরখন্দ অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ১৫০৩ সালে সাইবানি খানের কাছে পরাজিত হয়ে ফারগানা ও সমরখন্দ থেকে বিতাড়িত হন। এর ফলে তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। ১৫২৬ সালে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি খানুয়ার যুদ্ধে ও গোগরার যুদ্ধে জয়লাভ করে তার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

একইভাবে উদ্দীপকেও সালমান সাহেব মেম্বার হলেও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু চারপাশে শত্রু থাকার পরও সফলতা কম ছিল না। তারপরও আরো বেশি আধিপত্য বিস্তারের আশায় অন্যত্র গমন করেন। তাই বলা যায়, সালমানের এ ঘটনার সাথে বাবরের ভারতে আসার ঘটনার মিল বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে সালমান সাহেব মুঘল সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের প্রতিচ্ছবি নিজ এলাকা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধ ও বাহ্যিক আক্রমণ নানা কারণে বাবর বার বার ব্যর্থ হন।

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যিনি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন তিনি সম্রাট বাবার। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি ফারগনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে সিংহাসনে আরোহণের পর তাকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। উদ্দীপকে তা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের সালমান সাহেব অল্প বয়সে মেম্বার নির্বাচিত হবার পর নানা প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হন। নিজ এলাকা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও নানা অভিযানে বার বার তিনি ব্যর্থ হন। যেমনটি আমরা সম্রাট বাবরের ক্ষেত্রেও লক্ষ করি। পিতৃরাজ্য ফারগনায় অধিষ্ঠিত হবার পর বাবর প্রথম থেকেই দুই পিতৃব্য আত্মীয়-স্বজন এবং উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধীতার মুখে পড়েন। ১৪৯৭ সালে মধ্য এশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধের মুখে সমরখন্দ অধিকার করেন। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে সমরখন্দ হস্তচ্যুত হয়। সমরখন্দ ও ফারগনা হারিয়ে তিনি স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ান। পরবর্তীতে ১৫০০ ও ১৫০২ সালে যথাক্রমে ফারগনা ও সমরখন্দ পুনরুদ্ধার করলেও তা স্থায়ী হয় নি। অবশেষে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে ১৫০৪ সালে কাবুল অধিকার করে পুনরায় সমরখন্দ ও ফারগনা অধিকারের প্রচেষ্টা করলেও সাইবানি খানের পুত্রের নেতৃত্বে বিবেকদের নিকট গাজদাওয়ানের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে কাবুলে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত সাংগঠনিক অভিযানের অভাব, অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র প্রভৃতি কারণে সালমান সাহেব তথা বাবর বার বার অভিযানে ব্যর্থ হন।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ দ্বাদশ শ্রেণির ইসলামের ইতিহাস ক্লাসে তাহের সাহেব মুঘল বংশের ইতিহাস আলোচনা করছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। ছাত্রছাত্রীরা তাহের সাহেবকে প্রশ্ন করছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কী। তাহের সাহেব তাদেরকে জাহাঙ্গীরের শাসনামল বিস্তারিত তুলে ধরেন। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. সম্রাট জাহাঙ্গীর কী উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১

খ. সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলে শিখ গুরু অর্জুনকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? ২

গ. শাহজাদা খুররম কেন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন? ৩

ঘ. সম্রাট জাহাঙ্গীরকে একজন সফল শাসক বলার পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাট জাহাঙ্গীর 'নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খ শিখ সম্প্রদায়ের গুরু অর্জুন সিং বিদ্রোহী খসরুকে সমর্থন ও সহযোগিতা করায় সম্রাট তকে জরিমানা করেন। গুরু অর্জুন জরিমানা প্রদানে অস্বীকার জানালে সম্রাট তাকে প্রাণদন্ড দেন।

গ সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে অন্যতম ঘটনা শাহজাদা খুররমের বিদ্রোহ।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ও বুদ্ধিমান শাসক। তার জীবনের শেষ দিনগুলো ছিল বিদ্রোহে পরিপূর্ণ।

জাহাঙ্গীরের আমলে সিংহাসন দখল করার জন্য তার পুত্রগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার ৩ পুত্রের মধ্যে পারভেজ ও শাহরিয়ার ছিলেন যোগ্য ও প্রতিশ্রুতিবান। নানামুখী ষড়যন্ত্রে খুররম উত্তরাধিকার বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা লক্ষ করেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান খুররমের পরিবর্তে শাহজাদা শাহরিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করতে তৎপর হয়ে উঠেন। ফলে খুররম পিতার আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার বিদ্রোহে সম্রাট মর্মাহত হন। অবশেষে দাক্ষিণাত্য ও বাংলায় কিছুকাল অবস্থান করে খুররম পুনরায় পিতার নিকট আত্মসমর্পন করেন। এভাবেই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

ঘ শাসক হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সফল বলা যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল ইতিহাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার চরিত্র ছিল পরস্পরবিরোধী গুণাবলির সমষ্টি। শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তিনি উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পিতা আকবরের মতো বিচক্ষণ না হলেও শাসক হিসেবে জাহাঙ্গীর মোটামুটি সফল ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, জাহাঙ্গীর একজন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ছিলেন এবং অতি সহজেই তিনি সাম্রাজ্যের সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করতে পারতেন। তার কোনো উপদেষ্টা বা মন্ত্রিসভা না থাকায় সম্রাট নিজেই রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ মীমাংসা করতেন। শাসনসংস্কারে তিনি কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি, তবে তিনি তার পিতার শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। ফলে খুররম ও মহব্বত খানের বিদ্রোহ বাদ দিলে তার সময়ে বড় রকমের কোনো অঘটন দেখা যায় না।

সম্রাট জাহাঙ্গীর একজন সাহসী এবং নিপুণ সমরনায়ক ছিলেন। তিনি নিজে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন এবং যুদ্ধ বিষয়ে সেনাপতিদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতেন। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, তিনি বিজেতা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তার সময়ে কাংড়া ও মেবার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা ছাড়া মুঘল সেনাবাহিনী আর কোনো বড় বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

ন্যায়বিচারক হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মজলুম বিচারপ্রার্থী যাতে সম্রাটের কাছে সরাসরি তার অভিযোগ পেশ

Teachingbd24.com

করতে পারেন, সেজন্য তিনি বিচার ঘন্টা স্থাপন করেন। জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল বিচারপ্রার্থীই ঘন্টার সাথে যুক্ত শিকল টেনে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। তিনি অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। তিনি 'দস্তুরুল আমল' নামক ১২ টি আইন বিধিও প্রবর্তন করেছিলেন।

তিনি 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী' নামক একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। এটি মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের একটি অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐতিহাসিকগণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে ভারতীয় সাহিত্যের 'অগাস্টাস যুগ' বলে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন ▶ ৬০ আসামের শাসনকর্তা সালাদীন খার রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বিহারের শাসনকর্তা ইউসুফকে পরাজিত করে উক্ত রাজ্য অধিকার করেন এবং খান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার জীবনের কাহিনী নিয়ে সালাদীননামা রচনা করেন।

[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]

ক. দিল্লীর শেষ সুলতান কে ছিলেন? ১

খ. আলম খান লোদী ও দৌলত খান লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন শাসকের মিল রয়েছে বুঝিয়ে লেখ। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লীর শেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহীম লোদী।

খ আলম খান লোদী ও দৌলত খান লোদী ইব্রাহীম লোদীর বংশীয় লোক হলেও তাদের সাথে ইব্রাহীম লোদীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো ছিল না। সুলতান ইব্রাহীম লোদী জনপ্রিয় শাসক ছিলেন না। উপরন্তু অভিজাত ও প্রাদেশিক গভর্নরদের সাথে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাই পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ও অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি আলম খান লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। মূলত, এটা ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল।

গ সৃজনশীল ১৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬১ নান্দিনার শাসনকর্তা আলী শাহ জামালপুরের শাসনকর্তা হুসাম উদ্দিনকে পরাজিত করে তার সাম্রাজ্য অধিকার করেন। তিনি শাসনব্যবস্থা ও ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করেন। জামালপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিশাল রাস্তা নির্মাণ করেন। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]*

ক. বৈরাম খান কে ছিলেন? ১

খ. দীন-ই-এলাহী কী প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্ম ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কাকে সিংহাসনের পশ্চাতের শক্তি বলা হতো, কেন বলা হতো— ব্যাখ্যা করো। ৪

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈরাম খান সম্রাট আকবরের তত্ত্বাবধায়ক ও সেনাপতি ছিলেন।

খ ভারতের মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য হিন্দু-মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাই ছিল 'দীন-ই-এলাহী' এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হলো সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' এর ধর্মমত প্রচার। সম্রাটের এ ধর্মমত প্রচারের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা তিনি মনে করেন যে, হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য উদার ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করা উচিত। তাই তিনি তার সাম্রাজ্যের সকলকে একটি কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। এটি ছিল 'দীন-ই-এলাহী' প্রবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের সাথে দিল্লীর শাসক শেরশাহ এর মিল রয়েছে।

শেরশাহ মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। এছাড়া তার নতুন উদ্ভাবন ছিল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার। শেরশাহ পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ হতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন।

এর নাম ছিল 'সড়ক-ই-আজম' বা 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড'।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, নান্দিনার শাসনকর্তা আলী শাহ জামালপুরের শাসনকর্তা হুসাম উদ্দিনকে পরাজিত করে তার সাম্রাজ্য অধিকার করেন। তিনি শাসনব্যবস্থা ও ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করেন। জামালপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিশাল রাস্তা নির্মাণ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দিল্লীর শুর বংশীয় শাসক শেরশাহ এর সাথে উদ্দীপকের মিল রয়েছে।

ঘ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর প্রভাব ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য নূরজাহানকে সিংহাসনের পশ্চাতের শক্তি বলা হত।

নূরজাহান যেমন অসামান্য রূপবতী ও বিদুষী মহিলা ছিলেন, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি কবিতা পছন্দ করতেন এবং কবিতা লিখতে পারতেন। তার বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের নিকট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মাথা নোওয়াতে বাধ্য হত। বিপদে তিনি অসীম সাহস ও ধৈর্য ধারণ করতে পারতেন। নূরজাহান মুঘল প্রশাসনে একজন শক্তিশালী সম্রাজ্ঞী হিসেবে আবির্ভূত হন। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ তার অনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টা করতেন। ঐতিহাসিক স্মিথ তাকে 'Power behind the throne' বা সিংহাসনের পশ্চাতের শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। নূরজাহানের ক্ষমতার চর্চা দেখে জনগণ তাকে অধিক সমীহ করতেন। রাজদরবারের রাজনীতি তিনি দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি মুদ্রার অপর পিঠে নিজের নামাঙ্কনের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজকীয় ফরমানে তার সাক্ষর দেয়া অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনকে উচ্চপদ দিতে কার্পণ্য করেননি। পরিশেষে বলা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, "এক গ্লাস মদ ও এক ডিশ সুপের বিনিময়ে আমি আমার রাজ্যকে আমার প্রিয়তমা রানির কাছে বিক্রয় করেছি।"

প্রশ্ন ▶ ৬২ স্পেনের শাসনকর্তা তৃতীয় আব্দুর রহমান সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি তার বেগমের নামানুসারে ইতিহাস বিখ্যাত আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন- যা এখনও বর্তমান থেকে তার পত্নী প্রেমের নিদর্শন বহন করছে। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]*

ক. মনসব শব্দের অর্থ কী? ১

খ. রাজপুতদের সাথে সম্রাট আকবরের বৈবাহিত সম্পর্ক স্থাপনের মূল কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন শাসকের কার্যাবলীর মিল রয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের কারণ ও ফলাফল লিখ। ৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনসব শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা।

খ রাজপুতদের সাথে সম্রাট আকবরের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মূল কারণ রাজনৈতিক। সম্রাট আকবর ভারতের শক্তিশালী রাজপুতদের তার সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করেছিলেন। তাই তিনি তাদের সাথে সদ্ভাব স্থাপনের মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করেন। তাই তিনি তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন করেন। আকবর রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হন।

গ উদ্দীপকের শাসকের সাথে সম্রাট শাহজাহানের কার্যাবলীর মিল রয়েছে।

ভারত মুঘল শাসক সম্রাট শাহজাহান ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক। তার সময়কালকে মুঘল রাজবংশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। তিনি

Teachingbd24.com

তার স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর তার নামের সাথে মিল রেখে 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। এই তাজমহল এখনও বর্তমান এবং তা শাহজাহানের স্ত্রীর প্রতি অমর প্রেমের নির্দশন বহন করছে। এটি পৃথিবীর মানবসৃষ্টি সপ্ত আশ্চার্যের অন্যতম ইমারত।
উদ্দীপকে দেখা যায় যে, স্পেনের শাসনকর্তা আব্দুর রহমান সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি তার বেগমের নামানুসারে ইতিহাস বিখ্যাত আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যা আজও বর্তমান। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, উপর্যুক্ত সম্রাট শাহজাহানের সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুর রহমানের কার্যাবলীর মিল রয়েছে।

ঘ উক্ত শাসকের অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের কারণ ছিল শাহজাহানের মনোনয়ন, আওরঙ্গজেব কর্তৃক মেনে না নেয়া এবং এর ফলে আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল শাসক হলেন।
অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন আওরঙ্গজেব শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারাশিকোর প্রতি বেশি স্নেহ পোষণ করতেন। দারাশিকো ছিলেন উদারমনা ও শিয়া মুসলিমদের প্রতি সহানুভূমি সম্পন্ন। ফলে কট্টরপন্থী সুন্নী মুসলিমগণ আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করতে থাকেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও সেনাপতিত্বে আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন। রক্তক্ষয়ী উত্তরাধিকার যুদ্ধে নিজ কৃতিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আওরঙ্গজেব প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইদের পরাজিত করে এবং পিতা সম্রাট শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গে বন্দি করে ১৬৫৮ সালে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী খাজওয়ার যুদ্ধে ভাই শাহ সুজাকে এবং দেওরাইয়ের যুদ্ধে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বড় ভাই দারাশিকোকে পরাজিত করে তিনি দিল্লি অধিকার করেন। এবং ১৬৫৯ সালে দ্বিতীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। 'আলমগীর পাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে আওরঙ্গজেব ৬ষ্ঠ মুঘল সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে সমাসীন হন।

প্রশ্ন ▶৬৩ ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতির অন্যতম। তিনি স্পেনসহ পৃথিবীর অনেক দেশ এশিয়া, রোম, পর্তুগাল, সিসিলি প্রভৃতি জয় করেন। কিন্তু স্পেনে অভিযান ও উপদ্বীপের যুদ্ধই ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়ন বলেছিলেন স্পেনের ক্ষত আমার ধ্বংস সাধন করেছিল। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. নূরজাহান কে ছিলেন? ১
খ. জাত ও সওয়ার কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের যে শাসকের মিল রয়েছে তার কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখ। ৩
ঘ. নেপোলিয়নের উক্তিটির সাথে উক্ত শাসকের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নূরজাহান ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।

খ মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে নিয়োগকৃত মনসবদার গণের 'জাত' ও 'সওয়ার' নামের দুটি মর্যাদা ছিল।
মনসবদার নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছাধীন ছিল। একজন ব্যক্তির সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সম্রাট তাকে মনসবদার হিসেবে নিয়োগ দিতেন। এই মনসবদারদের দুটি মর্যাদা ছিল 'জাত' ও 'সওয়ার'।

গ উদ্দীপকের চরিত্রের সাথে আমার পাঠ্য বইয়ের শাসক আওরঙ্গজেবের মিল রয়েছে। আওরঙ্গজেব ছিলেন মুঘল বংশের সর্বশেষ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থেকে শুরু করে পরবর্তীতে সম্রাট হিসেবে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তিনি যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতির অন্যতম। তিনি স্পেনসহ পৃথিবীর অনেক দেশ যেমন, এশিয়া, রোম, পর্তুগাল, সিসিলি প্রভৃতি জয় করেন। অনুরূপভাবে সম্রাট আওরঙ্গজেবও ছিলেন একজন সুদক্ষ রাজনীতিক, সুনিপুণ সমরনীতিবিদ ও সাহসী যোদ্ধা। উত্তরাধিকার যুদ্ধ, বিদ্রোহ দমন ও দাক্ষিণাত্য অভিযানে সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে তার কৌশল ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তার সময় মুঘল সাম্রাজ্য উত্তরে কাশ্মির হতে দক্ষিণে তাঞ্জোর পূর্বে বাংলা ও পশ্চিমে কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার আমলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দাক্ষিণাত্য জয়। শাসনকার্যের সুবিধার্থে এ বিশাল সাম্রাজ্যকে ২১ টি সুবায় বিভক্ত করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক, ধর্মতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা, আরবি ভাষা ও ফার্সি সাহিত্যে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শাসক।

ঘ উদ্দীপকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের স্পেন বিজয়ের সাথে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।
দাক্ষিণাত্য নীতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের (১৬৫৮-১৭০৭) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে সম্রাট দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যের মারাঠা দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা দখল করেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান (১৭০৭)। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর এবং যোগ্য শাসক। তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। নেপোলিয়নের মতো আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তার সময় ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত বেশি হয়েছিল যে, এ বিশাল সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। আর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। উপরন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এ বিজয় তার পতনের পথ প্রশস্ত করে। তাই বলা যায়, নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▶৬৪ মহামহিম সুলায়মানের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার চরিত্রে দোষ ও গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি ছিলেন কাব্যরসিক এবং তার সময়ে অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। আবার মদ্যপান ও হেরেমপ্রিয়তার ফলে রাজকার্য পরিচালনার কোন দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তার শাসনামলে তার স্ত্রী সুলতানা নূরবানুর প্রভাব এত বেশি যে সুলতান কার্যতঃ তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পুতুল ছিলেন। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে মুঘল আমলের যে শাসকের মিল রয়েছে তার কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখ। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের চরিত্র ছিল বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ— ব্যাখ্যা কর। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের দ্বিতীয় সেলিমের সাথে মুঘল আমলের শাসক সম্রাট জাহাঙ্গীরের মিল রয়েছে।
ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল ইতিহাসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক, সহানুভূতিশীল ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। উদ্দীপকেও তা লক্ষ করা যায়।
সম্রাট জাহাঙ্গীর তার পিতার শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন এবং যুদ্ধ বিষয়ে

https://teachingbd24.com

সেনাপতিদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন। ন্যায়বিচারক হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মজলুম বিচারপ্রার্থী যাতে সম্রাটের কাছে সরাসরি তার অভিযোগ পেশ করতে পারে। সেজন্য তিনি বিচারঘণ্টা স্থাপন করেন। যার মাধ্যমে তিনি সহজে জনগণের অভিযোগের পূর্ণ সমাধান করতে পারতেন। তিনি অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারেও কঠোর ছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি দস্তুরুল আমল নামক ১২টি বিধি প্রবর্তন করেছিলেন। এছাড়া সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক। তার সময় চিত্রশিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। সুতরাং শাসক হিসেবে জাহাঙ্গীরকে সফল বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় সেলিমের সাথে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের তুলনা করা যায়।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় সেলিমের চরিত্রে দোষ ও গুণের সংমিশ্রণ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক একইভাবে জাহাঙ্গীরের চরিত্রেও বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

ঐতিহাসিকগণও কেউ প্রশংসা, আবার কেউ তীব্র সমালোচনা করেছেন। ঈশ্বরী প্রসাদ জাহাঙ্গীরের প্রশংসা করে বলেন, 'মুঘল ইতিহাসের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র হচ্ছে জাহাঙ্গীর।' আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগপ্রবণ, মহানুভব, নির্যাতনের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা এবং সুবিচারের প্রতি প্রগাঢ় মোহ তার চারিত্রিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার তার চরিত্রের তীব্র সমালোচক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, 'জাহাঙ্গীরের চরিত্রে নমনীয়তা ও নৃশংসতা, সুবিচার ও খামখেয়ালিপনা, রুচিবোধ, বর্বরতা সুবুদ্ধি ও জ্ঞানসুলভ গুণাবলির সমাবেশ দেখা যায়। তাকে একদিকে যেমন অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলে অভিহিত করা হয়েছে, অন্যদিকে, প্রজাদের মঙ্গলার্থে ১২টি প্রজামঙ্গলকর আইন প্রণয়ন করেন। অত্যধিক আফিম ও মাদকাসক্তি ছিল তার চরিত্রের বড় ত্রুটি। অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া তার চরিত্রের অন্যতম দোষ ছিল।' তাই বলা যায়, দ্বিতীয় সেলিমের চরিত্রে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৬৫ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) পুরো সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রদেশগুলো প্রাদেশিক গভর্নর বা ওয়ালি শাসিত হতো। উমর (রা) ব্যক্তিগতভাবে ওয়ালিদের নিযুক্ত করতেন। তিনি ন্যায়বিচারের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বিচারকাজে তিনি কোনো আপন-পর ভেদাভেদ করতেন না। মদ্যপানের অপরাধে তিনি তার পুত্র শাহমাকে বেত্রাঘাত করে এবং এর ফলে পুত্র মৃত্যুবরণ করে। মহানুভব ও ন্যায়পরায়ণ এ খলিফা ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়বিচারের জন্যই অধিক দিকটির স্মরণীয় হয়ে আছেন। *[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. 'দ্বীন-ই-এলাহী' নামক ধর্মের প্রবর্তক কে? ১
খ. আকবরের গুজরাট বিজয় অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকে সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সম্রাট আকবর এবং হযরত উমর (রা) একে অপরের সার্থক প্রতিচ্ছবি— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দীন-ই-এলাহী' নামক ধর্মের প্রবর্তক মুঘল সম্রাট আকবর।

খ সম্রাট আকবরের গুজরাট বিজয়ের (১৫৭২-১৫৭৩) ফলে সমুদ্র এবং পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলোর ওপর মুঘলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই গুজরাট বিজয় অতি গুরুত্বপূর্ণ।

গুজরাট বিজয়ের মাধ্যমে মুঘলরা ইউরোপীয় পর্তুগিজ শক্তির সংস্পর্শে আসে। সমুদ্র উপকূল অধিকৃত হওয়ায় তারা নৌবাহিনী গঠনের সুযোগ লাভ করে। গুজরাট বিজয়ের ফলে মুঘলদের নিকট দাক্ষিণাত্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। তাছাড়া এ বিজয়ের কারণে নিরাপদে মক্কায় হজব্রত পালনের সুযোগ তৈরি হয়। এসব কারণে গুজরাট বিজয়কে ঐতিহাসিকেরা অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

গ উদ্দীপকে মুঘল সম্রাট আকবরের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

কোনো অঞ্চল আয়তনে বড় হলে এককভাবে সেই অঞ্চলটি শাসন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ রকম সমস্যার প্রেক্ষিতে শাসনকার্যের সুবিধার্থে অঞ্চলটিকে যদি ছোট ছোট কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয় তবে তাকে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বলা যায়। প্রাদেশিক শাসনের এরূপ চিত্রই হযরত উমর (রা) এবং সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে।

হযরত উমর (রা) তার পুরো সাম্রাজ্যকে ১২টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রতিটি প্রদেশে গভর্নর বা ওয়ালি নিয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে, সম্রাট আকবর তার বিশাল সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৫টি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রদেশগুলো হচ্ছে বাংলা (উড়িষ্যাসহ), বিহার, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লি, আজমির, মুলতান (সিন্ধুসহ), লাহোর (কাশ্মিরসহ), কাবুল, গুজরাট, মালব, খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগর। এক্ষেত্রে সুবার সামরিক এবং বেসামরিক শাসন বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন সুবাদার। পদমর্যাদায় সুবাদারের পর গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন দেওয়ান। সম্রাট আকবরই তাদেরকে সরাসরি নিয়োগ দিতেন। প্রদেশের রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল দেওয়ানের ওপর। তিনি তার কাজের জন্য কেন্দ্রীয় দেওয়ানের নিকট জবাবদিহি করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে— প্রদেশের গঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় উমর (রা) এবং সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট মিল বিদ্যমান।

ঘ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সম্রাট আকবর এবং হযরত উমর (রা) দুজনেই আন্তরিকতা ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছেন।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। ইতিহাসে যে সকল শাসক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হয়েছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন তারা সকলেই প্রজারঞ্জক হিসেবে খ্যাত হয়ে আছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত হযরত উমর (রা) এবং মুঘল সম্রাট আকবর এমনই দুজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাসক।

উদ্দীপক থেকে দেখা যায়, হযরত উমর (রা) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বিচারকাজে তিনি কোনো আপন-পর ভেদাভেদ করতেন না। এর বাস্তব প্রমাণ হলো মদ্যপানের অপরাধে তিনি নিজ পুত্রকে বেত্রাঘাত করেন এবং এর ফলে তার পুত্রের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, সম্রাট আকবরও ন্যায়বিচারক ছিলেন। তিনি নিজে বিচার প্রশাসনের সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিনে তিনি বিচারপ্রার্থীদের অভিযোগ শুনতেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তার 'আকবরনামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আত্মীয়-অনাত্মীয়, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি ও রাস্তার জীর্ণ ভিক্ষুকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না।' সম্রাট নিজেও আইনের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তিনি বলতেন, 'স্বয়ং তিনি যদি কোনো অন্যায় কার্য করেন, তাহলে তিনি নিজেকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।' তার সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) অপরাধীকে শাস্তি দান অপেক্ষা অপরাধ নিবারণ ও দমনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। তার বিচার ব্যবস্থার আকর্ষণীয় দিক ছিল নিরপেক্ষতা, সহজলভ্যতা এবং ক্ষিপ্রতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হযরত উমর (রা)-এর মতো সম্রাট আকবরও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আপোসহীন ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উমর (রা) এবং সম্রাট আকবর একে অপরের সার্থক প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶ ৬৬ আবিরের পিতা রাজশাহী জেলার এক ক্ষুদ্র উপজেলার অধিপতি ছিলেন। তার ধমনীতে দুজন প্রখ্যাত সমর নায়কের বা রাজনীতিবিদের রক্ত প্রবাহিত ছিল। খুব অল্প বয়সে আবির পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সততা ও ধৈর্য তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বার বার বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত হয়েও নিজের চেষ্টায় একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. হুমায়ুন শব্দের অর্থ কী? ১

https://teachingbd24.com

খ. শেরশাহ কীভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন? ২

গ. উদ্দীপকের আবিরের সহিত তোমার পাঠ্যবইয়ের যে একজন শাসকের মিল রয়েছে তার প্রাথমিক জীবন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসক ছিলেন একজন সফল শাসক- মূল্যায়ন কর। ৪

৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুমায়ুন শব্দের অর্থ ভাগ্যবান।

খ মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরশাহ ভারতীয় উপমহাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন।

শেরশাহ ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। হুমায়ুন কোনো রকমে জীবন বাঁচিয়ে নিজাম নামক মাঝির সাহায্যে গঙ্গা পাড়ি দিয়ে আগ্রায় পৌছান। সেখান থেকে হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় শেরশাহকে আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারও হুমায়ুন কনৌজের বিলগ্রামে শেরশাহের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেরশাহ দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন।

গ উদ্দীপকের আবিরের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সম্রাট বাবরের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে আবির জীবনের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল শাসক সম্রাট বাবরের জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে।

জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ওমর শেখ মির্জা এবং মা কুতলুঘ নিগার খানম। তিনি পিতার দিক থেকে চাঘতাই তুর্কি বীর তৈমুর লঙ এবং মাতার দিক থেকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। শৈশবে বাবর বিদূষী মাতামহী আয়সন দৌলত বেগম এবং গৃহশিক্ষক শেখ মজিদের নিকট তুর্কি, আরবি ও ফারসি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

উদ্দীপকে আবির মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেই পিতৃব্য আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হন। একইভাবে সম্রাট বাবরও ১১ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি যখন ফারগানার দায়িত্ব লাভ করেন তখন ফারগানা রাজ্য চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করে বাবর মধ্য এশিয়ার পূর্বপুরুষ তৈমুরের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি পরপর দুবার সমরখন্দ অধিকার করে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও ধৈর্য হারাননি। ১৫০৪ সালে তিনি খোরাসানের রাজার সহায়তায় হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কাবুল ও গজনি অধিকার করেন। উদ্দীপকের আবিরের মতোই সম্রাট বাবরও তার মাতামহীর সাহচর্যে সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন।

ঘ শাসক হিসেবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবর ছিলেন অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। মধ্যযুগের ইতিহাসে বাবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতি। কৃতিত্ব ও চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কালী কিংকর দত্ত যথার্থই বলেন, "Babar is one of the most romantic and interesting personalities in the History of Asia". জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর মাত্র ১১ বছর বয়সে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি প্রথমে কাবুল এবং পরে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। শুধু প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার ভিত্তি সুদৃঢ় করে একে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

লেনপুল বলেন, তার ভারত বিজয় তাকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিয়েছে, যা একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়। বাবর প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে ওয়ালি, একজন দিওয়ান, শিকদার এবং কোতোয়াল নিয়োগ করেন। তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৫ মাইল অন্তর ডাক চৌকির ব্যবস্থা করেন। তিনি দিল্লি ও আগ্রার ২০টি উদ্যান, বহু পাকা নর্দমা, সেতু, অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বাবর একজন সুসাহিত্যিক, নিপুণ, সমালোচক ও হস্তশিল্প বিশারদ হিসেবে কৃতিত্বের দাবিদার। বাবরনামা তার গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাশব্রুক উইলিয়াম বাবরের চরিত্রের আটটি মৌলিক গুণের উল্লেখ করেন। যেমন- নিখুঁত বিচারবুদ্ধি, উচ্চাভিলাষ, যুদ্ধ নৈপুণ্য, সুদক্ষ শাসন-কৌশল, প্রজাহিতৈষীপণা, উদার প্রশাসনিক আদর্শ, সৈন্যদের মন জয় করার ক্ষমতা এবং ন্যায়বিচারের মানসিকতা।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাবর নিজেকে একজন দক্ষ শাসক হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৬৭ ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন তার রাজত্বের শেষ দিকে স্পেন আক্রমণ করে জয় করেছিলেন। কিন্তু এটা ছিল নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এ জন্য নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণকে 'স্পেনীয় ক্ষত' বলা হয়। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. 'দস্তুরুল আমল' কী? ১

খ. পানিপথের যুদ্ধের বর্ণনা দাও। ২

গ. নেপোলিয়নের আক্রমণের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের দাক্ষিণাত্য নীতিতে নেপোলিয়নের স্পেনীয় ক্ষতের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ৪

৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে ১২টি বিধি জারি করেন তা 'দস্তুরুল আমল' নামে পরিচিত।

খ ভারতীয় ইতিহাসে দিল্লির অদূরে হরিয়ানা রাজ্যের পানিপথ প্রান্তর উল্লেখযোগ্য একটি জায়গা। কারণ সাম্রাজ্যের ভাগ্যনির্ধারণকারী গুরুত্বপূর্ণ তিনটি যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হয়। পানিপথ প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় বিধায় এগুলোকে পানিপথের যুদ্ধ বলা হয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাবর বিজয়ী হয়। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ মুঘল সম্রাট আকবর ও হিমুর মধ্যে সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত। পরবর্তীতে ১৭৬১ সালে আহমদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে আবদালী মারাঠাদের পরাজিত করে মারাঠা অধিকৃত অঞ্চল দখল করে নেয়।

গ উদ্দীপকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের স্পেন বিজয়ের সাথে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।

দাক্ষিণাত্য নীতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের (১৬৫৮-১৭০৭) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে সম্রাট দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যের মারাঠা দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা দখল করেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান (১৭০৭)। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন একজন বিখ্যাত বীর এবং যোগ্য শাসক। তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। নেপোলিয়নের মতো আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তার সময় ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এত বেশি হয়েছিল যে এ বিশাল সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। আর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। উপরন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এ বিজয় তার পতনের পথ প্রশস্ত করে। তাই বলা যায়, নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের মধ্যে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘ নেপোলিয়নের শেষোক্ত উক্তিটি আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, দাক্ষিণাত্য সম্রাটের দেহের ও সাম্রাজ্যের সমাধি ভূমি ছিল।

https://teachingbd24.com

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে সকল কিছু লাভ করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সকল কিছুই হারালেন। এ সময় হতেই তার পতনের সূচনা হয়। তার জীবনের মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে।' দাক্ষিণাত্য বিজয়ের মাধ্যমে ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট কাবুল হতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মির হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিশাল ও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নরপতির মর্যাদা লাভ করেন। এতদসত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
দাক্ষিণাত্য জয়ের ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দেয়। উত্তর ভারতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে সম্রাটের প্রভাব হ্রাস পায়। ফলে আফগান, শিখ, জাঠ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এভাবে সম্রাটের জীবিতাবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয় এবং এ অবস্থার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। উদ্দীপকে বর্ণিত নেপোলিয়ন বলতেন, 'স্পেনীয় ক্ষত আমার ধ্বংস সাধন করেছিল।' ঠিক তেমনি দাক্ষিণাত্যের ক্ষত আওরঙ্গজেবের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। দাক্ষিণাত্য নীতির ব্যর্থতার ফলে দুশ্চিন্তায় সম্রাটের মন ও শরীর ভেঙে পড়ে এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য মুঘল সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের শেষ উক্তিটির সত্যতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬৮ জনাব হায়দার আলী সাহেব শান্তিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এলাকার প্রভাবশালী পরিবারগুলোকে বশে আনতে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তার কার্যালয়ে ঐ পরিবারের বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন, তাছাড়া তাদের ওপর ধার্যকৃত করসমূহ বৃদ্ধি না করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ফলে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং তিনি নির্বিঘ্নে দীর্ঘদিন ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হন। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. বৈরাম খান কে ছিলেন? ১
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হায়দার আলী সাহেবের পদক্ষেপগুলো সম্রাট আকবরের কোন্ নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত পদক্ষেপ দ্বারা সম্রাট আকবর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈরাম খান ছিলেন একজন তুর্কি যোদ্ধা ও আকবরের অভিভাবক।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব হায়দার আলী সাহেবের পদক্ষেপের সাথে সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।
আকবরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল তার রাজপুতনীতি। ভারতবর্ষে সকল শ্রেণির জনগণের শুভেচ্ছা, সদিচ্ছা ও সম্প্রীতির ওপর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মানসে সহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের হিন্দু জাগরণের নেতৃত্ব দানকারী রণদক্ষ ও নির্ভীক রাজপুতদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে সচেষ্ট হন। সম্রাট আকবর ভারতে বিভিন্ন রাজপুত বংশের সাথে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপনে যত্নবান হন। তিনি সর্বপ্রথম অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। ১৫৬৩ সালে তিনি তীর্থযাত্রীদের ওপর অর্পিত কর এবং জিজিয়া কর ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। এর ফলে রাজপুতদের শুধু নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার ও স্থায়িত্বে রাজপুতদের সহায়তা লাভ সম্ভব হয়।
উদ্দীপকেও জনাব হায়দার আলী এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রভাবশালী পরিবারগুলোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তার কার্যালয়ে ঐ পরিবারের বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করেন। তাই বলা যায়, জনাব হায়দার আলী পদক্ষেপে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত পদক্ষেপ অর্থাৎ রাজপুত নীতি দ্বারা আকবর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে আমি মনে করি।
ঐতিহাসিকরা মনে করেন রাজপুতদের সাথে আকবরের উদার ব্যবহার তার উচ্চ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড বলেন, "এই নীতির ফলে রাজপুতদের অধিকাংশ সুনির্দিষ্টভাবে সম্রাটের অনুগত হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ৫০,০০০ অশ্বারোহী বাহিনীর সেবালাভের অধিকারী হয়েছিলেন।" ভি এ স্মিথ বলেন, "আকবরের বিভিন্ন পদক্ষেপ রাজপুতদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় এবং তারা বাবরের নিকট পরাজয়ের আঘাত সহজেই ভুলে যায়। বিদেশি নয় বরং আকবরকে 'জাতীয় নরপতি' হিসেবে মেনে নিয়ে রাজপুতরা মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে সহযোগিতা করে।"
রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের বন্ধুত্বমূলক মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। এর ফলে রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য শাসন-এর ব্যাপারে এবং এদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে রাজপুতদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে রাজপুতদের প্রতি উদার আচরণের দ্বারাই সম্রাট আকবর প্রজাদের সর্বজনীন আতিথ্য পেয়েছিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করেছিলেন। এ নীতির সূত্র ধরেই তিনি 'মহান' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট আকবর রাজপুত নীতির মাধ্যমে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৬৯ হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক।
শুধু থাক,
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল'। *[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. সৎনামী কারা? ১
খ. নাদির শাহ ভারত আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কেন? ২
গ. উল্লিখিত কবিতাংশটুকু কোন মুঘল সম্রাটের কথা মনে করিয়ে দেয়? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উল্লিখিত কবিতাংশটুকু উক্ত শাসকের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিক তুলে ধরে? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের পাতিয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সৎনামী নামে পরিচিত।

খ সুনিপুণ যোদ্ধা ও দক্ষ কূটনীতিবিদ পারস্য সম্রাট নাদির শাহ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের দৈন্যদশা সম্পর্কে অবহিত হয়েই ভারত আক্রমণ করেন।
সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কতিপয় দুর্বল শাসক (বাহাদুর শাহ, জান্দাহর শাহ, মুহাম্মদ শাহ, আহমদ শাহ, দ্বিতীয় শাহ আলম প্রমুখ) মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তারা ছিলেন অকর্মণ্য এবং সামরিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নাদির শাহ ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার দখল করেন। পরে গজনি ও কাবুল অধিকারের পর তিনি বিখ্যাত পানিপথের সন্নিকটে আসেন। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট

https://teachingbd24.com

মাহমুদ শাহ নাদির শাহকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সৈন্যের অভাব, রসদ ও সরঞ্জামের স্বল্পতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে তিনি পরাজিত হন।

গ উল্লিখিত কবিতাংশটুকু মুঘল সম্রাট শাহজাহানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীমনের মানুষ। স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান অপরিসীম। তার স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাজমহল সবচেয়ে বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তার নির্মিত এ স্থাপত্য শিল্পটি তাকে অমর করে রেখেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে সম্রাট শাহজাহানের এ স্থাপত্য কীর্তিরই উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত,

'এক বিন্দু নয়নের জল,

কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাংশ মুঘল সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি তাজমহলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি এ তাজমহল। সম্রাট তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধির ওপর জগদ্বিখ্যাত এ ইমারতটি নির্মাণ করেন। এটি শুধু মুঘল স্থাপত্য নিদর্শনই নয় বরং পত্নীপ্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও স্বীকৃত। বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগরের বাইশ বছরের পরিশ্রমের ফসল তাজমহলের স্বপ্নদ্রষ্টা সম্রাট নিজেই। এর মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন শিল্পী ইসফানদিয়ার রুমী এবং প্রধান স্থপতি ইরানের ওস্তাদ ঈসা সিরাজী। বাঙালি শিল্পী বলদে দাসও এর অন্যতম স্থপতি ছিলেন। মর্মর পাথরে নির্মিত তাজমহলকে ঐতিহাসিক হ্যাভেল, ভারতের 'ভেনাস দ্য মিলো' বলে অভিহিত করেছেন। আর উদ্দীপকে এ তাজমহলেরই গুণকীর্তন করা হয়েছে, যা মূলত মুঘলদের মধ্যে সবচেয়ে শিল্পানুরাগী সম্রাট শাহজাহানের নামটাই আমাদের মানসপটে সমুজ্জ্বল করে তোলে।

ঘ না, উল্লিখিত কবিতাংশটুকু উক্ত শাসকের অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিক তুলে ধরে না বলে আমি মনে করি।

মুঘল সম্রাট শাহজাহান ললিতকলা বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন, যা শুধু তার রাজত্ব কালকেই নয় প্রকারান্তরে মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতাংশে সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহলের কথা বলা হয়েছে, যা কোনোভাবেই সম্রাটের স্থাপত্যকীর্তির সার্বিক দিককে তুলে ধরে না। কেননা তাজমহল ছাড়াও স্থাপত্য শিল্পে তার আরও অনেক অবদান রয়েছে। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। রাজধানী আগ্রায় সম্রাট দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, শিশ মহল ইত্যাদি স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে দিওয়ান-ই-খাস ছিল সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য মন্ডিত এবং পাথরখচিত মার্বেলের তৈরি। বহু মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত দিল্লির জামে মসজিদ তার স্থাপত্য অনুরাগের একটি বিশেষ নিদর্শন। পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এটি শিল্পী বেবাদাল খানের তত্ত্বাবধানে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছর ধরে নির্মাণ করা হয়। এ সিংহাসনের স্বর্ণনির্মিত চারটি স্তম্ভের ওপর একটি কারুকার্য খচিত চন্দ্রাতপ রয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষে মুখোমুখি বসানো একজোড়া ময়ূর স্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, শুধু তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের সমগ্র স্থাপত্য শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ স্থাপত্য শিল্পে তার অবদান আরও অনেক বেশি। উদ্দীপকের কবিতাংশে তার স্থাপত্যকীর্তির আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৭০ জামাল সাহেব একটি বিশাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু উক্ত ইউনিয়নটির বেশিরভাগ এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত চরাঞ্চল। সেজন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের আনুগত্য ও সমর্থন লাভের জন্য তাদের সাথে এক ধরনের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে বিজয় কৃষ্ণকে নিয়োগ দেন। ফলে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে জনগণের সেবা করতে সক্ষম হন। */বিএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা/*

ক. বাবর শব্দের অর্থ কী? ১

খ. রাজমহলের যুদ্ধের উপর টীকা লিখ? ২

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের হিন্দুদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন্ সম্রাট আকবরের যে নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চেয়ারম্যান সাহেবের ন্যায় সম্রাট আকবরেরও এ ধরনের নীতি উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা— মূল্যায়ন কর। ৪

৭০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

খ ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই রাজমহলে মুঘল বাহিনী ও দাউদ খানের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেটিই ইতিহাসে রাজমহলের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

মুঘলদের নিকট নত স্বীকার করে দাউদ খান নতি স্বীকার করে কটক সন্ধি স্বাক্ষর করলেও অনেক আফগান নেতা এ চুক্তি মেনে নেননি। তারা বিক্ষিপ্তভাবে মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় মুনিম খান প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করলে সুযোগ বুঝে দাউদ খান সন্ধি ভঙ্গ করে বাংলা পুর্নদখল করেন। এ পরিস্থিতিতে সম্রাট আকবরের নির্দেশে মুঘল বাহিনী ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে দাউদ খানকে আক্রমণ করেন এবং দাউদ খান পরাজিত হলে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটে।

গ সৃজনশীল ৩১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩১ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭১ মুঘল যুগের একজন যুবরাজ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ভাইদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। বিভিন্ন কারণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত যুবরাজ তার যোগ্যতা, দক্ষতা, আত্মপ্রত্যয় অভিনব যুদ্ধ কৌশল এবং কূটনৈতিক মেধার দ্বারা জয়লাভ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি একজন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান ছিলেন তবে কখনই অন্য ধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ভারত পরিদর্শনে এসে বলেন "প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করত এবং নিজ নিজ ধর্ম পালন করত।" */শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ/*

ক. কোথাকার অধিবাসীরা মারাঠা নামে পরিচিত? ১

খ. ভারতবর্ষে সম্রাট নাদির শাহের আক্রমণ সম্পর্কে কী জান? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবই এর কোন মুঘল শাসকের মিল আছে? তার ধর্মীয় নীতি আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ৪

৭১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মারাঠা নামে পরিচিত।

খ সুনিপুণ যোদ্ধা ও দক্ষ কূটনীতিবিদ পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ১৭৩৮ সালে ভারত আক্রমণ করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় দুর্বল মুঘল শাসকের সুযোগ নিয়ে নাদির শাহ কান্দাহার, গজনি ও কাবুল অধিকার করে নেন। একপর্যায়ে মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে মুঘল বাহিনীর পরাজয় ঘটলে নাদির শাহ সিন্ধু, কাবুল ও পশ্চিম পাঞ্জাব অধিকার করে নেন।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মিল রয়েছে। তার ধর্মীয় নীতি মূলত সুন্নি ধর্মমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন। আওরঙ্গজেবের জীবনে ধর্ম বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। সমসাময়িক মুসলিম সমাজে তিনি 'জিন্দাপীর' কিংবা বাদশাহর ছদ্মবেশধারী' দরবেশ হিসেবে পরিগণিত। তিনি শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন করেছিলেন। উদ্দীপকেও আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে বলা হয়েছে। সম্রাট একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিতে পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করতেন সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তিনি ইসলাম ধর্মানুমোদিত বিধান জারি করেন। দরবারে প্রচলিত ইসলামের বিধি বিধান ও মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি বন্ধ করেন। তিনি ইসলামি আচার-আচরণ বিরোধী উৎসবাদি বন্ধ করেন। নওরোজ উৎসব ও রাজদরবারে নৃত্যগীত বন্ধ করেন। ঝারোকা দর্শন রহিত করা হয়। মুদ্রার উপর কালেমা অঙ্কন, রাজসভায় অনৈসলামিক জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা এবং মহররমের উৎসবে শরিয়ত গর্হিত কার্যকলাপ রহিত করা হয়। মদ ও মাদকদ্রব্য প্রস্তুত ও ব্যবহার, জুয়া খেলা এবং বিলাসী পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে আওরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মীয় নীতির অধীনে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মীয় নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের ব্যাপক অংশে চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন খাঁটি সুন্নী মুসলমান ও ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। শাসনব্যবস্থায় তিনি অনেক ধর্মীয় রীতিনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। যা তার ধর্মনীতি নামে খ্যাত।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে মুঘল যুগের একজন যুবরাজ গোঁড়া সুন্নি মুসলমান ছিলেন তবে কখনোই ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যে ধর্মনীতি প্রয়োগ করেন তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সামাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর মধ্যে সৎনামী বিদ্রোহ অন্যতম। বলা হয় আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাতিয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় বিদ্রোহ করেছিল। শিখদের নবম গুরু তেগ বাহাদুর ও সম্রাট প্রবর্তিত নীতি অমান্য করতে কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তাকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। এছাড়া এ সময় কৃষিজীবী জাঠ সম্প্রদায় গোকলা নামে এক জমিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল। তারা ছিল আত্মসচেতন। অনেকে মনে করেন হিন্দুদের প্রতি আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা বিদ্রোহ করেছিল। জাঠদের পাশাপাশি বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা রাজপুতরাও সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় সংস্কারে পিছনে হিন্দু বিদ্রোহ মূল কারণ না হলেও তার এ ধর্মীয় নীতি সবাই সানন্দে গ্রহণ করেনি। ফলে সামাজ্যের সর্বত্র এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

প্রশ্ন ▶ ৭২ বায়েজিদ ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিও তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তার সরলতা, উদারতা, নিখুঁত বিচার বুদ্ধি, মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রজাহিতৈষণা, ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সবাইকে মুগ্ধ করত। তিনি নিজে কবি শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তার মধ্যে কাব্য প্রবণতা দেখা দেয়। তিনি আত্মচরিতের জন্য উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করেন। তিনি তার বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক। *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ]*

ক. কোন শব্দ হতে মুঘল শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে? ১
খ. তাজমহল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বায়েজিদের 'দুর্ধর্ষ যোদ্ধা'- চরিত্রটির সাথে সম্রাট বাবরের চরিত্রের যোগসূত্র স্থাপন কর। ৩
ঘ. বাবরের আত্মজীবনী সাহিত্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক তথ্য ভান্ডার হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোজাল শব্দ হতে মুঘল শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে।

খ সৃজনশীল ৩১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বয়েজিদের 'দুর্ধর্ষ যোদ্ধা' চরিত্রটির সাথে সম্রাট বাবরের সুনিপুণ সমর কুশলতার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্রাট বাবর তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পিতৃরাজ্য ফারগানা ও বিজিত সমরখন্দ হতে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেও তিনি কখনো হতাশ হননি। অজেয় মনোবল, দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও নির্ভীক সাহসিকতার সাথে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। উদ্দীপকের বায়োজিদের ক্ষেত্রেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, বায়েজিদ্ ছিলেন একজন দুর্ধষ যোদ্ধা। তিনি তার বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক। যা মুঘল সম্রাট বাবরকেই নির্দেশ করে। তিনি ভারতে লোদি সুলতানদের পতন ঘটিয়ে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজ্যের দুর্গ, ভেরা, কুশাব, চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল, কান্দাহার লাহোর, দিপালপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এ সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাবরকে ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা একই শাসক গোষ্ঠীর পথ উন্মুক্ত করেছিল।

ঘ উক্ত আত্মজীবনী অর্থাৎ 'তুযুক-ই-বাবরী' সাহিত্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— উক্তিটি যথার্থ।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সম্রাট বাবরের সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুর্কি ভাষায় লিখিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুযুক-ই-বাবরী' বা বাবরনামা সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্যার-ই-গেনিস রস বাবরের আত্মজীবনীকে সর্বযুগের সাহিত্যের মনোমুগ্ধকর ও রোমাঞ্চকর সৃষ্টিগুলোর অন্যতম বলে মনে করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ মানুষ বাবর এবং সম্রাট বাবর সম্পর্কে সম্যক তথ্য আহরণ করতে পারেন।

এ গ্রন্থে সে যুগের আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাবর তার বর্ণনায় ভারতের শহর ও গ্রামগুলোকে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বলেছেন। পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, ঝরনা ও ফুলের বাগান শোভিত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ কাবুলের তুলনায় তিনি উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের সমভূমিকে বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেয়ে বলে বর্ণনা করেছেন। বাবরের রচিত আত্মচরিত এমন একটি উৎকৃষ্ট ও বাস্তবধর্মী সাহিত্য যে এটি পাঠ করলে পাঠকের সম্মুখে আসল ঘটনা ভেসে ওঠে। ঈশ্বরী প্রসাদ যথার্থই বলেছেন 'পূর্বদেশীয় কোনো নৃপতিই বাবরের ন্যায় এরূপ সুস্পষ্ট মনোমুগ্ধকর এবং সত্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী রচনা করেননি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী 'তুযুক-ই-বাবরী' ভারতবর্ষের এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল।

প্রশ্ন ▶ ৭৩ ফারুক শাহ অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় তিনি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বংশের প্রায় ৩০০ বছরের শাসনকালের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য স্বীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থায় নতুন রীতি নীতি প্রবর্তন করেন। ভূমি মালিকানায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত হয়ে আছেন হাজার কি. মি. এর অধিক দৈর্ঘ্যের একটি রাস্তা তৈরির জন্য। *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ]*

ক. সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতার নাম কী? ১
খ. দিল্লীর লালকেল্লার অভ্যন্তরের স্থাপত্যগুলো সম্পর্কে কী জান- সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকের ফারুক শাহের সাথে তোমার পঠিত শাসকের সংস্কার সম্পর্কে লেখ। ৩
ঘ. অসাধারণ সব জনকল্যাণমূলক কাজ ও প্রশাসনিক রীতি নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প সময়ের উক্ত শাসক ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন– পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

https://teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের পিতার নাম মির্জা গিয়াস বেগ।

খ মুঘল সম্রাট শাহজাহান দিল্লির অদূরে শাহজাহানবাদে লাল কেল্লা নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এ দুর্গের অভ্যন্তরে দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস ও মমতাজমহল নামে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তবে এসব ইমারতের মধ্যে দিউয়ান-ই-খাস ছিল সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত বহু মূল্যবান পাথর খচিত সার্কেলের তৈরি। এই ইমারতটিকে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের ঐশ্বর্য ও খ্যাতির মূর্ত প্রতীক হিসেবে গণ্য করা যায়। সম্রাট একে ভূ-স্বর্গ মনে করতেন।

গ উদ্দীপকের ফারুক শাহের সাথে আমার পঠিত শেরশাহের ক্ষমতা দখল, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও জনকল্যাণমূলক কাজের মিল রয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন অনেক শাসকের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা নিজেদের দক্ষতা বলে শূন্য থেকে শুরু করে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। আবার অনেকে ক্ষমতায় এসে অল্প সময় শাসন করলেও তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পৃথিবীতে তাদেরকে অমর করে রাখে। উদ্দীপকের ফারুক শাহ বা আমার পাঠ্যবইয়ের শেরশাহের মধ্যেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, ফারুক শাহ নিজের যোগ্যতায় প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করে তাদের ৩০০ বছরের শাসনকালের মধ্যে সাময়িক সময়ের জন্য স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে শেরশাহও নিজ যোগ্যতা দক্ষতা বলে মুঘল সম্রাট হুমায়নকে পরাজিত করে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এর ফলে মুঘলদের প্রায় ৩৩০ বছরের শাসনামলের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরের জন্য নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আবার ফারুক শাহ তার শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নতুন রীতিনীতি প্রবর্তন করেন এবং হাজার কি.মি. দৈর্ঘ্যের একটি রাস্তা তৈরি করেন। ঠিক একইভাবে শেরশাহ তার শাসনামলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কতগুলো কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আইনের শাসন বলবৎ রাখা জননিরাপত্তা বিধান এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা জোরদার করেন। এছাড়া তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামের ১৫০০ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণ করেন।

ঘ অসাধারণ সব জনকল্যাণমূলক ও প্রশাসনিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প সময়ের উক্ত শাসক ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছেন— উক্তিটি যথার্থ।

পৃথিবীতে এমন অনেক শাসকের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা খুব অল্প সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতায় থেকেও তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তারা তাদের শাসনামলে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও জনগণের কল্যাণ সাধন করেছিল। এমনই একজন শাসক হলেন শেরশাহ। তিনিও তার স্বল্পকালের শাসনামলে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করেন এবং প্রশাসনিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকের ফারুক শাহের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রশাসনিক রীতিনীতির প্রবর্তন ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। অনুরূপভাবে শেরশাহও তার মাত্র পাঁচ বছরের শাসনকালে অসাধারণ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ সাধন, শুল্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অসহায় দুস্থদের সাহায্যদান ও লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। এছাড়া সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত করেন। সুলতানি যুগের প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করে তিনি তার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি এবং তাদের মধ্যে স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে তিনি সরকারি কর্মচারীদের বদলির নীতি গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহ জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক রীতিনীতির প্রবর্তনের জন্য একজন অনন্য শাসকের কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ৭৪ সম্রাট 'ক' ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। তিনি সব ধর্মের সর্বজনীনতায় ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সব ধর্মের সার নিয়ে ভারতের বুকে X নামক একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। বস্তুত এটি স্বতন্ত্র ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই সমীচীন। এ মতবাদে নামাজ, রোজা, হজ্জ, আযান প্রদান, দাড়ি রাখা, কুরআন ও হাদিস শিক্ষা ইত্যাদির কোন বিধান ছিল না। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*

ক. মমতাজমহল কে ছিলেন? ১

খ. পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লিখ। ২

গ. সম্রাট ক-এর X ধর্মের সাথে সম্রাট আকবরের কোন ধর্মনীতির সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি ছিল ইসলামের প্রতি হুমকি? উত্তরের স্বপক্ষের যুক্তি দাও। ৪

৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মমতাজমহল ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী।

খ সম্রাট আকবর ও বৈরাম খানের নেতৃত্বে ২,০০০ মুঘল সৈন্য হিমুর গতিকে রোধ করার জন্য ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ইতিহাসে সে যুদ্ধই পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এ যুদ্ধে হিমু পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আকবর দিল্লি ও আগ্রা দখল করে মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন এবং ভারতে দীর্ঘকাল স্থায়ী মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

গ উদ্দীপকে সম্রাট 'ক'-এর প্রবর্তিত ধর্মের সাথে সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-এলাহী' ধর্মমতের সামঞ্জস্য আছে।

সম্রাট আকবর ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। কবির, নানক, চৈতন্য প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের ন্যায় আকবরও সকল ধর্মের সর্বজনীনতায় ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক যিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তৎপর ছিলেন।

উদ্দীপকে সম্রাট 'ক' যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সব ধর্মের সার নিয়ে একটি সর্বজনীন ধর্মমত প্রবর্তন করেন একইভাবে মুঘল সম্রাট আকবরও সুলহি-ই-কুল নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে দীন-ই-এলাহী বা তৌহিদ-ই-ইলাহী (ঐশী একেশ্বরবাদ) নামক ভারতের বুকে একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সব ধর্মের উৎকৃষ্ট নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত এটি একটি সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম।" বস্তুত এটিকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম না বলে ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই সমীচীন। এই মতবাদের অনুসারীবৃন্দকে সম্রাটের নামে তাদের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম এই চারটি জিনিস উৎসর্গ করতে হতো। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী, সম্রাটকে সিজদাহ করতে হতো। তবে এ ধর্মমত মাত্র ১৮ জন গ্রহণ করেছিলেন। আর সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধর্মমতের বিলোপ ঘটে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি ছিল ইসলামের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

মূলত সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্মমতানুসারে সম্রাটের নামে সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম- এ চারটি জিনিস উৎসর্গ করা হতো এবং সম্রাটকে সেজদাহ দিতে হতো, যা ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এছাড়াও দীন-ই-এলাহী ধর্মমতের অনুসারীদের শূকর, কুকুর ইত্যাদি প্রতিপালন করতে এবং সিল্ক ও সোনালি কারুকার্যখচিত পোশাক পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করা হতো। এ মতবাদে নামাজ, রোজা, হজ, আজান প্রদান, দাড়ি রাখা, কুরআন ও হাদিস শিক্ষা করা ইত্যাদির অবকাশ ছিল না। ফলে এটি ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মমত। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, "আকবর তার

Teachingbd24.com

পূর্বপুরুষদের এবং প্রথম যৌবনের ধর্মের প্রতি তিক্ত বিরোধিতা প্রদর্শন করেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অবমাননা করেন।" দীন-ই-এলাহী ধর্মমতে বিশ্বাসীগণকে মৃত্যুর পূর্বেই পাথেয় সংগ্রহের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতে হতো। এটি ছিল, ইসলামের পরিপন্থি। তথাপি এ ধর্মের অনুসারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে তারা আসসালামু আলাইকুম না বলে 'আল্লাহ আকবর' এবং প্রত্যুত্তরে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' না বলে 'জাল্লা জালালুহু' বলতেন, যা ছিল ইসলাম ধর্মের অবমাননার শামিল।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্মমত ছিল ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রশ্ন ▶ ৭৫ সম্রাট আমানত মোহম্মদ মুসার রাজত্বকাল ছিল মাত্র ৫ বছর। তার সাম্রাজ্য ছিল সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরপুর। দান দাক্ষিণ্যে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত, বিদ্বান ও পণ্ডিতদের তিনি নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করতেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য এবং শিক্ষকদের আলাদা বেতন কাঠামো প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। তার আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*

ক. বাবর শব্দের অর্থ কী? ১
খ. পানি পথের প্রথম যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়েছিল? ২
গ. সম্রাট আমানত মোহাম্মদ মুসার কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার পঠিত শাসকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি আধুনিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাবর শব্দের অর্থ সিংহ।

খ সম্রাট বাবরের দিল্লি সাম্রাজ্যকে নিজের হস্তগত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে দিল্লির শাসনকর্তা ইব্রাহিম লোদি এবং বাবরের মধ্যে পানি পথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
বাবর নিজ মাতৃভূমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দেন তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য। এছাড়াও ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দৌলত খান লোদী, আলম খান এবং অপরাপর আফগান প্রাদেশিক শাসকরা বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আহ্বান জানালে বাবর অনতিবিলম্বে ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। যার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।

গ সৃজনশীল ৪৯ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭৬ হাসান 'চ' রাজ্যের রাজা নির্বাচিত হন। রাজা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্যে পরিচালনা করেন। তার দীর্ঘ ১০ বছর শাসনামলে রাজ্যের সমৃদ্ধি চরম পর্যায়ে পৌছে। রাজনীতিবিদ, সমরকুশলী ও ধর্মভীরু হাসান শেষে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। বিদ্রোহ দমন করে ঐক্য ও নিরাপত্তা কায়েম করে এবং সীমানা সম্প্রসারণ করেন। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*

ক. বারো ভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন? ১
খ. দাউদ শাহ কররানী কে ছিলেন? ২
গ. উদ্দীপকের রাজা হাসান শেখের মধ্যে বাংলার কোন সুবেদারের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়? উক্ত সুবেদার আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা বিবরণ দাও। ৩
ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত সুবেদারের রাজত্বকালের বর্ণনা কর। ৪

৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান।

খ দাউদ খান কররানী ছিলেন বঙ্গের শেষ স্বাধীন আফগান শাসক।
দাউদ খান কররানী আকবরের আনুগত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন। ১৫৭৬ সালের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে রাজা টোডরমল তাকে পরাজিত ও নিহিত করে বাংলায় মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
দাউদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশের ইতিহাসে আফগান যুগ শেষ হয়।

গ উদ্দীপকের রাজা হাসান শেখের মধ্যে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়।
মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। বাংলার সুবেদার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালের তার অন্যতম কৃতিত্ব ছিল দুর্ধষ মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে দক্ষিণ বাংলাকে রক্ষা করা। তার সময় বাংলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চরম শিখরে উন্নিত হয়। যা উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকের হাসান 'চ' রাজ্যের রাজা নির্বাচিত হয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার দীর্ঘ ১০ বছরের শাসনামলে রাজ্যের সমৃদ্ধি চরম পর্যায়ে পৌছে। শায়েস্তা খানের সুদীর্ঘ ৩০ বছরের শাসনামলেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি তার শাসনামলে বাংলার অর্থনীতি ও কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেন। জনহিতকর কাজের জন্য তিনি শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শায়েস্তা খানের আমলে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এ সময় বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করতেন। সুতরাং সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতির পরিচয় বহন করেন।

ঘ উদ্দীপকের আলোচিত সুবেদার হলেন বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান।
একজন দক্ষ সুবাদার হিসেবে শায়েস্তা খানের নাম সর্বজন স্বীকৃত। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শি শাসক। কুচবিহার, ত্রিপুরা, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে মুঘল শাসক প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি তিনি সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে হাসান একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, সমরকুশলী শাসক।তিনি তার রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণে অবদান রাখেন। যা শায়েস্তা খানের সুদীর্ঘ রাজত্বকালেও পরিলক্ষিত হয়। মীর জুমলার পর আওরঙ্গজেব কর্তৃক শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি ত্রিশ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। জয়ধ্বজের মৃত্যুর পর চক্রধ্বজ ক্ষমতায় এসে আসাম কামরূপ পুনঃদখল করেন। মুঘল বাহিনী তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল পুর্নদখলে ব্যর্থ হলেও শায়েস্তা খান ঐ অঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধিতে সক্ষম হন। তিনি নৌশক্তি বৃদ্ধি করে আরাকানের মগ পর্তুগিজ জলদস্যুদের ক্ষমতা খর্ব করেন। সন্দীপ দখল করে নেন। তার রাজত্বকালেই আরাকান রাজ্য থেকে চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়। তার রাজত্বকালেই বাংলা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চরম সীমায় পৌছায়। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুবাদার শায়েস্তা খানের রাজত্বকালকে সফল বলা যায়।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৩: ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসন (১৫২৬—১৮৫৮ খ্রি.)

১২৮. মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কে? (জ্ঞান)
ক সম্রাট বাবর খ সম্রাট হুমায়ুন
গ সম্রাট আকবর ঘ সম্রাট জাহাঙ্গীর ক

১২৯. বাবরের প্রকৃত নাম কী? (জ্ঞান) [সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]
ক সিরাজউদ্দীন মুহাম্মদ
খ জহির উদ্দীন মুহাম্মদ
গ আজম উদ্দীন মুহাম্মদ
ঘ সগীর উদ্দীন মাহমুদ খ

১৩০. বাবর কোন ভাষার শব্দ? (জ্ঞান)
ক ফার্সি খ উর্দু
গ পর্তুগিজ ঘ তুর্কি ঘ

১৩১. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৫২৯ খ ১৭২৯
গ ১৫২৬ ঘ ১৭৭৬ গ

১৩২. মেওয়াটের রাজধানীর নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক গাজিপুর খ কালি
গ হাওড়া ঘ আলওয়ার ঘ

১৩৩. "খানুয়ার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ ছিল"— এটি কার উক্তি? (জ্ঞান)
ক আর.সি.মজুমদারের
খ কে কে দত্তের
গ ঈশ্বরী টোপার ঘ ঈশ্বরী প্রসাদের ঘ

১৩৪. আইন-ই-আকবরীর রচয়িতা কে? (জ্ঞান) [সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা]
ক আকবর খ টোডরমল
গ আবুল ফজল ঘ বীরবল গ

১৩৫. কোন শাসক ভারতবর্ষে প্রথম কামানের ব্যবহার করেন? (জ্ঞান) [শাহ্ মখদুম কলেজ, রাজশাহী]
ক সেকেন্দার আলী খ বাবর
গ হুমায়ুন ঘ আকবর খ

১৩৬. খানুয়ারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় কে? (জ্ঞান) [পার্বতীপুর আদর্শ ডিগ্রী কলেজ, দিনাজপুর]
ক রানা সংগ্রাম সিংহ খ রানা প্রতাপ সিংহ
গ রানা জয় সিংহ ঘ রানা উদয় সিংহ ক

১৩৭. সম্রাট হুমায়ুনের সময় বাংলার সুলতান কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মুজাফফর খান খ টোডরমল
গ শাহ সুজা ঘ নুসরাত শাহ ঘ

১৩৮. 'চৌসার যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়? (অনুধাবন)
ক জাহাঙ্গীর কুলীর বিদ্রোহ দমনে
খ শের খানকে দমন করার জন্য
গ মাহমুদ লোদীকে পরাজিত করার জন্য
ঘ ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করার জন্য খ

১৩৯. ফরিদকে 'শের খান' উপাধি প্রদান করেন কে? (জ্ঞান)
ক ইব্রাহিম লোদী খ দেলোয়ার খান
গ মাহমুদ খান ঘ বাহার খান ঘ

১৪০. কেন্দ্রীয় শাসন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শেরশাহ কতজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন? (জ্ঞান) [রাজশাহী মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ]
ক ৬ জন খ ৮ জন
গ ১০ জন ঘ ৪ জন ঘ

১৪১. গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান) [মো: ছুফিউল্লাহ, অনু-৭]
ক শেরশাহ খ আকবর
গ মুহম্মদ বিন তুঘলক ঘ জাহাঙ্গীর ক

১৪২. 'লা-ই-কুহনা মসজিদ' কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
ক আকবর খ শেরশাহ
গ আওরঙ্গজেব ঘ জাহাঙ্গীর খ

১৪৩. 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? (জ্ঞান)
ক সোনারগাঁও হতে সিন্ধু অববাহিকা পর্যন্ত
খ আগ্রা হতে বুরহানপুর পর্যন্ত
গ লাহোর হতে মুলতান পর্যন্ত
ঘ আগ্রা হতে দিল্লি পর্যন্ত ক

১৪৪. শাহবাজ খান কে ছিলেন? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক আকবরের সেনাপতি খ বৈরাম খানের শিষ্য
গ বাবুরের সেনাপতি ঘ মুঘল সম্রাট ক

১৪৫. ফতেহপুর সিক্রিতে ইবাদাত খানা নির্মাণ করেন কে? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক আকবর খ বাবুর
গ শাহজাহান ঘ আওরঙ্গজেব ক

১৪৬. মনসবদারি প্রথা কে প্রবর্তন করেন? (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫]
ক সম্রাট বাবুর খ সম্রাট হুমায়ুন
গ সম্রাট আকবর ঘ সম্রাট জাহাঙ্গীর গ

১৪৭. 'রাসনী আন্দোলনের' সূত্রপাত-কোথায় ঘটে? (জ্ঞান)
ক ইরাকে খ ইরানে
গ সিরিয়ায় ঘ আফগানিস্তানে ঘ

১৪৮. কেন পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? (অনুধাবন)
ক বৈরাম খানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে
খ হিমুর জিঘাংসাপূর্ণ মনোভাবে
গ আবুল ফজলের প্ররোচনায়
ঘ ফৈজীর যুদ্ধংদেহী মনোভাবে খ

Teachingbd.com

১৪৯. রাজমহলের যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়? (অনুধাবন)
ক দাউদ খানের সন্ধি ভঙ্গ করায়
খ দাউদ খান উপঢৌকন প্রদান না করায়
গ দাউদ খান সৈন্য অপসারণ না করায়
ঘ দাউদ খান মুঘলদের রসদ সরবরাহ না করায় ক

১৫০. কাকে 'A child of many prayers' বলা হয়? (জ্ঞান)
ক সম্রাট আকবরকে খ সম্রাট হুমায়ুনকে
গ সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ঘ সম্রাট বাবরকে গ

১৫১. জাহাঙ্গীর শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ভুবন বিজয়ী খ পৃথিবীর ছায়া
গ পৃথিবীর আলো ঘ পৃথিবীর অভিশাপ ক

১৫২. কার রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলার উন্মেষ ঘটে? (জ্ঞান) [নজিপুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ]
ক সম্রাট হুমায়ুন খ সম্রাট আকবর
গ সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ সম্রাট শাহজাহান গ

১৫৩. ভারতীয় সাহিত্যের 'অগাস্টাস যুগ' বলা হয় কোন আমলকে? (জ্ঞান)
ক সম্রাট শাহজাহানের আমল
খ সম্রাট আকবরের আমল
গ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল
ঘ সম্রাট হুমায়ুনের আমল গ

১৫৪. কেন সম্রাট জাহাঙ্গীরকে 'A child of many prayers' বলা হতো? (অনুধাবন)
ক অনেক সুন্দর ছিলেন বলে
খ জাদুবিদ্যা জানতেন বলে
গ যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলে
ঘ অনেক সাধনার ফলে তার জন্ম হয়েছে বলে ঘ

১৫৫. কেন সম্রাট জাহাঙ্গীর 'Bell of Justice' টানিয়ে দেন? (অনুধাবন)
ক নামাযের সময় জানতে
খ রাজকীয় ফরমান ঘোষণা করতে
গ নিরীহ প্রজাদের অভিযোগ শুনতে
ঘ রাজস্ব আদায়ের খোঁজ খবর নিতে গ

১৫৬. তাজমহল কী? (জ্ঞান) [সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]
ক স্মৃতিসৌধ খ সমাধি সৌধ
গ সমাধি স্তম্ভ ঘ মিনার খ

১৫৭. কোন সম্রাটকে The Prince of Builders আখ্যা দেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান) [সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]
ক সম্রাট হুমায়ুন খ সম্রাট আকবর
গ সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ সম্রাট শাহজাহান ঘ

১৫৮. সমাট শাহজাহানের প্রাথমিক জীবনের অন্যতম যোগ্যতা ছিল— (অনুধাবন)
ক সাহসিকতা খ মদ্যপায়িতা
গ বিলাসিতা ঘ হেরেমপ্রিয়তা ক

১৫৯. লাল কেল্লা দুর্গ কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান) [ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]
ক সম্রাট জাহাঙ্গীর খ সম্রাট আকবর
গ সম্রাট শাহজাহান ঘ সম্রাট আওরঙ্গজেব গ

১৬০. কোন মুঘল সম্রাটকে জিন্দাপীর বলে আখ্যায়িত করা হয়? (জ্ঞান)
ক সম্রাট আওরঙ্গজেব খ সম্রাট আকবর
গ সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ সম্রাট শাহ আলম ক

১৬১. দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা কে ছিলেন? (জ্ঞান) [চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]
ক জালাল উদ্দিন খ খাওয়ারিজম
গ সুলতান মাহমুদ ঘ চেঙ্গিস খান ঘ

১৬২. শিবাজী কোন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? (জ্ঞান) [সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]
ক গণপতি খ ছত্রপতি
গ কোটিপতি ঘ দলপতি খ

১৬৩. মুঘল আমলে প্রজাদের প্রধান উপজীবিকা কী ছিল? (জ্ঞান)
ক কৃষি খ ব্যবসা
গ চাকরি ঘ শিক্ষকতা ক

১৬৪. কেন সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন? (জ্ঞান)
ক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায়
খ সম্মান বৃদ্ধিতে
গ উপঢৌকন প্রাপ্তিতে
ঘ উৎকোচ লাভের আশায় ক

১৬৫. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের অন্যতম কারণ কী? (অনুধাবন)
ক ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য স্বল্পতার জন্য
খ বাবরের বিশাল সৈন্য বাহিনীর জন্য
গ বাবরের অসীম বীরত্বের জন্য
ঘ ইব্রাহিম লোদীর ভুল সিদ্ধান্তের জন্য গ

১৬৬. হুমায়ুন অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক কপালি খ ভাগ্যবান
গ নিয়তি ঘ খুশ নসিব খ

১৬৭. শের খান কোন যুদ্ধে জয়ী হয়ে 'শেরশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক চৌসার যুদ্ধে খ কনৌজের যুদ্ধে
গ মান্দাসোর যুদ্ধে ঘ রাজমহলের যুদ্ধে ক

১৬৮. মনসব শব্দের অর্থ কী?
ক পদমর্যাদা খ প্রদেশ
গ সরকার ঘ সিংহাসন ক

১৬৯. সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি? (জ্ঞান)
ক তাজমহল খ ময়ূর সিংহাসন
গ মতি মসজিদ ঘ শীষমহল ক

Teachingbd.com

১৭০. নিচের '?' চিহ্নিত স্থানে উত্তরটি হবে— (প্রয়োগ)

i. গোগরার যুদ্ধ
ii. খানুয়ার যুদ্ধ
iii. ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১৭১. শেরশাহ জমি জরিপব্যবস্থা করেছিলেন— (অনুধাবন)

i. ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ii. অন্যায় নির্মূলে
iii. আনুগত্য প্রতিষ্ঠায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৭২. সুলহ্-ই-কুল প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন) [সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]

i. হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করা
ii. হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নাগরিক বৈষম্য দূর করা
iii. হিন্দুদের সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচার দূর করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i,ii ও iii **ঘ**

১৭৩. সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্বপূর্ণ ছিল— (অনুধাবন)

i. শিল্প সংস্কৃতির ধারণ
ii. নিপুণ সমরনেতা
iii. অন্যতম বিজেতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৭৪. সম্রাট শাজাহান বিখ্যাত হয়ে আছেন— (অনুধাবন) [কুমিল্লা মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ]

i. তাজমহলের কারণে
ii. পর্তুগিজদের দমনে
iii. ময়ূর সিংহাসন নির্মাণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৭৫. তাজমহল নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন) [সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]

i. প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিকে অমর করে রাখা
ii. শাহ্জাহানের রাজত্বের জাঁকজমক প্রকাশ করা
iii. মুঘল স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i,ii ও iii **গ**

১৭৬. সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে— (অনুধাবন) [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

i. রাজকোষে আর্থিক সংকট দেখা দেয়
ii. দাক্ষিণাত্যে সামরিক দুর্বলতা দেখা দেয়
iii. মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও iii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৭৭. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে কাজ করেছে— (অনুধাবন)

i. শিয়াদের বিরোধিতা
ii. সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা
iii. আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৭৮. সম্রাট বাবর তাঁর নামের সার্থকতা প্রমাণ করেন— (অনুধাবন)

i. সিংহের ন্যায় তেজ দ্বারা
ii. বাঘের ন্যায় তেজ দ্বারা
iii. সাহসিকতা দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৭৯. চৌসার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল— (অনুধাবন)

i. শের খানের বিদ্রোহের জন্য
ii. হুমায়ুনের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার জন্য
iii. জামান মির্জার অবরোধের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৮০. শেরশাহের অন্যতম সংস্কার হচ্ছে— (অনুধাবন)

i. ভূমি জরিপের ব্যবস্থা
ii. আশরাফি নামক স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন
iii. Branding of Horse System চালু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

উদ্দীপকটি পড়ে ১৮১ ও ১৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মঙ্গোল সেনাপতি চেংগিস খান তার সেনাবাহিনীকে পিরামিডের ন্যায় ক্রম ধাপে বিন্যস্ত করে পদ ও মর্যাদার বিভিন্ন ধাপ সৃষ্টি করেন। কেননা সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরে আনার জন্য এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। [জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ]

১৮১. উদ্দীপকে চেংগিস খানের সামরিক ব্যবস্থার সাথে কোন মুঘল সম্রাটের সামরিক ব্যবস্থার মিল আছে? (অনুধাবন)
ক বাবুর খ হুমায়ুন
গ আকবর ঘ শাহজাহান গ

১৮২. উদ্দীপকে বর্ণিত সামরিক ব্যবস্থা মুঘল আমলে কী নামে পরিচিত ছিল? (অনুধাবন)
ক ইকতা খ জায়গির
গ খালসা ঘ মনসবদারি ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ১৮৩ ও ১৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বর্তমান সরকার এল.জি.এস.পি প্রোগ্রামের আওতায় গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটি ইউনিয়নের আওতাধীন গ্রামগুলোকে একটি আলাদা আলাদা প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেছেন। ফলে একদিকে গ্রামগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমেও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে: [সকল বোর্ড ২০১৫]

১৮৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কোন শাসক গ্রহণ করেছিলেন?
ক ফিরোজ শাহ খ শেরশাহ
গ ইব্রাহিম খাঁ ঘ ইসলাম খাঁ খ

১৮৪. উক্ত শাসকের এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল—
i. সুষ্ঠ শাসন প্রণয়ন
ii. জনমঙ্গল সাধন
iii. আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ১৮৫ ও ১৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সিংহাসন আরোহণ করে ইব্রাহিম মাহমুদ তার সাম্রাজ্যে মুদ্রার অব্যবস্থাপনা দূর করার জন্য রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মানের মুদ্রা চালু করেন। [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]

১৮৫. উদ্দীপকের ইব্রাহিম মাহমুদের কর্মকাণ্ডের সাথে মুঘল যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য আছে? (প্রয়োগ) [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক বাবর খ হুমায়ূন
গ শেরশাহ ঘ আকবর গ

১৮৬. বিভিন্ন মানের মুদ্রার মধ্যে ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা) [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. আধুলি ii. সিকি
iii. পাঁচ সিকি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৭ ও ১৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-
বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীর লোক বসবাস করলেও বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন লোকজ অনুষ্ঠানগুলো তারা একসাথে মিলেমিশে পালন করে। রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান প্রত্যেক ধর্মের-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন। এতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আরও সুদৃঢ় হয়। [সকল বোর্ড ২০১৫]

১৮৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্প্রীতির এ সম্পর্কটি কোন মুঘল সম্রাটের সময়ে বেশি দেখা গিয়েছিল? (অনুধাবন)
ক সম্রাট বাবুর খ সম্রাট আকবর
গ সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ সম্রাট আওরঙ্গজেব খ

১৮৮. উক্ত সম্রাটের কাজের মাধ্যমে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. তার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়
ii. শাসন কাজে হিন্দুদের প্রাধান্য পায়
iii. ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

উদ্দীপকটি পড়ে ১৮৯ ও ১৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম অন্য একটি ইউনিয়নের এক মেম্বারের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী ফিরোজাকে বিবাহ করেন। ফিরোজা অত্যন্ত সুন্দরী ও মহিয়সী হওয়ায় চেয়ারম্যান তাঁর ক্রীড়নকে পরিণত হন। ফিরোজাই ইউনিয়নের সকল কাজকর্ম পরোক্ষভাবে পরিচালনা করতে থাকেন।

১৮৯. ফিরোজার মিল রয়েছে ইতিহাসের কোন নারীর সাথে? (প্রয়োগ)
ক সুলতান রাজিয়ার খ মমতাজ মহলের
গ জেবুন্নেসার ঘ নূরজাহানের ঘ

১৯০. উক্ত নারী পারদর্শিনী ছিলেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অশ্বারোহণে
ii. অসি চালনায়
iii. রণকৌশলে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

Teachingbd.com

অধ্যায়-৪: বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

প্রশ্ন ▶ ১ উত্তর আফ্রিকার সুদানে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবত চলে। অবশেষে ঔপনিবেশিক শাসকেরা সুদান শাসনের জন্য সুদানের জনগণকে দু'টি শিবিরে বিভক্ত করেন। *[চা. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭; নেবিহার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত? ১
খ. 'দ্বৈত শাসন' কী? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের উক্ত ঘটনার ফলাফল মূল্যায়ন করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কলকাতায় অবস্থিত।

খ ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলা প্রদেশকে শাসন করার যে নীতি গ্রহণ করে, তা-ই 'দ্বৈত শাসন' নামে পরিচিত।
দ্বৈত শাসন হলো দুইজনের শাসন। এ ব্যবস্থায় বাংলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নবাবের ওপর। অন্যদিকে বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমি-জমার বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, আর নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। লর্ড ক্লাইভের বাংলা শাসনের এ অভিনব নীতিই 'দ্বৈত শাসন' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত ব্রিটিশ শাসনামলের ঐতিহাসিক ঘটনা বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।
ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশ শাসকদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বঙ্গভঙ্গ। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত সুদানের জনগণকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করার মধ্যে তার এ কর্মকাণ্ডেরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে থাকা সুদানকে শাসন করার জন্য এক সময় ঔপনিবেশিক শাসকেরা এ অঞ্চলের জনগণকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে। একইভাবে লর্ড কার্জন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় হয়ে এসে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। কারণ বাংলা প্রদেশ ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ কোটি। ফলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিত। এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় আর্থ-সামাজিক সুবিধাটি নিশ্চিত করা এবং ব্রিটিশদের Divide and Rule Policy-এর বাস্তবায়ন করার জন্য এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নস্যাৎ করার জন্য লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে দুটি প্রদেশে রূপান্তরিত করেন, যা বঙ্গভঙ্গ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদাহ জেলাসহ) এবং আসাম নিয়ে 'পূর্ব-বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় এবং এর শাসনভার অর্পণ করা হয় স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের ওপর। কলকাতাকে রাজধানী করে অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য অংশ নিয়ে 'বঙ্গ প্রদেশ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত সুদানের জনগণকে দুটি শিবিরে ভাগ করার সাথে ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গভঙ্গের ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বঙ্গভঙ্গের ফলে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।
বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সামাজিক মর্যাদা ফিরে পায় এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম তথা সার্বিক দিকে প্রগতি নিশ্চিত করার শুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে, যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।
ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গ প্রদেশকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত করা হলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মুসলমান সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সমর্থন জানালেও কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকে। কারণ বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হলো 'মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা'। তাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ তারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনে স্বদেশি আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে থাকে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও হিন্দুদের প্রচণ্ড বিরোধিতায় ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে। দিল্লির রাজদরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর তারা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে দুই বাংলাকে আবার একত্র করে।
সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা কিছুটা লাভবান হলেও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরে। উভয়ের মধ্যে সন্দেহ, রেষারেষি মারাত্মক পর্যায়ে রূপ নেয়। এ বৈরী সম্পর্কের রেশ ধরেই এক সময় তারা আলাদা হয়ে যায়।

প্রশ্ন ▶ ২ পবিত্র হজ পালনের জন্য জনাব হারুন সাহেব সৌদি আরব গমন করেন। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে সেদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার-আচরণ তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। দীর্ঘদিন সেদেশে অবস্থান করে তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন। স্বদেশে ফিরে এসে দেখেন, মানুষ নানাবিধ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে লিপ্ত। এক শ্রেণির মানুষ মাজারে গিয়ে মানত করছে, সেজদা করছে, পিরের মুরিদ হয়ে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত আছে। এহেন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড তাকে মর্মাহত করে। তিনি ঐ সকল বিপথগামী মুসলমানদের ইসলামের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। *[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭]*

ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোন সালে গঠিত হয়? ১
খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মতো উক্ত আন্দোলনও তৎকালীন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল।'— বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ সালে গঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ১নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে হাজি শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।
ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফরায়েজি আন্দোলন ছিল অন্যতম। ইসলামের নানা অনৈসলামিক রীতিনীতি বন্ধকরণ এবং মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে হাজি শরীয়তুল্লাহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কার ও নীতিবর্জিত কার্যকলাপ বন্ধের জন্য এ আন্দোলনের সূচনা করেন। উদ্দীপকের হারুন সাহেবের কর্মকাণ্ডেও এ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের হারুন সাহেব সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসে দেশের জনগণের মধ্য থেকে নানা কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দূরীকরণের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। একইভাবে হাজি শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান কবরপূজা, পিরপূজা, উরস, মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি লক্ষ করেন যে, নতুন সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি কর্তৃক মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার হন। হিন্দুদের পূজায় ও জমিদার সন্তানদের বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দিতে হতো। এমনকি মুসলমানদের দাড়ি রাখার ওপর কর ধার্য করা হয়। এসব দেখে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সংগঠিত করেন, যা ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের হারুন সাহেবের ধর্মীয় আন্দোলনে বাংলার ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের সংস্কার আন্দোলনের মতো উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন ও তৎকালীন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে, আমরা দেখতে পাই যে, হারুন সাহেব নিজ দেশের মুসলমানদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দেখে মর্মাহত হন। তিনি বিপথগামী মুসলমানদের ইসলামের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে হাজি শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের ফলেও তৎকালীন মুসলিম সমাজে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়।

হাজি শরীয়তুল্লাহ ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক নেতা এবং সর্বোপরি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তিনি লক্ষ করেন যে, বাংলার মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতিতে আচ্ছন্ন। তাছাড়া জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারেও মুসলমানদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। এ পরিস্থিতিতে শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনের ফলে তৎকালীন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তার এ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। এ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যকার নানা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ফরায়েজিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয় এবং সমাজে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ যখন কুসংস্কার এবং ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতদুষ্ট বিচার ব্যবস্থায় নিমজ্জিত, ঠিক সেই ক্রান্তিকালে হাজি শরিয়তুল্লাহ গড়ে তোলেন ফরায়েজি আন্দোলন। এটি তৎকালীন সময়ে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৩ চাকলা রোশনাবাদ পরগনার রাজা মানিক্য বাহাদুর শাসন পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধায় সম্মুখীন হন। সমতলে সাধারণ বাঙালি, কৃষক, প্রজা, পাহাড়ি ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতি প্রজার বসবাস। একদিকে হিন্দু, মুসলিম ও পাহাড়িদের ধর্মীয় বিরোধ, অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী প্রজার জমিদারি প্রথা বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন তাকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে। জমিদারবিরোধী আন্দোলন প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে প্রজাদের ধর্মীয় বিরোধে প্রণোদনা দেন। এতে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রকট হলে, তিনি পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। একদল মানুষ তার পরগনা বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেক দল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। পরিশেষে তিনি পরগনা ভাগের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন।

[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭]

ক. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি কেন গঠন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপের প্রতিও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে জনমত তৈরি এবং তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরে তা পূরণের চেষ্টা করা হতো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বঙ্গভঙ্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের একটি চিরায়ত নীতি হলো ভাগ কর ও শাসন কর নীতি। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তারা শাসনাধীন অঞ্চলকে ভাগ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করত। এভাবে তাদের অন্যায় শাসনকে আরও স্থায়ী করার চেষ্টা চালাত। উদ্দীপকেও ব্রিটিশদের এমনই একটি কর্মকাণ্ড তথা বঙ্গভঙ্গের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের চাকলা রোশনাবাদ পরগনার রাজা মানিক্য বাহাদুর শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের জমিদার বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ বিরোধ প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ উস্কে দিয়ে পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হয়। বিশ শতকের শুরুতে ভারতে সে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। তাই ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট, কংগ্রেস ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিপত্য ধ্বংস করে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। আর উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপ অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের প্রতিও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র— উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, চাকলা রোশনাবাদ পরগনার রাজা মানিক্য বাহাদুর তার অধিভুক্ত পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। একদল মানুষ এ বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেকদল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ঠিক একইভাবে ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেও বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাংলার মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। কেননা, এর মধ্যে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি এবং একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। হিন্দুদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের মুখে সরকার যেন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না করে সে জন্য মুসলিম লীগসহ নানা সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দুসমাজ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র ও নেতিবাচক। পুঁজিপতি, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, জমিদার স্বার্থরক্ষায় এবং জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাছাড়া হিন্দুরা মনে করেছিলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমান জনগণের রাজত্ব হবে, আর বাঙালি হিন্দুরা হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হচ্ছে 'মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা'। এ সকল কারণে বঙ্গভঙ্গের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে কংগ্রেস একে রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। অন্যদিকে হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাব আর পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। এ বিভক্তির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্রীকরণ করা হয়। *[সকল বো. '১৬]*

ক. বেঙ্গল প্যাক্ট কী? ১

খ. খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও উক্ত ঘটনার পরিণতি কি একই ছিল? ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেন তা-ই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।

খ খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানের খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা করা।

ভারতীয় মুসলমানগণ মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক তুরস্কের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪) তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষে যোগদান করে। তাই ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশদের এ শর্তে সমর্থন দেয় যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ভারতীয় মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে খেলাফত আন্দোলন গড়ে তোলে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্রিটিশভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে দুটি নতুন প্রদেশে বিভক্ত করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত জার্মানিকে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্তির মধ্যে উল্লিখিত বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাবের প্রেক্ষিতে পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। ঠিক একইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গ প্রদেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। আর পূর্ব বাংলা ছিল চরম অবহেলিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে কলকাতা ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং পূর্ব বাংলার অবনতি ঘটে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গ করে। সুতরাং দেখা যায়, জার্মানির বিভক্তির মধ্যে বঙ্গভঙ্গের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও বঙ্গভঙ্গের পরিণতি একই ছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সামাজিক মর্যাদা ফিরে পায় এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম তথা সার্বিক দিকে প্রগতি নিশ্চিত করার শুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে, যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। জার্মানির বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রেও একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

জার্মানিকে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত করলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার শুরু হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্র করা হয়। ঠিক একইভাবে ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গ প্রদেশকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত করা হলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মুসলমান সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সমর্থন জানালেও কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকে। কারণ বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হচ্ছে 'মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা'। তাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ তারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনে স্বদেশি আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে থাকে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও হিন্দুদের প্রচণ্ড বিরোধিতায় ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে। দিল্লির রাজদরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর তারা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে দুই বাংলাকে আবার একত্র করে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও বঙ্গভঙ্গ ঘটনার পরিণতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ রফিক ও সফিক দুই ভাই। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন গার্মেন্টিসের মালিকানা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বড় ভাই রফিক গার্মেন্টিস পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং ছোট ভাই সফিক সংসার দেখাশোনা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় ভাই গার্মেন্টিস পরিচালনা এবং ছোট ভাই সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু গার্মেন্টিসের আয় থেকে ছোট ভাইকে সংসার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের কারণে বাবার প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টিসটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। *[সকল বো. '১৬; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকে গৃহীত কোন শাসনব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসনব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক নবাব আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

খ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়নি। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, দুর্বল সংগঠন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে একতার অভাব, সংহতি ও সর্বভারতীয় আদর্শের অভাব প্রভৃতি কারণে এ বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের তুলনায় ইংরেজরা ছিল অধিক দক্ষ, রণকুশলী, নিষ্ঠাবান ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, যা বিপ্লবীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমদিকে গৃহীত দ্বৈত শাসনব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি সনদের মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার, নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ক্লাইভ এ দেশে একটি অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন, যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এতে দেওয়ানি ও দেশ রক্ষা ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। উদ্দীপকেও ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, বাবার মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন গার্মেন্টসের মালিকানা নিয়ে রফিক ও সফিক দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বড় ভাই রফিক গার্মেন্টস পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং ছোট ভাই সফিক সংসার দেখাশোনা করবেন। তাদের এ ক্ষমতা ভাগাভাগির সাথে লর্ড ক্লাইভের গৃহীত দ্বৈতশাসন নীতির মিল রয়েছে। দ্বৈতশাসনের অর্থ হলো দুইজনের শাসন। এ ব্যবস্থায় বাংলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তি রক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে। অন্যদিকে বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমি-জায়গার বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ণ ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় নবাব পেল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। উদ্দীপকের দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনের এ অভিনব নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ দ্বৈত শাসনব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, বড় ভাই রফিক গার্মেন্টস পরিচালনা এবং ছোট ভাই সফিক সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু গার্মেন্টসের আয় থেকে ছোট ভাইকে সংসার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের কারণে বাবার প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টসটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থার ফলে বাংলার অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের কারণে যেমন তাদের বাবার প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টসটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঠিক একইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈতশাসনের নির্মম বলি হচ্ছে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নায়েব, সুবাদের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও জোরজবরদস্তিতে বাংলায় চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এ ব্যবস্থার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া প্রভাব এবং দস্তকের ব্যাপক অপব্যবহারে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দেশীয় বণিকেরা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে থাকে। দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাংলার রেশম শিল্প ও তাঁতশিল্পের ধ্বংস সাধিত হয়। তাছাড়া এ ব্যবস্থার ফলে বাংলায় আলিমদার প্রথার উদ্ভব ঘটে। এ আলিমরা বিভিন্ন খাতে বাড়তি কর আদায় করত, যা জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের মতোই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

প্রশ্ন ▶ ৬ বাসির উদ্দিন মোল্লা অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অপুত্রক হওয়ায় তার সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হারুন মিয়াকে উইল করে দিয়ে যান। হারুন মিয়া চরাঞ্চলের একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ হলেও তার এলাকায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই হারুন মিয়া প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে শ্বশুরের নামে একটি কলেজ, মায়ের নামে একটি মাদ্রাসা এবং নিজের নামে একটি স্কুল অত্র-এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরিব ও মেধাবী ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিনের পূর্বপুরুষেরা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন? ১

খ. ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যাসহ লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কোন আত্মীয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে হারুন মিয়ার কর্মকাণ্ডের আলোকে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজি মুহম্মদ মোহসিনের পূর্বপুরুষেরা পারস্যের অধিবাসী ছিলেন।

খ ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস তাদেরকে উন্নয়নের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তাই তখন শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে বাঙালি জাতি এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিপতিত হয়। মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি। তাই এ সময়ে বাংলার জনগণকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সমাজে শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের বৈপিত্রেয় বোন মন্নুজানের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে বাসির উদ্দিন মোল্লা যেমন তার অগাধ সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হারুন মিয়াকে উইল করে যান তেমনি মন্নুজানও তার সকল সম্পত্তি হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে দিয়ে যান।

হাজি মুহম্মদ মোহসিনের মাতা জয়নব খানমের তার পিতা হাজি ফয়জুল্লাহর সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে আগা মোতাহার বলে একজন ধনাঢ্য ইরানি ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে হয়েছিল। মন্নুজান ছিলেন আগা মোতাহারের ঔরসজাত সন্তান। হুগলি, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া অঞ্চলে আগা মোতাহারের বিস্তীর্ণ জায়গির ভূমি ছিল। তিনি তার এ ভূ-সম্পত্তি তার একমাত্র সন্তান মন্নুজানের নামে উইল করে দেন। তাছাড়া মন্নুজানের স্বামী হুগলির নায়েব-ফৌজদার সালাউদ্দিনের বিপুল সম্পত্তি ছিল। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মন্নুজান তার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হন। বিধবা নিঃসন্তান মন্নুজান তার এ বিশাল ধন সম্পত্তি তদারকি ও পরিচালনার জন্য তার ভাই হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে অনুরোধ করেন। বোনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮০৩ সালে মন্নুজানের মৃত্যুর পর হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার সৈয়দপুর জমিদারিসহ সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। আর এসব সম্পত্তি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন।

ঘ উদ্দীপকের হারুন মিয়ার মতো হাজি মুহম্মদ মোহসিনও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

মোহসিন সকল ধর্মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করতেন। তার টাকায় হুগলি, ইমামবাড়া, কলেজ, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস তৈরি হয়। তিনি নিজের প্রয়োজনের জন্য সামান্য অর্থ রেখে বাকি অর্থ গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। ১৭৬৯-১৭৭০ সালের সরকারি রেকর্ডপত্রে হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে একজন মানব হিতৈষী ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাজি মুহম্মদ মোহসিন যেমন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং গরিব ও মেধাবী ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, ঠিক একইভাবে হারুন মিয়াও পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা দূর করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হারুন মিয়া যে জনহিতৈষী কাজ করেছেন হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে তার আদর্শ মানব বলা যায়। তার কর্মকাণ্ড মোহসিনের কৃতিত্বকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে হারুন মিয়া ভিন্ন আঙ্গিকে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কৃতিত্ব তুলে ধরেছে। তার কর্মকাণ্ড মোহসিনের কৃতিত্বের যথার্থ উদাহরণ।

প্রশ্ন ▶ ৭ ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এটাকে সিপাহি বিদ্রোহ বললেও আমরা বলি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. হাজি শরিয়ত উল্লাহর পরিচালিত সংস্কার আন্দোলন কী নামে পরিচিত? ১

খ. প্রাচীন কালে অনেকেই বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা করতে এসেছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বিদ্রোহ ছিল প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী উক্ত সংগ্রামকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজি শরিয়ত উল্লাহর পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনকে ফরায়েজি আন্দোলন বলা হয়।

Teachingbd24.com

খ প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষ করে বাংলা অঞ্চল ছিল ধন সম্পদে পরিপূর্ণ। এ অঞ্চল ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই তখন গ্রামে পাওয়া যেত। তাছাড়া এ উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও নানা ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব পণ্যের আকর্ষণেই অনেকে এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসেছে।

গ উদ্দীপকের বিদ্রোহ অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহই ছিল ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

মূলত ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব সিপাহিদের বিদ্রোহের মাধ্যমে সূচিত হলেও ক্রমে তা সারা ভারতে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফিরোজপুর, মুজাফফরপুর ও আলীগড়ের সিপাহিরা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই বিপ্লবে সাধারণ জনগণও অংশগ্রহণ করে। সিপাহিরা দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেয় এবং ভারতের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। অযোধ্যা ও উত্তর প্রদেশেও এই বিপ্লব তীব্র আকার ধারণ করে। আর বারানসী, আজমীর, গুজরাট, লক্ষ্ণৌ, মিরাট, জৈনপুর, বিহার ও ঢাকা অঞ্চলেও এ আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের সকল স্তরের জনগণ এ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ফলে খোদ ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, এত বড় ভারতবর্ষকে শুধু একটি কোম্পানির হাতে রাখা ঠিক হবে না। তাই, ভারতের শাসনভার মহারানি ভিক্টোরিয়ার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতে একজন গভর্নর জেনারেল ও একজন ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ, বিপ্লবের পরে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে ব্যাপৃত হয়। এভাবে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপলাভ করেছিল। আর এই বিপ্লবের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ঘ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী উক্ত সংগ্রামকে অর্থাৎ, ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেন।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুনের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যবিস্তার, একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলো নানা অজুহাতে দখল, দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতি, অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই নীতি প্রয়োগ করে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তকপুত্র এবং পেশওয়ার দ্বিতীয় রাজা বাজিরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করা হয়। এসব ঘটনায় দেশীয় রাজন্যবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তাছাড়া ডালহৌসি কর্তৃক দিল্লি সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করায় সম্রাট পদ থেকে বঞ্চিত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও ক্ষুব্ধ হয়।

মূলত উল্লিখিত রাজনৈতিক কারণগুলোকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৮ ব্রিটিশ ভারতের একজন বিখ্যাত লর্ড ১৯০৫ সালে বাংলাকে দুভাগে ভাগ করে দুটি রাজধানী নির্ধারণ করে দেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তবে এ বিভক্তিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের হিন্দু- মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মুসলিম লীগ এ বিভক্তির পক্ষে এবং কংগ্রেস এ বিভক্তির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কত সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়? ১

খ. সৈয়দ আমীর আলীর পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তার পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্রিটিশ ভারতের এ বিভক্তির প্রশাসনিক ও সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়।

খ উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজের নবজাগরণে যেসব মনীষীর অবদান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী অন্যতম। তিনি ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল হুগলির এক সম্ভ্রান্ত শিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও ইতিহাসে এম. এ পাস করে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত গমন করেন। তিনি ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায়ে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় '*Central National Mohammedan Association*' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি মুসলিম সমাজের উন্নয়নে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। অবশেষে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত ব্রিটিশ শাসনামলের ঐতিহাসিক ঘটনা বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশ শাসকদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বঙ্গভঙ্গ। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। তার এ কর্মকাণ্ডেরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় লর্ড কার্জন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় হয়ে এসে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। কারণ বাংলা প্রদেশ ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ কোটি। ফলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিত। এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় আর্থ-সামাজিক সুবিধাটি নিশ্চিত করা এবং ব্রিটিশদের Divide and Rule Policy-এর বাস্তবায়ন করার জন্য এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নস্যাৎ করার জন্য লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে দুটি প্রদেশে রূপান্তরিত করেন, যা বঙ্গভঙ্গ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদাহ জেলাসহ) এবং আসাম নিয়ে 'পূর্ব-বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় এবং এর শাসনভার অর্পণ করা হয় স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের ওপর। কলকাতাকে রাজধানী করে অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য অংশ নিয়ে 'বঙ্গ প্রদেশ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাই ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গভঙ্গেরই ইঙ্গিত দেয়।

ঘ ব্রিটিশ ভারতের এ বিভক্তি অর্থাৎ, বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক ও সামাজিক কারণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লর্ড কার্জনসহ মেকেলে, রিজলে প্রমুখ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে মূলত প্রশাসনিক কারনেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল। তাদের যুক্তি বাংলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। ফলে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার বেহালদশা প্রভৃতি কারণে একজন গভর্নরের পক্ষে এই বিশাল প্রদেশের সুষ্ঠু শাসন কাজ পরিচালনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এরূপ একটি বাস্তবতার মধ্যে লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই বঙ্গ প্রদেশের বিভক্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পিছনে আর্থ-সামাজিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। বস্তুত কলকাতা ছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র। এককথায় কলকাতাকে ঘিরেই বাংলার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ফলে পূর্ববাংলা থাকে চরম অবহেলিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে কলকাতা ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে। এই অবস্থায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। এ কারণে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের পিছনে প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মূলত বঙ্গভঙ্গের জন্য আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক এ দুটো কারণই যৌক্তিক ছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস পড়ে রিফাত জানতে পারলো ইংরেজ বণিকরা ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এক সময় তারা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। প্রায় দেড়শ বছরের তৎপরতার পর বাংলায় ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার নবাব এ সময় নামে মাত্র সিংহাসনাধিকারী ছিলেন। তার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. ঔপনিবেশিক যুগে বাংলায় মুসলিম শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? ২

গ. ব্রিটিশরা বাংলায় যে কোম্পানি গঠন করেছিল এর দেওয়ানি লাভের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোম্পানির দেওয়ানি লাভে লর্ড ক্লাইভের ভূমিকা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ ব্রিটিশরা বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেছিল। এ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ব্রিটিশ শাসকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় প্রেরণ করলে ধীরে ধীরে এ কোম্পানি রাজনীতিতে ও হস্তক্ষেপ শুরু করে। যার অন্যতম উদাহরণ ১৭৬৫ সালে ইস্ট কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। এই দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দীপকে অনুরূপ ঘটনা বিদ্যমান।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ বাংলার ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এটি ছিল কোম্পানির এক বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয়। পি ই রবার্টস বলেন, "বাংলার বিখ্যাত দেওয়ানি লাভ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রথম পদক্ষেপ ছিল।" এর ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইনত ও কার্যত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় এবং দেওয়ানি অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানি বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করায় বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে এর ফলে কোম্পানি এবং কোম্পানি কর্মচারীদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই দেওয়ানি শাসনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এবং পরে সমগ্র ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটে।

ঘ কোম্পানির দেওয়ানি লাভে রবার্ট ক্লাইভের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের অগ্রপথিক ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক রবার্ট ক্লাইভ। ইস্ট কোম্পানির দেওয়ানি লাভে তার অবদান অসামান্য। তার অপরিসীম ভূমিকার ফলে ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে।

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ঘটনার সাথে রবার্ট ক্লাইভ নামটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৬৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে এলাহাবাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট থেকে প্রাপ্ত দুটি জেলা কারা ও এলাহাবাদ এবং বার্ষিক ২৬ লাখ টাকার বিনিময়ে ক্লাইভ দিল্লির সম্রাট হয়। শাহ আলমের নিকট থেকে এলাহাবাদের চুক্তি অনুযায়ী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। পরবর্তীতে অন্য একটি চুক্তির ভিত্তিতে ক্লাইভ নাবালক নবাব নাজিমউদ্দৌলাকে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বার্ষিক ৫৩ লাখ টাকা প্রদানে সম্মত হন। যার বিনিময়ে অত্র অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করতে ক্লাইভ নবাবকে বাধ্য করেন। এভাবে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে রাজস্ব বিভাগে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

পরিশেষে বলা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভে রবার্ট ক্লাইভের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১০ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাব আর পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এ বিভক্তির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল অন্দোলনের মুখে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্রিত করা হয়। *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*

ক. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও উক্ত ঘটনার পরিণতি কি একই ছিল? মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা নবাব আব্দুল লতিফ।

খ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় হয়ে আছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে বাঙালি জাতি সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলরত জনগণের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে রফিক, শফিক, জব্বারসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইউনেস্কোর মতে, দুই জার্মানিকে বিভক্তকারী বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ ও তা ভেঙে ফেলা জার্মানির একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ঘটনায় প্রথমে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয় পরে একটি শ্রেণির আন্দোলনের কারণে ১৯৯০ সালে চুক্তির মাধ্যমে দুই জার্মানি আবারও একত্রিত হয়। *[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. '১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয় অভ্যুত্থান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মতো উক্ত ঘটনার পরিণতি কি একই হয়েছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজি মুহম্মদ মোহসিন বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন।

খ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয় অভ্যুত্থান- উক্তিটি যথার্থ।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই ভারতের সর্বস্তরের শোষিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ সর্বপ্রথম প্রকাশ লাভ করে। ব্রিটিশ সরকার এবং অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক এ বিদ্রোহকে খাটো করে দেখলেও বাস্তবে এ বিপ্লব ছিল জাতীয় অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

গ সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ও শোষিত না হলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না। ইংরেজরা ভারতীয়দের ওপর যে রাজস্ব নীতি গ্রহণ করেছিল তাতে কৃষকদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। ফলে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এছাড়া খাজনা বৃদ্ধি, পথকর, জলকর আরোপের কারণে ভারতীয়রা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। *[কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]*

ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে মুলতান জয় করেন? ১

খ. সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের যে কারণটির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. নানা কারণে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতার পর্যবসতি হয়- বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান জয় করেন।

খ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট সিংহলরাজের প্রেরিত আটটি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়াই ছিল আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ।

অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে সিংহলরাজ আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ আটটি জাহাজে করে খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। রাজা দাহির তা আদায়ে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তিনি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য খলিফার অনুমতি নিয়ে সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করেন।

গ উদ্দীপকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ইংরেজ শাসনের একশ বছরে মহাজন, নীলকর, জমিদার ও কোম্পানির কর্মচারিদের অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন এ বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমি প্রস্তুত করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিনীতির ফলে বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক তাদের সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব প্রমাণ করতে না পারায় সম্পত্তি হারিয়ে ইংরেজ কোম্পানির শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ইংরেজদের ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। অতিরিক্ত কর ধার্যকরণ ও নানা অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশরা বাজার দখলের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্রিটেন থেকে আমদানি করতে থাকে। ফলে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হতে থাকে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসে। এছাড়া, ইংরেজ শাসনামলে খাজনা বৃদ্ধি, চৌকিদারি কর, পথকর, জলকর, যানবাহনের ওপর কর ইত্যাদি নানা রকম কর আরোপের ফলে ভারতীয়রা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত জনগণ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যোগ দেয়। উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, ইংরেজ শাসনামলে গৃহীত রাজস্ব নীতি ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদে ভারতীয়রা একটি মহাবিদ্রোহের সূচনা করে। যা ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণটির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যাপকতা লাভ করলেও নানা কারণে এ মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সংগঠনের অভাব, উপযুক্ত নেতা ও সর্বভারতীয়দের সমর্থনের অভাব, সামরিক প্রশিক্ষণ ও রসদের অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-বাহিনী ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং দেশীয় স্বার্থান্বেষী জমিদারদের অসহযোগিতার ফলে সুসংঘটিত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ সফলতা লাভ করতে পারেনি।

ইংরেজ সরকার অত্যন্ত কঠোরভাবে এ বিদ্রোহ দমন করে। ইংরেজ সেনাপতি নিকলসন ১৮৫৩ সালে দিল্লি অধিকার করেন এবং সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয়। বিপ্লবীদের মধ্যে আদর্শ ও একতার অভাবই এ বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। বিপ্লবীরা ভারতের সকল শ্রেণি ও সকল অঞ্চলের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব তাদের বিজয়ে সাহায্য করেছিল। এর পাশাপাশি বিপ্লবীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতার অভাব বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া তোপী, আহমদউল্লাহ প্রমুখ নেতাও অদূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পিছনে এ সকল কারণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মুর্শিদাবাদ পরগনার রাজা চাণক্য শাসন পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হন। সমতলে সাধারণ বাঙালি কৃষক প্রজা, পাহাড়ে ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতি প্রজার বসবাস। একদিকে হিন্দু, মুসলিম ও পাহাড়িদের ধর্মীয় বিরোধ, অন্যদিকে স্বাধীনতা প্রজায় জমিদারি প্রথা বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন তাকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে। জমিদার বিরোধী আন্দোলন প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে প্রজাদের পরগনা বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেক দল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। পরিশেষে তিনি পরগনা ভাগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. 'দারুল হারব' অর্থ কী? ১

খ. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি কেন গঠন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপের প্রতি ও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। - বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দারুল হারব' অর্থ বিধর্মীর রাজ্য।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত বঙ্গভঙ্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের একটি চিরায়ত নীতি হলো 'ভাগ কর ও শাসন কর নীতি।' নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তারা শাসনাধীন অঞ্চলকে ভাগ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করত। এভাবে তাদের অন্যায় শাসনকে আরও স্থায়ী করার চেষ্টা চালাত। উদ্দীপকেও ব্রিটিশদের এমনই একটি কর্মকাণ্ড তথা বঙ্গভঙ্গের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের মুর্শিদাবাদ পরগনার রাজা চাণক্য শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের জমিদার বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ বিরোধ প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ উস্কে দিয়ে পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হয়। বিশ শতকের শুরুতে ভারতে সে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়অবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। তাই ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট, কংগ্রেস ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিপত্য ধ্বংস করে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল কার চেষ্টা করে। আর উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপ অর্থাৎ, বঙ্গভঙ্গের প্রতিও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র— উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, মুর্শিদাবাদ পরগনার রাজা চাণক্য তার অধিভুক্ত পরগনাকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। একদল মানুষ এ বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেকদল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ঠিক একইভাবে ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেও বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাংলার মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। কেননা, এর মধ্যে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি এবং একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। হিন্দুদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের মুখে সরকার যেন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না করে সে জন্য মুসলিম লীগসহ নানা সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দুসমাজ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র ও নেতিবাচক। পুঁজিপতি, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, জমিদার স্বার্থরক্ষায় এবং জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাছাড়া হিন্দুরা মনে করেছিলেন, নতুন প্রদেশে

Teachingbd24.com

মুসলমান জনগণের রাজত্ব হবে, আর বাঙালি হিন্দুরা হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গভঙ্গের অর্থ হচ্ছে 'মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা'। এ সকল কারণে বঙ্গভঙ্গের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে কংগ্রেস একে রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে।
সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। অন্যদিকে হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ পবিত্র হজ পালনের জন্য জনাব শিহাব সাহেব সৌদি আরবে গমন করেন। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে সেদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার আচরণ তিনি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। স্বদেশে ফিরে এসে দেখেন, মানুষ নানাবিধ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে লিপ্ত। তিনি ঐসব বিপথগামী মুসলমানকে ইসলামের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম কী? ১
খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয় বলে তুমি কি মনে কর? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম মোহসেন উদ্দিন আহমেদ দুদু মিয়া।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে হাজি শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।
ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফরায়েজি আন্দোলন ছিল অন্যতম। ইসলামের নানা অনৈসলামিক রীতিনীতি বন্ধকরণ এবং মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে হাজি শরীয়তুল্লাহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কার ও নীতিবর্জিত কার্যকলাপ বন্ধের জন্য এ আন্দোলনের সূচনা করেন। উদ্দীপকের শিহাব সাহেবের কর্মকাণ্ডেও এ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।
উদ্দীপকের শিহাব সাহেব সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসে দেশের জনগণের মধ্য থেকে নানা কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দূরীকরণের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। একইভাবে হাজি শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান কবরপূজা, পিরপূজা, উরস, মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি লক্ষ করেন যে, নতুন সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি কর্তৃক মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার হন। হিন্দুদের পূজায় ও জমিদার সন্তানদের বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দিতে হতো। এমনকি মুসলমানদের দাড়ি রাখার ওপর কর ধার্য করা হয়। এসব দেখে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সংগঠিত করেন, যা ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শিহাব সাহেবের ধর্মীয় আন্দোলনে বাংলার ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের সংস্কার আন্দোলনের মতো উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ, ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয় বলে আমি মনে করি।
হাজি শরীয়তুল্লাহ ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক নেতা এবং সর্বোপরি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি লক্ষ করেন যে, বাংলার মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতিতে আচ্ছন্ন। তাছাড়া জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারেও মুসলমানদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। ফলে তিনি একদিকে যেমন তদানীন্তন মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালান অপরদিকে তিনি তাদের সামাজিক বৈষম্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি জমিদার ও নীলকরদেরদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এটাকে অনেক ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ফরায়েজিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয় এবং সমাজে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। এর মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণ যখন সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে ইংরেজ শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট ছিল তখন তারা ধর্মীয়ভাবে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল বলে হাজি শরীয়তুল্লাহ মনে করতেন। তাই তিনি প্রথমে তাদেরকে ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পথ প্রসারিত করতে মনোযোগ দেন। ফলে উক্ত আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জ্ঞান অন্বেষী হাজী আহমেদ তার এলাকার শিক্ষার সুযোগ তৈরি ও শিক্ষার প্রসারের এবং জনহিতকর কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিজের বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন। এ ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ফান্ড গঠন করা হয়। তার এ উদ্যোগে গরিব ও মেধাবী ছাত্ররা সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। *[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী ছিল? ১
খ. দ্বৈত শাসন কী? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আহমেদের কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত কোন বিখ্যাত দাতার সামঞ্জস্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সমাজের উন্নয়নে উক্ত দাতার দান অতুলনীয়' পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের প্রকৃত নাম ছিল মীর নিসার আলী।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত হাজী আহমদের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের হাজি মুহম্মদ মোহসিনের সাদৃশ্য রয়েছে।
গরিব মেধাবী মুসলিম ছাত্ররা যাতে আধুনিক শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য হাজি মুহম্মদ মোহসিন ১৮০৬ সালে তৎকালীন ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি দিয়ে মোহসিন ট্রাস্ট গঠন করেন। হাজি মুহম্মদ মোহসিনের এ কর্মকাণ্ডই হাজী আহমদের কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়।
হাজী আহমদ তার এলাকার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজের বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন। তার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দিয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ফান্ড তৈরি করা হয়। একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিন শিক্ষা বিস্তারে হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তার মৃত্যুর পর ১৮৩৬ সালে হুগলি মোহসিন ফান্ড, হুগলি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য তিনি দান করেছেন তার বিশাল ঐশ্বর্য। এভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের দানকৃত অর্থে এখনো মুসলিম সমাজ উপকৃত হয়ে আসছে। উদ্দীপকের হাজী আহমদের কর্মকাণ্ডে দানবীর হাজি মুহম্মদ মোহসিনের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

ঘ সমাজের উন্নয়নে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের দান অতুলনীয়— উক্তিটি যথার্থ।
হাজি মুহম্মদ মোহসিন দুর্দশাগ্রস্থ মুসলমান সমাজকে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে তার সম্পত্তি জনকল্যাণে উদারহস্তে দান করেন। গরিব-মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করতে তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উদ্দীপকে হাজী আহমদ তার এলাকায় শিক্ষার সুযোগ তৈরি, শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ও জনহিতকর কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিজের বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন।
মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি ও শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮০৬ সালে হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। তার এ উদ্যোগে গরিব ও মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষার সুযোগ পায়। মুহসীনের দানকৃত অর্থে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বছর পর এর সাথে একটি ইংরেজি ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

https://teachingbd24.com

এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের সুযোগ পায়। মোহসিন ফান্ডের অর্থ প্রথমদিকে ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপে কেবল অমুসলিম ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা হলেও নবাব আব্দুল লতিফের জোর তৎপরতায় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ জুলাই স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল সিদ্ধান্ত নেন যে, মোহসিন ফান্ডের সমুদয় অর্থ সম্পূর্ণভাবে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই ব্যয় করা হবে। মোহসিন ফান্ডের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৫,০০০ টাকা। এ টাকা বিভিন্ন সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হয় তার মধ্যে নতুন মাদ্রাসা স্থাপন, মুসলিম ছাত্রদের মাসিক বৃত্তি প্রদান, শিক্ষকদের বেতন প্রদান ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, হাজি মুহম্মদ মোহসিনের দান সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶১৬ মৌলি মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রী। সে একদিন স্কুল শিক্ষকের কাছে জানতে পারল এই উপমহাদেশে এমনও সাহসী লোকের জন্ম হয়েছিল যিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লা স্থাপন করে যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তখন কৃষক শ্রেণির ওপর যে কোন ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. বারো ভূঁইয়া বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে মনীষীর বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে তার ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এই ধরনের একজন মনীষীর আন্দোলন সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

খ 'বারো ভূঁইয়া' বলতে বাংলার ইতিহাসে কতিপয় স্বাধীনচেতা জমিদারদেরকে বোঝায়।

বাংলার ইতিহাসে বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ষোল শতকের মধ্যবর্তীকাল হতে সতের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। এ জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। তাদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ইতিহাসে এ জমিদারগণ 'বারো ভূঁইয়া' নামে পরিচিত। 'বারো' বলতে সংখ্যায় বোঝানো হয় না বরং এ জমিদারদের সংখ্যা ছিল বারো জনের অধিক।

গ উদ্দীপকে মৌলির শিক্ষকের দেওয়া তথ্যে তিতুমীরের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম অস্ত্র ধারণ করে শহিদ হয়েছিলেন।

স্থানীয় জমিদার ও নীলকররা তিতুমীরের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে তারা তিতুমীরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্যে প্ররোচিত করে। এ প্রক্রিয়ায় তারা প্রথমে তিতুমীরকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে শায়েস্তা করার জন্য হুমকি প্রদান করে। এ পরিস্থিতিতে তিতুমীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ১৮২৫ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যা 'বারাসাত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এ বিপ্লবের সংবাদে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার বিরাট এক পুলিশ বাহিনী নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তিতুমীরের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও গোলাম মাসুম খানের সেনাপতিত্বে গণবাহিনী ইংরেজ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর তিনি ১৮৩১ সালে কলকাতার নিকটবর্তী নারকেলবাড়িয়া নামক স্থানে এক বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং চতুর্দিকে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তবে ব্রিটিশ বাহিনীর তীব্র আক্রমণে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয় এবং তিতুমীর ব্রিটিশদের হাতে ধৃত ও নিহত হন। পরিশেষে বলা যায় যে, তিতুমীর ছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী নেতৃত্ব।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত নেতা অর্থাৎ তিতুমীরের আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তিতুমীর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনা করেও ১৮৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার এ সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের পথকে ত্বরান্বিত করেছিল। কেননা তার এ আন্দোলনে সাড়া দিয়েই বাংলার নিরীহ জনগণ পরবর্তীতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। ফলে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটেছিল এবং রানির সরাসরি শাসন কায়েম হয়। আর পরবর্তীতে মুসলমানদের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের কর্ম প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আর এর ব্যাপকতা আরও লক্ষ করা যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন ও বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যা ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তাছাড়া পরবর্তীতে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে নিপতিত করে। এছাড়া তিতুমীর বাংলার নিরীহ দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের সংগঠিত করেছিল যা বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের পথকে রুদ্ধ করেছিল। তাছাড়া জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রামে উজ্জীবিত হয়ে বাংলার মানুষ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়েছিল। যা বাংলার স্বাধীনতার সূর্য উদয়নে সাহায্য করেছিল।

প্রশ্ন ▶১৭ ভিয়েতনামে ফরাসি উপনিবেশিক শাসন ছিল। তারা ভিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিভক্ত করে। এতে উত্তর দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ আন্দোলন শুরু করে এবং দুই অংশ আবার ১৯৭৬ সাথে একত্রিত হয়। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]*

ক. বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন কে? ১

খ. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন অঞ্চলের বিভক্তির মিল রয়েছে? ইহা রদের কারণ কী ছিল? ৩

ঘ. উক্ত রদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর।

খ ভারতের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ সিপাহিদের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাই কোন কোন ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহ বলেন।

ঐতিহাসিক নর্টন, ফরেস্টার, ডাফ প্রমুখ মনে করেন যে, ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সিপাহিদের মধ্য দিয়ে শুরু হলেও কালক্রমে তা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। মূলত ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ছিল একটি সর্বাত্মক ও সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই একে মহাবিদ্রোহ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সাথে ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় 'বঙ্গভঙ্গ' তথা বাংলা বিভক্তির মিল রয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ছিল হিন্দুসমাজ ও কংগ্রেসের স্বদেশি আন্দোলন।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে বঙ্গভঙ্গ করা হয়। কিন্তু ভঙ্গাভঙ্গ বিরোধী হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিরা এতে আপত্তি জানায়। কংগ্রেস বিলেতি পণ্য বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলন শুরু করে এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উত্তেজনাকর খবর সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। ক্রমে এই আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। অবহাদৃষ্টে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বিক্ষোভ ও হত্যাযজ্ঞের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ছিল কিছু সংখ্যক হিন্দু নেতাদের ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কংগ্রেসের স্বদেশি আন্দোলন।

ঘ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী।

১৯১১ সালে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের চাপের মুখে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। বঙ্গবঙ্গ রদের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানগন হতাশ হয়ে পড়েন। তারা ব্রিটিশ সরকারের নীতির ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এ ঘটনা থেকে মুসলমানগণ শিক্ষালাভ করে যে, স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে আরও অধিক সংগঠিত হতে হবে। এছাড়া বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার পর পর ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহর আহ্বানে উভয় বাংলার নেতৃস্থানীয়দের সভায় ভাইসরয়ের কাছে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি স্মারকলিপি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ ও

Teachingbd24.com

স্বাতন্ত্রবোধে আরও পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের জন্য মুসলিম লীগ মুসলমানদের মুখপাত্রে পরিণত হয়। শুধু পূর্ব বাংলায় নয় ১৯১২ সাল বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কলকাতায় গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এ দলই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্বে দেয়। এভাবে মুসলিম লীগের হাত ধরেই এসেছিল ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ। ফলে ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ স্থায়ী হতে পারেনি এবং নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে বঙ্গের ভাগও নিশ্চিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৮ 'ক' অঞ্চলের এক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী যুদ্ধে বিদেশি শক্তি উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় অমর্তদের সহযোগিতায় ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অনুপ্রেণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শাসককে পরাজিত করে প্রত্যক্ষভাবে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ না করে পরোক্ষভাবে শাসন করতে থাকে এবং ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। ফলে উক্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয় এবং এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. বাঁশের কেল্লা কে নির্মাণ করেন? ১

খ. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ কেন সংঘটিত হয়েছিল? ২

গ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণ উদ্দীপকের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিতে কী কী প্রভাব ফেলেছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন মীর নিসার আলী তিতুমীর।

খ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সংগঠিত হবার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক বৈষম্য দায়ী ছিল।

পলাশির যুগের পর থেকে ইংরেজরা শাসনকার্মে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে এদেশের জনগণকে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক নানা দিক দিয়ে শোষণ করতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তবে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সামরিক বাহিনীতে 'এনফিল্ড রাইফেলের' ব্যবহার

গ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণ উদ্দীপকের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি সনদের মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার, নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ক্লাইভ এ দেশে একটি অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন, যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এতে দেওয়ানি ও দেশ রক্ষা ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। উদ্দীপকেও ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকেও লক্ষ্যণীয় যে, ক অঞ্চলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী যুদ্ধে বিদেশি শক্তি উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় অমর্ত্যদের সহায়তায় ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শাসকে পরাজিত করে এবং প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ না করে পরোক্ষভাবে শাসন করতে থাকে যা ইতিহাসের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার শাসনের অধিকার দুটি পৃথক সংস্থার হাত চলে যায়। কোম্পানি দেওয়ানি পেলেও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয় নায়েবে নাজিম রেজা খানের হাতে এবং নবাবের নিয়মিত ক্ষমতা থাকলেও তা প্রয়োগে নবাবের কোন ক্ষমতা ছিল না। মূল ক্ষমতা ছিল কোম্পানির হাতেই। যার ফলশ্রুতিতে বাংলায় পরবর্তীতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উদ্দীপকেও আমরা এ ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাই।

ঘ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা গ্রহণ অর্থাৎ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি সনদের মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার, নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ক্লাইভ এ দেশে একটি অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন, যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এতে দেওয়ানি ও দেশ রক্ষা ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। উদ্দীপকেও ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীগনের দায়িত্বহীনতার কারণে প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল; দ্বৈতশাসন অনুসারে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব কোম্পানির হাতে ন্যস্ত হওয়ায় কোম্পানির কর্মচারি ও বণিকরা রাতারাতি প্রশাসক বনে যায়। এসব তথাকথিত প্রশাসকদের ভারতীয় রাজস্ব রীতিনীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় ইংল্যান্ডের রীতিনীতি ভারতে প্রয়োগ করতে থাকেন। এতে প্রশাসনিক জটিলতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। পি ই রবার্টস বলেন, বাংলার নবাব এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল খুবই জটিল এবং দুর্বোধ্য; দ্বৈতশাসনের ফলে রাজনৈতিক ও পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতালাভের সাথে সাথে কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। দ্বৈতশাসন বাংলায় কোম্পানির চরম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বৈদেশিক নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলার জন্য নবাবকে কোম্পানির সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়। দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব সরাসরি আদায় করার ক্ষমতা অর্জন করে। তাছাড়া নায়েব সুবাদার নিয়োগ করার ক্ষমতা কোম্পানি সংরক্ষণ করার সুবাদে নিয়ামতের সাধারণ প্রশাসনের উপর কোম্পানির চরম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং দ্বৈতশাসনে নবাবের পক্ষে রেজা খান রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তৎপরতা দেখালেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন। দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বৃদ্ধি পেয়ে জনজীবনে চরম অরাজকতা ও নিরাপত্তাহীনতা নেমে আসে।

সুতরাং বলা যায় যে, দ্বৈত শাসনের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে একটি বিশেষ ধর্মে জনগণ ক্রমাগত পিছিয়ে যেতে থাকে। শাসক গোষ্ঠী তাদের সন্দেহের চোখে দেখত তাই তারা অন্য একটি ধর্মে বিশ্বাসী জনগণকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করলে তারা এগিয়ে যায় এবং অন্য ধর্মে বিশ্বাসীরা পিছিয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল শাসক গোষ্ঠীর বিভক্ত করে শাসন করার কৌশল। যা হতে পরবর্তীতে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হিসেবে একটি অঞ্চলকে প্রশাসনিকভাবে বিভক্ত করলে অন্যরা তার বিরোধিতা করে সফল হন। এতে পিছিয়ে পড়াগোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. নীলদর্পণের রচয়িতা কে? ১

খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তোমার পাঠ্য বইয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শাসক গোষ্ঠীর এগিয়ে নেওয়া পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাসক গোষ্ঠীর পদক্ষেপগুলো কীভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীলদর্পণ নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ আমার পাঠ্যবইয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ছিল মুসলমান সম্প্রদায়। এ জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্রিটিশ শাসকেরা নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রথম থেকেই মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য তথা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহী ছিল। ফলে তারা হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের উন্নতিকল্পে নানা পদক্ষেপ নেয় যা উদ্দীপকের লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে একটি বিশেষ ধর্মের জনগণ অর্থাৎ মুসলমানরা ক্রমাগত পিছিয়ে যেতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী তাদের সন্দেহের চোখে দেখত তাই তারা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ তথা হিন্দুদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করলে তারা এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। লক্ষণীয় যে, ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। এ সময় মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন নামে সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবাব আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টা ও ইংরেজ সরকারের সদিচ্ছার কারণে মোহসিন ফান্ডের টাকা কেবল মুসলমান ছাত্রদের জন্য

Teachingbd24.com

ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিন্দু কলেজ কে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপায়িত করে মুসলমানদের জন্যও এর দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের পর মুসলমান ছাত্রদের জন্য সরকারের মঞ্জুরীকৃত বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয় ও কোটা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয়। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, পিছিয়ে পড়া মুসলমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্রিটিশ সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছিল।

ঘ শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের মুসলমানদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ গুলো নানাভাবে মুসলমানদের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিল।

মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অপারগ ছিল। ফলে তারা এক সময় হিন্দুদের শিক্ষা-দীক্ষা সামাজিক দিক তুলনায় পিছিয়ে দিয়ে যায়, যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের দেখা যায় যে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে একটি বিশেষ ধর্মের জনগণ ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে শাসকগোষ্ঠী তাদের অবস্থার উন্নয়নে নান পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ শাসনামলেও মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের অবস্থার উন্নতিকল্পে নানা পদক্ষেপ হাতে নেয়। যা তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা মুসলমানরা লাভ করে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীতে মুসলমানরা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। কংগ্রেস এর নেতৃত্বে হিন্দুদের ঐক্যবন্ধতার সুফল তারা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। ফলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার আদায়ে তারা সচেষ্ট হয় এবং এ লক্ষ্যে ক্রমে তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে। ১৯০৬ সালে তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ গঠন করে ব্রিটিশ সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপসমূহের ফলে মুসলমানগণ কর্মক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া ক্ষমতা হ্রাসে সক্ষম হয়।

সুতরাং দেখা যায় ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত ক্ষেত্রগুলো মুসলমানদের উন্নতিকল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶২০ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশটি পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পূর্ব জার্মানি আলাদা হয়ে যাবার পর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই ক্রমান্বয়ে একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকে। পূর্ব জার্মানির মানুষ দলে দলে বার্লিন দেয়াল টপকে পশ্চিম বার্লিনে আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি আবারো ঐক্যবন্ধ একটি জার্মানিতে পরিণত হয়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভারতের সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী? ১

খ. বারাসাত বিদ্রোহ কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভারতীয় উপমহাদেশের কোন ঘটনাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটির বিভক্তিকরণের প্রভাব এবং উপমহাদেশের ঘটনাটির বিভক্তিকরণের প্রভাব ছিল বিপরীতধর্মী— বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

খ ১৮২৫ সালে তিতুমীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব ঘোষণা করেন— যা ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তিতুমীরকে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার্থে তিতুমীর ১৮২৫ সালে চব্বিশ পরগনার কিয়দংশ নদীয়া জেলার কিয়দংশ এবং ফরিদপুরের কিয়দংশ সংযুক্ত করে এক এলাকা গঠন করেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব করেন। যেটিই ইতিহাস বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্রিটিশভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে দুটি নতুন প্রদেশে বিভক্ত করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত জার্মানিকে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্তির মধ্যে উল্লিখিত বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাবের প্রেক্ষিতে পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। ঠিক একইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গ প্রদেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। আর পূর্ব বাংলা ছিল চরম অবহেলিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে কলকাতা ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং পূর্ব বাংলার অবনতি ঘটে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গ করে। সুতরাং দেখা যায়, জার্মানির বিভক্তির মধ্যে বঙ্গভঙ্গের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ জার্মানি এবং বাংলা বিভক্তি করণের প্রভাব পৃথক ছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সামাজিক মর্যাদা ফিরে পায় এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম তথা সার্বিক দিকে প্রগতি নিশ্চিত করার শুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে, যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। জার্মানির বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রেও একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

জার্মানি এবং বাংলা পুনরায় একত্রিত হলেও এই বিভাগের ফল ভিন্ন ছিল। উদ্দীপকে দেখা যায় জার্মানি বিভাগের ফলে পূর্ব জার্মানি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলা বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়। ঢাকা নতুন সৃষ্ট প্রদেশের রাজধানী হয়। এর ফলে অফিস আদালতে এ অঞ্চলের মানুষ চাকরি পায়। এছাড়া নতুন রাস্তাঘাট নির্মিত হওয়ায় এ অঞ্চলের অর্থনীতি উন্নত হয়। সুতরাং বলা যায়, জার্মানি এবং বাংলা বিভাগের প্রভাব ভিন্ন ছিল।

প্রশ্ন ▶২১ মিম মেঘ মিশনারি স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী। সে তার স্কুলের শিক্ষকদের পাঠদানের মাধ্যমে জানতে পারে এ উপমহাদেশে এমনও সাহসী লোকের জন্ম হয়েছিল, যিনি অত্যাচারি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তথা কৃষকদের ওপর যে কোন ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। জোরপূর্বক অলাভজনক এক ধরনের ফসল ফলাতে কৃষকদের বাধ্য করার কারণে তিনি জমিদার ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরিতে সক্ষম হন। *[ডা: আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]*

ক. দুদু মিয়া কে ছিলেন? ১

খ. সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করো। ২

গ. মিমের শিক্ষকের দেওয়া তথ্যে যে মনীষীর বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে, ব্রিটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. এই ধরনের মনীষীর আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল— পর্যালোচনা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদু মিয়া হাজি শরীয়তুল্লাহর পুত্র ও ফরায়েজি আন্দোলনের একজন সংগঠক ছিলেন।

https://teachingbd24.com

খ ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং এর সময়ে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইংরেজ শাসনে নানা কারণে সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হলেও বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এনফিল্ড রাইফেল। যার টোটা গরুও শূকরের চর্বিতে তৈরি ছিল বলে গুজব রটে যায়। সর্বপ্রথম বঙ্গপ্রদেশের ব্যারাকপুরে শুরু হওয়া এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসন এর বিরুদ্ধে প্রথম বৃহত্তর সংগ্রাম হিসেবে গণ্য হয়। এই বিপ্লব ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

গ মিমের শিক্ষকের দেয়া তথ্যে যে মনীষীর বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে তিনি হলেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

তিতুমীরের সময়কালে বাংলার নিরীহ দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারী জমিদারদের ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তিনি বাংলার কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন। তিতুমীর জোরপূর্বক নীলচাষে কৃষকদের বাধ্য করানোর প্রতিবাদ করেন কারণ এটা ছিল কৃষকদের জন্য অলাভজনক। তিনি বিভিন্ন জমিদার ও নীলকুটিয়ালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করে তাদের পরাজিত করেন। ১৮২৫ সালে তিতুমীর একটি স্বাধীন এলাকা গঠন করে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব ঘোষণা করে যা বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এরপর ১৮৩১ সালের কলকাতার নিকটবর্তী নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে এক বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং চতুর্দিকে বাশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তবে ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণে সেটি ধ্বংস হয় এবং তিতুমীর শহিদ হন।

ঘ এই ধরনের অর্থাৎ তিতুমীরের মতো মনীষীর আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তিতুমীরের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল তিনটি প্রথমত, সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় বিস্তার এর মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। এদিক দিয়ে তার সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও ফরায়েজি আন্দোলনের মিল আছে। দ্বিতীয়ত, অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করা বাংলার বিভিন্ন সময় সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ এর সাথে সম্পর্কিত। তৃতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা তথা ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এদিক থেকে পরবর্তী সিপাহি বিপ্লবসহ ব্রিটিশ বিরোধী সকল সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে তার আন্দোলনের মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিতুমীরের মতো মনীষীদের গণসম্পৃক্ত আন্দোলন-সংগ্রাম সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা বপন করেছিল।

কালে কালে এই স্বাধীনতার চেতনাই বাংলার মানুষকে নানাভাবে উজ্জীবিত করেছে। ১৮৮৭ সালের সিপাহি বিপ্লব, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গঠন, বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পেছনে তিতুমীর ও তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন মনীষীদের কর্মকাণ্ডের প্রেরণা ছিল। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার পিছনে তাই তিতুমীরসহ হাজী শরীয়তুল্লাহ, সূর্যসেন প্রমুখ মনীষীর অবদান অসম্বীকার্য। পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। যার সূচনা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন হয় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করার মাধ্যমে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিতুমীরের মতো মনীষীর আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২২ হোসেন আলী তার এলাকায় একটি ইসলামি আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। তবে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলাও এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।

[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. বাঁশের কেল্লা আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন কে? ১

খ. কোম্পানির দেওয়ানি লাভ বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ব্রিটিশ বাংলার কোন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটির আলোকে উক্ত আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঁশের কেল্লা আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট।

খ দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হওয়ায় এটি বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানি আইনত ও কার্যত বাংলা-বিহার উড়িষ্যার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়েই কোম্পানি বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করার সুযোগ লাভ করে। ফলে বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ দেওয়ানি শাসনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এবং সমগ্র ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটে।

গ উদ্দীপকের সাথে ব্রিটিশ বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলনের মিল রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব ধর্মীয় নেতা সমাজ সংস্কারক ছিলেন তার মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ অন্যতম। তৎকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কবরপূজা, পিরপূজা, উরস ও মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হন এবং এগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। এ সমস্ত কুসংস্কার সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। যেটি ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত। উদ্দীপকেও অনুরূপ আন্দোলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হোসেন আলী তার এলাকার একটি ইসলামি আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা তোলাও ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। হাজী শরীয়তুল্লাহও অনুরূপ উদ্দেশ্যে ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থা সংস্কার করার লক্ষ্যে এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলার পল্লিতে ঘুরে বেড়ান এবং অধঃপতিত মুসলমানদের ফরজ পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। ফরজ শব্দের অর্থ যা পালন করা অত্যাবশ্যকীয়। মূলত এই ফরজ শব্দ থেকেই ফরায়েজি আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটেছে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি হাজী শরীয়তুল্লাহ জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে সর্বহারা কৃষকগণকে রক্ষার জন্য এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আন্দোলনের মাধ্যমে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি অর্থাৎ শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে উক্ত আন্দোলন তথা ফরায়েজি আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম। তার এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একদিকে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা এবং অন্যদিকে ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। উদ্দীপকের আন্দোলনেরও অনুরূপ উদ্দেশ্য বিদ্যমান।

হাজি শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলন প্রথম দিকে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমান্বয়ে এটি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। ফরায়েজি আন্দালনের কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশ সরকার এবং তাদের পোষ্য জমিদার নীলকর ও মহাজনগণ ভীত হয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের ধর্মকর্মে বাধা প্রদান করতে থাকে। ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমানদের ঈদের কোরবানি বন্ধ করে, এমনকি মসজিদের আজান দেওয়াও বন্ধ করে দেয়। এতে হাজী শরীয়তুল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়। তিনি অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হাজার হাজার কৃষক এ আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্দোলনের ভয়বহতায় জমিদারগণ ভয় পেয়ে যান। ১৮৩১ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহর সাথে হিন্দু জমিদারদের সংঘাত বাঁধে। বাংলার হতদরিদ্র কৃষকগণকে নিয়ে তিনি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও উৎপীরণের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনের ফলে বাংলার জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৩ তপন চৌধুরী ও স্বপন চৌধুরী তাঁদের বাবার মৃত্যুর পর সিদ্ধান্ত নিলেন তপন চৌধুরী জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকবে এবং স্বপন চৌধুরী প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু চৌধুরীকে জমিদারি আয় থেকে পর্যাপ্ত অর্থ না দেয়ায়। তাঁর পক্ষে প্রশাসন পরিচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের কারণে বাবার জমিদারি ও প্রজাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. বেঙ্গল প্যাক্ট কী? ১
খ. ১৮৫৭ সনে সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমদিকের কোন শাসন ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসনব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেন তাই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও ওহাবী আন্দোলনের নেতা আব্দুল ওহাব তৎকালীন মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। সমাজে প্রচলিত পির পূজা, কবর, পূজা, পির ফকিরদের দরবারে মানত করা ইত্যাদি পাপাচারপূর্ণ কার্যকলাপ যখন মুসলিম সমাজকে গ্রাস করেছিল। তখন তিনি এসব থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে এলেন। তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপে কুসংস্কারমুক্ত হয়ে মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয় কত সালে? ১
খ. খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারের সাথে ব্রিটিশ বাংলার কোন সংস্কারকের কার্যকলাপের সাদৃশ্য বর্তমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংস্কারণের আন্দোলন মুসলিম জাগরণের পাশাপাশি অত্যাচারী ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারকের সাথে আমার পঠিত সমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহর মিল লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব ধর্মীয় নেতা সমাজ সংস্কারক ছিলেন তার মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ অন্যতম। তৎকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কবরপূজা, পিরপূজা, উরস ও মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হন এবং এগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। তিনি কালীপূজা, লক্ষীপূজা, কবরপূজা, নৃত্যগীত ইত্যাদি শিরক ও অনৈসলামিক কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের উপদেশ দেন। পূর্ব বাংলায় অধঃপতিত মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলাম ধর্মের আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে আল্লাহ মনোনীত সকল ফরজ কাজ সম্পাদনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তার এ আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, সৌদি আরবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনাকারী মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব মুসলিম সমাজে পিরপূজা, কবরপূজা, কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানত প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তার পরিচালিত এ আন্দোলন ওহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। তিনি এ আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন এবং জনগণকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন। ঠিক এভাবেই হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজে ধর্মীয় জাগরণের পাশাপশি রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যায়, উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারের সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহর সমাজ সংস্কার সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত সংস্কারকের অর্থাৎ হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন মুসলিম জাগরণের পাশপাশি অত্যাচারী ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে এ উক্তিটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

ভারতীয় উপমহাদশের ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলনগুলোর মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম। তার এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একদিকে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা এবং ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এ আন্দোলনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

পূর্ব বাংলার মুসলমানরা যখন কুসংস্কারে নিমজ্জিত; গরিব কৃষক ও নিরীহ জনসাধারণ ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতদুষ্ট বিচারব্যবস্থা, জমিদার মহাজন ও নানা অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ ঠিক সেই ক্রান্তিকালে আবির্ভাব ঘটে হাজী শরীয়তুল্লাহর। তিনি ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিলোপ সাধন করার চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কার মুক্ত করে ফরজ পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু তার এ আন্দোলন শুধু আধ্যাত্মিক আন্দোলনেই স্থির থাকেনি। এ আন্দোলন শোষিত মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ লাভ করে। তিনি বাংলার মুসলমান ও গরিব কৃষক শ্রেণির ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেন যা তার পুত্র দুদু মিয়ার সময় অনেকটা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। তার সময়ে মুসলমানদের বিভিন্ন কর দিতে হতো। প্রথমদিকে এটি রাজনৈতিক আন্দোলন না হলেও পরবর্তীতে এ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। যদিও এ আন্দোলন খুব বেশিকাল স্থায়ী ছিল না, তথাপি এ আন্দোলন মুসলিম জাগরণের পাশপাশি ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের অপরিসীম প্রভাবের ফলে মুসলিম জাগরণের পাশাপাশি ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারও ভীত হয়ে পড়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জমির উদ্দিন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত একজন আল্লাহ ভীরু মানুষ। কিন্তু তার এলাকায় অনেকেই কবর পূজা, পির পূজা প্রভৃতিতে বিশ্বাস করত। তাই তিনি এসব ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য সচেষ্ট হন। অল্পদিনে তিনি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় এসব অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে সমর্থ হন। *[কিশোরগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ, কিশোরগঞ্জ]*

ক. দ্বৈত শাসন কে প্রবর্তন করেন? ১
খ. মীর কাসিমের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকের বর্ণিত জমির উদ্দীনের সাথে তোমার পঠিত হাজী শরীয়তুল্লাহর কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের মতোই হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন সফল হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড ক্লাইভ দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন।

খ মীর কাসিমের পুরো নাম মীর কাসিম আলী খান।

তিনি ছিলেন মীর জাফরের জামাতা। তিনি ১৭৬০ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন। ইংরেজরা ১৭৬৩ সালে মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাসিমকে মসনদে বসায়। তিনি ইংরেজ স্বার্থবিরোধী কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন যার ফলে তার সাথে ইংরেজদের বিরোধ বাঁধে এবং ১৭৬৪ সালে তা বক্সারের যুদ্ধে রূপ লাভ করে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জমির উদ্দীনের সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন সাদৃশ্য রয়েছে।

কোম্পানি আমলে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে জনাব 'ক' এর আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম ছিল। ইসলামের নানা অনৈসলামিক রীতিনীতি বন্ধ এবং মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ এ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি মুসলমানদের কুসংস্কার ও নীতিবর্জিত কার্যকলাপ বন্ধের জন্য এ আন্দোলনের সূচনা করেন। যেমনটি 'ক' এর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জমির তার অঞ্চলের জনগণের মধ্য থেকে নানা কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দূরীকরণে আন্দোলন পরিচালনা করেন। একইভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান কবরপূজা, পিরপূজা, উরস, মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি লক্ষ করেন যে, নতুন সৃষ্ট জমিদার-শ্রেণি কর্তৃক মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার হয়। হিন্দুদের পূজায় ও জমিদার সন্তানদের বিদেশে শিক্ষাদানের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দিতে হতো। এমনকি মুসলমানদের দাড়ি রাখার ওপর কর ধার্য করা হয়। এসব দেখে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সংগঠিত করেন, যা ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জমির উদ্দিন এর ধর্মীয় আন্দোলনে বাংলার ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আন্দোলন অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন সফল হতে না পারলেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি— শিক্ষকের এ মন্তব্যটি যথার্থ।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮০২ সালে ভারতে ফিরে এসে মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে ফরায়েজি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এছাড়াও তার এ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি মুসলমানদের সচেতন করা। ব্রিটিশ শাসক ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায়কে প্রতিবাদী করে তোলা।

উদ্দীপকে জমির উদ্দিনের এর ধর্মীয় আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষক বললেন, এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। একইভাবে এই আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ফরায়েজি আন্দোলনও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়নি। কারণ এ আন্দোলন পরবর্তীতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পাথেয় হয়েছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহ জমিদারদের কর প্রদান না করতে ভারতীয়দের নির্দেশ দেন। তিনি এই শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য তার অনুসারীদেরকে লাঠিয়াল বাহিনী গঠনে নির্দেশ দেন। ফলে ভারতীয়রা তাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মোৎসাহী হয়ে ওঠে। আর এভাবে মুসলমানরা ব্রিটিশ ও জমিদারি শোষণের শিকল থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অধিকন্তু এ আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ সম্ভব হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামের পুনর্জাগরণ, কুসংস্কার দূর ও ভারতীয়দের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ফরায়েজি আন্দোলন ইতিহাসে অন্যতম মাইলফলক হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶২৬ মনিকা একদিন তার ইতিহাসের শিক্ষকের কাছে জানতে পারল, এই উপমহাদেশে এমনও সাহসী লোকের জন্ম হয়েছিল যিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লা স্থাপন করে যুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তথা কৃষক শ্রেণির ওপর যে কোনো ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। জোরপূর্বক অলাভজনক এক ধরনের ফসল ফলাতে কৃষকদের বাধ্য করার কারণে তিনি জমিদার ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরি করতে সক্ষম হন।

[সরকারি আকবর আলী কলেজ, উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ]

ক. কত সালে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে মহান ব্যক্তির বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে তার ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এই ধরনের একজন মহান ব্যক্তির আন্দোলন সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়।

খ বঙ্গভঙ্গের পিছনে রাজনৈতিক কারণই মুখ্য ছিল বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর (Divide and rule Policy) নীতির বহিঃপ্রকাশ। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নস্যাৎ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্যেই লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাহসী নেতা হলেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। তিনিই প্রথম ব্রিটিশদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, মনিকা এমন একজন নেতার গল্প শুনল যিনি অত্যাচারী এক শাসকের বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লা স্থাপন করে যুদ্ধ করেছিলেন। এখানে মূলত তিতুমীরের কথা বলা হয়েছে। কেননা তিনি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

তিতুমীর ১৭৮২ সালের ২৭ জানুয়ারি বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-চব্বিশ পরগনার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের দৃশ্যে মর্মাহত হয়ে তিতুমীর আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে কোনো সুবিচার না পেয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন। তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা স্থাপন করেন। প্রাথমিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজ সশস্ত্র বাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন। পরবর্তীতে ইংরেজরা কর্নেল স্টুয়ার্টের অধীনে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলে তিতুমীর ও তার অনুসারীরা তাদের বিপক্ষে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। কামান ও গোলাবর্ষণে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয় এবং তিতুমীর পরাজিত হন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে তিতুমীরের এ সংগ্রামের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ এ ধরনের একজন নেতা অর্থাৎ তিতুমীরের আন্দোলন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল— উক্তিটি যথার্থ।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন অনেক নেতার সন্ধান পাওয়া যায়, যারা তাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জনগণের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। তারা অনিয়ম অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে যুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন। হয়তো তারা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছেন, তথাপি তাদের এ সকল আন্দোলন সংগ্রামের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এমনই একজন নেতা ছিলেন তিতুমীর। তিনি ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। তবে তার আন্দোলনের প্রভাব ছিল ব্যাপক।

তিতুমীরের বিদ্রোহ সফল হয়নি সত্য, তবে একে কোনোভাবেই নিরর্থক বলা যাবে না। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তদানীন্তন বাংলার নিপীড়িত কৃষক ও তাঁতীকূলের সমন্বয়ে পরিচালিত তিতুমীরের আন্দোলনকে একটি গণবিপ্লব বলা যেতে পারে। তার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইংরেজদের গোলাবারুদ নীলকর, জমিদারদের আক্রমণের মুখে তার বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে। এ ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম পরবর্তীকালের সকল আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। তিতুমীরের বিদ্রোহ সফল না হলেও এটি পরবর্তীকালে ভারতীয়দের মুক্তির সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহের মূলে তিতুমীরের এ বিপ্লব প্রেরণা উদ্রেককারী হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল। এভাবেই এ সংগ্রাম বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶২৭ এলাকার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজ 'ক'। অধ্যক্ষ করিম সাহেবের নেতৃত্বে কলেজটি সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছিল। তিনি সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেন এবং আলফাজ সাহেব নতুন অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কলেজের আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মানুযায়ী একাডেমিক দায়িত্ব পালন করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ সাহেব। একাডেমিক বিষয়ের যাবতীয় ব্যয় তার দ্বারাই নির্বাহ করা হয়। এ ব্যাপারে নতুন অধ্যক্ষ সাহেবের যথাযথ সহযোগিতার অভাবে উপাধ্যক্ষ

https://teachingbd24.com

সাহেবের পক্ষে একাডেমিক ব্যয় সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সাহেবের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এতে একাডেমিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কলেজের চলতি এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় ঘটে। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সাহেবের দ্বন্দ্বের কারণে কলেজটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. বঙ্গভঙ্গ হয় কত সালে? ১

খ. যোগ্য ও শক্তিশালী মুসলিম নেতৃত্বের অভাবই খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলার ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকের গৃহীত কোন শাসন ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসন ব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? যুক্তি দেখাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯০৫ সালে।

খ যোগ্য ও শক্তিশালী মুসলিম নেতৃত্বের অভাবই খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

খিলাফত আন্দোলনের এক পর্যায়ে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে খিলাফত আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মতো উপযুক্ত নেতার অনুপস্থিতির ফলে আন্দোলনে সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমদিকে গৃহীত দ্বৈত শাসনব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি সনদের মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন। আবার নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ক্লাইভ এ দেশে একটি অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন, যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এতে দেওয়ানি ও দেশ রক্ষার ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। উদ্দীপকেও ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির এ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' কলেজের অধ্যক্ষ আলফাজ সাহেব কলেজের আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং একাডেমিক দায়িত্ব পালন করেন উপাধ্যক্ষ সাহেব। অধ্যক্ষ সাহেবের যথাযথ সহযোগিতার অভাবে উপাধ্যক্ষ সাহেবের পক্ষে একাডেমিক ব্যয় সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

ঘ হ্যাঁ; আমি মনে করি, উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

দ্বৈতশাসনের অর্থ হলো দুইজনের শাসন। এ ব্যবস্থায় নিয়ামত বা বাংলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তি রক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে। অন্যদিকে বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমি-জায়গার বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ণ ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় নবাব পেল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। উদ্দীপকের দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনের এ অভিনব নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে অধ্যক্ষ আলফাজ সাহেব কলেজের আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং উপাধ্যক্ষ একাডেমিক ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সাহেবের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে কলেজটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থার ফলে বাংলার অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের মতোই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছিল; যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বিংশ শতাব্দীর এক কালজয়ী পুরুষ অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ। তিনি একাধারে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম প্রিন্সিপাল, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা,পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বহু ভাষাবিদ, বরেণ্য সাহিত্যিক। মুসলিম লীগ হয়েও পাকবাহিনীর নৃশংসতায় ব্যথিত হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা বর্জনকারী। জাতির এহেন ক্রান্তিকালে তার মতো সজ্জনের আর্বিভাব অতীব জরুরি। *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. তিতুমীর বাঁশের কেল্লা কোথায় নির্মাণ করেন? ১

খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সাথে নওয়াব আব্দুল লতিফের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির অবদান মূল্যায়ন করো।. ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীর নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সাথে নবাব আব্দুল লতিফের অবদানের সাদৃশ্য রয়েছে।

উনিশ শতকের অন্যতম মুসলিম নেতা ও সমাজকর্মী নবাব আব্দুল লতিফ। ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে যখন বাংলার মুসলমানগণ হতাশাগ্রস্ত ও অসংগঠিত তখন তাদের পাশে যে কয়জন মনীষী এগিয়ে আসেন নবাব আব্দুল লতিফ তাদের মধ্যে অন্যতম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ বাংলার প্রথম মুসলিম প্রিন্সিপাল। তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। অনুরূপভাবে নবাব আব্দুল লতিফও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তার প্রচেষ্টায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। নবাব আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি, ফার্সি বিভাগ খোলা হয়। তিনিই প্রথম মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার দাবি জানান। ফলে ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং সব সম্প্রদায়ের ছাত্ররা এখানে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইব্রাহিম খাঁর সাথে নবাব আব্দুল লতিফের শিক্ষা প্রসারের মিল রয়েছে।

ঘ বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির অবদান অপরিসীম।

১৮৬৩ সালে নবাব আব্দুল লতিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি ছিল মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একমাত্র সংগঠন। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে জনমত তৈরি করা এবং তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা। মুসলমানদের সার্বিক উন্নয়নে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যকর্ম ও শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির মাসিক সভায় ইতিহাস, বাণিজ্য, কলা, কৃষিবিদ্যা, ভূগোলসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ও সমাজ উন্নয়নমূলক নানা বিষয় আলোচনা করা হতো। এ সোসাইটির মাধ্যমে কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজি ভাষায়ও সাহিত্য বিভাগ খোলা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সোসাইটি বাংলার মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। এ সোসাইটিতে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার ওপর আলোচনা হতো। মুসলিম ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় সাধনের জন্য মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সোসাইটি মুসলমানদের প্রতি অন্যায় আচরণমূলক আইনগুলো সম্পর্কে সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলমানদের দুর্ভোগ লাঘব করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। প্রগতিশীল কার্যাবলি ও চিন্তাধারার জন্য এ সোসাইটি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ সোসাইটির উদ্যোগের ফলে মুসলমানরা সচেতন হয় এবং আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার মুসলমানদের পুনর্জাগরণে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির ভূমিকা অগ্রগণ্য।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৯ নাসির সাহেব যে এলাকার মানুষ সে এলাকায় এক সময় তেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে এলাকার মানুষ অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন ছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্কুল কলেজ থাকায় সেখানকার লোকজনের চেয়ে নাসির সাহেবের এলাকার মানুষ ছিল সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে। তাই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে নাসির সাহেব তার এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং গরিব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অর্থ সহায়তার ব্যবস্থা করেন।

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ]

ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের নাসির সাহেবের এলাকার লোকজনের সাথে ভারতের কোন জাতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিক্ষা-বিস্তারে নাসির সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কর্মকাণ্ডে বিশদ বর্ণনা দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজি মুহম্মদ মোহসিন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন।

খ ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকেই ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রভু হয়েই ইংরেজ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের ওপর দমন ও শোষণ নীতি গ্রহণ করেছিল। ফলে মুসলমানদের মনে ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ইংরেজরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণেও মুসলমানগণ তাদের শাসনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এ সকল কারণেই তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নাসির এলাকার লোকজনের সাথে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের বাঙালি জাতির সামঞ্জস্য দেখা যায়।

পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে বাঙালি জাতি এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিপতিত হয়। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ে বাঙালি জাতি নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। 'ব্রিটিশদের সকল কাজকর্ম কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে ঐ অঞ্চলে শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি ঘটলেও পূর্ব বাংলার জনগণ এ থেকে চরম বঞ্চনার শিকার হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, নাসির সাহেব এলাকার চেয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন তাদের এলাকায় স্কুল, কলেজ এবং মাদরাসা থাকায় সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। ফলে নাসির সাহেবের এলাকা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ববাংলার বাঙালিরা বিশেষ করে মুসলমানগণ পশ্চিম বাংলার চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের রাজধানী কলকাতায় হওয়ার কারণে সেখানে অনেক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা গড়ে ওঠে। এছাড়া সে অঞ্চলে বিভিন্ন কলকারখানা, অফিস আদালতও গড়ে ওঠে। সেই তুলনায় পার্শ্ববর্তী পূর্ব বাংলা এ সকল ক্ষেত্রে অবহেলিত হতে থাকে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে এ অঞ্চলের জনগণ শিক্ষা অর্জন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে শিক্ষা বিস্তারে নাসির সাহেবের অবদানের সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের অবদানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙালি জাতি বিশেষ করে মুসলমানগণ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। শিক্ষা-দীক্ষা সকল ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে পড়ে। জাতির এমন দুর্দিনে বাংলায় কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাদের নানামুখী তৎপরতায় এ অঞ্চলের জনগণের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এমনই একজন মনীষী ছিলেন হাজি মুহম্মদ মোহসিন, যার কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের নাসির সাহেবের কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, নাসির সাহেব শিক্ষাক্ষেত্রে তার এলাকার জনগণকে পিছিয়ে পড়তে দেখে নিজ এলাকায় একটি ডিগ্রি কলেজ, একটি হাই স্কুল, একটি গার্লস স্কুল এবং একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য অর্থ সহায়তাও করেন। একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিনও দরিদ্র মুসলমানদের শিক্ষা প্রসারের জন্য অনেক অবদান রাখেন। তার গঠিত ফান্ডের টাকা দিয়ে হুগলি মাদরাসা ও হুগলি মোহসিন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ টাকা দিয়ে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। তার ফান্ডের টাকা দিয়ে নতুন নতুন আরও স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ করা হয়। তার টাকায় ঢাকা, হুগলি, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদরাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাঙালিদের শিক্ষা বিস্তারে হাজি মুহম্মদ মোহসিন অপরিসীম অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩০ ১৯ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্স ভিয়েতনাম আক্রমণ করে। তারা দেশটিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে। ফরাসিদের উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনামিদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করে দেয়া। তারা ভিয়েতনামকে ভাগ করে ভিয়েতনামের সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করতে তৎপর হয়। পরবর্তীতে ভিয়েতনামের উপনিবেশবাদ বিরোধীরা সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে ফরাসিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

[নিউ গভ: ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক কে? ১

খ. মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ভিয়েতনাম ভাগের সাথে তোমার পঠিত বঙ্গভঙ্গের সাথে মিল কোথায়? চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের আন্দোলনের সাথে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো যোগসূত্র আছে কী? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক লর্ড কর্ণওয়ালিস।

খ স্বার্থের অনুকূলে ছিল বলে মুসলমানগণ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ কার্যক্রমটি সমর্থন করেছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি এবং একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাই নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমতকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। তিনি মনে করতেন বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের উদ্দীপ্ত করেছে কর্ম-সাধনায় এবং সংগ্রামে। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা পেয়েছিল। তাই তারা এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল।

গ উদ্দীপকের ভিয়েতনাম ভাগের সাথে বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি বা বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন কার্যক্রম পরিচালনার নীতি হলো ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের একটি চিরায়ত পদ্ধতি। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তারা শাসনাধীন অঞ্চলকে ভাগ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করত। এভাবে তারা তাদের অন্যায় শাসনকে আরও স্থায়ী করার চেষ্টা চালাত। উদ্দীপকের ভিয়েতনাম ভাগের ক্ষেত্রেও এরূপ পরিস্থিতি লক্ষণীয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ভিয়েতনাম যখন ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত হয় তখন ফ্রান্স ভিয়েতনামকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনামিদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা। উপনিবেশবাদের এই রাজনৈতিক ধারা ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিশ শতকের শুরুতে ভারতে যে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলা, বিশেষত এর রাজধানী কলকাতা। তাই বাংলাকে বিভক্ত করে ব্রিটিশরা বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার অশুভ উদ্দেশ্যই ছিল তাদের মূল পরিকল্পনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত ভিয়েতনাম ভাগ এবং বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক কারণই মুখ্য হয়ে ওঠে।

https://teachingbd24.com

ঘ স্ব স্ব স্বার্থরক্ষার দিক বিবেচনায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের আন্দোলনের সাথে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন করা যায়।

যেকোনো আন্দোলনের পেছনে স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপকের ভিয়েতনামিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে তাদের স্বার্থ ছিল উপনিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করা। অন্যদিকে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের আন্দোলনের পেছনে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল।

উদ্দীপক থেকে দেখা যায়, আন্দোলনের মাধ্যমে ভিয়েতনাম (১৯৫৪ সালে) ফ্রান্সের উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ফ্রান্স ভিয়েতনামকে ভাগ করেও তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বুঝতে পারেনি। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ভিয়েতনামিরা আবার এক হয়েছে। ভিয়েতনামিদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেক রূপ যেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে নতুন প্রদেশে পৃথক হাইকোর্ট গঠনের সিদ্ধান্তে হিন্দু আইনজীবীদের বৈষয়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এতে তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বস্তুত তারা মনে করেছিলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমানদের রাজত্ব হবে এবং হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। এ কারণে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে এবং বঙ্গভঙ্গকে মাতৃভূমি বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। পরবর্তীতে হিন্দুদের আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলন ও ভিয়েতনামিদের স্বাধীনতা আন্দোলন পরোক্ষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩১ সবুজ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে জানতে পারে একটি দেশের দখলদার সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে দেশের একটি বড় প্রদেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করে। কিন্তু একটি বিশেষ অংশের জনগণের আন্দোলনের মুখে কয়েক বছর পর এ বিভক্তি রদ করা হয়।

[দিনাজপুর সরকারী কলেজ]

ক. বাঁশের কেল্লা কে নির্মাণ করেন? ১

খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে তোমার পঠিত বই-এ কোন বিভক্তি ও রদের কথা বলা হয়েছে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. পাঠ্য-পুস্তকে উল্লিখিত বিভক্তি এবং রদের ফলে নতুন প্রদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী সুফল এনেছিল? আলোচনা করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

খ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে স্বাধীন রাষ্ট্র ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গের এবং বঙ্গভঙ্গ রদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালীন ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এ বিভক্তি উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে সুপরিচিত। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষনীয় যে, সবুজ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারে একটি দেশের দখলদার সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে দেশের একটি বড় প্রদেশকে দু'টিভাগে ভাগ করে কিন্তু একটি বিশেষ অংশের জনগণের আন্দোলনের মুখে কয়েক বছর পর এ বিভক্তি রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা হয়। এজন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এছাড়া পুঁজিপতি, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় বা জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। উদ্দীপকে বর্ণিত একটি দেশের বড় প্রদেশকে দুইটি অংশে ভাগ করে পুনরায় তা একটি দেশে পরিণত করার সাথে বাংলার ইতিহাসের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বিভক্তি অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে নতুন প্রদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সুফল বয়ে এনেছিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হয় এবং ১৯১১ সালে তা রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্দীপকেও বঙ্গভঙ্গ ঘটনার বিষয়টিই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের সবুজ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে বঙ্গভঙ্গ ও তার রদ সম্পর্কে জানতে পারে। বঙ্গভঙ্গ পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলিম সমাজ ও রাজনীতিতে বঙ্গভঙ্গের ফলে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় হাইকোর্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট আইন পরিষদ ভবনসহ বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হতে থাকে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ সচেতন হয়ে ওঠায় তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক প্রভাব পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি অর্জিত হয়। পূর্বে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন গঠিত প্রদেশের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানরা নিজেদের অধিকার আদায়ে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের ও তা রদের ফলে পূর্ববাংলার জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶৩২ বাসির উদ্দিন মোল্লা অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অপুত্রক হওয়ায় তার সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হারুন মিয়াকে উইল করে দিয়ে যান। হারুন মিয়া চরাঞ্চলের একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ হলেও তার এলাকায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই হারুন মিয়া প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে শ্বশুরের নামে একটি কলেজ, মায়ের নামে একটি মাদ্রাসা এবং নিজ নামে স্কুল অত্র এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরিব ও মেধাবী ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে এসময়ে গরিব ও মেধাবী ছেলে মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে? ১

খ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেন ঘটেছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে ইঙ্গিতকৃত কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে হারুন মিয়ার কর্মকাণ্ডের ন্যায় ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

খ লর্ড ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ফলে এবং প্রাকৃতিক কারণে বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাছাড়া ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত টানা তিন বছর বৃষ্টির অভাবে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। ভালো ফসল না হওয়ার পরও কোম্পানি করের হার না কমিয়ে বরং বৃদ্ধি করতে থাকে। যার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে ১৭৭০ সালে দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলা ১১৭৬ সনে এ দুর্ভিক্ষ হয় বলে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের বৈপিত্রেয় বোন মনুজানের মিল রয়েছে।
উদ্দীপকে বাসির উদ্দিন মোল্লা যেমন তার অগাধ সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হারুন মিয়াকে উইল করে যান তেমনি মনুজানও তার সকল সম্পত্তি হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে দিয়ে যান।
হাজি মুহম্মদ মোহসিনের মাতা জয়নব খানমের তার পিতা হাজী ফয়জুল্লাহর সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে আগা মোতাহার বলে একজন ধনাঢ্য ইরানি ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে হয়েছিল। মনুজান ছিলেন আগা মোতাহারের ঔরসজাত সন্তান। হুগলি, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া অঞ্চলে আগা মোতাহারের বিস্তীর্ণ জায়গির ভূমি ছিল। তিনি তার এ ভূ-সম্পত্তি তার একমাত্র সন্তান মনুজানের নামে উইল করে দেন। তাছাড়া মনুজানের স্বামী হুগলির নায়েব-ফৌজদার সালাউদ্দিনের বিপুল সম্পত্তি ছিল। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মনুজান তার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হন। বিধবা নিঃসন্তান মনুজান তার এ বিশাল ধন সম্পত্তি তদারকি ও পরিচালনার জন্য তার ভাই হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে অনুরোধ করেন। বোনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮০৩ সালে মনুজানের মৃত্যুর পর হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার সৈয়দপুর জমিদারিসহ সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। আর এসব সম্পত্তি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে হারুন মিয়ার কর্মকাণ্ডের ন্যায় ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যক্তি অর্থ্যাৎ হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কর্মকান্ড শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।
মহসীন সকল ধর্মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করতেন। তার টাকায় হুগলি, ইমামবাড়া, কলেজ, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস তৈরি হয়। তিনি নিজের প্রয়োজনের জন্য সামান্য অর্থ রেখে বাকি অর্থ গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। ১৭৬৯-১৭৭০ সালের সরকারি রেকর্ডপত্রে হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে একজন মানব হিতৈষী ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।
হাজি মুহম্মদ মোহসিন যেমন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং গরিব ও মেধাবী ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, ঠিক একইভাবে হারুন মিয়াও পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা দূর করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হারুন মিয়া যে জনহিতৈষী কাজ করেছেন হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে তার আদর্শ মানব বলা যায়। তার কর্মকাণ্ড মহসীনের কৃতিত্বকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে হারুন মিয়া ভিন্ন আঙ্গিকে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কৃতিত্ব তুলে ধরেছে। তার কর্মকাণ্ড শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাব আর পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। এ বিভক্তির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্রীকরণ করা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো, জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ এর সাথে ইঙ্গিতকৃত ঘটনার পরিণতিতে কি একই ছিল? মতামত দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নবাব আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ সুহেল ও ফিরোজ দুই ভাই। পিতার মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত সোনার দোকানের মালিকানা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বড় ভাই সুহেল সোনার দোকান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং ছোট ভাই ফিরোজ সংসার দেখাশুনা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় ভাই দোকান এবং ছোট ভাই সংসার দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু দোকানের আয় থেকে ছোট ভাইকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। যার ফলে বাবার প্রতিষ্ঠিত সোনার দোকানটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। *[মদন মোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. ওহাবী মানে কী? ১
খ. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সময় সংঘটিত অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডকে তথাকথিত বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষমতা ভাগাভাগি বাংলায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমদিকে গৃহীত কোন শাসন ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত শাসন ব্যবস্থাও বাংলার অর্থনীতিতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওহাবী হলো ইসলামের একটি শাখাগোষ্ঠী।

খ অন্ধকূপ হত্যা ছিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে প্রচারিত একটি মিথ্যা অভিযোগ। তাই এ হত্যাকাণ্ডকে তথাকথিত বলা হয়।
নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট বন্দি হলওয়েল মিথ্যা প্রচারণা চালায়। সে নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪,১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ছোট একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে এদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। বাকি ২৩ জন কোনো রকমে বেঁচে যায়। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত ভিত্তিহীন কাহিনী 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আয়তন দিন দিন বেড়েই চলছে। সেই সাথে বাড়ছে লোকসংখ্যা। একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে এ বিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ভেঙে দু ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ। এর উদ্দেশ্য হলো জনগণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। *[মদন মোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. খেলাফত আন্দোলনের নেতার নাম কী? ১
খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২
গ. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর শুধু প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই উক্ত ঘটনা ঘটেছিল? যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খেলাফত আন্দোলনের নেতা মোহাম্মদ আলী।

খ লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। ভারতের যেসব অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমন্বয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে। এভাবে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো থাকবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের দাবিই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক এ লাহোর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

গ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তির সাথে পাঠ্যবইয়ের বঙ্গভঙ্গের সাদৃশ্য রয়েছে।
ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ ঘটনা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভারতের

https://teachingbd24.com

বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেন। ভাগ হবার পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। বাংলা প্রদেশের আয়তন বিশাল হবার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার মহলে উপস্থাপিত হয় যার ফলে বঙ্গকে বিভক্ত করা হয়।
তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এই বিশাল আয়তনবিশিষ্ট বঙ্গ প্রদেশটি একজন প্রশাসকের পক্ষে রাজধানী কলকাতা থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। এজন্য প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে দুটি প্রদেশে পরিণত করেন।

ঘ না আমি মনে করি প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ হলেও এর পেছনে আরও অনেক কারণ ছিল।
বঙ্গভঙ্গের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের অনেক বড় রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এসব আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। তাই লর্ড কার্জন ঢাকাকে রাজধানী করে কলকাতাভিত্তিক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে এ আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। এই জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের অনুকূলে ছিল না। তাই সুচতুর ব্রিটিশ সরকার তাদের চিরাচরিত 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি চরিতার্থ করার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সির জনসাধারণের মাঝে সাম্প্রদায়িক বীজ ছড়িয়ে দেয়। এই সময় পূর্ব বাংলার জনগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হয় এবং পৃথক আবাস ভূমির দাবি তোলে। এই দাবি পূরণের ফলস্বরূপ বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। এছাড়া বঙ্গভঙ্গের পিছনে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও মুখ্য ছিল। তাই বলা যায় যে, শুধু প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই বঙ্গভঙ্গ ঘটেনি।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা কয়লার ব্যবসার মাধ্যমে অঢেল সম্পদের মালিক হন। কিন্তু এ ধনসম্পদ তিনি নিজের ভোগ-বিলাসে খরচ না করে তা আর্তমানবতার সেবায় এবং শিক্ষা বিস্তারে ব্যয় করেন। প্রথমেই তিনি মির্জাপুরে মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করেন কুমুদিনী হাসপাতাল। এছাড়া নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতেশ্বরী হোমস, কুমুদিনী কলেজ ও দেবেন্দ্র কলেজ।
[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

ক. The Spirit of Islam এর লেখক কে? ১
খ. বাংলার নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে কীভাবে? ২
গ. দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দানশীল বিদ্যানুরাগী মহাপুরুষের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনহিতকর কাজে উক্ত মহাপুরুষের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'The Spirit of Islam'-এর লেখক সৈয়দ আমীর আলী।

খ বাংলায় বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণকে বলা হয় নবজাগরণ। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় জীবন ও বিশ্বাসের নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়। এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক জীবনধারাকে প্রবাহিত করে। এতে বাংলায় নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। ভারতীয় মনীষীগণ তাদের উন্নত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৈতিক ভাবাদর্শের দ্বারা নানা সংস্কারমূলক কাজে অবদান রাখেন। এতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে।

গ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের দানশীল ও বিদ্যানুরাগী মহাপুরুষ হাজি মুহম্মদ মোহসিনের মিল রয়েছে।
বাংলার হাতেম তাই নামে পরিচিত হাজি মুহম্মদ মোহসিন ছিলেন অত্যন্ত জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব। বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংযমী জীবন যাপন করতেন। নিজের সমুদয় সম্পত্তি তিনি মানবকল্যাণে উদারহস্তে দান করেন। আর তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই উদ্দীপকে বর্ণিত রণদা প্রসাদ সাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। রণদা প্রসাদ সাহা অঢেল সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের ভোগ-বিলাসে খরচ করেননি। আর্তমানবতার সেবা এবং শিক্ষা বিস্তারে তিনি তার সম্পত্তি ব্যয় করেন। একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার বোনের কাছ থেকে পাওয়া বিশাল ধন-সম্পত্তি বাংলার গরিব মেধাবী শিক্ষার্থী, দুস্থ-অসহায়দের কল্যাণে দান করেন। সুতরাং দেখা যায়, দানশীলতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের রণদা প্রসাদ সাহা এবং হাজি মুহম্মদ মোহসিন একে অন্যের প্রতিরূপ।
হাজি মুহম্মদ মোহসিন শিক্ষার পেছনে তার সম্পদ ব্যয় করেন।

ঘ উক্ত মহাপুরুষ অর্থাৎ হাজি মুহম্মদ মোহসিন জনহিতকর কাজে অসামান্য অবদান রেখেছেন।
দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা যেমন তার সকল ধন-সম্পদ আর্তমানবতার সেবায় এবং শিক্ষা বিস্তারে ব্যয় করেন, ঠিক একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিনও তার সকল সম্পত্তি জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন। হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার সমুদয় অর্থ শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা এবং দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেন।
শিক্ষা বিস্তারে হাজি মুহম্মদ মোহসিন হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতি সাধনে প্রচুর অর্থ দান করেন। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে ১৮০৬ সালে একটি ফান্ড গঠন করে জনহিতকর কাজে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। মহসীন ফান্ডের অর্থে তার মৃত্যুর পর ১৮৩৬ সালে হুগলি মহসীন ফান্ড, হুগলি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১৮৪৮ সালে হুগলিতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোহসিন ফান্ডের বৃত্তির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান তরুণ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। বাংলার মুসলমান সমাজকে যারা পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন, তাদের অগ্রদূত সৈয়দ আমীর আলীও ছিলেন সুবিধা প্রাপ্ত একজন। উদ্দীপকের দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা যেমন আর্তমানবতার সেবায় শিক্ষা বিস্তারে নিজের সকল অর্থ ব্যয় করেছেন, ঠিক একইভাবে হাজি মুহম্মদ মোহসিনও তার সকল অর্থ নিজে ভোগ না করে জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন।
উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, হাজি মুহম্মদ মোহসিন ছিলেন অত্যন্ত দানশীল এবং বিদ্যানুরাগী, যা তাকে জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয়ে প্রেরণা দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ সৌদি আরবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব। মুসলিম সমাজে পিরপূজা, কবরপূজা, কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য মানত প্রভৃতি কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত ছিল। তিনি এগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। পিরপূজা, দরবেশদের পূজা, কবর দর্শন প্রভৃতি তিনি নিষিদ্ধ করেন। তার পরিচালিত এই আন্দোলন "ওহাবি আন্দোলন" নামে পরিচিতি ছিল। তার এই আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন এবং জনগণকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে।
[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভ করে? ১
খ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রভাব কীরূপ ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারকের সাথে তোমার পঠিত কোন সমাজ সংস্কারকের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের সংস্কারের ন্যায় উক্ত সংস্কারকের সংস্কার আন্দোলন এক ও অভিন্ন? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভ করে।

খ ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য।
দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানি আইনত ও কার্যত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়েই কোম্পানি বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করার সুযোগ লাভ করে। ফলে বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ দেওয়ানি শাসনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এবং পরে সমগ্র ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারকের সাথে আমার পঠিত সমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহর মিল লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব ধর্মীয় নেতা সমাজ সংস্কারক ছিলেন তার মধ্যে হাজি শরীয়তুল্লাহ অন্যতম। তৎকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কবরপূজা, পিরপূজা, উরস ও মানতের মতো নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হন এবং এগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। তিনি কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কবরপূজা, নৃত্যগীত ইত্যাদি শিরক ও অনৈসলামিক কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের উপদেশ দেন। পূর্ব বাংলায় অধঃপতিত মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলাম ধর্মের আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে আল্লাহ মনোনীত সকল ফরজ কাজ সম্পাদনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তার এ আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, সৌদি আরবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনাকারী মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব মুসলিম সমাজে পিরপূজা, কবরপূজা, কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানত প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তার পরিচালিত এ আন্দোলন ওহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। তিনি এ আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন এবং জনগণকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন। ঠিক এভাবেই হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজে ধর্মীয় জাগরণের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যায়, উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারের সাথে হাজী শরীয়তুল্লাহর সমাজ সংস্কার সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের সংস্কারকের সংস্কার আন্দোলন এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এক ও অভিন্ন বলে আমি মনে করি।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম। তার এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একদিকে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা এবং অন্যদিকে ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। তৎকালীন মুসলিম সমাজকে কবরপূজা, পিরপূজা, মানত করা প্রভৃতি ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ইসলামের মূলনীতি অর্থাৎ ফরজের দিকে মুসলমানদের পরিচালিত করাই হাজী শরীয়তুল্লাহর এ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। একইভাবে উদ্দীপকের সমাজ সংস্কারকও তার ওহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পিরপূজা, কবরপূজা, মানত, পির-দরবেশদের প্রতি অনুরক্ত থাকা প্রভৃতি নানাবিধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে ইসলামের মূলনীতি তথা প্রকৃত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালান। এছাড়া তিনি তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন। হাজি শরীয়তুল্লাহও তার ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণের পাশাপাশি অত্যাচারী ব্রিটিশ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে প্রতিবাদী করে তুলতে সক্ষম হন। তিনি তার অনুসারীদেরকে জমিদারদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেন। এভাবে সাধারণ জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, উদ্দীপকের সংস্কারকের আন্দোলনের ন্যায় হাজি শরীয়তুল্লাহর সংস্কার আন্দোলনও একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶৩৮ জনাব গিয়াস সাহেব একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি ১৮ বৎসর বয়সে মক্কা শরিফ গমন করেন এবং ২০ বৎসর পরে হজ্জ পালন শেষে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফিরে আসেন। তিনি বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন। তিনি ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় কাজের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। উচ্চ শ্রেণির ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তার কাজ চালিয়ে যান। পরবর্তীতে এটি আন্দোলনে রূপ নেয়। *[শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সামরিক কারণ সম্পর্কে কী জান? ২

গ. গিয়াস সাহেবের কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্যবই এর কোন সংস্কারের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন কতখানি সফল হয়েছিল? পরবর্তী কোনো আন্দোলন কী এই আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী।

খ সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল সামরিক বাহিনীতে বৈষম্য।

ইংরেজরা দেশীয় সৈন্যদের স্বার্থবিরোধী অনেক কাজ করে। যেমন পদোন্নতির ব্যাপারে ভারতীয় অভিজ্ঞ সামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সিপাহির কোনো সুযোগ ছিল না, অথচ অনভিজ্ঞ ইংরেজ সৈন্যদের পদোন্নতি দিয়ে উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়া হতো। সীমাহীন বেতন বৈষম্য, জোরপূর্বক বিদেশে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা ও অন্যান্য নানা কারণে ভারতীয় সিপাহিদের ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট করে তোলে এবং সিপাহি বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

গ সৃজনশীল ১৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন পুরোপুরি সফল হয়েছিল।

আঠার শতকে যেসব আন্দোলন সংগ্রাম বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল ফরায়েজি আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ যখন কুসংস্কারের নিমজ্জিত, গরিব কৃষক, নিরীহ জনসাধারণ যখন ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতদুষ্ট বিচার-ব্যবস্থা ও অত্যাচারে জর্জরিত সেই ক্রান্তিকালে আর্বিভাব ঘটে হাজী শরীয়তুল্লাহর। তার এ আন্দোলন-সংগ্রাম পরবর্তীতে তিতুমীরের আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।

উদ্দীপকে দ্রষ্টব্য যে, জনাব গিয়াস সাহেব মক্কায় হজ পালন শেষে দেশে ফিরে সেখানে বিদ্যমান নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ও তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্ক সচেতন করেন। যা হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত তিনি পূর্ব বাংলার অধ:পতিত মুসলিম সমাজের ইসলামের মূলনীতিতে ফিরিয়ে আনার ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করেন। তার পুত্র দুদু মিয়ার সময় এ আন্দোলন একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামোয় প্রজা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আন্দোলনের প্রভাব আমরা পরবর্তীতে তিতুমীরের আন্দোলনের লক্ষ করি। তিনিও সমাজসংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনিও বিভিন্ন অনৈসলামিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গড়ে তোলেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তীকালে তিতুমীরের আন্দোলনেও পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶৩৯ সাদিয়া তার দাদার কাছ থেকে জানতে পারে যে, এক বিদেশি বাণিজ্য সংস্থার কাছে বাংলার রাজ্যশক্তি সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হয়। সাদিয়ার দাদা আরো জানান, রাজ্য শক্তির নিকটতম আত্মীয় সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা ও কাজে সহায়তা করেছিল, সাদিয়ার দাদা মতামত দেন যে, উক্ত সংস্থার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে বাংলার এক যুগের সূচনা করে। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*

ক. ঈশা খান কে ছিলেন? ১

খ. অন্ধকূপ হত্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সাদিয়ার দাদা কোন যুদ্ধের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাদিয়ার দাদার সর্বশেষ মতামতটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশা খান ছিলেন বাঁর ভূইয়াদের নেতা।

খ 'অন্ধকূপ হত্যা' প্ররোচনা ছিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে প্রচারিত একটি মিথ্যা অভিযোগ।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট বন্দি হলওয়েল মুক্তি পেয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালায় যে, নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে ১৮ ফুট

Teachingbd24.com

দৈর্ঘ্য ও ১৪.১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ছোট একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে এদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়। বাকি ২৩ জন কোনোরকমে বেঁচে যায়। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত এ কাহিনি 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত।

গ সাদিয়ার দাদা পলাশির যুদ্ধের কথা বলেছেন।

পলাশির যুদ্ধ শুধু বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয় বিশ্ব ইতিহাসেও একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ব্রিটিশ কোম্পানির চতুর কর্মচারীরা নবাব বিরোধী স্বার্থান্বেষী কিছু বিশ্বাসঘাতকের সাথে সন্ধি করে এ নবাবকে পরাজিত করে। উদ্দীপকেও পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে এ বিষয়গুলোই বলা হয়েছে।

সাদিয়ার দাদা বলেন বাংলার রাজশক্তি তার নিকটতম আত্মীয়দের বিশ্বাস ঘাতকতায় বিদেশি বাণিজ্য সংস্থার সাথে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হয়। এখানে মূলত পলাশির যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির রণ প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে নবাবের খালা ঘষেটি বেগম, সেনাপতি মির জাফর, রাজদরবারের কিছু উচ্চপদস্থ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ কোম্পানির পক্ষাবলম্বন করে। প্রহসনের এ যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হয়। এ ঘটনায় শুধু বাংলার তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতন হয়নি, বাংলার নবাব সরকার যুগেরও কার্যত অবসান ঘটে। আর সাদিয়ার দাদার বক্তব্যও এ বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ সাদিয়ার দাদার সর্বশেষ মন্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

উদ্দীপকে সাদিয়ার দাদার সর্বশেষ মতামত হলো, উক্ত সংস্থার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে বাংলায় নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি মূলত পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার ক্ষমতা দখলের কথা বলেন। সত্যিকার অর্থেই ইংরেজ কোম্পানির শাসনক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলা একটি নতুন যুগে পদার্পণ করে।

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসনের শুরু হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করে। এর মধ্যদিয়ে বাংলা সহ সমগ্র ভারতবর্ষে মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ইংরেজদের মাধ্যমে ভারতের সামরিক সংগঠন, আইন-কানুন, শিক্ষাদীক্ষা ও শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এ সময় মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতি অবহেলার শিকার হয় এবং ভাতরবর্ষে মুঘল শিক্ষা ও সভ্যতার স্থলে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। প্রফেসর এস আহমদের মতানুসারে বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ পানিপথের যুদ্ধের মতোই স্মরণীয় ও মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুপ্রবেশের সহজ সুযোগ তৈরি হয়। আর ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ছিল ভারতবর্ষের নিকট যুগের অগ্রবর্তী ঘটনা, যা ভারতীয়দেরকে প্রভাবিত করে। তাই বলা যায়, কোম্পানির ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে এক নবযুগের সূত্রপাট ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ মিসরের সেনা অভ্যুত্থানের সংবাদটি পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর এক বিপ্লবের কথা মনে পড়ে যায় গবেষক মোবিন আহমেদের। পাশে বসা ছেলেকে বিপ্লবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন— তৎকালীন শাসকের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, দেশীয় জনগণের ক্ষমতা রহিতকরণ, দত্তক পুত্রের অধিকার অস্বীকার, সেনাদের মধ্যে বৈষম্য বিভিন্ন বিষয়ে দেশীয় জনগণের সমর্থন নিয়ে সৈনিকরা শাসকদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লব সংঘটিত করে। সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এ বিপ্লব ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. তিতুমীর কে ছিলেন? ১

খ. 'বঙ্গভঙ্গের পিছনে রাজনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল'— কথাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ভারতীয় উপমহাদেশের যে বিপ্লবের চিত্র ফুটে উঠেছে তার রাজনৈতিকও অর্থনৈতিক কারণ লিখ। ৩

ঘ. 'উক্ত বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও পরবর্তীতে স্বাধীনতাকামীদের অনুপ্রাণিত করে—ব্যাখ্যা করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীর ছিলেন বাংলার নীলবিদ্রোহের নেতা।

খ বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক কারণই মুখ্য ছিল বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর (Divide and Rule Policy) নীতির বহিঃপ্রকাশ। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নস্যাৎ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্যেই লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করেন।

গ মোবিন আহমেদের বক্তব্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাই সিপাহি বিপ্লব নামে পরিচিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এ বিপ্লবের পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল। এ কারণগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল। এ সময়ে লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি নামে রাজ্য বিস্তারের এক অভিনব নীতি গ্রহণ করেন। এ স্বত্ববিলোপ নীতি দ্বারা দেশীয় রাজাগণের বহুদিনের দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করা হয়। এ নীতির ফলে কর্ণাটের নবাব নানা সাহেব সহ অনেকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া লর্ড কর্নওয়ালিশের শাসন সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানদের উচ্চ রাজপদ হতে বাদ দেওয়া হয়। এসকল কারণে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পেছনের অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। এসময় ইংরেজদের ভূমি নীতির ফলে বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক তাদের সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব প্রমাণ করতে না পারায় সম্পত্তি হারিয়ে ভূমিদখলকারী ইংরেজ কোম্পানির শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগ করে দেশীয় জমিদার আত্মসাৎ করে নেয়। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য ব্রিটেন থেকে এনে বাজারে বিক্রির ফলে দেশীয় অর্থনীতি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইংরেজরা এদেশের স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী লুটপাট করে। এছাড়াও কোম্পানি সরকার কর্তৃক ইংরেজ ও দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ছিল। আর এ সকল কারণই সিপাহি বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে।

ঘ উক্ত বিপ্লব অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও স্বাধীনতাকামীদের অনুপ্রাণিত করে— উক্তিটি যথার্থ।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ভারতের ইতিহাসে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। এটা ব্রিটিশ সরকারের নীতি ও শাসনকার্যের ব্যাপারে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। এ পরিবর্তনের মধ্যে কোম্পানি শাসনের অবদান ছিল অন্যতম। তাছাড়াও এ বিদ্রোহ পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামে উৎসাহ দিয়েছিল।

সিপাহি বিপ্লব ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম গৌরবময় বৃহত্তর সংগ্রাম। এই সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়। এ মহাবিপ্লবের ফলে জনগণের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় তা পরবর্তীকালে যে কোনো আন্দোলন সর্বোপরি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা দান করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব বা মহাবিপ্লবকে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম বৃহত্তর সশস্ত্র সংগ্রাম হিসেবে গণ্য করা হয়। এ আন্দোলনে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালের সকল আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এ মহাবিপ্লবের গুরুত্ব সম্পর্কে S.N Sen মন্তব্য করেন- The revolt commanded popular support in various degree in the principal threat of war, which entended roughly from western Bihar to the eastern confines of Panjab.

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও পরবর্তী সময়ের সকল আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-৪: বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

১৯১. সিপাহি বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল কোনটি? (অনুধাবন) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
ⓚ কোম্পানি শাসনের অবসান ⓚ স্বত্ববিলোপ নীতি ⓖ সামরিক সংস্কার ⓖ রাজনৈতিক দলের জন্ম **ক**

১৯২. বাংলায় মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন কে? (জ্ঞান)
ক সম্রাট আকবর খ দাউদ খান কররানী গ সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ মুর্শিদ কুলি খান **ক**

১৯৩. কত খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর তার দীন-ই-ইলাহী ঘোষণা করেন? [শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]
ক ১৫৮০ খ ১৫৮১ গ ১৫৮২ ঘ ১৫৮৩ **গ**

১৯৪. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণীয় অবদান রাখেন। বাংলাকে মুঘল নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধুর সাথে কোন নবাবের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক নবাব আলীবর্দী খানের খ নবাব মুর্শিদ কুলি খানের গ নবাব সিরাজউদ্দৌলার ঘ নবাব মীর কাসিমের **খ**

১৯৫. নবাবি শাসনামলে বাংলার উন্নতিকে কোন দেশের উন্নতির সাথে তুলনা করা হতো? (জ্ঞান)
ক ভারত খ ইউরোপ গ আফ্রিকা ঘ অস্ট্রেলিয়া **খ**

১৯৬. বক্সারের যুদ্ধে কোম্পানির হাতে বাংলায় কোন নবাবের পরাজয় হয়? (জ্ঞান)
ক নবাব সিরাজউদ্দৌলার খ নবাব আলিবর্দি খানের গ নবাব মীর কাসিমের ঘ নবাব মীরজাফরের **গ**

১৯৭. ফখরুখশিয়ারের ফরমানকে ইংরেজ কোম্পানির ম্যাগনা কার্টা বলা হয় কেন? (উচ্চতর দক্ষতা) [কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]
ক ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করার অনুমতি পায় বলে খ মুঘল সম্রাটের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় বলে গ ভারতবর্ষে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পায় বলে ঘ শুল্কমুক্ত, অবাধ ও একচেটিয়া বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে বলে **ঘ**

১৯৮. পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক রবার্ট ক্লাইভ খ ওয়াটসন গ ভ্যান্সিটার্ট ঘ ওয়ারেন হেস্টিংস **ক**

১৯৯. কত সালে 'এলাহাবাদ চুক্তি' সম্পাদিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৭৫৭ খ ১৭৬০ গ ১৭৬৪ ঘ ১৭৬৫ **ঘ**

২০০. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে— (জ্ঞান) [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]
ক ১৯১৮ সালের ১৩ এপ্রিল খ ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল গ ১৯১৯ সালের ২৩ এপ্রিল ঘ ১৯১৯ সালের ২৫ এপ্রিল **খ**

২০১. প্রথম কোন বাঙালি মুসলমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি? (জ্ঞান) [আনোয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক নবাব আব্দুল লতিফ খ এ কে ফজলুল হক গ তিতুমীর ঘ হাজি শরীয়তউল্লাহ **গ**

২০২. দুদু মিয়াকে অত্যাচারিত কৃষকেরা ত্রাণকর্তা মনে করেন কেন? (অনুধাবন) [পার্বতীপুর আদর্শ ডিগ্রী কলেজ, দিনাজপুর]
ক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রাথমিকভাবে সফল হয়েছিলেন বলে খ অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন বলে গ সিপাহি বিদ্রোহে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে ঘ নীলকর সি. অ্যান্ড্রু অ্যান্ডারসন ডানলপের বিরুদ্ধে সফল হয়েছিলেন বলে **ঘ**

২০৩. তিতুমীরের বিদ্রোহ মুসলমানদের মনে কোন ধরনের প্রেরণা জুগিয়েছে? (অনুধাবন) [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]
ক বাঁশের কেল্লা তৈরির প্রেরণা জুগিয়েছে খ বিভেদনীতির প্রেরণা জুগিয়েছে গ আত্মরক্ষায় সেনা প্রশিক্ষণের প্রেরণা জুগিয়েছে

২০৪. বারাসাত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে? (জ্ঞান)
ক সৈয়দ আমীর আলী খ দুদু মিয়া গ হাজি শরীয়তুল্লাহ ঘ তিতুমীর **ঘ**

২০৫. ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় কারা? (জ্ঞান)
ক মুসলমানরা খ হিন্দুরা গ বৌদ্ধরা ঘ জৈনরা **ক**

২০৬. সিপাহি বিপ্লবের মূল কারণ কোনটি? (জ্ঞান)
ক ধর্মীয় খ সামরিক গ অর্থনৈতিক ঘ সামাজিক **খ**

২০৭. মোল্লা জহির হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মনাশের জন্য এক ধরনের প্রসাধনী তৈরি করেন যাতে গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো থাকত। এ প্রসাধনী সিপাহি বিপ্লবের কোন বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করছে? (প্রয়োগ)
ক এনফিল্ড রাইফেল খ ইংরেজি ভাষার প্রচলন গ পূজার জন্য শিশুদের উৎসর্গ বন্ধ করা ঘ বাল্যবিবাহ বন্ধ করা **ক**

Teachingbd.com

http://teachingbd.com

২০৮. উপমহাদেশের সর্বপ্রথম গৌরবময় বিপ্লব ছিল কোনটি? (জ্ঞান) [রাজশাহী সরকারি কলেজ]
ক সিপাহি বিপ্লব খ ফকির বিদ্রোহ
গ কৃষক আন্দোলন ঘ স্বদেশি আন্দোলন ক

২০৯. ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ব প্রথম গৌরবময় বৃহত্তম সংগ্রাম কোনটি? (জ্ঞান)
ক পলাশী যুদ্ধ খ ফরায়েজি আন্দোলন
গ সিপাহি বিদ্রোহ ঘ নীল বিদ্রোহ গ

২১০. '*The Indian War of Independence*' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ক কিশোরী লাল মিত্র খ সাভারকার
গ জন ডেভিড
ঘ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ খ

২১১. ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৮৩৬ খ ১৮৪৮
গ ১৮৫০ ঘ ১৮৫৫ ক

২১২. হাজি শরীয়তউল্লাহ ভারতীয় উপমহাদেশকে দারুল হরব বলেছেন কেন? (অনুধাবন) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক বিবাহ অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল বলে
খ জুমার নামাজ পড়া নিষিদ্ধ ছিল বলে
গ পির পূজা ও মাজার পূজা করা হতো বলে
ঘ ব্রিটিশরা এ দেশ শাসন করত বলে ঘ

২১৩. বাংলার মুসলিম সমাজের আধুনিকায়ন প্রথম শুরু করেছিলেন কে? (জ্ঞান)
ক সৈয়দ আমীর আলী
খ নবাব আবদুল লতিফ
গ তিতুমীর
ঘ হাজি মুহম্মদ মোহসিন খ

২১৪. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? (জ্ঞান)
ক সৈয়দ আমীর আলী খ রামমোহন রায়
গ সৈয়দ আহমদ খান
ঘ নবাব আবদুল লতিফ ঘ

২১৫. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন কে গঠন করেন? (জ্ঞান) [বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]
ক নবাব আব্দুল লতিফ
খ হাজি মুহম্মদ মোহসিন
গ তিতুমীর ঘ সৈয়দ আমির আলী ঘ

২১৬. ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের নাম কী? (জ্ঞান)
ক ন্যাশনাল কংগ্রেস
খ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন
গ বিজেপি ঘ ন্যাশনাল পার্টি খ

২১৭. 'এ শর্ট হিস্টরি অব দ্যা স্যারাসিনস'-গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ক সৈয়দ আহমদ
খ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
গ সৈয়দ আমীর আলী
ঘ রাজা রামমোহন রায় গ

২১৮. নিচের কোনটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন? (অনুধাবন)
ক বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি
খ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন
গ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন
ঘ জাতীয় কংগ্রেস ঘ

২১৯. ব্রিটিশ ভারতে মোট জনসংখ্যার কত ভাগ মুসলমান ছিল? (জ্ঞান)
ক এক-তৃতীয়াংশ খ এক-চতুর্থাংশ
গ এক-পঞ্চমাংশ ঘ অর্ধেক গ

২২০. ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিওটিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)
ক নবাব আবদুল লতিফ
খ স্যার সৈয়দ আহমদ
গ সৈয়দ আমীর আলী
ঘ হাজি মুহম্মদ মোহসিন খ

২২১. 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' এর প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)
ক হাজি শরীয়তুল্লাহ
খ নবাব আবদুল লতিফ
গ হাজি মুহম্মদ মোহসিন
ঘ স্যার সৈয়দ আহমদ ঘ

২২২. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দলের নাম কী? (জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক ভারতীয় মুসলিম লীগ
খ ভারতীয় জনতা পার্টি
গ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
ঘ ভারতীয় পিপলস পার্টি গ

২২৩. ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি— কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? (জ্ঞান) [পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ]
ক মুসলিম লীগ খ কৃষক শ্রমিক দল
গ প্রজা পার্টি ঘ কংগ্রেস ক

২২৪. 'The Bengalee' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন কে? (জ্ঞান)
ক নবাব সলিমুল্লাহ
খ নবাব আবদুল লতিফ
গ সুরেন্দ্রনাথ ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ

২২৫. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ফলে কী হয়? (অনুধাবন)
ক মুসলমানদের মনে আত্মজাগরণ ঘটে
খ মুসলমানরা সামাজিকভাবে অপদস্ত হয়
গ মুসলমানদের ধর্মচিন্তা বৃদ্ধি পায়
ঘ হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় ক

২২৬. অভিভক্ত বাংলার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো কোথায় গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)
ক উড়িষ্যায় খ পাটনায়
গ কলকাতায় ঘ মাদ্রাজে গ

Teachingbd.com

২২৭. ১৯০৫ সালে সরকার বঙ্গপ্রদেশ বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি প্রদেশ গঠন করে। প্রদেশ দুটি কী? [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]
ক আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ
খ পূর্ব বাংলা ও আসাম
গ নদীয়া ও আসাম
ঘ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গ **খ**

২২৮. 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামের নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় কোনটি? (জ্ঞান)
ক ঢাকা খ আসাম
গ কলকাতা ঘ সোনারগাঁও **ক**

২২৯. বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমতকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন কে? (জ্ঞান)
ক স্যার সলিমুল্লাহ খ সৈয়দ আমীর আলী
গ সৈয়দ আহমদ আলী ঘ নবাব আবদুল লতিফ **ক**

২৩০. বাংলাকে বিভক্ত করাটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং অন্যায় কাজ বলে মন্তব্য করে কোন দল? (জ্ঞান)
ক কংগ্রেস খ মুসলিম লীগ
গ বিজেপি
ঘ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন **ক**

২৩১. বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করে কোন দল? (জ্ঞান)
ক কংগ্রেস খ মুসলিম লীগ
গ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন ঘ বিজেপি **ক**

২৩২. অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি কী? (অনুধাবন)
ক ব্যর্থ হয় খ সার্থক হয়
গ স্থগিত হয়
ঘ ব্যাপক আকার ধারণ করে **ক**

২৩৩. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক কে? (জ্ঞান)
ক খাজা নাজিমউদ্দিন
খ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ.
ঘ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী **খ**

২৩৪. 'শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতা হোক বা না হোক ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে'। অ্যাটলির এ ঘোষণাটি ইতিহাসে কী নামে পরিচিত? (প্রয়োগ)
ক ফেব্রুয়ারি ঘোষণা খ জুনের ঘোষণা
গ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান
ঘ লাহোর প্রস্তাব **ক**

২৩৫. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি কোথায় নির্মিত হয়? (জ্ঞান)
ক সুতানটি খ গোবিন্দপুর
গ কলকাতা ঘ বিহার **গ**

২৩৬. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করতে সক্ষম হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক কোম্পানির প্রশাসনিক যোগ্যতা
খ বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুর্বলতা
গ বাংলার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসলীলা
ঘ নবাবদের বিলাসবহুল জীবনযাপন **খ**

২৩৭. 'তরিকা-ই-মোহাম্মদীয়া' মতবাদটির প্রবর্তক কে? (জ্ঞান)
ক হাজি শরীয়তুল্লাহ খ আব্দুল ওহাব
গ সৈয়দ আহম্মদ শহীদ
ঘ মীর নিসার আলী **গ**

২৩৮. সিপাহি বিদ্রোহকে 'জাতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন কে? (জ্ঞান)
ক আর্ল স্টানলি খ ডিজরেলি
গ ফরেস্টর ঘ ডাফ **খ**

২৩৯. বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল কার প্রচেষ্টায়? (জ্ঞান)
ক নবাব আবদুল লতিফের
খ সৈয়দ আমীর আলীর
গ সৈয়দ আহমেদের
ঘ হাজি মুহম্মদ মোহসিনের **ক**

২৪০. ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবিকে বলা হয় বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ছয়দফা দাবির সাথে ব্রিটিশ আমলের কোনটির তুলনা করা যায়? (প্রয়োগ)
ক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ খ লক্ষ্ণৌ চুক্তি
গ লাহোর প্রস্তাব ঘ বেঙ্গল প্যাক্ট **গ**

২৪১. বাংলার দেওয়ানি লাভের পরও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নেননি। কারণ— (অনুধাবন)
i. কোম্পানির দক্ষ জনবলের অভাব
ii. প্রয়োজনীয় রেকর্ড-এর অভাব
iii. রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৪২. নবাব সলিমুল্লাহ সিমলা বৈঠকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কাছে পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এর কারণ ছিল— (অনুধাবন)
i. মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায়
ii. মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ
iii. ইসলাম শিক্ষা সম্প্রসারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৪৩. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে— (অনুধাবন)
i. মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ ত্বরান্বিত হয়
ii. হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়
iii. মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

২৪৪. বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন)
i. ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দমন
ii. পূর্ব বাংলার উন্নয়ন সাধন
iii. ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ঘ

২৪৫. খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় জনমনে যে ধরনের প্রভাব ফেলে— (অনুধাবন)
i. আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
ii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আশান্বিত করে
iii. অধিকারবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   খ

২৪৬. অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে কংগ্রেস যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করে তার মধ্যে রয়েছে— (অনুধাবন)
i. সরকারি চাকরি ও পদবি ত্যাগ
ii. আইন ব্যবসা বর্জন
iii. বিলাতি পণ্য পরিহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ঘ

২৪৭. একে ফজলুল হক উপস্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে— (অনুধাবন)
i. ভারতে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে
ii. স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রদেশগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম
iii. বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ক

২৪৮. ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের- (অনুধাবন) [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]
i. অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা
ii. ফরজ পালনে উদ্বুদ্ধ করা
iii. জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪৯ ও ২৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব রহমত দীর্ঘদিন যাবৎ বিদেশে অবস্থান শেষে দেশে ফিরে লক্ষ করেন, দেশের মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিতে মগ্ন। তাছাড়া একশ্রেণির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অত্যাচারে মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় জনাব রহমত একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন।

২৪৯. জনাব রহমতের পরিচালিত আন্দোলনটি বাংলার কোন আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করছে? (প্রয়োগ)
ক নীল বিদ্রোহ   খ ফরায়েজি আন্দোলন
গ সিপাহি বিদ্রোহ   ঘ ভাষা আন্দোলন   খ

২৫০. উক্ত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মুসলমানদের সচেতন করা
ii. ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা
iii. বাংলার অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ক

উদ্দীপকটি পড়ে ২৫১ ও ২৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় একটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাই এটি প্রথম পর্যায়ে সরকারের সাথে সহযোগিতা ও নরমপন্থা অবলম্বন করলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নানামুখী কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় নবচেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে।

২৫১. উদ্দীপকে কোন সংগঠনটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন
খ বেঙ্গল এসোসিয়েশন
গ সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
ঘ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ   গ

২৫২. উক্ত সংগঠনটি যে কারণে ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থায়ী আসন করে নেয় তা হলো— (অনুধাবন)
i. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী- ভূমিকা পালন
ii. মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার
iii. হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব দূর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫৩ ও ২৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' এলাকাকে 'Y' থেকে ভেঙে জেলা ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে 'X' এলাকার লোকজন আনন্দিত হয়। কিন্তু 'Y' এলাকার জনগণ এই ঘটনার বিরোধিতা করে। পরিস্থিতির এক পর্যায়ে 'Y' এলাকায় ধর্মঘট পালিত হয়।

২৫৩. 'X' এলাকার জনগণকে কাদের সাথে তুলনা করা যায়? (প্রয়োগ)
ক বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাকারীদের সঙ্গে
খ বঙ্গভঙ্গকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে
গ বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষের জনগণের সঙ্গে
ঘ স্বদেশী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে   গ

২৫৪. 'X' এলাকার লোকের উক্ত এলাকা জেলা ঘোষণার উদ্যোগে আনন্দিত হওয়ার কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এতে এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে
ii. এতে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে
iii. এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে স্বার্থ সংরক্ষিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ঘ

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৫: বাংলার ইতিহাস (পাকিস্তান আমল)

প্রশ্ন ▶ ১

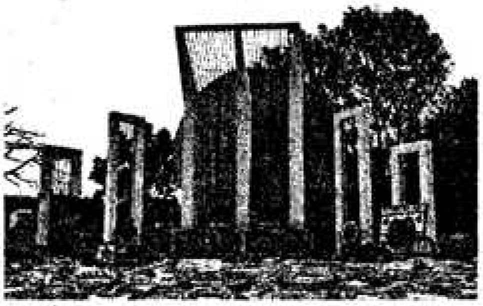

[দি. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭]

ক. 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল— মূল্যায়ন করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল লতিফ।

খ হিন্দু ও মুসলিম দুটি আলাদা জাতি— কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উত্থাপিত এ তত্ত্বই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি। তাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতি-প্রথা এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেন। এ মতামতই দ্বি-জাতিতত্ত্ব নামে পরিচিতি।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি বাঙালির ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে নির্দেশ করে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি আত্মপ্রকাশ করে। শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ওপর নানা বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। প্রথমেই তারা আঘাত হানে বাঙালির ভাষার ওপর। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। তাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলন শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০ শতাংশের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকতের রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা অর্জিত হয় এবং বিকশিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা। উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত স্থাপনাটি ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই নির্মিত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, এ চিত্রের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পাশাপাশি এ আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দাবি আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের মধ্যদিয়ে এ ঘটনারই অবতারণা করা হয়েছে।

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এক ব্যালট বিপ্লব ঘটায়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ এক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির প্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান, যা আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। পরে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া না হলে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আর পৃথিবীর মানচিত্রে উদ্ভব ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২

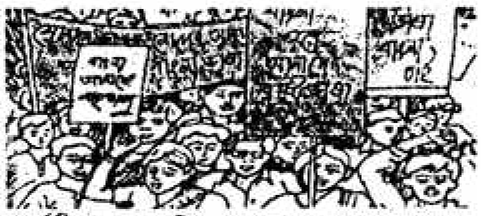

[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭]

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১
খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ছবিটি বাঙালির কোন আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উক্ত আন্দোলনের চেতনার মাঝে বাঙালির স্বাধীনতার বীজ সুপ্ত ছিল।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়।

খ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের ১ অক্টোবর যে পরিষদ গঠিত হয় তাই 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনের গতিকে বেগবান করতে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য তরুণ অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ নুরুল হক ভূঁইয়া। ভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদানের ক্ষেত্রে এ পরিষদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩ আলভী গার্মেন্টসের কর্ণধার কাদের চৌধুরী তার অধীন কর্মচারীদের নিয়োগবিধি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরি, বোনাস, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সুবিধা প্রদানে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে আসছিল। এতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে দাবি আদায়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। আন্দোলনের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে মালিক তাদের ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে। *[সকল বোর্ড '১৬]*

ক. 'লাহোর প্রস্তাব'-এর উত্থাপক কে? ১
খ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেন ঘটেছিল? ২
গ. উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর শ্রমিক সংঘের আন্দোলনের পরিণতির মতোই যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

খ ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ফলে এবং প্রাকৃতিক কারণে বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল।
১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ অভিনব শাসন ব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাছাড়া ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে ফসল উৎপাদনে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু তার পরও কোম্পানি করের হার না কমিয়ে বরং বৃদ্ধি করতে থাকে। যার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে ১৭৭০ সালে দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলা ১১৭৬ সনে এ দুর্ভিক্ষ হয় বলে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।

গ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গৃহীত বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। আর এ অধিকার বঞ্চনার দিক দিয়েই উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নানা ধরনের শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আলভী গার্মেন্টসের কর্ণধার কাদের চৌধুরী তার অধীন কর্মচারীদের নিয়োগবিধি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরি, বোনাস, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। এতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা একত্র হয়ে দাবি আদায়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করতে থাকে। সরকারের বৈষম্য নীতির ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্য নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পূর্ব বাংলার চারটি রাজনৈতিক দল (১. আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. নেজামে ইসলাম ও ৪. গণতন্ত্রী দল) একত্র হয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে তারা ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল বাংলার মানুষের এক ব্যালট বিপ্লব। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে এ বিষয়েরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, শ্রমিক সংঘের পরিণতির মতো যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আলভী গার্মেন্টসের বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে। আন্দোলনের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে মালিকপক্ষ তাদের ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ঠিক একইভাবে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অপতৎপরতা ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে আবার নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ সাময়িকভাবে সফলতা অর্জন করে অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা ব্যর্থতার রূপ পরিগ্রহ করে। মূলত যুক্তফ্রন্ট কোনো আদর্শিক ভিত্তিতে নয়, বরং নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্টে বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের ভাঙন এবং মন্ত্রিসভা বাতিলের জন্য এ সময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা অপতৎপরতা শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিকল্পিতভাবে আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনাসহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ওপর এর দায় চাপিয়ে দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার শাসনব্যবস্থায় আবার পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ও উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক সংঘের পরিণতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ খনিজ সম্পদে ভরপুর আফ্রিকার একটি দেশ সুদান। এ দেশের উত্তরাঞ্চলের আয়তন দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে অনেক বড় হলেও জনসংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। এ ছাড়া উত্তরাঞ্চলে নদীনালা কম থাকার কারণে এখানকার ভূমি ছিল অনুর্বর এবং কোথাও কোথাও মরুময়। অন্যদিকে নদীবিধৌত দক্ষিণ সুদান ছিল উর্বর এবং খনিজ সম্পদগুলোও ছিল এ অঞ্চলে অবস্থিত। রাষ্ট্রক্ষমতায় উত্তর সুদানের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় দক্ষিণ সুদানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে উত্তর সুদান সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। এ অবস্থায় দক্ষিণ সুদান সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দিলে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা অর্জন করে। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা কী ছিল? ১
খ. একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তদানীন্তন পাকিস্তানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের আলোকে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি চিত্র তুলে ধরো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।

খ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় হয়ে আছে।
একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে বাঙালি জাতি সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলরত জনগণের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে রফিক, শফিক, জব্বারসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র

https://teachingbd24.com

জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তদানীন্তন পাকিস্তানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান– এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনে বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেজন্য এখানে কোনো কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল না। কৃষির উৎপাদন না হওয়ায় শিল্পের কাঁচামালের অভাবে এ অঞ্চলে শিল্পকারখানাও তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের থেকে দুর্বল ছিল। অন্যদিকে, পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এ জন্য এ অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল উর্বর ভূমি, যার ফলে এখানে কৃষির উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল। নদীবিধৌত পূর্ব পাকিস্তানে ফসলের উৎপাদন ছিল অত্যধিক। এত কিছুর পরও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণের শিকার হয়ে নিজ এলাকায় উন্নতি করতে পারেনি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের দক্ষিণাঞ্চল ছিল উর্বর এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর এবং উত্তর অঞ্চল ছিল অনুর্বর। আবার উত্তরাঞ্চলের আয়তন বেশি হলেও দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, সুদানের এই বৈশিষ্ট্যের সাথে পাকিস্তানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মিল ছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের ন্যায় তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল পাহাড়সমান।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় ৩২% বেশি। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেত। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের হলেও জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় হতো এদের জন্য।

মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল না। তাছাড়া স্টেট ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদেশি মিশনসমূহের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে গৃহীত মোট তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ ছিল অনেক কম। উদ্দীপকে দেখা যায়, উত্তর সুদান দক্ষিণ সুদানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে উত্তর সুদানে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার করে পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত উত্তর সুদানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করা হয়। একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীও পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ৫ হোসনি মুবারক দীর্ঘ ৩০ বছর মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার শাসনামলে তিনি বিরোধী মতকে কঠোর হস্তে দমন করেন। তার সময় মিসরে মৌলিক মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়। তার পদত্যাগের দাবিতে মিসরের জনগণ তাহরির স্কোয়ারে সমবেত হয় এবং জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে হোসনি মুবারক সরকারের পতন হয়। পরবর্তীকালে মিসরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]

ক. পাকিস্তানের জনসংখ্যার কত অংশের মাতৃভাষা বাংলা ছিল? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে পাকিস্তানি আমলের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মিসরীয় কর্তৃপক্ষের মতো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়েছিল– তুমি কি এর সাথে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬.৪০ অংশের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।

খ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

এ হত্যাযজ্ঞের নীল নকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল টিক্কা খান, খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী প্রমুখ। এ ঘৃণ্য অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ধানমন্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাক বাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে।

গ মিসরের উক্ত আন্দোলনের সাথে আমার পঠিত পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মিল বিদ্যমান।

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর সামরিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল আইয়ুব খান। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তিনি পূর্ব বাংলায় তার দমন-নিপীড়ন নীতি অব্যাহত রাখেন। পরে তার এই শাসন পরিক্রমায় বাংলার ছাত্রসমাজের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আর ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলন এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নিলে আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকেও এই দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হোসনি মোবারক সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মিসরে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মিসরের জনগণ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। একইভাবে ১৯৬৯ সালেও পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে, যা ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলনে রূপ নেয়। প্রবল গণবিদ্রোহের মুখে আইয়ুব খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়। একই সাথে তিনি আর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ারও ঘোষণা দেন। এভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চে আইয়ুব খানের শাসনের অবসানের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার ওপর নানা ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচার করতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আর ১৯৬৯ সালের আন্দোলন ছিল এগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, হোসনি মোবারকের স্বৈরাচারী শাসন তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেশের আপামর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঠিক একইভাবে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণ স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ফলশ্রুতিতে আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। এই আন্দোলন

https://teachingbd24.com

ইতিহাসে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড় ও সংগঠিত আন্দোলন। এ আন্দোলন ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষের মাধ্যমে শুরু হলেও তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। বাংলার শহর ও গ্রামের শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এ আন্দোলন যেন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ক্ষিপ্ত জনতা সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবন আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ আন্দোলনের ফলেই আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আর এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপলাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে সর্ববৃহৎ আন্দোলন।

প্রশ্ন ▶ ৬ বসনিয়া ছিল এক সময় সার্বিয়ার একটি প্রদেশ। বসনিয়ানরা রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা সার্বিয়ানদের হাতে ছিল। তারা বসনিয়ানদের ওপর বৈষম্য ও শোষণনীতি গ্রহণ করলে বসনিয়াবাসী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সার্বিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করতে গেলে সেখানে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠীর হাতে বহু ছাত্রজনতা হতাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করেন।

[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারী কলেজ, কুমিল্লা]

ক. ছয় দফা কে ঘোষণা করেন? ১
খ. আইয়ুব খানের পতনের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বসনিয়দের স্বায়ত্তশাসন দাবির আন্দোলনের সাথে বাঙালির কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বসনিয়দের আন্দোলনের মতো বাঙালির উক্ত আন্দোলনও স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করেন।

খ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনই ছিল আইয়ুব খানের পতনের মূল কারণ।
আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর দায়িত্ব গ্রহণ করে সমগ্র পাকিস্তানে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। জনগণের সকল মৌলিক অধিকার কেড়ে নেন। এক পর্যায়ে তার বিরুদ্ধে জনগণ তীব্র আন্দোলন শুরু করলে তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মুখে তিনি ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন।

গ বসনিয়াবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দাবির সাথে বাঙালির ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।
১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলা ছিল সামরিকভাবে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য বাংলার জনগণের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে সাধারণ মানুষের মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' পেশ করেন। কিন্তু শাসকচক্র এই ছয় দফা মানতে অস্বীকৃতি জানালে পূর্ব বাংলার জনগণ ছয় দফার সমর্থনে আন্দোলন শুরু করে। এরপর ক্রমান্বয়ে স্বাধিকারের প্রশ্নে সংঘটিত হয় ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান। আর গণঅভ্যুত্থানের হাত ধরেই বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয় এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বসনিয়া সার্বিয়ার একটি প্রদেশ ছিল এবং বসনিয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা সার্বিয়ানদের হাতে ছিল। সার্বিয়ানরা বসনিয়দের ওপর বৈষম্য ও শোষণ নীতি গ্রহণ করলে বসনিয়াবাসী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অধিকার সংবলিত কিছু দফা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সার্বিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করতে গেলে সেখানে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠীর হাতে বহু জনতা হতাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। সুতরাং বসনিয়দের স্বায়ত্তশাসন দাবির আন্দোলন বাঙালির ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ বসনিয়াবাসীর আন্দোলনের মতোই বাঙালির ছয় দফা আন্দোলন স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল— উক্তিটি যথার্থ।
পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ছয় দফা কর্মসূচি নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি জাতিকে সংগ্রামের শক্তি জুগিয়েছিল। প্রেরণা জুগিয়েছিল স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। সরকার এ আন্দোলন দমনে যতই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে ততই আন্দোলন দ্রুত দানা বাঁধতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ততোই সুসংহত রূপ লাভ করে। পুলিশ নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন এদেশে সর্বপ্রথম গণমুখী আন্দোলন গড়ে তোলে। ছয় দফা ভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান হয়। আর এ গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। এর ফলে পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের ভিত কেঁপে ওঠে। যে ঘটনাগুলো উদ্দীপকে বর্ণিত বসনিয়াবাসীর শোষণ ও নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উদ্দীপকে বসনিয়ার মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবি ঘটে। কিন্তু তারা বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকচক্রের আচরণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে একটি মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আর এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৪ বছরের স্বৈরশাসন ও শোষণের বেড়াজাল ভেঙে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকের বসনিয়দের আন্দোলনের মতোই বাংলার ছয় দফা আন্দোলনও স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ সাংবাদিক আবু নাছের সাহেব ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে কোনোমতেই একাত্ম নন। তিনি মনে করেন যে, ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষার কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ছাত্ররাই বড় রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের ইতিহাস জাতি আজও ভুলে যায়নি। ছাত্রদের অন্যতম কাজ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা। *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপিত হয়? ১
খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. বাংলাদেশে এ ধরনের একটি আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি পেশার মানুষ জড়িত ছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মাইলফলক।
১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি নিজেদের স্বাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যায়। তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে এবং জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরপরই কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালির বহু কাঙ্ক্ষিত ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।
মায়ের ভাষা প্রত্যেক মানুষেরই প্রাণের ভাষা। তাই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার থেকে যদি কাউকে বঞ্চিত করা হয় তবে তার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষার দাবিতে বাঙালিদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা জাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে। এ আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ, যেটি উদ্দীপকের আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যেও পরিলক্ষিত হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবাদিক আবু নাছের সাহেব মনে করেন, ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ছাত্ররাই বড় রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। অনুরূপভাবে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগ ছিল চিরস্মরণীয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করলে ছাত্র সমাজ এর প্রতি রুখে দাড়ায়। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে তারা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সাল থেকে চলমান এই আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এদিন ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌছলে পুলিশ তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে রফিক উদ্দিন, আবুল বরকত, আব্দুস সালাম, আব্দুল জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। তাদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকার কথাই ফুটে উঠেছে।

ঘ বাংলাদেশে এ ধরনের অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি পেশার মানুষ জড়িত ছিল– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। এ আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাজনীতির বিকাশ ঘটায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পেশার মানুষ মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সকল জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে ভাষা আন্দোলন সফল হয়।

ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ে সংঘটিত গণআন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত ঘটায়। ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনায় বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ সংগ্রামী চেতনায় জেগে ওঠে। ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সর্বস্তরের গণমানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারির বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ছাত্র-শিক্ষক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ণ দিবস হরতাল পালন করে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। এই দিন আবার পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক, রিকশাচালক আউয়াল। পুলিশের এ নৃশংসতার প্রতিবাদে জনতা দলে দলে রাস্তায় নেমে আসে। প্রবল আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি পেশার মানুষ জড়িত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৮ পশ্চিমপন্থি বাসির সরকারের বিভিন্ন শোষণনীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের নিষ্পেষিত রহমতপুরবাসী এক সময় তীব্র আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে মি. জামিলের নেতৃত্বে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করলে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক. ঐতিহাসিক ছয় দফা কে উত্থাপন করেন? ১

খ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেন ঘটেছিল? ২

গ. মি. জামিলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিটি গণঅভ্যুত্থানে কী ধরনের ভূমিকা রেখেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আলোচ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন করেন।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জামিলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি তথা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গণঅভ্যুত্থানে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পশ্চিমপন্থি বাসির সরকারের বিভিন্ন শোষণনীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের নিষ্পেসিত রহমতপুরবাসী এক সময় তীব্র আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে মি. জামিলের নেতৃত্বে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করলে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বেও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে নতুন মাত্রা যোগ হয়। স্বৈরাচারী শাসকের দমননীতির বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের তীব্র বিক্ষোভ সমগ্র দেশে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে তখন মওলানা ভাসানী সারাদেশব্যাপী ৬ ডিসেম্বর প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানান। তিনি পুলিশের প্রতিবন্ধকতা এবং লাঠিচার্জ উপেক্ষা করে গভর্নর হাউস ঘেরাও করেন। তিনি ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর হরতাল ঘোষণা করলে ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে তা প্রতিপালিত হয়। তার নেতৃত্বে ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী মহল, কৃষক-শ্রমিক এবং সাংবাদিক হরতাল পালনে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। হরতালে পুলিশের গুলিতে শতাধিক লোক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর প্রতিবাদে ২১, ২২ ও ২৩ জানুয়ারি হরতালসহ শোক মিছিল পালন করে। সারাদেশে প্রবল বেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। জনগণের এ আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রস্তাব দিলেও মওলানা ভাসানী তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আইয়ুব খানের পদত্যাগ অবধি তিনি প্রত্যক্ষভাবে সরকারবিরোধী এ আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মি. জামিল এবং মওলানা ভাসানী একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য, সরকারি দমননীতি ও ছয় দফার প্রভাব প্রভৃতি।

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকাশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যবাহী ঐতিহাসিক ঘটনা। মূলত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সকল গণবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সামরিক স্বৈরাচারের অবসান এবং স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত তীব্র আন্দোলনই '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বাঙালির মনে ক্ষোভের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল। ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় তা আরো জোরদার রূপ লাভ করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা দায়ের বাঙালির মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমগ্র পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী জনগণ যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে থাকে, পাকিস্তানি সরকার তখন তা দমনের জন্য নৃশংস পুলিশি নির্যাতন চালাতে থাকে। নির্যাতন যতই বাড়তে থাকে জনগনও ততই আন্দোলনমুখী হতে থাকে। বাঙালি জনগণ যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন গড়ে তোলেন, তখন এ আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য 'আগরতলা মামলা' দায়ের করা হয়। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ আরো সোচ্চার হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করলে গণআন্দোলন দুর্বার গতিতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পেছনে শুধু একটি কারণই বিদ্যমান ছিল না, এর পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ।

প্রশ্ন ▶ ৯ জনাব আলী হোসেন তার নাতনিকে একটি গণআন্দোলনের কথা বলছিলেন। তিনিও সে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের সে আন্দোলন ক্রমে প্রকট আকার ধারণ করলে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন এবং মামলার সকল আসামীকে মুক্তি দেন। ছাত্ররা মুক্তিপ্রাপ্ত সকল আসামীকে গণসংবর্ধনা দেয় এবং এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেই ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। *[শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ]*

https://teachingbd24.com

ক. ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর কে ছিলেন? ১
খ. ছয় দফাকে বাঙালি জাতীর মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব আলী হোসেনের অংশ নেয়া গণআন্দোলন কীভাবে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়? ৩
ঘ. গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে তা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনে সক্ষম হয়েছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

খ বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ায় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।
পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই বলা যায়, ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

গ উদ্দীপকের জনাব আলী হোসেনের অংশ নেওয়া আন্দোলনটি হলো ১৯৬৯ এর গণআন্দোলন। ব্যাপকভাবে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ১৯৬৯ এর আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।
বস্তুত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সকল গণবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সামরিক স্বৈরাচারের অবসান এবং স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ছয়দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত তীব্র গণআন্দোলনই ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।
উদ্দীপকে জনাব আলী হোসেন তার নাতনিকে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এর গল্প বলছিলেন। যা মূলত ছাত্র আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের মস্কো ও চীনপন্থি দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা পেশ করে আন্দোলনের ডাক দেয়। ক্রমেই এ আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা একসময় ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যা পরবর্তীকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল প্রত্যক্ষ সুদূরপ্রসারী, যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতিদান করে।
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ আন্দোলন যার ফলাফল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফলাফল হলো আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসান। আর এর পরোক্ষ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল হলো বাংলাদশের সার্বভৌমত্ব অর্জন।
বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের অত্যন্ত তাৎপর্যময় একটি ঘটনা। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাক সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহার করে তাকে মুক্তি দেন। এছাড়া এ আন্দোলনের ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থার সূচনাসহ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়। সর্বোপরি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং শাসক গোষ্ঠী ১৯৭০ সালে নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। আর এ অভ্যুত্থানের পরবর্তী বড় সাফল্য হলো, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মহাবিজয়। এছাড়াও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।
পরিশেষে বলা যায়, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা যা বাঙালিদের জন্য সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে এনেছিল।

প্রশ্ন ▶১০ ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিরা আন্দোলন গড়ে তোলে। এর বিরুদ্ধে আসামি পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায়। এর ফলে অনেক ভাষাসৈনিক নিহত আহত হন। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*
ক. তমদ্দুন মজলিশ কত সালে গঠিত হয়? ১
খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের দুটি কারণ আলোচনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে কোন আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের চেয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অধিক তাৎপর্য বহন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পেছনে নানা কারণ বিদ্যমান ছিল।
মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গঠিত মধ্য, বাম ও ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যজোট যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের সহায়ক হয়। পাশাপাশি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের দলিল। পূর্ব বাংলার জনগণ ২১ দফার প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন জানায় ফলে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

গ উদ্দীপকের আন্দোলনটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়।
মায়ের ভাষা প্রত্যেক মানুষেরই প্রাণের ভাষা। তাই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার থেকে যদি কাউকে বঞ্চিত করা হয় তবে তার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত আসামের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের বাঙালির ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষার দাবিতে প্রতিবাদী চেতনা জাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও প্রাদেশিক সরকার অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাভাষী জনগণ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ভাষার দাবিতে চলমান ধর্মঘটে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায় সরকার। ঘটনাস্থলেই ১১ জন ভাষা সৈনিক শহিদ হন। ১৯৫২ সালে সংঘটিত বাঙালির ভাষা আন্দোলনের চিত্রও অনেকটা এ রকম। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। প্রথম থেকেই বাঙালিরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সাল থেকে চলমান এই আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ আরও অনেকে।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাষার দাবিতে প্রাণদান করার দিক থেকে আলোচ্য আন্দোলন দুটি একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। এই আন্দোলন শোষিত বাঙালির প্রতিবাদী চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ফলে বাঙালি অনুধাবন করতে পেরেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত স্বাধীনতার চেতনার এ দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।
আসামের বাঙালিরা আমাদের মতোই বাংলা ভাষার দাবিতে প্রাণ দিয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমে তারাও তাদের দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন তাদের মধ্যে কোনো স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করতে পারেনি। এ কারণেই তারা ভারতের প্রাদেশিক শাসনের

https://teachingbd24.com

গন্ডিতেই আবদ্ধ রয়েছে। পক্ষান্তরে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে একটি পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে এই আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনে প্রভাবকের কাজ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আলোচ্য দুইটি ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীন সত্তার জাগরণের মধ্য দিয়ে উদ্দীপকের ভাষা আন্দোলন অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে রিবা জানতে পারে, আলজেরিয়ার স্বাধীনতা ৮ বছর আগে শুরু হয়েছিল। এ যুদ্ধে আলেজেরিয়ান ন্যাশনাল ফ্রন্ট নেতৃত্ব দেয়। এ ফ্রন্ট যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিসরের কায়রোতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। ওই সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বমত জনসমর্থন সৃষ্টি। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. অপারেশন সার্চলাইট কখন শুরু হয়? ১
খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন কেন পেছানো হয়? ২
গ. আলজেরিয়ার অন্তবর্তী সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আলজেরিয়ার সরকারের ভূমিকা ও বাংলাদেশের সরকারের ভূমিকা কি একইরূপ? যুক্তিসহ মূল্যায়ন কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচন বন্যাজনিত কারণে পেছানো হয়।
১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত থাকলেও ভয়াবহ বন্যাজনিত কারণে তা পরিবর্তন করে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া নির্বাচনের প্রাক্কালে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনে নির্বাচনের তারিখ ১ মাস পিছিয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়।

গ আলজেরিয়ার অন্তবর্তীকালীন সরকারের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের সাদৃশ্য রয়েছে।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আলেজেরিয়ার নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিসরের কায়রোতে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয়, যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এসব বিভাগের মাধ্যমেই যুদ্ধকালে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অনুপস্থিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দিন আহমেদের ওপর। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী করা হয় খন্দকার মোশতাক আহমদকে, অর্থমন্ত্রী করা হয় এম মনসুর আলীকে এবং স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী করা হয় এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ সরকারের অবদান ছিল অতুলনীয়। আর উদ্দীপকেও এ সরকারের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের আলজেরিয়া সরকারের ভূমিকা ও বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা একই প্রকৃতির ছিল না।
উদ্দীপকের আলজেরিয়ায় গঠিত সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রতি বিশ্ব জনমত বা জনসমর্থন সৃষ্টি করা। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারে কাজের পরিধি ছিল আরও ব্যাপক। কেননা মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্ব জনমত সৃষ্টির পাশাপাশি যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখেছিল।
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে। কিন্তু মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় পরিকল্পিতভাবে সামরিক-বেসমারিক জনগণকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এছাড়া বেশ কিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। এসব সেক্টর ও ফোর্সে যুদ্ধ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মাঝে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ রাখা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে এ সরকার। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, সংগ্রামী জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকার সাহায্যে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। এছাড়াও এ সরকার কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা ছাড়াও সার্বিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, আলজেরিয়ার গঠিত সরকারের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা আর মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা একই প্রকৃতির ছিল না।

প্রশ্ন ▶ ১২ আদি সিদ্ধান্ত নিল তার একমাত্র মেয়েকে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করাবেন। আদির বড় ভাই মাহিন তার পূর্বসূরীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর উপদেশ দিলেন। *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*

ক. ১৯৫৪ এর নির্বাচনে কোন দলের ভরাডুবি ঘটে? ১
খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ কী ছিল? ২
গ. মাহিন কোন চেতনায় ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর উপদেশ দিলেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মাহিনের এই ধরনের চেতনা বাঙালির জাতীয় জীবনে কী ভূমিকা রাখবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মূল কারণ হলো তাদের গণমুখী নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়ন।
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পিছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করা। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার সকল স্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল এবং নির্বাচনি প্রচারণায় যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক শোষণ ও আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

https://teachingbd24.com

গ ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আদি মেয়েকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আদি মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে চাইলে তার চাচা বাধ সাধেন। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষা চর্চা করা ছাড়া প্রকৃত বাঙালি হওয়া যায় না। তার এ ধরনের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।
ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্নিহিত পরিচয়কে বাঁচানোর সর্বাত্মক আন্দোলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের আপামর জনতার ওপর জোর করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাংলা এদেশের মাতৃভাষা, আমাদের মায়ের ভাষা। তাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল বের করে। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন অনেকে। তবুও এ দেশের জনগণ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আন্দোলনের প্রভাবেই আদি তার মেয়েকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন। বাংলা ভাষা চর্চা ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

ঘ মাহিনের এ ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনা বাঙালির জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে এক অসাধারণ ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। এ চেতনা পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে।
ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্যের সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তীকালে সকল আন্দোলনের প্রাণশক্তি জোগায়। এ অন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাঙালি ১৯৬৬ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জোগায়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের বিরাট বিজয় মূলত একুশের ঐক্যের বিজয় আর ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ মূলত বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। ২১শে ফেব্রুয়ারির ত্যাগ ও সংহতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়া পত্তন করে। যার চরম পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। তাই বাঙালির জীবনে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা অপরিসীম। এজন্য উদ্দীপকের মাহিনের মতো হাজারো বাঙালি জনতা এ দিনটি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সাফা গ্রুপের কর্ণধার আবিদ তার অধীন কর্মচারীদের নিয়োগবিধি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরী, বোনাস, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সুবিধা প্রদানে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে আসছিল। এতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে দাবী আদায়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আন্দোলনের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নেয়া হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে মালিক তাদের ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে। *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*

ক. কত সালে ছয় দফা প্রস্তাব দেওয়া হয়? ১
খ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেন ঘটেছিল? ২
গ. উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর শ্রমিক সংঘের আন্দোলনের পরিণতির মতই যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৬ সালে ছয়দফা প্রস্তাব দেওয়া হয়।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গৃহীত বৈষম্য নীতির প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। আর এ অধিকার বঞ্চনার দিক দিয়েই উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নানা ধরনের শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সাফা গ্রুপের কর্ণধার আবিদ তার অধীন কর্মচারীদের নিয়োগবিধি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরি, বোনাস, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। এতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা একত্র হয়ে দাবি আদায়ে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করতে থাকে। সরকারের বৈষম্য নীতির ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্য নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পূর্ব বাংলার চারটি রাজনৈতিক দল (১. আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. নেজামে ইসলাম ও ৪. গণতন্ত্রী দল) একত্র হয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে তারা ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল বাংলার মানুষের এক ব্যালট বিপ্লব। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে এ বিষয়েরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, শ্রমিক সংঘের পরিণতির মতো যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল।
যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অপতৎপরতা ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে আবার নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ সাময়িকভাবে সফলতা অর্জন করে অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা ব্যর্থতার রূপ পরিগ্রহ করে। মূলত যুক্তফ্রন্ট কোনো আদর্শিক ভিত্তিতে নয়, বরং নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্টে বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের ভাঙন এবং মন্ত্রিসভা বাতিলের জন্য এ সময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা অপতৎপরতা শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিকল্পিতভাবে আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনাসহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ওপর এর দায় চাপিয়ে দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার শাসনব্যবস্থায় আবার পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ও উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমিক সংঘের পরিণতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রূপনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৫ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে কাশেম চৌধুরী সবচেয়ে প্রভাবশালী। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অনেক নেতার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই কাশেম চৌধুরীকে পরাজিত করার জন্য অন্য চারজন প্রার্থী নির্বাচনি ঐক্য গড়ে তোলেন। ফলে কাশেম চৌধুরী শক্তিশালি প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যজোটের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়? ১
খ. ছয় দফাকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয় কেন? ২
গ. অনুচ্ছেদের উল্লিখিত নির্বাচনের সাথে কোন ঐতিহাসিক নির্বাচনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

https://teachingbd24.com

ঘ. উক্ত ঐতিহাসিক নির্বাচনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে পরিবর্তন এসেছিল তা মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়।

খ ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির পথ সূচিত হওয়ায় এটিকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, নির্যাতিত জনগণ ছয় দফাকে মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত করে। পাকিস্তানি শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন ম্যাগনাকার্টা অধিকার বিল, ঠিক তেমনি বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি হলো ছয় দফা। এ জন্য এটিকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

গ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্বাচনের সাথে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে যেমন কাশেম চৌধুরী শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যজোটের কাছে পরাজিত হয়। একইভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগও যুক্তফ্রন্টের নিকট বিপুল ভোটে পরাজিত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে বড়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। কিন্তু মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও দমননীতির কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং হাজী দানেশের বামপন্থি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অন্যদিকে, যুক্তফ্রন্টের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ হারিকেন প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে। নির্বাচনকে সামনে রেখে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও ফ্রন্ট ব্যাপক নির্বাচনি প্রচারণা চালায়। নির্বাচনি প্রচারণার জন্য তারা সবুজকোর্তা বাহিনী নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালিকে এক নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করে। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে এ বিজয় ছিল এক তীব্র প্রতিবাদ। এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্যের অবসান ঘটায়।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে পরিবর্তন এসেছিল তা ছিল সত্যিই এক আমূল পরিবর্তন। এ নির্বাচনের ফলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের নেতাদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এর স্থলে আওয়ামী লীগ নেতাদের উত্থান ঘটে। রাজনীতিতে অবাঙালি নেতৃত্বের প্রশ্নে বাংলার মানুষের মোহমুক্তি ঘটে। শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলার জাতীয় রাজনীতিতে এলিট শ্রেণি ও ভূস্বামী অভিজাতদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এ নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনসহ সকল প্রাদেশিক মন্ত্রী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এ নির্বাচন প্রমাণ করে, পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।

যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ ও উদীয়মান নেতার কাছে মুসলিম লীগের অনেক প্রবীণ ও প্রভাবশালী নেতা ধরাশায়ী হন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এবং শাসনক্ষমতায় পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব দেখতে চায়।

প্রশ্ন ▶ ১৫

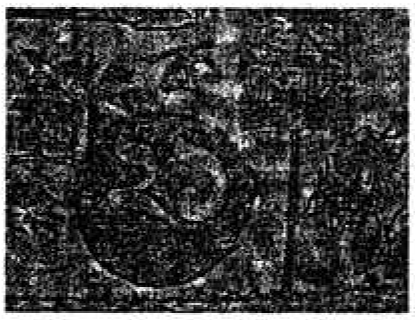

[কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]

ক. ২১ দফার প্রথম দফা কী? ১

খ. ভাষা আন্দোলনকে কেন বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়? ২

গ. উক্ত শ্লোগানে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা কীভাবে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপলাভ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শ্লোগানের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ দফার প্রথম দফা হলো বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

খ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের পথ সূচিত হওয়ায় একে বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়।

দেশ বিভাগের পর বাঙালি প্রথম ভাষাকেন্দ্রিক বৈষম্যের শিকার হয়। মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বাঙালি ভাষা আন্দোলন করে এবং এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। এ জন্য এ আন্দোলনকে বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়।

গ উক্ত স্লোগানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এ আন্দোলনই পরবর্তীকালে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপলাভ করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের অধিকারবঞ্চিত মানুষের গণচেতনার বহিঃপ্রকাশ। ভাষা আন্দোলন ছিল পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণাদানকারী আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন থেকে পাওয়া জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হয়ে বাঙালি প্রথমে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনের পরিণতিতে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

এছাড়া ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলন জাতীয় চেতনা উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাঙালি জাতির অধিকার সচেতনতাবোধ জাগ্রত করে। বাঙালি জাতি অন্যায়, অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের শিক্ষালাভ করে। এ আন্দোলনই গণআন্দোলনের প্রেরণা যোগায়। তাই বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ নিহিত ছিল।

ঘ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন যে বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় তা নিরসনের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

ছয় দফা ছিল মূলত বাঙালির বাঁচার দাবি। এ দাবি ছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে ছয় দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৯৬৬ সালে এ আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই ছয় দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে আলাদাভাবে একটি জাতিসত্তাবোধের জন্ম হতে থাকে। সকল শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণি ছয় দফার মধ্যে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। এজন্যই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের নিকট ছয় দফা কর্মসূচি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ছয়

Teachingbd24.com

দফা আন্দোলন বাঙালির মানবিক চেতনার জন্ম দেয় এবং জাতীয়তাবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালের সমস্ত আন্দোলন এমনকি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ছয় দফার চেতনাবোধ।
পরিশেষে বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রিপার কলেজের সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষক খালি পায়ে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে বের হলো। প্রভাতফেরি শেষে তারা তাদের কলেজের শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাল। সর্বশেষ তাদের অডিটোরিয়ামে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। আলোচনায় রিপাদের কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, এ আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফা কী? ১
খ. ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিশের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দিবসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রিপাদের কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে লেখ। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

খ ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। তমদ্দুন মজলিশই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। অর্থাৎ তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে।

গ উদ্দীপকে ২১ ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ দিবসের গুরুত্ব অপরীসীম।
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল বাঙালির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যময় একটি দিন। এদিন বাংলা ভাষার দাবিতে সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট ও শোভাযাত্রার আহ্বান করা হয়। পাক সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে একটি কালজয়ী ইতিহাসের জন্ম দেন।
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মিলিত হয়। সেখানে তারা গাজিউল হকের সভাপতিত্বে সমাবেশ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগান দিতে দিতে মিছিল সহকারে অধিবেশনরত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের এ মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে রফিক, বরকত, জব্বার শহিদ হন। এ দিনের ঘটনা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলন বহুগুণে জোরালো হয়। ফলে পাক সরকার বাঙালির ভাষার দাবি মানতে বাধ্য হয়। এই দিনটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। যা বিশ্বজুড়ে বাঙালি জাতির গৌরবকে ছড়িয়ে দেয়। এ সকল আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের ইতিহাসে ২১ ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ হ্যাঁ, রিপাদের কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রিপাদের কলেজে ২১ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় তাদের কলেজের অধ্যক্ষ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, এ আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে। অধ্যক্ষের এ উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এ অন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পরবর্তী সকল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ ছিল ১৯৫৪ এর নির্বাচন। যেখানে বাঙালি জাতি যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে। এরপর ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির প্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান যা আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। আর এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি দীর্ঘ নয় মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির প্রথম আন্দোলন সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে পাক-সরকারের বিরুদ্ধে আরো অনেক আন্দোলন হয়। যার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। এ যুদ্ধে বাঙালি জাতি নিজেদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৭ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানিদের ওপর চরম নির্যাতন চালাত। তারা সকল প্রকার ব্যাংক বিমা ও বাণিজ্যিকর কেন্দ্রগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তুলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সস্তা কাঁচামাল দিয়ে তাদের অধিকাংশ বাণিজ্যকেন্দ্র ও কারখানা চলত। ফলে সহজেই সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত এবং এজন্যই পূর্ব পাকিস্তান কখনোই উন্নত হতে পারেনি। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি বলা হয় কোনটিকে? ১
খ. পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি সামাজিক বৈষম্যর বর্ণনা দাও? ২
গ. উদ্দীপকে পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বৈষম্যের ফলেই পূর্ব-পাকিস্তান সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল ছিল- মন্তব্যটি মূলপাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের 'বাঁচার দাবি' বলা হয়।

খ পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের সামাজিক বৈষম্য ছিল শোচনীয়।
স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করে। সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক সুবিধা বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পেত। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল।

গ উদ্দীপকে পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।
পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক সর্বোচ্চ বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। তাদের শোষণের মাত্রা ছিল ভয়াবহ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আয়তনে বড় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেজন্য এখানে কোনো কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এজন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ এ সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় সকল শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। উদ্দীপকে এ সকল বৈষম্যমূলক ঘটনারই অবতারণা করা হয়েছে।
এ সকল বৈষম্যমূলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান কখনো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত বৈষম্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলেই পূর্ব পাকিস্তান সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল ছিল— মন্তব্যটি সঠিক।
পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেশে সামরিক শাসনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর পশ্চিমা

https://teachingbd24.com

শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি। দ্বিতীয়টিতে বরাদ্দ ছিল ৯৫০ কোটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য, ১,৩৫০ কোটি রুপি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। তৃতীয়টিতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩৬% ও ৬৩%। এছাড়া মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেত। আবার শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় সকল শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারও মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। এ সকল কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। কেন্দ্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ▶১৮ আমিন সাহেব বিটিভিতে একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখছিলেন। এতে আফ্রিকা অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনা দেখাচ্ছিল। ঐ অঞ্চলের সম্পদ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সরকারের বৈষম্যনীতির কারণে তারা সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও শোষিত হতে থাকে। তাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন এক মহান নেতা। তিনি দাবি জানালেন জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কর ও শুল্ক ধার্য এবং আদায়, আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা প্রদেশের হাতে থাকবে।

[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]

ক. মুজিব নগর সরকার কতো তারিখে শপথ গ্রহণ করেন? ১
খ. অপারেশন সার্চ লাইট কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবির সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোন দাবির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত দাবিই বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে— যুক্তি দেখাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি-ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্য প্রদর্শন করে। এসব বৈষম্যের প্রতিকার ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকা অঞ্চলের নেতা ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে সরকারের বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারের নিকট দাবি তুলে ধরে। ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুও বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেছিলেন। ছয় দফা দাবিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। বলা হয় প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রের হাতে, বাকি সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে। দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু করার দাবি করা হয়। এছাড়া রাজস্ব ও শুল্ক এবং বৈদেশিক বিষয় প্রদেশের হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়। এ ছয় দফা দাবিতে আরো বলা হয় নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী তথা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে পারবে। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। অবশেষে ১৯ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে 'ছয় দফা' কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। উদ্দীপকের নেতার দাবিনামায় এ ছয় দফা দাবিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত দাবিনামা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, নির্যাতিত জনগণ ছয় দফাকে মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত করে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে আমাদের বাঁচার দাবি বলে মন্তব্য করেন। এটি ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা। শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। বাংলার স্বাধিকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছয় দফা ছিল নির্বাচনের মূল ইশতেহার। এ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। বাঙালির স্বাধীনতার ভিত্তি ছয় দফা হওয়ায় এটিকে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ যার মাধ্যমে বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করে, অভ্যুদয় হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। আর এর মূলে ছিল ছয় দফা কর্মসূচির অবদান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

পরিশেষে বলা যায়, ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্টা' ফরাসি বিপ্লবে 'অধিকার বিল' এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'-এর যে অবদান, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতেও ছয় দফার ভূমিকা সীমাহীন।

প্রশ্ন ▶১৯ ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর, বাঙালি জাতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে নেমে এসেছিল। নূর হোসেন নিজের বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়ে এদেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রামকে বেগবান করেছিলেন। হাজারো জনতার ভিড়ে নূর হোসেন ছিলেন সমুজ্জ্বল দেদীপ্যমান। খালি গা আর জিন্সের প্যান্ট পরা নূর হোসেন ছুটে যাচ্ছিলেন এ মিছিল থেকে ও মিছিলে। সবার চোখ আটকে যাচ্ছিল তার বুকে ও পিঠে। জীবন্ত এক প্রতিবাদী পোস্টার, যে পোস্টার পৃথিবীর সব প্রতিবাদী পোস্টারকে হার মানায়। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কয়টি দল অংশগ্রহণ করে? ১
খ. ছয়দফা দাবির যেকোনো একটি দাবি আলোচনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্বৈরাচারী আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান আমলের কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মতো রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হওয়ার ফলেই কি আমাদের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ১৬ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।

খ ছয় দফার প্রথম দাবিতে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়।

প্রথম দাবিতে উল্লেখ ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করে একে সত্যিকার অর্থে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এর সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির এবং প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত স্বৈরাচারী আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান আমলের ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে। মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা ষড়যন্ত্র ও আইয়ুব খানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সকল অংশে ১৯৬৯ সালে এক দুর্বার গণআন্দোলন শুরু হয়। আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি ছিল আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। আর এ ঘটনার সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

Teachingbd24.com

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন হঠাৎ করেই গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়নি। ডাকসু এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যুগপৎ কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা এবং সমাবেশের ডাক দেয়। সমাবেশে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। সমাবেশ শেষে মিছিল হয়। এ মিছিলে পুলিশ বাধা দেয় এবং গুলিবর্ষণ করে। এতে আসাদুজ্জামানসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হন। এতে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে। এভাবে আরও বিভিন্ন ধরনের ক্ষোভ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জমা হতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণিত স্বৈরাচারী আন্দোলনের সাথে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের মতো রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হবার ফলেই অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রজনতার আন্দোলন ও আত্মত্যাগের ফলেই আমাদের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল বলে আমি মনে করি।

আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী ভূমিকার কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল অংশেই গণঅসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী অসন্তোষ ও বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে, ঠিক একইভাবে উদ্দীপকের ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তৎকালীন শাসনের পতন হয়েছিল।

১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি এগারো দফার দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং আহত অবস্থায় বন্দি হয়। ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র-জনতা পুলিশ এবং ইপিআরের সাথে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। পুলিশ একপর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করলে বিরাট একটি মিছিল শহিদ মিনারের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে পুলিশের গুলিবর্ষণে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান। ২১ জানুয়ারি আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে বহু লোক রাস্তায় নেমে পড়ে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে এক চেতনার সৃষ্টি হয়। এর ফলে পরবর্তীকালে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে। গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের পতন হলে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে জনগণের এ বিজয়কে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠলে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে নূর হোসেনের ন্যায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের আত্মত্যাগের ফলেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶২০ ভারতের আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিমল প্রসাদ ১৯৬০ সালে ঘোষণা করেন 'অসমিয়া' ভাষা হবে আসামের একমাত্র রাজ্য ভাষা। এ ঘোষণার ক্ষোভে ফেটে পড়ে আসামের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগঠন করা হয় 'কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ'। এ পরিষদ ১৯ মে ১৯৬০ তারিখে হরতালের ডাক দেওয়ায় রাজ্য সরকার এ দিন কারফিউ ঘোষণা করে। কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১ জন তরুণী ও ১০ জন তরুণ। অবশেষে আসামের রাজ্যভাষা হিসেবে অসমিয়ার পাশাপাশি বাংলাও স্থান লাভ করে। *[গাজীপুর সরকারী মহিলা কলেজ]*

ক. ঐতিহাসিক ছয় দফা কে উত্থাপন করেন? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয় সে আন্দোলনে চূড়ান্ত পর্যায়টি বিশ্লেষণ করে। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহাসিক ছয় দফা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপন করেন।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্য পূর্ব বাংলার চারটি দলের সমন্বয়ে গঠিত ঐক্যবদ্ধ দলই ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত।

যুক্তফ্রন্ট গঠন ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আওয়ামী মুসলিম লীগ (নেতৃত্বাধীন নেতা সোহরাওয়ার্দী), কৃষকপ্রজা পার্টি (শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন) গণতন্ত্রী দল (দানেশের নেতৃত্বাধীন) এবং নেজাম-ই-ইসলাম (মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন) দলসমূহ একত্রিত হয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাছাড় জেলার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম ও অবদানের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিমল প্রসাদ ১৯৬০ সালে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে আসামের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ আন্দোলন গঠিত হয় কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। এ পরিষদ ১৯ মে হরতালের ডাক দেওয়ায় সরকার কারফিউ ঘোষণা করে। কারফিউ ভঙ্গ করলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১ জন তরুণী ও ১০ জন তরুণ। অবশেষে আসামের রাজ্যভাষা হিসেবে অসমিয়ার পাশাপাশি বাংলাও স্থান লাভ করে। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের গভর্নর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণের পুনরাবৃত্তি করে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তীব্র আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। গোলাম মাহবুবকে এ পরিষদের আহ্বায়ক করা হয়। সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন, হরতাল ও বিক্ষোভের আহ্বান করেন। আন্দোলন চরম মাত্রায় রূপ নিলে সরকার ভীত হয়ে এ দিন ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা গোপনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য আলোচনা করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন।

অবশেষে আন্দোলনের চাপে সরকার উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনের সাথে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রমগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আন্দোলন হলো বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপ নেয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু করলে বাঙালিরা প্রথম থেকেই এর প্রতিবাদ করে। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হলেও ১৯৫২ সালে তাদের আন্দোলন চূড়ান্ত রূপে পরিণত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের সাথে এ আন্দোলনই সাদৃশ্যপূর্ণ

১৯৫২ সালের শুরুতেই পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করায় পুনরায় আন্দোলন গতি সঞ্চার করে।

পূর্ব বাংলার বিক্ষুব্ধ জনতা এ ঘোষণার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট ও হরতাল কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে পুনরায় রাজপথ মুখরিত হয় । ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন ছিল। ঐ দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ হরতাল, বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনে ভীত হয়ে সরকার আন্দোলন নস্যাতে দমন নীতি গ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩ টায় ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল ও জনসভা নিষিদ্ধ করেন। নিষেধ থাকার পরও ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মিলিত হয়। সমাবেশ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই শ্লোগানে মিছিল সহকারে আন্দোলনরত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্রদের মিছিল বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌছলে পুলিশের সাথে ছাত্র জনতার সংঘর্ষ বাঁধে এবং একপর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রফিকউদ্দিন, জব্বার, বরকত সহ অনেকে শহিদ হন। এ ঘটনা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সরকার ১৯৫৬ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণ অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২১ ইসলামপুর অঞ্চলের নির্বাচনে ক্ষমতাশীল প্রভাবশালী দলের নেতাকে মোকাবিলা ও পরাজিত করার জন্য ছোট দলগুলো একতাবদ্ধ হয়। তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এক সুদীর্ঘ নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। জনগণ উক্ত জোটের ওপর সার্বিক আস্থা রেখে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে নির্বাচনে জোটের নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতারা চরমভাবে পরাজিত হন। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. হুমায়ুন শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ফরায়েজিদের মতবাদ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইসলামপুর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতা পূর্ব কোন নির্বাচন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী হলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না; পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুমায়ুন শব্দের অর্থ ভাগ্যবান।

খ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হাজি শরিয়তউল্লাহ ভারতবর্ষে যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন তা ফরায়েজি আন্দোলন হিসেবে অভিহিত।

হাজি শরিয়তউল্লাহ বাংলার মুসলমান সমাজে নানারূপ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি লক্ষ করেন। ইংরেজদের অত্যাচারে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। শরীয়তউল্লাহ তাদের জন্য দুঃখ অনুভব করে তাদের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফরায়েজি আন্দোলনের সূচনা করেন।

গ উদ্দীপকে ইসলামপুর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতা পূর্ব ১৯৫৪ সালের নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা প্রদর্শন করে। ফলে মুসলিম লীগ একটি জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চে পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে সমমনা বিরোধী দলগুলো ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গঠন করে।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। যে দফাগুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আর পূর্ব বাংলার জনগণের ব্যালটবিপ্লবের ছোঁয়ায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে, আর মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন পায়। ফলে মুসলিম লীগ চিরতরে পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব হারায়। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্টের নেতারা পূর্ব বাংলার মানুষের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে ব্যালটবিপ্লব ঘটান। উদ্দীপকেও ১৯৫৪ এর নির্বাচনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায় যে, ইসলামপুর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতা পূর্ব যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, 'যতই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হোক না কেন গায়ের জোরে নির্বাচিত হওয়া যায় না।'

উদ্দীপকের ইসলামপুর অঞ্চলের দলগুলোর মতো পূর্ব বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে তাদের আশার একমাত্র ভেলা হিসেবে বেছে নেয়। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ব্যাপক ব্যবধানে পরাজিত হয়। এছাড়া পূর্ব বাংলার মানুষ যখন তাদের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথে দৃঢ়কল্প তখন মুসলিম লীগের ক্ষীণ ষড়যন্ত্র যেন ধোপেই টিকেনি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনমানুষের ব্যালটবিপ্লব। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা এ লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে ছিল। এমনকি তারা পাকিস্তানের ৫৬.৪০ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ৩.২৭ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাছাড়া এমন উদ্দেশ্য সাধনে তারা পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। তারা পূর্ব বাংলাকে বন্দি শিবিরে পরিণত করেছিল। তবে তাদের এ সকল নির্যাতন ও প্রহসনের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষ। এ ঘটনা উদ্দীপকে উল্লিখিত ইসলামপুর অঞ্চলের জনগণ কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন দলকে পরাজিত করার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, অগণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন ও পেশি শক্তির বলে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না— ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত।

প্রশ্ন ▶ ২২ একটি ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রীয়াশীল গোষ্ঠীর দুঃশাসনে কুতুবখালীর বিস্তীর্ণ জনপদের পূর্ব অঞ্চলের জনগণ শোষিত ও বঞ্চিত হয়। এমতাবস্থায় পূর্বাঞ্চলের নেতৃবর্গ ও জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে চরমভাবে পরাজিত করে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. বঙ্গভঙ্গ কেন পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলিমদের মাঝে আশার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে? ২

গ. কুতুবখালীর পূর্ব অঞ্চলের জনগণ পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ায় এটি পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলিমদের মাঝে আশার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

বঙ্গভঙ্গকে প্রথম দিকে পূর্ব বাংলার মুসলিমরা স্বাগত না জানালে ও পরবর্তীতে তারা এটিকে স্বাগত জানায়। পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গের ফলে শিল্পকারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এসকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নতি হবে বলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আশার আলো দেখতে পায়।

গ উদ্দীপকে কুতুবখালীর পূর্বাঞ্চলের লোকজন পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ সালের নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা প্রদর্শন করে। ফলে মুসলিম লীগ একটি জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চে পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে সমমনা বিরোধী দলগুলো ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গঠন করে।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। যে দফাগুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আর পূর্ব বাংলার জনগণের ব্যালটবিপ্লবের ছোঁয়ায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে, আর মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন পায়। ফলে মুসলিম লীগ চিরতরে পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব হারায়। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্টের নেতারা পূর্ব বাংলার মানুষের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে ব্যালটবিপ্লব ঘটান। উদ্দীপকেও ১৯৫৪ এর নির্বাচনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায় যে, কুতুবখালীর পূর্বাঞ্চলের লোকজন পাকিস্তান আমলের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ হয়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, 'যতই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হোক না কেন গায়ের জোরে নির্বাচিত হওয়া যায় না।'

উদ্দীপকের কুতুবখালীর জনগণের মতো পূর্ব বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে তাদের আশার একমাত্র ভেলা হিসেবে বেছে নেয়। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ব্যাপক ব্যবধানে পরাজিত হয়। এছাড়া পূর্ব বাংলার মানুষ যখন তাদের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পথে দৃঢ়কল্প তখন মুসলিম লীগের ক্ষীণ ষড়যন্ত্র যেন ধোপেই টিকেনি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনমানুষের ব্যালটবিপ্লব। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা এ লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে ছিল। এমনকি তারা পাকিস্তানের ৫৬.৪০ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ৩.২৭ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাছাড়া এমন উদ্দেশ্য সাধনে তারা পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। তারা পূর্ব বাংলাকে বন্দি শিবিরে পরিণত করেছিল। তবে তাদের এ সকল নির্যাতন ও প্রহসনের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষ। এ ঘটনা উদ্দীপকে উল্লিখিত কুতুবখালীর পূর্বাঞ্চলের জনগণ কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন দলকে পরাজিত করার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, অগণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন ও পেশি শক্তির বলে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না— ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত।

প্রশ্ন ▶ ২৩ অভি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র। সে একদিন টিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখছিল অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ইংরেজি বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেছিলেন। এই বিষয় অভিকে ব্যথিত করে। অভির মনে প্রশ্ন জাগে এই জন্যই কি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল?

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. মুসলিম লীগ কতো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অভির মনোকষ্টে কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অভির মতো সাধারণ মানুষের চেতনাই বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করে উক্তিটির তাৎপর্য তুলে ধর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ অভির মনোকষ্টে এদেশের ইতিহাসের ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি ধ্বংস করার লক্ষ্যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা প্রদান করলে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং তাদের ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

অভি বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যে এ ভাষার প্রতি অপ্রীতিকর কোনো ধরনের আচরণ সহ্য করতে পারে না। কারণ ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এর রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তখন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দু ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবীগণ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বাঙালি জাতিকে অবদমিত করে রাখতে এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়— যার ধারাবাহিকতায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলার সংগ্রামী জনগণ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। এ মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রফিকউদ্দিন, আবুল বরকত ও আব্দুল জব্বার ঘটনাস্থলে শহিদ হন। তাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাঙালির ভাষার দাবি। ভাষা শহিদদের এ অপরিসীম আত্মত্যাগই অভির মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশকৃত নিজস্ব ভাষার প্রতি মমত্ববোধের চেতনাই বাঙালিকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জুগিয়েছে— মন্তব্যটি যৌক্তিক।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বস্তুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর তৎকালীন পূর্ব বাংলায় যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তন্মধ্যে ভাষা আন্দোলন ছিল সবচেয়ে ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এটি সংঘটিত হয়েছিল বাঙালির বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধের কারণে। এ আন্দোলন বাংলার গণমানুষকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ চেতনাই কালক্রমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়।

উদ্দীপকে বাংলা ভাষা ও হিন্দি মিশিয়ে উপস্থাপনার উল্লেখ করা হয়েছে। যেটি অভিকে ব্যথিত করে। কারণ বাংলা ভাষার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে এই সংস্কৃতি ভাষা শহিদদের অসম্মানিত করেছে। কিন্তু অভির মতো ভাষা সচেতন মানুষের চেতনায় আমাদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে সহায়তা করে। অনুরূপভাবে বাঙালি জাতি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল সেটিকে নস্যাৎ করার জন্য ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এভাবে বাঙালিরা সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ আন্দোলন বাঙালির মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বাঙালিরা এটিও বুঝতে পারে যে, আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়া তাদের অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। ফলে তারা ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়, বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধের চেতনাই বাঙালিকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৪ ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিরা আন্দোলন গড়ে তোলে। এর বিরুদ্ধে আসামি পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায়। এর ফলে অনেক ভাষাসৈনিক নিহত ও আহত হন। *[রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজ]*

ক. 'তমদ্দুন মজলিশ' কত সালে গঠিত হয়েছিল? ১

খ. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে কেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আন্দোলনটি আমাদেরকে বাংলাদেশের কোন আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের চেয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অধিক তাৎপর্য বহন করে।' বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৭ সালে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়েছিল।

খ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক দুরভিসন্ধি থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।

পাকিস্তানের শাসনভার যেসব রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে ছিল তাদের অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী। নতুন রাষ্ট্রের প্রধান বণিক-ব্যবসায়ীরাও ছিলেন উর্দুভাষী। তাছাড়া পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মতে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তারা মনে করতেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, এতে তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এসব কারণে তারা উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল।

গ সৃজনশীল ১০ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২৫ দক্ষিণ সুদানের তেল, গ্যাস ও কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি বৃহৎ অংশ উত্তর সুদানে ব্যয় হতো। রাষ্ট্রিয় সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও দক্ষিণ সুদানের লোকজন নানা হয়রানির শিকার হতো। এরূপ বৈষম্য আর বঞ্চনা তৎকালীন সুদানের জাতিগোষ্ঠির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। দু'দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় এর ভিত্তিতে ২০১১ সালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষ গণভোট মেনে নেয় এবং জাতিসংঘের সহায়তায় দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে। *[দিনাজপুর সরকারী কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কর। ২

গ. স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে– উহা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে আলোচনা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবাব আব্দুল লতিফ।

খ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক।

এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট একচেটিয়া ভোট পেয়ে বিশাল জয় লাভ করে ফলে একে 'ব্যালটবিপ্লব' বলা হয়। প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের ২৩৬টি আসনে জয় লাভ করে। আর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগের কুশাসন ও শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাংলার জনগণের পুঞ্জিভূত বেদনা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন।

গ স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাদৃশ্য রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপুল সম্ভাবনাময় হলেও পূর্ব বাংলার জনগণ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উদ্দীপকে দক্ষিণ সুদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, দক্ষিণ সুদানের তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ উত্তর সুদানে ব্যয় করা হতো, এসব বৈষম্য ও বঞ্চনা তৎকালীন সুদানের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। যার ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের দক্ষিণ সুদানের এ বঞ্চনার ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়। লক্ষণীয় যে প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতির কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পাকিস্তানে যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার প্রথমটি পর্যালোচনা করলেই এ বৈষম্য স্পষ্ট হয়। যেমন: এতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ সকল অর্থনৈতিক বৈষম্যই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রাণিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, চরম বৈষম্যের জের ধরে উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের জাতিগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং এ গণভোটের রায় মেনে সাবেক সুদান রাষ্ট্র ভেঙে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অন্যদিকে, পাকিস্তান শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম বৈষম্য, অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মূলত তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করে মোকাবিলা করে। ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দখলকৃত অঞ্চলসমূহে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। বাঙালি যুবক সম্প্রদায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামগঞ্জে-শহরে গোপনে সংগঠিত হয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। পাক বর্বর বাহিনীর জঘন্যতম অত্যাচারে হাজার হাজার যুবক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অস্ত্রধারণ করে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমান্ড গঠিত হয় এবং তাদের আক্রমণে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রেই সুদানের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের বিশেষত্বের প্রমাণ রেখেছে।

প্রশ্ন ▶২৬ দক্ষিণ সুদানের তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের বৃহৎ অংশ উত্তর সুদানে ব্যয় হতো। রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও দক্ষিণ সুদানের লোকজন নানা হয়রানির শিকার হতো। এরূপ বৈষম্য আর বঞ্চনা তৎকালীন সুদানের জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। দু'দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শান্তিচুক্তি এবং এর ভিত্তিতে ২০১১ সালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় উভয় পক্ষ গণভোট মেনে নেয় এবং জাতিসংঘের সহায়তায় দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. যুক্তফ্রন্ট কতটি দল নিয়ে গঠিত হয়। ১

খ. আগরতলা মামলা কী? ২

গ. স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে– বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয়।

খ ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান যে মামলা দায়ের করে, তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

আগরতলা মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল– ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম দেওয়া হয় আগরতলা মামলা।

গ স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাদৃশ্য রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপুল সম্ভাবনাময় হলেও পূর্ব বাংলার জনগণ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উদ্দীপকে দক্ষিণ সুদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে লক্ষণীয় দক্ষিণ যে, সুদানের তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ উত্তর সুদানে ব্যয় করা হতো, এসব বৈষম্য ও বঞ্চনা তৎকালীন সুদানের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি

করে। যার ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের দক্ষিণ সুদানের এ বঞ্চনার ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়, লক্ষণীয় যে প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতির কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পাকিস্তানে যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার প্রথমটি পর্যালোচনা করলেই এ বৈষম্য স্পষ্ট হয়। যেমন: এতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ সকল অর্থনৈতিক বৈষম্যই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়, দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, চরম বৈষম্যের জের ধরে উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের জাতিগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং এ গণভোটের রায় মেনে সাবেক সুদান রাষ্ট্র ভেঙে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অন্যদিকে, পাকিস্তান শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম বৈষম্য, অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মূলত তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করে মোকাবিলা করে। ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দখলকৃত অঞ্চলসমূহে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। বাঙালি যুবক সম্প্রদায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামগঞ্জে-শহরে গোপনে সংগঠিত হয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। পাক বর্বর বাহিনীর জঘন্যতম অত্যাচারে হাজার হাজার যুবক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অস্ত্রধারণ করে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমান্ড গঠিত হয় এবং তাদের আক্রমণে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রেই সুদানের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের বিশেষত্বের প্রমাণ রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং উত্তর দাও:

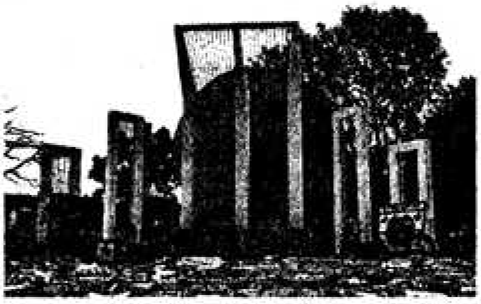

(ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর)

ক. ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. ঐতিহাসিক ছয়দফা বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে চিত্রটি পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত আন্দোলনের চেতনার মাঝে বাংলার স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।" উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মতামত প্রদান কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

খ অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ছয় দফা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটায়।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই ছয় দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। কেননা সকল শোষিত, বঞ্চিত, ও নিপীড়িত শ্রেণি ছয়দফার মধ্যে নিজেদের অধিকার রক্ষার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আলাদাভাবে বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটতে থাকে।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা একজন বিশ্ব নন্দিত ব্যক্তিত্ব। একসময় তার দেশ ছিল ইংরেজদের অধীনে। ইংরেজরা তখন আফ্রিকানদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনের অবসান হলেও শ্বেতাঙ্গরাই ছিল রাষ্ট্রের কর্ণধার। তারা স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার বঞ্চিত করত। নেলসন ম্যান্ডেলা তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে তাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি সম্বলিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যা তাদের মুক্তির সনদ বলে বিবেচিত হয়। *(ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর)*

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন জয় লাভ করে? ২

গ. উদ্দীপকে কর্মসূচীর সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল আছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত কর্মসূচিকে 'বাংলার মুক্তির সনদ বলা হয়' মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর জুলুম, নির্যাতন ও বৈষম্য, বঞ্চনার জবাব দেওয়া।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আওয়ামী লীগকে সমর্থন প্রদান করে। এই নির্বাচনে হেরে যাওয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আফ্রিকা অঞ্চলের নেতা ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে সরকারের বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারের নিকট দাবি তুলে ধরে। ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুও বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেছিলেন। এটি ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা। এই ছয় দফা দাবিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। বলা হয় প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রের হাতে, বাকি সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে। দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু করার দাবি করা হয়। এছাড়া রাজস্ব ও শুল্ক এবং বৈদেশিক বিষয় প্রদেশের হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়। এ ছয় দফা দাবিতে আরো বলা হয় নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী তথা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে পারবে। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। অবশেষে ১৯ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে 'ছয় দফা' কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। উদ্দীপকের নেতার দাবিনামায় এ ছয় দফা দাবির প্রতিফলন ঘটেছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কর্মসূচীর সাথে বাংলার মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবিকে বলা হয়— উক্তিটি যথার্থ।
পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, নির্যাতিত জনগণ ছয় দফাকে মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত করে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে আমাদের বাঁচার দাবি বলে মন্তব্য করেন। শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। বাংলার স্বাধিকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছয় দফা ছিল নির্বাচনের মূল ইশতেহার। এ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। বাঙালির স্বাধীনতার ভিত্তি ছয় দফা হওয়ায় এটিকে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ যার মাধ্যমে বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করে, অভ্যুদয় হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। আর এর মূলে ছিল ছয় দফা কর্মসূচির অবদান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।
পরিশেষে বলা যায়, ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্টা' ফরাসি বিপ্লবে 'অধিকার বিল' এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'-এর যে অবদান, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতেও ছয় দফার ভূমিকা সীমাহীন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ হোসনি মোবারক মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই সামরিক বাহিনীর সহায়তা নিয়ে স্বৈরাচারী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। তিনি কখনও বিরোধী দলের কোন মতামতকে গ্রাহ্য করেন নি। একসময় দেশের আপামর জনসাধারণ তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষের আইনজীবীর নাম কী ছিল? ১
খ. একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিসরের উক্ত আন্দোলনের সাথে পঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলন সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলনের মতই উক্ত আন্দোলন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু পক্ষের আইনজীবীর নাম ছিল স্যার টমাস উইলিয়াম।

খ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য বাঙালিকে রক্ত দিতে হয়েছিল। এ কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয়।
পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬.৪০ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে মাত্র ৩.২৭ ভাগ মানুষের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বাঙালি জাতি এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলনরত অবস্থায় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা অনেকে শহিদ হন। আর শহিদদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়েই বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই এ দিনটি স্মরণীয়।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে সবচেয়ে বড় আন্দোলন।
১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার ওপর নানা ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচার করতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আর ১৯৬৯ সালের আন্দোলন ছিল এগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, হোসনি মোবারকের স্বৈরাচারী শাসন আর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেশের আপামর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঠিক একইভাবে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণ স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ফলশ্রুতিতে আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। এই আন্দোলন ইতিহাসে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড় ও সংগঠিত আন্দোলন। এ আন্দোলন ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষের মাধ্যমে শুরু হলেও তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। বাংলার শহর ও গ্রামের শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এ আন্দোলন যেন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ক্ষিপ্ত জনতা সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবন আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ আন্দোলনের ফলেই আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আর এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা পরবর্তীকালে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপলাভ করে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সর্ববৃহৎ আন্দোলন।

প্রশ্ন ▶ ৩০ ১৯৬০ সালে ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ধর্মঘটে আসাম রাইফেলসের একটি ব্যাটালিয়ন আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। এর ফলে ১১ জন ভাষা সৈনিক ঘটনাস্থলে শহিদ হন। পরবর্তীতে আন্দোলন আরও জোরদার হলে চাপের মুখে আসাম সরকার বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। *[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়েছিল কত সালে? ১
খ. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আন্দোলনটি আমাদেরকে বাঙালির কোন আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাঙালির উক্ত আন্দোলনটি উদ্দীপকের আন্দোলন অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ— মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৭ সালে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়েছিল।

খ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক দুরভিসন্ধি থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।
পাকিস্তানের শাসনভার যেসব রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে ছিল তাদের অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী। নতুন রাষ্ট্রের প্রধান বণিক-ব্যবসায়ীরাও ছিলেন উর্দুভাষী। তাছাড়া পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মতে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তারা মনে করতেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, এতে তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এসব কারণে তারা উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল।

গ উদ্দীপকের আন্দোলনটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়।
মায়ের ভাষা প্রত্যেক মানুষেরই প্রাণের ভাষা। তাই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার থেকে যদি কাউকে বঞ্চিত করা হয় তবে তার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। উদ্দীপকে উল্লিখিত আসামের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের বাঙালির ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষার দাবিতে প্রতিবাদী চেতনা জাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও প্রাদেশিক সরকার অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা

Teachingbd24.com

হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাভাষী জনগণ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে ভাষার দাবিতে চলমান ধর্মঘটে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায় সরকার। ঘটনাস্থলেই ১১ জন ভাষা সৈনিক শহিদ হন। ১৯৫২ সালে সংঘটিত বাঙালির ভাষা আন্দোলনের চিত্রও অনেকটা এ রকম। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। প্রথম থেকেই বাঙালিরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সাল থেকে চলমান এই আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ আরও অনেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাষার দাবিতে প্রাণদান করার দিক থেকে আলোচ্য আন্দোলন দুটি একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। এই আন্দোলন শোষিত বাঙালির প্রতিবাদী চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ফলে বাঙালি অনুধাবন করতে পেরেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত স্বাধীনতার চেতনার এ দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

আসামের বাঙালিরা আমাদের মতোই বাংলা ভাষার দাবিতে প্রাণ দিয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমে তারাও তাদের দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন তাদের মধ্যে কোনো স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করতে পারেনি। এ কারণেই তারা ভারতের প্রাদেশিক শাসনের গণ্ডিতেই আবদ্ধ রয়েছে। পক্ষান্তরে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে একটি পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে এই আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনে প্রভাবকের কাজ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আলোচ্য দুই ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীন সত্তার জাগরণের মধ্য দিয়ে উদ্দীপকের ভাষা আন্দোলন অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ সুমনা চৌধুরী কিছুদিন আগে 'ক' রাষ্ট্রের ইতিহাস পড়েন। তিনি রাষ্ট্রটির একটি অংশের দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস বিশেষত সর্বশেষ শাসনকারী কর্তৃত্বের শোষণ সম্পর্কে অবগত হন। তিনি জানতে পারেন, সর্বশেষ কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উক্ত অংশের জনগণ প্রথম থেকেই ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা ও পৃথক মুদ্রার জন্য সুপারিশ পেশ করেন।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]

ক. কত সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুপারিশগুলোতে ছয়দফার যে দাবি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের নেতার সুপারিশগুলোর মতো ছয় দফা দাবিগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল– মূল্যায়ন কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটির কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচারে এটি দ্রুত পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিতি লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবের অনেক আগেই পাকিস্তান শব্দটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। লাহোর প্রস্তাবে আঞ্চলিক স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হলেও ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে একে সংশোধন করে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা উল্লেখ করে। ফলে এ প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে আখ্যা পায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সুপারিশগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ছয় দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারে চরম অবহেলা, পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন এবং সরকারের নিকট কতগুলো দাবি পেশ করেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমনা 'ক' রাষ্ট্রটির একটি অংশের দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস বিশেষত সর্বশেষ শাসনকারী কর্তৃত্বের শোষণ সম্পর্কে অবগত হন। তিনি জানতে পারেন, সর্বশেষ কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উক্ত অংশের জনগণ প্রথম থেকেই ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা ও পৃথক মুদ্রার সুপারিশ করে। এ দাবি দুটির সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফার কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা এবং মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক দাবি দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ। ছয় দফার দাবির দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে কেবল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। অর্থ ও মুদ্রা বিষয়ক প্রস্তাবটি ছয় দফা দাবির ৩য় দফার অন্তর্ভুক্ত। ছয় দফায় মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক দুটি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। প্রথমত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সহজ ও অবাধ বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় দুই অঞ্চলে দুটি স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনায় ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। দ্বিতীয়ত, ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে এক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন বিধান রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার না হতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, ছয় দফা দাবির কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও মুদ্রা বিষয়ক দাবি দুটি উদ্দীপকের সুপারিশগুলোতে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের সুমনা চৌধুরী দাবিনামা সম্পর্কে জানতে পারেন অর্থাৎ ছয় দফা দাবিনামা ঐ দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৬৬ সালের ছয়দফা দাবিসমূহ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। এতে আইয়ুব খান সরকার আতঙ্কিত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে অনেক লোক প্রাণ হারালে ৮ জুন প্রতিবাদস্বরূপ প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।

উদ্দীপকের সুমনা চৌধুরী একটি দেশের ইতিহাস পড়ে জানতে পারেন যে সে দেশের একজন মহান নেতার উত্থাপিত সুপারিশনামা ওই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। ঠিক একইভাবে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ছয় দফা দাবি, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে সারাদেশে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা দমনের জন্য সরকার ১০ মে ৩৫০০ জন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করে। আর ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করে ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু করে। এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পরও সরকার গঠন করতে না পারায় দেশব্যাপী ১৯৭১ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। আর দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবিই পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩২ ফরাসিরা কানাডায় উপনিবেশ স্থাপন করে ফরাসি ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। কানাডার জনগণ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই আন্দোলন পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয় এবং কানাডা ফরাসিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে?

[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]

ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপিত হয়? ১

খ. ভারত বিভক্তির মূল কারণ কী ছিল? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ বপিত হয়েছিল। ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সালে উত্থাপিত হয়।

খ ভারত বিভক্তির মূল কারণ ছিল দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব। ১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশনের প্রথম দিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর বহুল আলোচিত দ্বি-জাতিতত্ত্ব (Two-Natios Theory) ঘোষণা করেন। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ২২ মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। দ্বি-জাতি তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিমের পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। ফলে ভারত বিভক্তির পথ সুগম হয়।

গ উদ্দীপকের সাথে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিল রয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে এর রাষ্ট্র ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এসময় সংখ্যাগুরু মানুষের ভাষা বাংলা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার প্রমুখ। এই আন্দোলন পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফরাসিরা কানাডায় জোর করে তাদের ফরাসি ভাষা চাপিয়ে দেয়। পরবর্তীতে কানাডার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এই আন্দোলন তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে কানাডা ফরাসিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে বাংলাদেশের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এ আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দাবি আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের মধ্যদিয়ে এ ঘটনারই অবতারণা করা হয়েছে।

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এক ব্যালটবিপ্লব ঘটায়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ এক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা দাবির প্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান, যা আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। পরে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া না হলে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আর পৃথিবীর মানচিত্রে উদ্ভব ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ কেনিয়া একটি অঞ্চলের সোহাহিলি ভাষাভাষিরা পূর্বঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী ধর্মঘট পালন করে। হাজার হাজার ছাত্র-যুবক-জনতা জমায়েত হলেন আন্দোলনে। একই শ্লোগান সকলের মুখে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, "মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, সোহাহিলি ভাষা জিন্দাবাদ।" সবাইকে অবাক করে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি বর্ষিত হয়। এতে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটে। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১

খ. সিমলা ডেপুটেশন কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনগণের আত্মত্যাগের তাৎপর্য তোমার পাঠ্যবইয়ের ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে শেরে বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক উপস্থাপিত মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রস্তাবটি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

খ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন এবং চাকরিতে অধিক নিয়োগ দানের দাবিতে মুসলিম প্রতিনিধি দল ১৯০৬ সালে সিমলায় লর্ড মিন্টোর সাথে যে মত বিনিময় করেন, তা সিমলা ডেপুটেশন নামে পরিচিত।

ভারতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার ছক চূড়ান্ত হওয়ার আগেই সরকারের সামনে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুভূতি ও বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর ৩৫ সদস্যের মুসলিম প্রতিনিধি দল আগা খানের নেতৃত্বে সিমলায় ভারতের ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেন। এটি সিমলা ডেপুটেশন নামে খ্যাত।

গ সৃজনশীল ৩২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ আমেরিকায় ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ থেকে মুক্তির জন্য জর্জ ওয়াশিংটন ঐতিহাসিক ১১ দফা ঘোষণা করেন, যা সমগ্র আমেরিকার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। *[সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর]*

ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবই এর কোন দফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত দফা ঘোষণাকারী পরবর্তীতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার গুরুত্ব নিরূপণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

খ মৌলিক গণতন্ত্র হলো সামরিক শাসক আইয়ুব খানের প্রবর্তিত এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্রের কাঠামো, যাতে কেবল নির্দিষ্টসংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল।

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর প্রচলিত গণতান্ত্রিক কাঠামো পরিত্যাগ করে এক অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করে। যেটি মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত। মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো ছিল চার স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা, যা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত সাজানো ছিল। এ মৌলিক গণতন্ত্রের স্তরগুলো হলো— ১. ইউনিয়ন পরিষদ, ২. থানা পরিষদ, ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ। এ পরিষদগুলোতে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্যই থাকত।

গ উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবই এর ৬ দফার সাদৃশ্য রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৬ সালের ৬ দফার গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত এ ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে 'নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স' আহ্বান করা হয়। এতে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্ব পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মাত্র ২১ জন যোগ দেয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ

https://teachingbd24.com

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবি সংবলিত 'ছয় দফা' প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের বিরোধিতায় তিনি ব্যর্থ হন। পরে লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কর্মসূচী প্রকাশ করেন। এই ছয় দফা বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।
উদ্দীপকের জর্জ ওয়াশিংটনের ১১ দফা ও উপর্যুক্ত বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার মধ্যে তাই সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়টি নিজ নিজ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।

ঘ উক্ত দফা ঘোষণাকারী অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তীতে যে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ভাষণ দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষণকে 'UNESCO' ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারী হেরিটেজ এর অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করেছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা। অনেকে এই ভাষণকে বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ হিসেবে আখ্যা দেন। উনিশ মিনিটের ও এক হাজার একশত সাতটি শব্দের মাস্টারপিস তুল্য এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ও বাহুল্য নেই। এতে আছে সারকথা ও সারমর্ম। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তার এক বহুল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। এই ভাষণের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা এবং এর মাধ্যমেই বাঙালি পেয়েছে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। যার ফলশ্রুতিতে বাঙালি লাভ করেছিল স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ রোহান একটি প্রখ্যাত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেন। বার্ষিক একটি মিটিংয়ে রোহান বাংলাতে বক্তৃতা করছেন। এ সময় মালিক পক্ষ বাংলাতে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করলে রোহান বলল, আমি বাংলাতে বক্তৃতা করব। কিন্তু মালিক পক্ষের প্রবল চাপে তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হন। *[আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ]*

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ কী ছিল। ১
খ. আগরতলা মামলা দায়েরের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রোহানের মনোভাব ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মালিক পক্ষের এ ধরনের আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল— এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভাষা আন্দোলন।

খ ছয় দফাভিত্তিক বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার প্রেক্ষাপটে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছিল।
ছয় দফা দাবি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ থেকে বাঙালির মুক্তির সনদ। এ কারণে ছয় দফা দাবি আদায়ে বাঙালি জাতি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে সরকার কৌশলে বাংলার প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করে।

গ রোহানের মনোভাবে ইতিহাসের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলা ভাষাই ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। তারপরেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাকে বাদ দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। আর এ চক্রান্তকে রুখতে বাঙালি জাতি আন্দোলনে যোগদান করে। এ আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন হলেও পরবর্তীকালে তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।
উদ্দীপকের রোহান একটি বিখ্যাত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে চাকরি করেন। বার্ষিক মিটিংয়ে রোহান বাংলাতে বক্তৃতা করলে মালিক পক্ষ বাংলাতে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করে। রোহান বলল, আমি বাংলাতে বক্তৃতা করব। মালিক পক্ষের চাপে সে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে বাধ্য হয়। কাজে বাংলা ভাষার প্রতি প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আর এ আকর্ষণ ভাষা আন্দোলনের প্রভাবেই হয়েছে। কেননা পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেয়। এতে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। যা ১৯৫২ সালে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা অনেক শহিদের জীবনের বিনিময়ে বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। বাঙালি জাতি যেমনি বাংলা ভাষার প্রতি চরম মমত্ববোধ থেকে ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তেমনি রোহানও বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব প্রকাশ করেছেন।
তাই বলা যায়, রোহানের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ঘ রোহানের কোম্পানীর মালিক পক্ষের এ ধরনের আচরণ অর্থাৎ ভাষার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাঙালি জাতিকে মুক্তি যুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এ আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। এ আন্দোলনে মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দাবি আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে এ জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এক ব্যালট বিপ্লব সংগঠন করেছিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ এক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা দাবির প্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান। যা আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে। পরে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া না হলে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তার সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আর পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ ১৯৫৮ খ্রি. সিরিয়া ও মিসর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র UAR গঠন করে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল একই সেনাবাহিনী এবং একটি যৌথ পতাকার দু'টি পার্শ্ববর্তী দেশ প্রতিরক্ষাসহ সকল বিষয়ে সংঘবদ্ধভাবে কার্য নির্বাহ করবে। কিন্তু UAR প্রতিষ্ঠার পর থেকে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের নিজেকে UAR এর প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে সমস্ত কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ও বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আধিপত্য ও একনায়কতন্ত্র বিস্তারের চেষ্টা করেন। ফলে সিরীয় জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। অবশেষে ১৯৬১ খৃ. UAR এর বিলুপ্তি ঘটে।
[আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? ১
খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সিরীয় জনগণের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কীরূপ বৈষম্যের স্বীকার হয়েছিল? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. UAR এর বিলুপ্তির ন্যায় উক্ত বৈষম্যমূলক নীতিই বাংলার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

teachingbd24.com

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সিরীয় জনগণের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সিরীয় জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রশাসনিক, সামরিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। তাই বলা যায় যে, সিরীয় জনগণ যে সকল বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা পূর্ব বাংলার জনগণের বৈষম্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৬ শতাংশ মানুষের বসবাস পূর্ব পাকিস্তানে হলেও ১৯৪৭-১৯৫৮ পর্যন্ত ৪ জন রাষ্ট্র প্রধানের মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। ১৯৫৬ সালে চালু হওয়া কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র ১৯৫৮ সালে বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়। সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো প্রকট হয়। সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। আর্থিক বৈষম্য ছিল বাঙালিদের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সকল ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় অতি সহজে পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। একইভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিপীড়নমূলক বৈষম্য দেখা যায়।

ঘ 'UAR এর বিলুপ্তির ন্যায় উক্ত বৈষম্যমূলক নীতি অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক বৈষম্যমূলক নীতিই বাংলার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল'— উক্তিটি যথার্থ।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিরা বৈষম্যমূলক নীতি প্রদর্শন করতে থাকে। কিন্তু বাংলার মানুষ তা মুখ বুজে সহ্য করেনি। তারা পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ছয় দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়।
১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার ঘোষণা দেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই ছয় দফার দাবি না মানলে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এর সাথে যুক্ত হয় ছাত্রদের ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন। ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা দায়েরকে কেন্দ্র করে আন্দোলন আরও তীব্র হয় এবং গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে এবং সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগ করে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। কেননা এ নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। যা UAR এর বিলুপ্তির মতোই পাকিস্তান সরকারের গৃহীত বৈষম্য নীতিই পাকিস্তান সরকারের পতন ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল।
পরিশেষে বলা যায়, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতিই পূর্ব বাংলার জনগণকে স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে এবং পরবর্তীতে এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাংলার স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামের জন্যই যেন লতিফুর রহমানের জন্ম। তিনি কখনও নিজের সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করেননি। একদা এই সাহসী লতিফুর নিজ দেশের সরকারের কাছে ৬টি দাবি পেশ করেন। যা তার দেশের জনগণের বাঁচার দাবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। তার এই দাবিগুলো পরবর্তী কালে দেশের নানা আন্দোলন সংগ্রামে ব্যাপক গুরুত্ব রেখেছিল।

[আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. ৬ দফা কে ঘোষণা করেন? ১
খ. ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকের ৬ দফা পাঠ্যপুস্তকের যে দাবির প্রতিচ্ছবি তার ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ৬ দফার মতো ঐতিহাসিক ৬ দফা বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উত্তরের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয় দফা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে বাঙালি জাতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলরত জনগণের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে রফিক, শফিক, জব্বারসহ অনেকে নিহত হয়। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। এই দিনেই বাংলার রাজপথ ভাষার দাবি আদায়ের জন্য রক্তেরঞ্জিত হয়।

গ সৃজনশীল ৩৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ লতিফুরের দেওয়া দাবিগুলো অর্থাৎ ছয়দফা দাবি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম। ছয় দফার বিরুদ্ধে আইয়ুব খান কঠোর নিন্দা জানান। আইয়ুব খান ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বলে আখ্যা দেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। মিছিলে তেজগাঁওয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় শ্রমিক মনু মিয়া ও আবুল হোসেনসহ নাম না জানা অনেক ব্যক্তি। ১০ মে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ৩৫০০ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ দফার গণজাগরণ ধ্বংস করে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা শুরু করে। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের মুখে সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৬ দফাকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে না গিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ শুরু করে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে লাল-সবুজের পতাকা অর্জন করে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ছয় দফার মতোই বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফার দাবিগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ মীর্জাপুর উপজেলার নতুন কহেলা গ্রামে চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে গ্রামবাসীর অসন্তোষ তুঙ্গে। গ্রামবাসী স্বৈরাচারী চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার জন্য বারবার নির্বাচন দাবি করে আসছিলেন এবং এ ব্যাপারে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নিলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে চেয়ারম্যান প্রভাব খাটিয়ে নতুন চেয়ারম্যানকে জেলে পুরে দেয় এবং বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে গ্রামবাসীর ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আবারও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. তমদ্দুন মজলিশ গঠিত পরিষদের নাম কী? ১
খ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেন ঘটেছিল? ২
গ. উদ্দীপকের গ্রামবাসী সংঘবদ্ধ হওয়ার সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, গ্রামবাসীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিণতির মতই যুক্তফ্রন্টের পরিণতিও একই হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তমদ্দুন মজলিশের গঠিত পরিষদের নাম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

https://teachingbd24.com

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি গৃহীত বৈষম্য নীতির প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। আর এ অধিকার বঞ্চিত হওয়ার দিক দিয়েই উদ্দীপকের শ্রমিক সংঘ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য চাপ দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, মীর্জাপুর উপজেলার নতুন কহেলা গ্রামে স্বৈরাচারী চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার জন্য বারবার নির্বাচন দাবি করে আসছিল। এ ব্যাপারে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করতে থাকে। সরকারের বৈষম্য নীতির ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্য নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো একত্র হয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ছিল বাংলার মানুষের এক ব্যালটবিপ্লব। সুতরাং উদ্দীপকে শ্রমিক সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে এ বিষয়েরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, গ্রামবাসীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিণতির মতোই উদ্দীপকে গ্রামবাসীদের আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দাবি মেনে নিলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে চেয়ারম্যান প্রভাব খাটিয়ে নতুন চেয়ারম্যানকে জেলে পুরে দেয় এবং বিভিন্ন অজুহাত ও কৌশলে গ্রামবাসীর ঐক্য ভেঙে দেয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আবারও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ঠিক একইভাবে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অপতৎপরতা ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে আবার নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

উদ্দীপকের গ্রামবাসীর সংঘবদ্ধতা যেমন সাময়িকভাবে সফলতা অর্জন করে অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা ব্যর্থতার রূপ পরিগ্রহ করে। মূলত যুক্তফ্রন্ট কোনো আদর্শিক ভিত্তিতে নয় বরং নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্টে বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের ভাঙন এবং মন্ত্রিসভা বাতিলের জন্য এ সময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা অপতৎপরতা শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিকল্পিতভাবে আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনাসহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ওপর এর দায় চাপিয়ে দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে এ মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার শাসনব্যবস্থায় আবার পাকিস্তানি সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের মধ্যে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ও গ্রামবাসীর পরিণতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩৯ 'X' রাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি প্রদেশের মধ্যে পূর্ববর্তী একটি প্রদেশ ছিল জনবহুল। এই প্রদেশটি কেন্দ্র থেকে নানা অগণতান্ত্রিক আচরণের শিকার হয়। মাতৃভাষা কেড়ে নেয়া হয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অস্বীকার করা হয়, শিক্ষা, সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত প্রদেশের একজন প্রধান ও জনপ্রিয় নেতা কয়েক দফা সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করে তার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে যান।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. আগরতলা মামলা কত সালে দায়ের করা হয়? ১

খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনবহুল প্রদেশের নেতার কয়েক দফা প্রস্তাবটির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রস্তাবে গুরুত্ব বা তাৎপর্য অপরিসীম— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯৬৮ সালে দায়ের করা হয়।

খ বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকাশ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যবাহী ঐতিহাসিক ঘটনা।

বস্তুত আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও সামরিক স্বৈরাচারীর অবসান এবং ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ইতিহাসে এ আন্দোলনই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের জনবহুল প্রদেশটির নেতার কয়েক দফা প্রস্তাবটির সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবির সাদৃশ্য রয়েছে।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে বাঙালি নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের চরম অবহেলা, পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন এবং সরকারের নিকট কতগুলো দাবি পেশ করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের জনবহুল প্রদেশটির প্রধান ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা কেন্দ্রের বৈষম্য নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি দফা সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। এখানে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক বিরোধীদলীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এ ছয়দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের মুক্তির সনদ। যাতে বাঙালির প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে আইন সভা গঠন ইত্যাদি বিষয়ে দাবি জানানো হয়। সুতরাং ১৯৬৬ সালের বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা কর্মসূচির সাথে উদ্দীপকের প্রস্তাবের সামঞ্জস্য রয়েছে।

ঘ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে উক্ত প্রস্তাবের অর্থাৎ ছয় দফা দাবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বৈষম্য ও শোষণ করা হয়েছিল ছয় দফা কর্মসূচি ছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকস্বরূপ। এতে বাঙালির চরম প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের সোচ্চার দাবি জানানো হয়। এটি ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বাঁচার দাবি। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য এটি ছিল এক সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও অনুপ্রেরণা সমৃদ্ধ কর্মসূচি। ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন দমনের জন্য সরকার কঠোর দমন-নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে বাঙালির নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের ঐক্য ও সংহতি জোরদার করে। তাদের এই ঐক্য, সংহতি ও সংগ্রামী চেতনার ফসল ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। আর এ গণঅভুত্থানের পথ ধরেই বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। ছয় দফার আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ হলো ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ, যার মাধ্যমে অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, 'ছয় দফা' দাবি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। অনেকেই মনে করেন ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্টা' ফরাসি বিপ্লবে 'অধিকার বিল' এবং আমেরিকার 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' এর যে অবদান, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছয় দফার অবদান।

পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। যা এর গুরুত্বকেই বহন করে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪০

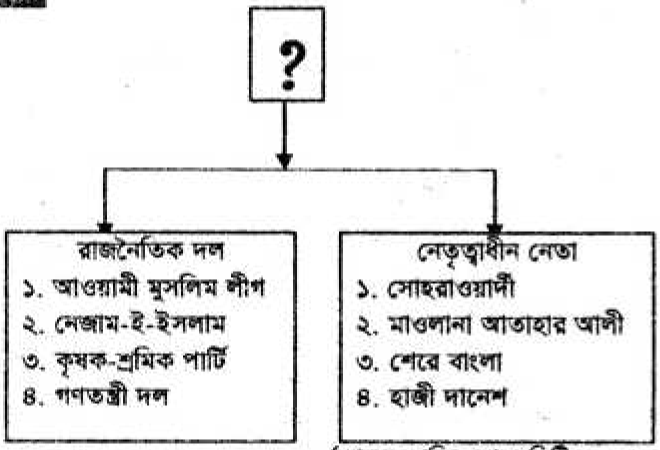

[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. সৈয়দ আমীর আলী কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. খেলাফত আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '?' চিহ্ন দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরবর্তী ইতিহাসে উক্ত ঘটনা কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা মূল্যায়ন কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৈয়দ আমীর আলী ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

খ খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানের খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা করা।

ভারতীয় মুসলমানগণ মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক তুরস্কের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষে যোগদান করলে ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশদের এ শর্তে সমর্থন দেয় যে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ভারতীয় মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে খেলাফত আন্দোলন গড়ে তোলে।

গ প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '?' চিহ্ন দ্বারা ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট গঠনকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নানা ধরনের শোষণ বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করতে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐকবন্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

প্রদত্ত ছকের বাম পাশে চারটি রাজনৈতিক দল যথা— আওয়ামী মুসলিম, নেজাম-ই- ইসলাম, কৃষক প্রজাতন্ত্র পার্টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটির ডান পাশে এ চারটি দলের নেতৃত্বাধীন নেতা যথাক্রমে সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা মোতাহের আলী, শেরে বাংলা এবং হাজী দানেশের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এটি মূলত যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাথে সংগতিপূর্ণ। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করতে থাকলে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বৈষম্য নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার পূর্ব বাংলার চারটি রাজনৈতিক দল যথা- আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল একত্রিত হয়ে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এই দল ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং এর নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাই বলা যায়, প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '?' দ্বারা ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট গঠনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, পরবর্তী ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট গঠন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আতাহার আলী, শেরে বাংলা, হাজী দানেশ প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যুক্তফ্রন্ট জোট বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৪১ বসনিয়া ছিল এক সময় সার্বিয়ার একটি প্রদেশ। বসনিয়ারা রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা সার্বিয়ানদের হাতে ছিল। তারা বসনিয়দের উপর বৈষম্য ও শোষণনীতি গ্রহণ করলে বসনিয়াবাসী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সার্বিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করতে গেলে সেখানে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠীর হাতে বহু ছাত্রজনতা হতাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

ক. দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন কে? ১

খ. ছয় দফা সম্পর্কে আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বসনিয়াদের স্বায়ত্তশাসনের দাবির আন্দোলনের সাথে কোন আন্দোলন সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বসনিয়াদের আন্দোলন ও বাঙালির আন্দোলন স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বৈত শাসনের প্রবর্তক লর্ড ক্লাইভ।

খ ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তির দাবি সম্বলিত যে কর্মসূচি পেশ করেন তাই ছয় দফা কর্মসূচি নামে পরিচিত।

ছয় দফা বাঙালি জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ছয় দফায় যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয় সেগুলো হলো, শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা, রাজস্ব ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা, বৈদেশিক মুদ্রা ও বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এগুলোকে কেন্দ্র করে ছয় দফা আন্দোলন সূচিত হয়।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪২ শ্রেণি কক্ষে একজন শিক্ষক মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন- মাতৃভাষা রক্ষার জন্য আমাদের দেশে যে আন্দোলন হয়েছিল সেটি আমাদের মাঝে এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দেয়। বিশ্বের ইতিহাসে ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে কেবল বীর বাঙালির। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]*

ক. মুজিব নগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর। ৩

https://teachingbd24.com

ঘ. উক্ত আন্দোলন এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দেয়-- বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিব নগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৩ মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হোসনি মুবারক ক্ষমতায় আসীন হয়। তিনি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। পরবর্তী তিনি গণতন্ত্র প্রবর্তনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনের পর তিনি মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। সামরিক বাহিনীর সহায়তা নিয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। বিরোধী দল মতামত তিনি কখনো গ্রাহ্য করেননি; বরং তিনি বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতার ও তাদের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করেন। কিন্তু একসময় মিসরের জনগণ তার দমন পীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। তাহরি স্কয়ারে সংঘটিত প্রবল গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগে বাধ্য হন। *(অমৃতলাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল)*

ক. পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন কে? ১

খ. 'বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলন সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানে 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেন জেনারেল আইয়ুব খান।

খ ছয় দফা দাবিতে বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কথা ছিল বলে একে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এতে বাঙালির চরম প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি উত্থাপন করা হয়। তাছাড়া ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিদের জন্য পৃথক অর্থব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষার দাবি জানানো হয়। এর ফলে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়। এই ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। তাই এটি বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

গ মিসরের উক্ত আন্দোলনের সাথে আমার পঠিত পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মিল বিদ্যমান।

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর সামরিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল আইয়ুব খান। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তিনি পূর্ব বাংলায় তার দমন-নিপীড়ন নীতি অব্যাহত রাখেন। পরে তার এই শাসন পরিক্রমায় বাংলার ছাত্রসমাজের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আর, ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলন এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নিলে আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকেও এই দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হোসনি মোবারক সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মিসরে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মিসরের জনগণ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। একইভাবে ১৯৬৯ সালেও পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে, যা ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলনে রূপ নেয়। প্রবল গণবিদ্রোহের মুখে আইয়ুব খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়। একই সাথে তিনি আর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ারও ঘোষণা দেন। এভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চে আইয়ুব খানের শাসনের অবসানের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ফলাফল ছিল বাঙালি জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের ইতিহাসের এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ এ আন্দোলনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনে তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। তাছাড়া এ আন্দোলনের ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার সূচনাসহ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়। রাজনীতিতে আইয়ুব খানসহ কেন্দ্রীয় এলিটশ্রেণির মনোভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরও সুসংহত রূপধারণ করে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু করলে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লৌহমানব বলে খ্যাত আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। আইয়ুব খানের পদত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরো সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে ধাবিত হতে শুরু করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক গণরায় প্রদানের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। আর এ নির্বাচনই মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রভূমি তৈরি করে, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত হয়।

এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৪৪ রফিক একজন স্কুল শিক্ষক, তার ছেলে সাওনকে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেন কিন্তু সাওনের মা এতে নাখোশ। তিনি চান তার ছেলেকে অক্সফোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাতে। রফিক সাহেব বুঝিয়ে বলেন যে, অধিক জ্ঞান আরোহণের জন্য মাতৃভাষায় লেখা পড়ার বিকল্প হতে পারে না। *(কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর)*

ক. তমদ্দুন মজলিশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. ছয়দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২

গ. কোন আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে রফিক সাহেব সাওনকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করান? ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠা করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম।

খ সৃজনশীল ৯ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সাওনের বাবা সাওনকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সাওনের মা সাওনকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে চাইলে তার বাবা বাধ সাধেন। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষা চর্চা করা ছাড়া প্রকৃত বাঙালি হওয়া যায় না। তার এ ধরনের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

https://teachingbd24.com

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্নিহিত পরিচয়কে বাঁচানোর সর্বাত্মক আন্দোলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের আপামর জনতার ওপর জোর করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাংলা এদেশের মাতৃভাষা, আমাদের মায়ের ভাষা। তাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল বের করে। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন অনেকে। তবুও এ দেশের জনগণ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আন্দোলনের প্রভাবেই সাওনের বাবা তার সাওনকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন। বাংলা ভাষা চর্চা ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

ঘ উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম আন্দোলন। পাকিস্তানিদের বাঙালিকে দমিয়ে রাখার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা তাদের প্রথম প্রতিবাদ গড়ে তোলে। এ আন্দোলনে সকল বাঙালি একাত্ম প্রকাশ করে। ফলে তৈরি হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত ও নির্যাতিত করতে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক সব ক্ষেত্রেই এদেশের মানুষ ছিল বঞ্চিত। এমনকি এদেশের জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের ভাষা, মায়ের ভাষা বাংলাকেও কেড়ে নিতে চেয়েছিল। উর্দুকে এদেশের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালি সফলতা লাভ করে। বাংলা এ অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সফলতা পাওয়ার পর এদেশের মানুষ তাদের দাবি আদায়ের পথ পেয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে, আন্দোলন ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে নিজেদের অধিকার করা আদায় করা সম্ভব নয়। এজন্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সামনে আসে। ভাষা আন্দোলন প্রেরণা যুগিয়েছে সবকটি আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনের সফলতা ও প্রেরণায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষার প্রশ্নে বাঙালির এ আন্দোলন জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ গত ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সজিব তার বাবার সঙ্গে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়েছিল। সেখান সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন দেখে ভাষা শহিদদের প্রতি সজিবের শ্রদ্ধা ও সম্মান আরো বেড়ে যায়। সজিব উপলব্ধি করতে পারে শহিদ মিনার আমাদের জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রতীক। *[মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়]*

ক. কাদের স্মৃতি স্বরূপ শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল? ১

খ. ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের সফলতা কী ছিল? ২

গ. তোমার কলেজে উদ্দিপকে উল্লিখিত দিবস উদযাপনে গৃহীত কর্মসূচি সফল করতে তুমি কী করতে পার? ৩

ঘ. সজিবের উপলব্ধির যথার্থতা যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষা শহিদদের স্মৃতিস্বরূপ শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল।

খ ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের সফলতা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান।

বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের আত্মত্যাগের ফলাফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ বাংলা ও উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। যা পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ আমার কলেজে উদ্দীপকে উল্লিখিত দিবস অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনে গৃহীত কর্মসূচী সফল করতে আমি নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ দিন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে ভাষা শহিদরা তাদের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপর ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহে দিবসটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সজীব ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তার বাবার সাথে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যায়। সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন দেখে ভাষা শহিদের প্রতি সজীবের শ্রদ্ধা ও সম্মান আরো বেড়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের দেশে স্কুল কলেজগুলোতে প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহিত হয়ে থাকে। এ সকল কর্মসূচি সফল করতে আমরা বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠান, প্রবন্ধ রচনা, দেয়ালিকা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, র‍্যালি, সভা, প্রভৃতি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এতে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে হবে। এর পাশাপাশি আমার কলেজে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। ভাষা শহিদদের বিজয় গাঁথা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা সমিতি র‍্যালির আয়োজন করা যায়। এগুলোতে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিকে সফল করতে আমি সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

ঘ উদ্দীপকের সজীব এবং সর্বস্তরের জনগণকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে দেখে, ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বেড়ে যায়।

ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ আন্দোলনই ছিল বাঙালির অধিকারবোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। বাঙালি যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি; তাদেরকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়— এ আন্দোলন তা প্রমাণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার মর্যাদা। আর এ অর্জন তাদেরকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় নতুনভাবে উজ্জীবিত করে।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানারকম বৈষম্য প্রদর্শন করেছিল। তারা পাকিস্তানের ৫৬.৪০ ভাগ লোকের মুখের ভাষা বাংলার পরিবর্তে মাত্র ৩.২৭ ভাগ লোকের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ এর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে। তারা ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এছাড়া তারা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। পূর্ব বাংলার জনগণ এ লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিউরসহ বেশ কয়েকজন নিহত হন।

এভাবে সারা বাংলাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনাই বাঙালিকে পরবর্তী সকল আন্দোলনে অনুপ্রেরণা দান করে। এ চেতনার সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৫: বাংলার ইতিহাস (পাকিস্তান আমল)

২৫৫. পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ জুলফিকার আলী ভুট্টো
ⓚ লিয়াকত আলী খান
ⓖ ইয়াহিয়া খান ⓖ আইয়ুব খান
উত্তর: খ

২৫৬. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগের মাতৃভাষা ছিল উর্দু? (জ্ঞান)
ক ২.২৭ খ ৫.২৭
গ ৩.২৭ ঘ ৪.২৭
উত্তর: গ

২৫৭. তমদ্দুন মজলিস কোন ধরনের সংগঠন ছিল? (জ্ঞান)
ক সাংস্কৃতিক খ রাজনৈতিক
গ ধর্মীয় ঘ অর্থনৈতিক
উত্তর: ক

২৫৮. 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে? (জ্ঞান)
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ আবুল কাশেম
গ আবুল মনসুর ঘ আবুল মকসুদ
উত্তর: খ

২৫৯. পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক করাচি খ রাওয়ালপিন্ডি
গ সিন্ধু ঘ লাহোর
উত্তর: ক

২৬০. 'আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' কে বলেছিলেন? (জ্ঞান)
ক কাজী মোতাহের হোসেন
খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ কবি ফররুখ আহমদ
উত্তর: খ

২৬১. ভাষা আন্দোলনের ফলে কী গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
ক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা
খ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা
গ মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা
ঘ উর্দু ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য চেতনা
উত্তর: ক

২৬২. ভাষা আন্দোলনের সর্বোচ্চ অর্জন কোনটি? (অনুধাবন) [পটিয়া সরকারি কলেজ]
ক যুক্তফ্রন্টের বিজয়
খ রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি
গ আইয়ুব খানের পতন
ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন
উত্তর: খ

২৬৩. 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'— ঘোষণাটি কার? (জ্ঞান)
ক আইয়ুব খানের
খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর
গ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের
ঘ খাজা নাজিমউদ্দিনের
উত্তর: খ

২৬৪. সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার নিচের কোন আন্দোলনে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন? (জ্ঞান) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
ক ছয়দফা আন্দোলন
খ ৬২ সালের আন্দোলন
গ ভাষা আন্দোলন
ঘ ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে
উত্তর: গ

২৬৫. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'—এ গানটির বর্তমান সুরকার কে? (জ্ঞান)
ক আলাউদ্দিন আল আজাদ
খ আব্দুল লতিফ
গ আলতাফ মাহমুদ ঘ গাফফার চৌধুরী
উত্তর: গ

২৬৬. একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন ছিল কোনটি? (জ্ঞান) [মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]
ক রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই খ একুশে ফেব্রুয়ারি
গ ভাষা আন্দোলন
ঘ কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
উত্তর: ঘ

২৬৭. ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে গঠিত হয় কোনটি? (জ্ঞান) [মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]
ক বাংলা একাডেমী
খ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
গ শিল্পকলা একাডেমী
ঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
উত্তর: ক

২৬৮. কত সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে? (জ্ঞান) [সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ]
ক ১৯৫৩ খ ১৯৫৪
গ ১৯৫৫ ঘ ১৯৫৬
উত্তর: ঘ

২৬৯. পাকিস্তানি শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানে কোন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ]
ক গণতান্ত্রিক খ ঔপনিবেশিক
গ রাজতান্ত্রিক ঘ প্রজাতান্ত্রিক
উত্তর: খ

২৭০. কৃষক-শ্রমিক পার্টি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৫৪ খ ১৯৫৩
গ ১৯৫৫ ঘ ১৯৫৬
উত্তর: খ

২৭১. কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক এ কে ফজলুল হক খ হাজী দানেশ
গ মাওলানা আতহার আলী
ঘ সোহরাওয়ার্দী
উত্তর: ক

২৭২. আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠনের সভাপতি কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মাওলানা ভাসানী
খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ শামসুল হক
ঘ খাজা নাজিমউদ্দিন
উত্তর: ক

Teachingbd.com

২৭৩. কত সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– (জ্ঞান) [সকল বোর্ড-২০১৫]

(ক) ১৯৫২ (খ) ১৯৫৩
(গ) ১৯৫৪ (ঘ) ১৯৫৫

২৭৪. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করে—— (জ্ঞান)

(ক) যুক্তফ্রন্ট (খ) মুসলিম লীগ
(গ) জামাত-ই-ইসলাম (ঘ) ন্যাপ (মোজাফফর) ক

২৭৫. বাংলা একাডেমী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) [ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]

(ক) ১৯৫৫ (খ) ১৯৫৬
(গ) ১৯৫৭ (ঘ) ১৯৫৮ ক

২৭৬. যুক্তফ্রন্টের কোন দলটি এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন ছিল? (জ্ঞান) [সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ]

(ক) আওয়ামী মুসলিম লীগ (খ) নেজামে ইসলামি পার্টি
(গ) কৃষক শ্রমিক পার্টি (ঘ) গণতন্ত্রী দল গ

২৭৭. 'সমাজতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ'— কোন দল ঘোষণা করে? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

(ক) মস্কোপন্থি ন্যাপ (ওয়ালী)
(খ) চীনপন্থি ন্যাপ (ভাসানী)
(গ) আওয়ামী লীগ (ঘ) মুসলিম লীগ খ

২৭৮. আওয়ামী মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)

(ক) ১৯৫০ (খ) ১৯৪৯
(গ) ১৯৪৮ (ঘ) ১৯৪৭ খ

২৭৯. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ কী? (অনুধাবন) [কুমিল্লা মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ]

(ক) ভোট জালিয়াতি
(খ) কম সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি
(গ) যুক্তফ্রন্টের নানা ধরনের অপপ্রচার
(ঘ) জনসংযোগের অভাব ঘ

২৮০. পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে একমাত্র মিল ছিল— (জ্ঞান) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

(ক) ভাষা (খ) পোশাক
(গ) ধর্ম (ঘ) সংস্কৃতি গ

২৮১. "২৩ বছরের ইতিহাস আমাদের বঞ্চনার ইতিহাস"— উক্তিটি কার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়?

(ক) হামিদ খান ভাসানী (খ) শেখ মুজিবুর রহমান
(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(ঘ) এ.কে. ফজলুল হক খ

২৮২. আজাদ এমন একজন পাক শাসকের কথা বলেন যিনি জাতীয় বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করেছেন। কোন শাসকের সাথে এটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

(ক) মোনায়েম খান (খ) লিয়াকত আলী খান
(গ) মাহমুদ খান (ঘ) আইয়ুব খান ঘ

২৮৩. ছয়দফা কর্মসূচি কে ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)

(ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) মওলানা ভাসানী
(গ) সার্জেন্ট জহুরুল হক (ঘ) এ.কে. ফজলুল হক ক

২৮৪. ছয়দফার সাথে কোন বিখ্যাত নেতার নাম জড়িত? (জ্ঞান) [লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট]

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(খ) মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
(গ) শেরে বাংলা একে ফজলুল হক
(ঘ) বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ঘ

২৮৫. ৬ দফা দাবি কোথায় উত্থাপন করা হয়? (জ্ঞান) [লালমনিরহাট সরকারি কলেজ]

(ক) ইসলামাবাদে (খ) করাচিতে
(গ) রাওয়ালপিন্ডিতে (ঘ) লাহোরে ঘ

২৮৬. ছয়দফা কর্মসূচিকে শেখ মুজিবুর রহমান কী বলে অভিহিত করেন? (জ্ঞান) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

(ক) পশ্চিম পাকিস্তানের 'বাঁচার দাবি'
(খ) পূর্ব পাকিস্তানের 'বাঁচার দাবি'
(গ) পশ্চিম পাকিস্তানের যুক্ত হওয়ার দাবি
(ঘ) পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবি খ

২৮৭. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার প্রধান আসামি কে ছিলেন? (জ্ঞান)

(ক) শেখ মুজিবুর রহমান
(খ) মোহাম্মদ খুরশীদ
(গ) এল.এস. নূর মোহাম্মদ
(ঘ) সার্জেন্ট জহুরুল হক ক

২৮৮. আগরতলা মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় কোথায়? (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]

(ক) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (খ) কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট
(গ) চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট (ঘ) কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ক

২৮৯. 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর আহ্বায়ক কে ছিলেন? (জ্ঞান) [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

(ক) গাজীউল হক (খ) আবদুল মতিন
(গ) শামসুল হক (ঘ) মহিউদ্দিন আহমদ খ

২৯০. আইয়ুব খানের পতনের কারণ হিসেবে কোনটি অধিক উপযোগী? (অনুধাবন) [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]

(ক) '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন
(খ) '৬৬-এর ছয়দফা আন্দোলন
(গ) '৭০-এর নির্বাচনের পরাজয়
(ঘ) '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ঘ

২৯১. কার বিরুদ্ধে জনগণ গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

(ক) আইয়ুব খান (খ) খাজা নাজিমউদ্দিন
(গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(ঘ) লিয়াকত আলী খান ক

২৯২. ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন কোনটি? (জ্ঞান)

(ক) তমদ্দুন মজলিশ
(খ) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
(গ) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
(ঘ) অধিকার আন্দোলন ক

Teachingbd.com

২৯৩. ছয়দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলার কারণ কী? (অনুধাবন) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
ক ছয়দফা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা
খ ছয়দফা পাকিস্তানি শাসকদের শায়েস্তা করার ভিত্তি
গ মানসিক অধিকারের ভিত্তি
ঘ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অধিকার খর্বের হাতিয়ার
ক

২৯৪. মৌলিক গণতন্ত্রের উদ্ভাবক কে? (জ্ঞান) [মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]
ক আইয়ুব খান খ টিক্কা খান
গ জিয়াউল হক ঘ ফজলুল হক
ক

২৯৫. কোন প্রেসিডেন্টের আমলে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়? (জ্ঞান)
ক ইস্কান্দার মির্জা খ আইয়ুব খান
গ মোনায়েম খান ঘ ফাহাদ খান
খ

২৯৬. ভাষা আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রাধান্য সৃষ্টি হয়— (অনুধাবন)
i. আওয়ামী লীগের ii. গণতন্ত্রী দলের
iii. যুবলীগের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

২৯৭. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল— (অনুধাবন) [ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]
i. বৃহস্পতিবার ii. ৮ই ফাল্গুন
iii. ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

২৯৮. ভাষার প্রশ্নে সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল— (অনুধাবন)
i. পূর্ববাংলার অফিস-আদালতের ভাষা হবে বাংলা
ii. বাংলা ভাষার দাবির প্রশ্নে গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে
iii. বাংলা ও উর্দু দুটিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

২৯৯. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মসূচিতে ছিল— (অনুধাবন) [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]
i. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
ii. পাটশিল্পের জাতীয়করণ
iii. শহিদ মিনার নির্মাণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৩০০. ছয়দফায় প্রদেশগুলোতে নিজস্ব মিলিশিয়া গঠনের কথা বলার কারণ— (অনুধাবন) [পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ]
i. আঞ্চলিক সংহতি রক্ষা ii. জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষ
iii. স্বাধীনতা রক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৩০১. ঐতিহাসিক ছয়দফার বিষয়বস্তু ছিল — (অনুধাবন) [শাহ্ মখদুম কলেজ, রাজশাহী]
i. স্বায়ত্তশাসন
ii. দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে
iii. সেনাবাহিনী প্রদেশের হাতে থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৩০২. ছয় দফায় মুদ্রা সম্পর্কে বলা হয়— (অনুধাবন) [মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]
i. দুই অঞ্চলের একই মুদ্রা থাকবে
ii. দুই অঞ্চলের আলাদা মুদ্রা থাকবে
iii. সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

৩০৩. ছয়দফা দাবি কর্মসূচির অন্যতম পটভূমিকা হচ্ছে— (অনুধাবন) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]
i. বৈষম্যমূলক নীতি
ii. পাক-ভারত যুদ্ধ পরবর্তী
iii. পাক শাসকের ষড়যন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i,ii ও iii
ঘ

৩০৪. 'DAC'-এর পূর্ণরূপ হলো— (অনুধাবন)
i. ডেমোক্রেটিক অ্যাকটিভ কমিটি
ii. ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি
iii. ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কাউন্সিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii
খ

৩০৫. পূর্ব বাংলার জনমনে মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করে— (অনুধাবন)
i. বৈষম্যমূলক নীতির কারণে
ii. ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কারণে
iii. অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

http://teachingbd.com

৩০৬. পূর্ব বাংলার প্রতি মুসলিম লীগের মনোভাব ছিল— (অনুধাবন)
i. অগণতান্ত্রিক
ii. ষড়যন্ত্রমূলক
iii. গণতান্ত্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৩০৭. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার মধ্যে অন্যতম ছিল— (অনুধাবন)
i. পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন
ii. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার
iii. সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৮ ও ৩০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
পাকিস্তানি শাসকগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঙালিদের শাসন করত হলে প্রথমে ভাষাকে আঘাত করতে হবে। তাই তারা বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা হতে দেয়নি। [সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]

৩০৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন কোন ঘটনাকে নির্দেশ করে? (জ্ঞান)
ক অসহযোগ আন্দোলন খ স্বাধিকার আন্দোলন
গ ভাষা আন্দোলন ঘ গণআন্দোলন গ

৩০৯. উক্ত আন্দোলনের ফলে— (অনুধাবন)
ক উর্দু ভাষা স্বীকৃতি পায়
খ ইংরেজি ভাষা স্বীকৃতি পায়
গ বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পায়
ঘ ফার্সি ভাষা স্বীকৃতি পায় গ

উদ্দীপকটি পড়ে ৩১০ ও ৩১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাকিব তার বন্ধু হাসানের সাথে পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকের একটি নির্বাচন নিয়ে কতকগুলো বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ জোট গঠন করে এবং জয়লাভ করে। দলটির নির্বাচনি কর্মসূচি ২১ দফায় বিন্যস্ত হয়। [পার্বতীপুর আদর্শ ডিগ্রি কলেজ, দিনাজপুর]

৩১০. উদ্দীপকে উল্লেখিত নির্বাচনি জোট নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ক ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
খ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন
গ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন
ঘ মহাজোটের নির্বাচন ক

৩১১. উদ্দীপকে উল্লেখিত নির্বাচনি ঐক্যজোটের অন্তর্ভুক্ত দলের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আওয়ামী লীগ
ii. কৃষক লীগ
iii. গণতন্ত্রী দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও ii ঘ i,ii ও iii ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১২ ও ৩১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মারুফ ও ফারুক দুই বন্ধু। তারা একই দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে। মারুফ পূর্বাঞ্চলে বাস করত। সেখানে লোকজন ছিল নির্যাতিত ও অবহেলিত। ফারুক পশ্চিমাঞ্চলে বাস করত। পশ্চিমাঞ্চল পূর্বাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করত। পূর্বাঞ্চলের অর্থে পশ্চিমাঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। পূর্বাঞ্চলের পণ্য পশ্চিমাঞ্চলে চলে যেত। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা পণ্যের ন্যায্য মূল্যও পেত না। ভোগও করতে পারত না। [ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]

৩১২. মারুফের অঞ্চলটি 'পূর্ব পাকিস্তানের মতো কোন বৈষম্যের শিকার? (প্রয়োগ)
ক রাজনৈতিক খ অর্থনৈতিক
গ সামাজিক ঘ ধর্মীয় খ

৩১৩. মারুফের মতো পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা দিন দিন—(উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল
ii. দরিদ্রতায় নিমজ্জিত হচ্ছিল
iii. উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ক

উদ্দীপকটি পড়ে ৩১৪-৩১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাসুম তার দাদার কাছ থেকে একটি ঐতিহাসিক কর্মসূচির কথা শুনছিলেন। মাসুম জানতে পারে যে, উক্ত কর্মসূচিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় ও প্রদেশের ক্ষমতা ভাগাভাগি, প্রাদেশিক রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়েছে।

৩১৪. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন ঐতিহাসিক কর্মসূচির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে? (প্রয়োগ)
ক ১১ দফা খ ৬ দফা
গ ৮ দফা ঘ ২১ দফা খ

৩১৫. উক্ত কর্মসূচিতে ঘোষণা করা হয়েছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রশাসনিক বৈষম্য ii. সামরিক বৈষম্য
iii. রাজনৈতিক বৈষম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৩১৬. উক্ত কর্মসূচিকে বলা হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মুক্তির সনদ ii. বাঁচার দাবি
iii. অভিবাসনের দাবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

http://teachingbd.com

অধ্যায়-৬: স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

প্রশ্ন ▶ ১ "আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।"

[ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. '১৭]

ক. জাতিসংঘের কোন অঙ্গ-সংগঠন একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়? ১

খ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতকে 'কালরাত' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কবিতার লাইনগুলি তোমার পাঠ্যবইয়ের যে আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয় তার পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো (UNESCO) একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

খ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাই এ রাতটি কালরাত হিসেবে পরিচিত।

এ হত্যাযজ্ঞের নীল নকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল টিক্কা খান, খাদিম হোসেন, রাও ফরমান আলী প্রমুখ। এ ঘৃণ্য অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ধানমন্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাকবাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে। তাই এ রাতটি 'কালরাত' নামে আখ্যা পেয়েছে।

গ উদ্দীপকের কবিতার লাইনগুলি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ আন্দোলনের পটভূমি ছিল ছয়দফাভিত্তিক বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার।

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকাশ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বস্তুত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গণবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সামরিক স্বৈরাচারের অবসান এবং স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এ অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহিদ হন।

উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতার লাইনগুলো এদেশের দামাল ছেলেদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে মহান অর্জনকে তুলে ধরে। ছাত্রনেতা আসাদ ছিলেন ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী একজন শহিদ। আর এ আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। বস্তুত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সামরিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বাঙালির মনে যে ক্ষোভের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল ছয়দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় ১৯৬৯ সালে তা আরো জোরদার হয়। অন্যদিকে, আগরতলা মামলার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। এ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ৮টি বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' (Democratic Action Committee) সংক্ষেপে DAC নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করে। আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করা ছিল 'ডাক'-এর উদ্দেশ্য। বিক্ষুব্ধ জনতা আইয়ুবী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ডাক এর ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে ছাত্ররা তাদের এগারো দফা দাবি নিয়ে অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সমাবেশে পুলিশ বাঁধা দিলে ছাত্রদের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়। ফলে ছাত্রনেতা আসাদসহ আরও তিনজন নিহত হয়।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ এ আন্দোলনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। তাছাড়া এ আন্দোলনের ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সূচনাসহ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়। রাজনীতিতে আইয়ুব খান সমর্থিত এলিটশ্রেণির মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরও সুসংহত রূপ ধারণ করে। এ আন্দোলনে আইয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হলে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লৌহমানব খ্যাত আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। আইয়ুব খানের পদত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরো সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে ধাবিত হতে শুরু করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক গণরায় প্রদানের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। উল্লেখ্য যে, ছয়দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফুটে ওঠে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে গণরায়ের চরম প্রতিফলন দেখা যায়। নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রভূমি তৈরি করে, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত হয়। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ
↓
?
↓

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথ তলায় গঠিত হয়	রাষ্ট্রপতি— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি— সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী— তাজউদ্দিন আহমদ

[ঢা. বো.; রা. বো.; চ. বো. '১৭]

ক. মুক্তিযুদ্ধে কয়টি সেক্টর ছিল? ১

খ. ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '?' দ্বারা ঐতিহাসিক কোন সরকারকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উক্ত সরকারের অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধে এগারোটি সেক্টর ছিল।

খ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা। এ কারণে এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। সমগ্র জনতা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের প্রতিহত করতে থাকে। মূলত তার এ ভাষণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তার আহ্বানে সাড়া দিয়েই বাঙালি জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এজন্য বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

গ প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '?' দ্বারা ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ভূমিমন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান; পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ; তিন বাহিনীর প্রধান যথাক্রমে কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানী, লে. কর্নেল (অব) আব্দুর রব, ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত '?' চিহ্নটি দ্বারা মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারকেই বোঝানো হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর সাংগঠনিকভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহত রূপ দেওয়া হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি সরকারের যে প্রশাসনিক কাঠামো থাকে এবং যে সকল দায়িত্ব সরকারকে পালন করতে হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার সেরকম একটি গতিশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল এবং সরকারের দৈনন্দিন সকল কার্যাদিও এ সরকার সফলতা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করত।

মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর সামরিক-বেসামরিক জনগণকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এছাড়া বেশ কিছু সাবসেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। এসব সেক্টর ও ফোর্সে যুদ্ধ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মাঝে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণব্যবস্থা করা, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ রাখা এবং সাথে সাথে সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকার যে অপরিসীম অবদান রেখেছিল তা সত্যিই বিশ্বের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ▶৩ পাহাড়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদটি দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারে ছিল। এর ফলে উন্নয়নমূলক কাজ উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে বেশি হয়েছে। স্কুল, ডাকঘর, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট, বাজার দক্ষিণভাগেই স্থাপিত হয়। এলাকার লোকজনকে যে কোনো প্রয়োজনে দক্ষিণাঞ্চলের ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ প্রভাবশালী ও সেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সেচ্ছাচারিতায় উত্তরাঞ্চলের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারল চেয়ারম্যান পদ উত্তরাঞ্চলের দখলে না আসা পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের অত্যাচার হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উত্তরের সকলে জোটবদ্ধ হয়ে উত্তরের প্রার্থীকে ভোট দিল। ফলে উত্তরের প্রার্থী বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলো। কিন্তু নানা কৌশলে দক্ষিণের লোকজন নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে তার পদে বসতে বাধা দিল।

[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭]

ক. সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের ইতিহাসে উক্ত ঐতিহাসিক নির্বাচনের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিপাহি বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয়।

খ ১৯২০ সালে ইংরেজদের অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদ করে এবং ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী যে অহিংস আন্দোলনের আহ্বান জানান তাই অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত।

১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করলে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, যা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। এ সকল ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ এবং ভারতে নিজেদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহাত্মা গান্ধী এ অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

গ উদ্দীপকের নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকের পাহাড়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদটি দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারে ছিল। এর ফলে উন্নয়নমূলক কাজে উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে অধিক ব্যয় করা হতো। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের প্রভাব প্রতিপত্তি ও স্বেচ্ছাচারিতায় উত্তরাঞ্চলের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উত্তরের প্রার্থী বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। অনুরূপভাবে পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য, অত্যাচার নির্যাতনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নিরঙ্কুশভাবে বিজয় অর্জনে সহায়তা করে।

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান ভাগের পর থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের হাতে। তারা পূর্ব পকিস্তানের প্রতি বৈষম্য অত্যাচার নির্যাতনের নীতি গ্রহণ করে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করত। আর পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সামরিক সকল দিক থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নানা আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এর ফলে ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলে পাক-গোষ্ঠী আওয়ামী লীগের হাতের ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। উদ্দীপকেও এ নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ বাংলাদেশের ইতিহাসে উক্ত ঐতিহাসিক নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল সর্বজনীন বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল যেমন চমকপ্রদ, তেমনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রেও এ নির্বাচনের প্রভাব ছিল তাৎপর্যমণ্ডিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পতন ঘন্টা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বার্তাবাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্তুত এ নির্বাচনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়। অপরপক্ষে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা শাসকেরা নির্বাচনী বিজয়কে নস্যাতের চক্রান্ত শুরু করলে বাঙালি জাতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। আর এ কারণেই বলা হয় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ নিহত ছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মধ্যে সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটে। তারা নিজেদের শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত জাতি হিসেবে ভাবতে শেখে। তারা পাক শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে আর ভয় পায় না। এ সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার সূর্যকে।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বিলোপ এবং গণতন্ত্রের নবজাগরণের উদ্দেশ্যে গ্যাটিসবার্গ নামক স্থানে এক যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে 'গ্যাটিসবার্গ এড্রেস' নামে খ্যাত। তার এ ভাষণের ব্যাপ্তি ছিল মাত্র তিন মিনিট। ভাষণে তিনি গণতন্ত্র, শোষিত মানুষের মুক্তি ও অধিকারের কথা বলেছেন। পৃথিবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দাস প্রথা বিলোপে এটি একটি মাইলফলক।

[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭; নরসিংদী মডেল কলেজ]

ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে পেশ করা হয়? ১

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের সাথে বাংলাদেশের কোন মহান নেতার ভাষণের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় উভয় নেতার ভাষণ তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বাংলার মহান নেতার ভাষণ ছিল আরও দিক নির্দেশনামূলক ও চেতনায় উদ্দীপ্ত— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ সালে পেশ করা হয়।

খ হিন্দু ও মুসলিম দুটি আলাদা জাতি— কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উত্থাপিত এ তত্ত্বই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি। তাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতি-প্রথা এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেন। এ মতামতই দ্বি-জাতিতত্ত্ব নামে পরিচিতি।

গ উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের তুলনা করা যায়।

১৮৬৩ সালে আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের দৈর্ঘ্য মাত্র তিন মিনিট হলেও ঐ ভাষণটি আজও ইতিহাস হয়ে আছে। তার এ ভাষণটি ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে একটি তাৎপর্যবহুল ঘটনা। এ ভাষণটি ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা। এ ভাষণের পরপরই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এ ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে তৃতীয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়। কিন্তু পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে। এর ফলে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহসাকি ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এছাড়াও তিনি এ ভাষণে গণহত্যার তদন্ত এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। এ ভাষণে তিনি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঐতিহাসিক এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আর বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের এ ভাষণেরই প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে আব্রাহাম লিংকনের ভাষণে।

ঘ প্রেসিডেন্ট লিংকনের ভাষণের মতো বাংলাদেশের উক্ত মহান নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অধিক নির্দেশনামূলক ও চেতনায় উদ্দীপ্ত— উক্তিটি যথার্থ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল আব্রাহাম লিংকনের ভাষণটির মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৩ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ৩ মিনিটের ভাষণ এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয়ই ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। লিংকনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো গণতন্ত্র সম্বন্ধে তার বিখ্যাত উক্তি, 'This Government of the people, by the people and for the people will never perish from the earth.' আর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' ৭ মার্চের এ ৭টি শব্দ বাঙালিকে দুর্বার করে তুলেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। অনেকে এই ভাষণকে বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ হিসেবে আখ্যা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। এর মাধ্যমে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। যদিও বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তারপরও মুক্তিপাগল বাঙালি এই ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার সবুজ সংকেত দেখতে পান। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তার এ ঘোষণা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। পরবর্তীতে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে এ ভাষণটি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ৭ মার্চের ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর এদিক থেকেই আব্রাহাম লিংকনের চেয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অধিক নির্দেশনামূলক ও গুরুত্ববহ।

প্রশ্ন ▶ ৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পৈরতলা রেল ব্রিজের পাশে একটি গণকবর আছে। এটি সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তেই বের হয়ে আসল মানুষের হাড়-গোড় আর পঁচা লাশ। পাশাপাশি দুইটা বিশাল গর্ত। আনুমানিক তিন চারশ মানুষের মরদেহ এখানে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। এগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নিরপরাধ মানুষের সমাধি। হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার আল বদরদের হাতে তারা শহিদ হয়েছেন।'

[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. '১৭]

ক. ছয়দফা কর্মসূচি কে পেশ করেন? ১

খ. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য আমাদের কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যের আলোকে মহান মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি পেশ করেন।

খ ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে যে মামলা দায়ের করা হয় তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

আগরতলা মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল— বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম হয় আগরতলা মামলা।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য আমাদেরকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৩ বছরের স্বৈরশাসন ও শোষণের বেড়াজাল ভেঙে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের এ যুদ্ধে বাঙালি জাতিকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়েছে স্বাধীনতা। উদ্দীপকে এ সময়ের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পৈরতলা রেল ব্রিজের পাশে একটি গণকবর আছে। এটি সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তেই বের হয়ে আসল মানুষের হাড়-গোড় আর পঁচা লাশ। প্রত্যক্ষদর্শীর এ বক্তব্য আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের কথা মনে করিয়ে দেয়। জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় কিছু চিহ্নিত দল বা ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক এবং আপামর জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের অপর অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন চাপিয়ে দেয়। তারা নির্বিচারে সাধারণ জনগণকে হত্যা করে। উদ্দীপকের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যেও এ সময়কার হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

ঘ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিকামী বাঙালি জাতির ওপর অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যা পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের ওপর চালানো গণহত্যা ও নির্যাতনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি জাতির নয় মাস ব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী এদেশের আপামর জনসাধারণের উপর গণহত্যা ও অমানবিক নির্যাতন চালায়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালিদের বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত পাক-হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর গণহত্যা, লুণ্ঠন ও অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন চাপিয়ে দেয়। ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার বাহিনী বাংলার ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, নিরীহ জনগণের ওপর গণহত্যা চালায়। এর মাধ্যমে শুরু হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মার্চ থেকে শুরু করে দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলে এ যুদ্ধ। এ সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাধারণ বাঙালিদের ওপর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। তাদের এ সকল অপকর্মে তাদেরকে সার্বিকভাবে সহায়তা করে এদেশের কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল। তারা নিজেদের রাজাকার বাহিনী, আল-বদর, আল-শামস সহ বিভিন্ন নাম দিয়ে সংগঠিত করে এবং পাক বাহিনীকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে নানাভাবে সহয়তা দান করে। তাদের সহয়তায় পাক বাহিনী আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। পাক-বাহিনী হত্যা, লুণ্ঠন, মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েও ক্ষান্ত হয়নি। তারা এদেশের মা-বোনদের সম্ভ্রম কেড়ে নেওয়ার মত জঘন্য কাজ থেকেও বিরত থাকেনি। মুক্তিবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পাক হানাদার বাহিনী তাদের দোসর রাজাকারদের সহায়তায় ১৪ ডিসেম্বর আরেক দফা বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করে দেওয়ার জন্য তারা ঐ দিন এদেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৭১ সালের বাঙালিদের ওপর পাক-বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ও গণহত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে এক নির্মম অধ্যায় সংযোজন করেছে। অবশেষে বহু নির্যাতন ও ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে বীর বাঙালি দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাক-বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে। বাঙালির এ আত্মত্যাগের চিত্রই উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ সীমাহীন বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে ভিয়েতনামের দুই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসমতা তৈরি হয়। এর ফলে গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ভিয়েতনামের দুই অংশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের একজন সামরিক কর্মকর্তার নির্দেশে উত্তর ভিয়েতনামের একটি অংশে মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। এতে বহু নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র নারী-পুরুষ এবং শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটি তাদেরকে বিশ্ববাসীর ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। অবশেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয়। *[সকল বো. '১৬]*

ক. বাংলাদেশকে কোন দেশ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে? ১

খ. মুজিবনগর সরকার কেন গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডটি দুই পাকিস্তানের কোন হত্যাকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের হত্যাকাণ্ডের মতো উক্ত হত্যাকাণ্ডটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত চিত্রমাত্র— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বপ্রথম ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে দ্রুত পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত তৈরি করা ছিল মুজিবনগর সরকার গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন পরিচালনা করার বিষয়টিও এ সরকার গঠনের পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডটি পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর পরিচালিত হত্যাকাণ্ডকে নির্দেশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৫ মার্চ রাতে এ অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এর পরিকল্পনা করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাদের এ ঘৃণ্য অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। উদ্দীপকেও এ ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, সীমাহীন বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে ভিয়েতনামের দুই অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসমতা তৈরি হয়। ফলে দুই ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধের একপর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক সামরিক কর্মকর্তার নির্দেশে উত্তর ভিয়েতনামের একটি অংশে নিরপরাধ ও নিরস্ত্র নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ঠিক একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমাহীন বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসমতা সৃষ্টি হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। এ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার ভীত হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক) সাথে আলোচনার নামে তারা কালক্ষেপণ করে পূর্ব পাকিস্তানে সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে বাঙালির ওপর আক্রমণের নির্দেশ জারি করে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ত্যাগ করেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে পাকবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় এক গণহত্যার তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে। ওই রাতে অসংখ্য নিরস্ত্র নারী-পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এ সংখ্যা ৩৫,০০০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দীপকের গণহত্যায়ও বাঙালির এ নির্মম দৃশ্যপট ফুটে উঠেছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের হত্যাকাণ্ডের মতো উক্ত হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ মার্চের গণহত্যাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তর ভিয়েতনামের একটি অংশে মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড চালায়। এ হত্যাকাণ্ডটি ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের একটি চিত্র মাত্র। একইভাবে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক-হানাদার বাহিনী পূর্বপাকিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর এক ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড চালায়। এ হত্যাকাণ্ডটিও ছিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি খণ্ডিত চিত্র।

২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার পরই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিসেনাদের গেরিলা আক্রমণে জনসমর্থনহীন পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। বর্বর পাকিস্তানিরা এ সময় নিরীহ বেসামরিক জনতার ওপর আক্রমণ করে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে থাকে। ছাত্র-যুবকদের দেখামাত্রই তারা গুলি করে হত্যা করে। সমগ্র বাংলাদেশকে ধ্বংস করার নেশায় পাকবাহিনী মেতে ওঠে। শহর, গ্রাম, সমগ্র দেশেই তারা অমানবিক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। যুদ্ধ চলাকালে হানাদার বাহিনী তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস (স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী) প্রভৃতি বাহিনীর সহায়তায় এ দেশের নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন করে এবং অসংখ্য নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটায়। যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে যৌথবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পাক হানাদার বাহিনী তাদের দোসরদের নিয়ে ১৪ ডিসেম্বর আরেক দফা বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্যই ঐদিন পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ২৫ মার্চ রাতের হত্যাকাণ্ডটি ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কেননা দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকবাহিনী এ দেশের আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে।

প্রশ্ন ▶ ৭ ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার বসনিয়া অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত। বিদ্যমান খ্রিষ্টান রাজশক্তির কাছে বসনীয় জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শোষিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। এতে বসনীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেয়। ফলে যুগোশ্লাভিয়া সরকার তাদের দমনে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। রাজকীয় সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে অসংখ্য নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করে। বাড়িঘর লুণ্ঠন করে। নারীর ইজ্জত লুটে নেয়। শিশুরাও রেহাই পায় না, তারপরও বসনীয়দের দমাতে পারেনি। তারা তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এখনও সেখানে বসনীয়দের বহু গণকবর আবিষ্কৃত হচ্ছে। *[সকল বোর্ড-২০১৫; বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*

ক. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ কে? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বসনীয় জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি সাদৃশ্য ব্যাখ্যাসহ লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বসনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিবরণ দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ হলেন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর জুলুম, নির্যাতন ও বৈষম্য বঞ্চনা করার জবাব দেওয়া।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আওয়ামী লীগকে সমর্থন প্রদান করে। এই নির্বাচনে হেরে যাওয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়।

গ উদ্দীপকের বসনীয় জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি সাদৃশ্য হলো বসনীয় জনগণের মতো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শাসন, শোষণের শিকার হতে থাকে। তারা সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। একইভাবে উদ্দীপকেও আমরা লক্ষ করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই খ্রিষ্টান রাজশক্তির কাছে বসনীয় জনগণ শোষিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত হতে থাকে।

প্রথম থেকেই বাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধিকারের প্রশ্নে ক্রমাগত উপেক্ষিত হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসনক্ষমতার কর্ণধার। পূর্ব বাংলার জননেতা এ কে ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। পশ্চিমাদের এ বৈষম্য নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং সামরিক সামাজিক, শিক্ষাক্ষেত্রসহ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। আর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এরূপ নির্লজ্জ বৈষম্যনীতিই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। এ বঞ্চনার দিকটিই উদ্দীপকের সাথে পূর্ব পাকিস্তানিদের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বসনিয়ার মতোই বাংলাদেশও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনায় অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার পর বাঙালিরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পাক সরকার বাঙালিদের দমনের জন্য বাংলার অসংখ্য নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং নারী ও শিশুদের ওপর চালায় নির্যাতন। এতসব অত্যাচারের পরও পাক সরকার বাঙালিদের দমাতে পারেনি। তারা তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকে বসনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

বসনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর যুগোশ্লাভিয়া সরকার যেভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে একইভাবে বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করেছে পাকিস্তান সরকার। বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে তারা নানা অপতৎপরতা চালায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার পরপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় উজ্জীবিত অদম্য বাঙালি পাকিস্তানি হানাদার শক্তির বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে। এই যুদ্ধে সারা দেশের আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতাকামী জনগণকে দমনের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়। সকল অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে হানাদার বাহিনী ১৪ ডিসেম্বর এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় মেতে ওঠে। তবে শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কিত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিত্র।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৮ কুমারি নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত বসুমতি গ্রাম। নদীর উত্তর পাড়ে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বসবাস সত্ত্বেও দক্ষিণ পাড়ের লোকেরা তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন করতে থাকে। ফলে উত্তর পাড়ের লোকেরা তাদের নেতা শরিফ খানের নেতৃত্বে প্রতিবাদমুখর হতে থাকে। তারা স্বতন্ত্র গ্রাম প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করে। দক্ষিণ পাড়ের লোকেরা তাদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায় এবং তাদের নেতাকে ধরে নিয়ে যায়। নেতার অবর্তমানে তারা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। তারা সুষ্ঠু নেতৃত্বের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করে স্বতন্ত্র গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'চরমপত্র' কে পাঠ করতেন? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অনুচ্ছেদটি বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের সময় চরমপত্র পাঠ করতেন এম আর আখতার মুকুল।

খ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা অপারেশন সার্চলাইট হিসেবে পরিচিত।

এ হত্যাযজ্ঞের নীল নকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল টিক্কা খান, খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী প্রমুখ। এ ঘৃণ্য অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ধানমন্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাক বাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে।

গ অনুচ্ছেদটি বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকার গঠনের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৭১ সালে শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং যুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠন করা হয় মুজিবনগর সরকার। এ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে।

পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর পশ্চিমা পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন চরমে পৌঁছলে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যার নাম দেওয়া হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল। এ সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এসব বিভাগের মাধ্যমেই যুদ্ধকালে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়। এ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, অর্থ সরবরাহ, বিশ্ব জনমত আদায়ের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে।

কুমারি নদীর উত্তর পাড়ের লোকেরা যেভাবে কমিটি গঠন করে তাদের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র গ্রাম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, তেমনি ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বাঙালিরা যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকার গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন— তাজউদ্দিন আহমদ, এম. মনসুর আলী, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ— যারা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই দূরদর্শী নেতা। চরম প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বিষয়াদিসহ সকল দিক সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করে তোলেন এবং তার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন শক্তিশালী সংগঠক ও পরিচালক।

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র, প্রশিক্ষণের অর্থের সংস্থান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ছিলেন মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ত্রাণ সংগ্রহ, ত্রাণশিবিরে ত্রাণ বিতরণ এবং পরবর্তী সময়ে শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইত্যাদি দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনে তার অবদান অসামান্য।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় স্ব-স্ব দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করে মুজিবনগর সরকারের সদস্যরা বাংলাদেশ নামক একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶ ৯ প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যকে তালিকায় যুক্ত করে ইউনেস্কো। এবার যোগ হয়েছে ৭৮টি নথি। এগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ একটি। এর অনন্য দিক হলো, ইউনেস্কোর এটাই প্রথম স্বীকৃত ভাষণ, যা আগে থেকে লিপিবদ্ধ ছিল না।

[আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ঘোষণা করেন কে? ১

খ. ভাষা আন্দোলন স্মরণীয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষণের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উল্লিখিত ভাষণের তাৎপর্য কতটুকু তা মূল্যায়ন কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ভাষা আন্দোলন স্মরণীয় হয়ে আছে।

ভাষা আন্দোলন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে বাঙালি জাতি সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলরত জনগণের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে রফিক, শফিক, জব্বারসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। তাই ভাষা আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষণের সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। সম্প্রতি এ ভাষণটিকে ইউনেস্কো কর্তৃক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আর এ ভাষণটিই হচ্ছে ইউনেস্কোর প্রথম স্বীকৃত ভাষণ। যেমনটি উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটির সুদীর্ঘ পটভূমি বিদ্যমান। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত

https://teachingbd24.com

দীর্ঘ ২৪ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণকে। বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে এ নিপীড়নমূলক আচরণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করে আসছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্তির জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে- যা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কেননা ১৯৭০ সালের এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের বিজয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা করে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও ১মার্চ ইয়াহিয়া খান এ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে। অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধদিবস হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার এবং জনগণের দাবি মানা না হলে খাজনা ও ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব কর্মসূচি পালিত হয়। তবে কর্মসূচি পালনকালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সহিংসতায় বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ প্রদান করেন।

ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য অপরিসীম।

৭ মার্চ বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। ৭ মার্চের ভাষণ লক্ষ লক্ষ উপস্থিত-অনুপস্থিত শ্রোতার মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিল। ৭ মার্চের ভাষণ কালোত্তীর্ণ ও যুগোত্তীর্ণ ভাষণ। ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে এর ভূমিকা অপরিসীম। ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণীয় দলিল হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এ ভাষণ মূলত বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে শাশ্বত প্রেরণার উৎস ও প্রতীক। এ ভাষণে তিনি শুধু স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি দেন, যা পূর্ববাংলার সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশনানুযায়ী দেশের স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। সংগ্রামী জনতা বিভিন্নভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদেরকে প্রতিহত করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যায়। ১০ মার্চ সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ এতে কর্ণপাত না করে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। বঙ্গবন্ধুর আদেশ অর্থাৎ ৭ মার্চের ভাষণে শুধু সেনাবাহিনী ছাড়া সর্বত্রই আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৬ মার্চ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সকলেই পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১০ সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও কিছু উগ্রবাদী শত শত বছর ধরে রাখাইনে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম জাতিগত নিপীড়ন শুরু করে। কোন ধরনের স্বাধীনতার ডাক বা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশগ্রহণ না করলেও গণহত্যা, লুটতরাজ ও উচ্ছেদের শিকার এই অসহায় মানুষগুলো সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের। নিরাপদে নিজ আবাস ভূমিতে রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর সাথে জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ সরকার। *[সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি? ১

খ. 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে পাকিস্তান আর্মি যুদ্ধের সূচনা করেছিল— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরণার্থী হওয়া ও দুর্দশাপূর্ণ জীবনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কোন ঘটনার কী সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গারা নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রত্যাশা ও অর্জন ছিল ভিন্ন— ব্যাখ্যা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ।

খ অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে পাকিস্তানি আর্মি যুদ্ধের সূচনা করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর রাজনৈতিক সংকট আরো তীব্র হয়। অন্যদিকে সংকট নিরসনের চেষ্টা না করে ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপন করে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তিনি টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের নির্দেশ দেয়। নির্দেশ মোতাবেক টিক্কা খান অপারেশন সার্চলাইট নামে খ্যাত অভিযানের মাধ্যমে ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধের ঘোষণা করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরণার্থী হওয়া ও দুর্দশাপূর্ণ জীবনের সাথে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে বাঙালি জনগণের ওপর ব্যাপক সামরিক, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। তাদের এ নৃশংসতা হতে মুক্তি পাবার জন্য লাখ লাখ বাঙালি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও কিছু উগ্রবাদী শত শত বছর ধরে রাখাইনে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম জাতিগত নিপীড়ন চালায়। গণহত্যা, লুটতরাজ ও উচ্ছেদের শিকার এই অসহায় মানুষগুলো সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালিদের ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা এদেশের জনগণের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করে এবং বাড়িঘর লুটপাট করে ধন-সম্পদ হস্তগত করে। তাদের এসকল নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার হতে মুক্তির জন্য বাংলাদেশের জনগণ পালিয়ে সীমান্তবর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকার বাংলাদেশি শরণার্থীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত সরকার আশ্রয় দেয়। শুধু শরণার্থীদের আশ্রয় ও প্রতিপালন নয়, ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে এবং বিশ্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের কথা প্রচার করে বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের পরিস্থিতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশি শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনাকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গারা নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রত্যাশা ও অর্জন ভিন্ন ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

দীর্ঘ ২২ বছর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার বাঙালির একমাত্র প্রত্যাশা ছিল স্বাধীনতা। তাই তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তাদের একমাত্র

https://teachingbd24.com

লক্ষ্য ছিল হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু। কিন্তু উদ্দীপকে বর্ণিত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাশা পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের প্রত্যাশা হতে সম্পূর্ণ আলাদা।
উদ্দীপকের রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মায়ানমারে ফিরে যাওয়াই একমাত্র প্রত্যাশা। স্বাধীনতা অর্জন তাদের আকাঙ্ক্ষা নয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিমা হানাদারদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণ স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থীরাও সেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা নিজ দেশে ফিরে আসার পাশাপাশি দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। এ লক্ষ্যেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা মরণপণ যুদ্ধ করে। এরই ফলশ্রুতিতে ত্রিশ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায়।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রত্যাশা ও অর্জন উদ্দীপকে উল্লিখিত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাশা হতে ভিন্নতর।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইতিহাস শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি ও ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করতে বললে আরিফ নিম্নলিখিত দিকগুলো চিহ্নিত করে।

ছক-০১	ছক-০২
১. ছয় দফা কর্মসূচির উপস্থাপনের পটভূমি	১. ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি
২. ছয় দফা দাবিসমূহ	২. ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু
৩. ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৩. ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উপস্থাপন করেন? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র কাঠামো বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে আরিফের আলোচিত ছক-০২ এর ২নং দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আরিফের আলোচিত ছক-০১ এর ৩নং দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

খ আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁর প্রতিশ্রুত গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেন। এটাকে Basic Democracy বা মৌলিক গণতন্ত্র বলা হয়। এ ব্যবস্থায় উভয় প্রদেশ থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়।
সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে সমগ্র পাকিস্তানে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর হাতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করার ভোটাধিকার অর্পণ করা হয়।

গ আরিফের আলোচিত ছক ০২-এর ২ নং দিকটি হলো ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু।
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বলতে গেলে এ ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা ঘটে।
৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল জাতীয় পরিষদে যোগদানের শর্ত হিসেবে চারটি দাবি উত্থাপন। যথা-
১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
৩. সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে হবে।
৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই ভাষণ ইউনেস্কো তাদের ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজের অংশ করার মাধ্যমে আমাদের গর্বিত করেছে।

ঘ আরিফের আলোচিত ছক-০১ এর ৩নং বিষয়টি হলো— ছয় দফা দাবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য।
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে সীমাহীন বৈষম্য প্রদর্শন করে তা নিরসনের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছয় দফা ছিল মূলত বাঙালিদের বাঁচার দাবি। এ ছয় দফা দাবি ছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে ছয় দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৯৬৬ সালে এ আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই ছয় দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে আলাদাভাবে একটি জাতিসত্তাবোধের জন্ম হতে থাকে। সকল শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণি ছয় দফার মধ্যে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। এজন্যই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের নিকট ছয় দফা কর্মসূচি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ছয় দফা আন্দোলন বাঙালির মানবিক চেতনার জন্ম দেয় এবং জাতীয়তাবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালের সমস্ত আন্দোলন এমনকি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ছয় দফার চেতনাবোধ।
পরিশেষে বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১২ আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের পথিকৃত আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। দয়া, সরলতা, উপস্থিত বুদ্ধি, বাগ্মিতা ও মিষ্টি ব্যবহার তাকে বিশ্বের আদর্শ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এইভাবে একজন মেহনতি মানুষ নিজের প্রতিভায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীর গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের জন্য তার ঐতিহাসিক ভাষণ "Government of the People, by the People and for the People". আজও তাকে অমর করে রেখেছে। *[ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা]*

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? ১
খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ২
গ. উদ্দিপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রপতির সাথে তোমার পঠিত কোন রাষ্ট্রপতির মিল খুজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত নেতার চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি আব্রাহাম লিংকন ছিলেন দয়া, সরলতা, বাগ্মিতা ও মিষ্টি ব্যবহারের অধিকারী। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ বিষয়গুলোর মাঝে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের প্রতিফলন দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে, আব্রাহাম লিংকনের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ উভয়ই ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার চরিত্রে দয়া, সরলতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও বাগ্মিতার সন্নিবেশ ঘটেছিল। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি বাংলার মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাত থেকে তিনি নিরীহ বাঙালিদের রক্ষা করেন। আর বীর বাঙালি তার নেতৃত্বে অস্ত্রধারণ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল।

ঘ উক্ত নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও আপসহীন বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

TeachingBD24.com

আব্রাহাম লিংকন যেমন স্বার্থান্ধ মানুষের পাশবিকতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও পাক-শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতনের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করেছিলেন। তারই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন। আর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। এছাড়া তিনি ১৯৬৬ সালের ছয়দফাভিত্তিক আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয় এবং ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লে ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরে তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার নামেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীনতার মহানায়ক এবং তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

প্রশ্ন ▶ ১৩ কানাডার নাগরিক জনসন বিশ্বখ্যাত একটি টেলিভিশন চ্যানেলে 'যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ' শীর্ষক রিপোর্টে কাজ করে থাকেন। তিনি গত সপ্তাহে দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন। দেশটি মুসলিম অধ্যুষিত এবং দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। একটি অঞ্চলের হাতেই অন্য অঞ্চলের সকল অর্থ-সম্পদ ব্যবহৃত হতো। শোষিত অঞ্চলের মধ্যে তাদের অর্জিত সম্পদের মাত্র ১৬% ব্যয় হতো। এ ধরনের বৈষম্যের কারণেই বৃহৎ দেশটি ভেঙে শোষিত অঞ্চলটি একটি স্বাধীন দেশের রূপ নেয়। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনসনের রিপোর্ট তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনসন বর্ণিত কারণটি ছাড়াও 'অনেকগুলি কারণে বাংলাদেশের জন্ম' তোমার মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ জনসনের 'যুদ্ধ ও সংঘর্ষ' শীর্ষক রিপোর্ট আমার পাঠ্য বইয়ের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বঞ্চনায় অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার পর বাঙালিরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। উদ্দীপকে জনসনের রিপোর্টে তা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের জনসন 'যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ' শীর্ষক রিপোর্টে কাজ করে থাকেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন। যেখানে দুই রাষ্ট্রের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্যগুলো উঠে আসে। যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি। বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে পাকিস্তান সরকার নানা অপতৎপরতা চালায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার পরপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় উজ্জীবিত অদম্য বাঙালি পাকিস্তানি হানাদার শক্তির বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে। এই যুদ্ধে সারা দেশের আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতাকামী জনগণকে দমনের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়। সকল অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে হানাদার বাহিনী ১৪ ডিসেম্বর এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় মেতে ওঠে। তবে শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ জনসন বর্ণিত অর্থনৈতিক কারণটি ছাড়াও রাজনৈতিক, সামাজিক নানা বৈষম্যমূলক নীতির কারণেই অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

দীর্ঘ ২৪ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণকে। বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে এ নিপীড়নমূলক আচরণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করে আসছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্তির জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে— যা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কেননা ১৯৭০ সালের এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের বিজয়। নির্বাচনের রায় স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা আরো বলিষ্ঠ ও শাণিত করে এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও ত্বরান্বিত করে।

উদ্দীপকে জনসনের রিপোর্টে দেখা যায়, একটি অঞ্চলের অর্থ-সম্পদ নির্বিচারে অন্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হত। যা আমাদের পূর্ব বাংলার প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই নির্দেশ করে। এ কারণটির পাশাপাশি পূর্ববাংলার প্রতি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামরিক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নেও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব সন্তোষজনক ছিল না। চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বাংলার জনগণ বৈষম্যের শিকার হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাঙালি প্রতিনিধিত্ব ছিল অনেক কম। সামরিক দিক দিয়েও পূর্ব বাংলা ছিল অরক্ষিত।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে নানা টালবাহানা করে। ১৯৭১ সালে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে ঢাকায় এসে গোপনে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। হুকুম মতো ২৫ মার্চ ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এই হত্যা, অত্যাচার-অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের মতো গর্জে উঠেছিল। ফলশ্রুতিতে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাঙালি জনগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পাকিস্তানী শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে বাঙালিদের মধ্যে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ১৯৭১ এর মার্চ মাসের সময়টা ছিল ভয়ংকর। তারপরও সেই দিনগুলিতে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন সাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। অগ্নিঝরা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এই ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালি নেতা পাকিস্তানের সরকারের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন। *[আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. ১৯৭০ এর নির্বাচনে পিপিপি প্রধান কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ এর নির্বাচনে পিপিপি প্রধান ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

Teachingbd24.com

ঘ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— এ নির্বাচনের রায়ের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়।
১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের বিজয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় পাকিস্তান ভৌগোলিক কারণে কার্যত বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি এ নির্বাচনের ফলে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া এ নির্বাচনে জনগণের রায় বাস্তবায়নে সরকারের অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

গ উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে।
১৯৭০ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। দেশব্যাপী নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের মূল বিষয় ছিল চারটি। প্রথমত, চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করা। দ্বিতীয়ত, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া। তৃতীয়ত, গণহত্যার তদন্ত করা। চতুর্থত, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।
উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি, পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন দুঃসাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। অগ্নিঝরা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এই ভাষণের সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে। এ ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। তার নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। এ সময় খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৩ মার্চ সরকার সামরিক আইন জারি করেন। ১৪ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি অবাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দেন। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু জনসাধারণকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। এরপর ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু বৈঠক অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করার আগে গণহত্যার আদেশ দিয়ে যায়। যার ফলে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। এভাবে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে।
পরিশেষে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক নির্দেশনা।

প্রশ্ন ▶ ১৫

[আব্দুল মোল্লা কাদির সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রাপ্ত নারী কত জন? ১
খ. মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার পথে কোনো ষড়যন্ত্রই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রাপ্ত নারী ২ জন।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতের পাকবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের ইঙ্গিত বহন করে।
২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ ও নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তা ছিল ইতিহাসের অন্যতম এক নারকীয় ঘটনা। অপ্রতিহতভাবে ৩৬ ঘণ্টা ধরে মানবেতর মহাতাণ্ডবলীলা চালানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলগুলো তাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি। উদ্দীপকেও এ ঘটনার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।
ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। যা বাঙালি তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় অপারেশন সার্চলাইট। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে এ অপারেশনে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে গভীর রাতে চালায় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। ২৫ মার্চ রাতে একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরান ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, কলাবাগান, রায়েরবাজার প্রভৃতি স্থানে। এভাবে দেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানি নরপশুরা গণহত্যা চালায়। সুতরাং বলা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ছিল বাঙালির জন্য ভয়াবহ একটি রাত, যে রাতের চিত্রই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার পথে কোনো ষড়যন্ত্রই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না—কথাটি যথার্থ।
স্বাধীনতার বড় আকাঙ্ক্ষিত একটি শব্দ। এই স্বাধীনতা অর্জনে হাজার বাধা-বিপত্তিও তুচ্ছ হয়ে যায়। স্বাধীনতা অর্জনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে মুক্তির আস্বাদ নিতে মানুষ অকাতরে জীবন দিয়ে দেয়। তাই স্বাধীনতার চরম প্রকাশকে কখনোই কোনোভাবেই রুদ্ধ করা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এ কথারই প্রমাণ বহন করে।
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বাঙালির ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে এবং ২৫ মার্চ রাতে বীভৎস গণহত্যা চালায়। কিন্তু তারপরও বাঙালি জাতি ন্যায়সংগত স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে আসেনি। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, অন্যায়ভাবে কখনোই কোনো জাতির স্বাধীনতার চেতনাকে নস্যাৎ করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ১৬ একটি চলচ্চিত্রে দেখান হয় একটি দেশ স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করছে। ঐ দেশেরই কিছু লোক সংগঠিত হয়ে নিজ দেশের বিরুদ্ধে নানা অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের পক্ষে যোদ্ধাদের অবস্থান হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দেয়া, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়াসহ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজ দেশের স্বাধীনতাকে তারা অস্বীকার করে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. চরমপত্র ও জল্লাদের দরবার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কে? ১
খ. মুজিব নগর সকার সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ২
গ. চলচ্চিত্রে দেখান স্বাধীনতা বিরোধী লোকদের কর্মকাণ্ডের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কোন শ্রেণির লোকদের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের সময় উক্ত দিকটি আমাদের স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করেছে— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

https://teachingbd24.com

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চরমপত্র ও জল্লাদের দরবার অনুষ্ঠানটি যথাক্রমে এম. আর আখতার মুকুল ও রাজু আহমদ পরিচালনা করতেন।

খ মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়েই মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধকে সাংগঠনিক রূপ দিতে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মুজিবনগর সরকারের দায়িত্ব ছিল দক্ষতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে দেশকে শত্রুমুক্ত করা, দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করা। মুক্তিযুদ্ধের সফলতার পেছনে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গ চলচ্চিত্রে দেখানো কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধীদের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত তখন কতিপয় বিশ্বাসঘাতক বাঙালির স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করে। পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য তারা কতকগুলো দল গড়ে তোলে। এ দলগুলোর মধ্যে আলবদর ও রাজাকার বাহিনী ছিল অন্যতম। তারা পাকিস্তানিদের সাথে মিলিত হয়ে বাঙালিদের ওপর হত্যা ও নির্যাতন চালায়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

চলচ্চিত্রে দেখানো প্রতিবেদনে এমন একদল লোককে দেখাচ্ছিল যারা সংগঠিত হয়ে রাষ্ট্রের বিপক্ষে নানা অপতৎপরতা চালায় এবং মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়াসহ দেশের স্বাধীনতাকে তারা অস্বীকার করে। একইভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও শান্তি কমিটি দখলদার বাহিনীর দোসর হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আলবদর বাহিনী একটি ভয়ঙ্কর দল ছিল। তাদের ওপর বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল দায়িত্ব ছিল। ১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের হত্যাকাণ্ডে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিল এ দেশের দালালরা। উদ্দীপকে বর্ণিত চলচ্চিত্রের প্রতিবেদনটিতে এ বিষয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ মুক্তিযুদ্ধের সময় উক্ত দিকটি অর্থাৎ স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতার দিকটি আমাদের স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করেছিল- উক্তিটি যথার্থ।

একটি দেশের স্বাধীনতা লাভ সে দেশের জন্য চরম অহঙ্কারের ও গর্বের বিষয়। আর এ স্বাধীনতা যদি হয় যুদ্ধের মাধ্যমে লাখ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত, তাহলে এ স্বাধীনতা মানুষকে স্বর্গীয় অনুভূতি দান করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ছিল এমনই একটি গৌরবের বিষয় কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের অপকর্মগুলো এই মহান অর্জনে কালিমা লেপন করে।

বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো আমাদের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে বাঙালিদেরকে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এ যুদ্ধে হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে আলবদর, রাজাকার, আল শামসসহ বিভিন্ন বাহিনী। তারা বাঙালি হয়েও পাক বাহিনীর হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তারা যদি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য না করত তাহলে আরো আগেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারতাম। তারা নিজেদের মানবিক সত্তা বিকিয়ে দিয়ে এরূপ হীন কাজে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে অপবিত্র হয়েছিল বাংলার শহীদদের রক্ত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা বিরোধীরা অত্যন্ত জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের মাথা বিশ্বদরবারে নিচু হয়ে আসে। তাই বলা যায়, স্বাধীনতা বিরোধীদের কর্মকাণ্ড আমাদের স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব 'ক' বলল, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা আমাদের বাঙালি জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছে। তবে নির্বাচনী ফলাফল না মেনে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানারকম টালবাহানা করার ফলে জনগণ আরও ক্ষুব্ধ হয়। তবে এদেশের মানুষের একটি অংশ (কতিপয় রাজনৈতিক দল) জন দাবির বিরোধিতা করে। কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করে অবশেষে মুক্তিকামী জনগণের আপোষহীন আত্মত্যাগের ফলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। *[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]*

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয়েছিল? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলে বাঙালি জাতি কীভাবে নির্বাচন কেন্দ্রিক হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' নানারকম টালবাহানা বলতে কোন ঘটনাবলি নির্দেশ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'ক' এর সর্বশেষ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছিল।

খ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য এবং পাকিস্তানি সরকারের শোষণ হতে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি জাতি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচনকেন্দ্রিক হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি ব্যালটের মাধ্যমে আস্থা জানিয়ে বাঙালি জাতি পাকিস্তান সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন ও বৈষম্যের জবাব দেয়।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক' নানারকম টালবাহানা বলতে ১৯৭১ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরে জেনারেল ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রমূলক আচরণকে নির্দেশ করা হয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি সব দিক থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে বঞ্চিত করে আসছিল। বাঙালিদের ওপর তাদের বৈষম্য নীতি এত প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে, ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলেও পশ্চিমা শাসক শ্রেণি আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা প্রদান করার ক্ষেত্রে নানা টালবাহানা শুরু করে। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। নিয়মানুযায়ী আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু শুরু হয় বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার অপতৎপরতা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানা ধরনের টালবাহনা শুরু করে। আর ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে আসে। চারদিকে স্লোগান ধ্বনিত হতে থাকে "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।" এভাবে বাঙালি পাক শাসকদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করার টালবাহানার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব 'ক'-এর সর্বশেষ উক্তি অর্থাৎ সকল বাধা অতিক্রম করে মুক্তিকামী জনগণের আপসহীন আত্মত্যাগের ফলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি — বক্তব্যটি সম্পূর্ণ সঠিক।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে নানাভাবে বঞ্চিত করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও পাক সরকার আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরু করে। বাঙালিদের দমিয়ে রাখার জন্য তারা বিভিন্ন হীন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের শত বাধা অতিক্রম করে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। জনাব 'ক' এর সর্বশেষ উক্তিতে, এ কথারই প্রকাশ ঘটেছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও পাক শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করার অপতৎপরতায় মেতে ওঠে।

https://teachingbd24.com

১৯৭১ সালে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করে বাঙালি জাতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। আর ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ঢাকায় আসার ঘোষণা দেন। ১৬-২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের ব্যর্থ আলোচনার পর কোনোরকম সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা ছাড়াই গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। আর ২৫ মার্চের কালরাতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে পাকহানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। আর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে বাঙালি জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে আলবদর, আল শামস, রাজাকার ও শান্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের ঘোরতর বিরোধিতা করলেও বীর বাঙালি তেজোদীপ্ততার সাথে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পরিশেষে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান সরকারের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে আপসহীন আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মুকুল টেলিভিশনে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতিবেদন দেখছিল। যুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষেরা কেউ পত্র-পত্রিকা লেখালেখি করছে, কেউ দেশাত্মবোধক গান গাইছে, কেউ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতা, গান গেয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে জনৈক পাঠকের সংবাদ পাঠ মুকুলকে পুলকিত করে তোলে। *[সরকারি হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কত তারিখে? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝ? ২

গ. মুকুলের দেখা প্রতিবেদনের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোন দিকটির মিল লক্ষ করা যায়? ৩

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের উক্ত দিকটি আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে? বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মুকুলের দেখা প্রতিবেদনের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণের মিল লক্ষ করা যায়।

মুকুলের দেখা প্রতিবেদনে সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিকরা তাদের লেখা, গান, কবিতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। ঠিক একইভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। তাদের সাথে এগিয়ে এসেছে অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন।

যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল, নৈতিক শক্তি ধরে রাখার ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সংস্কৃতিকর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। তারা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। শিল্পী, সাহিত্যিকরা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ের মনোবল সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সংবাদ পাঠ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এ ছাড়া এম. আর. আখতার মুকুলের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'চরমপত্র' এবং 'জল্লাদের দরবার' অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। উক্ত অনুষ্ঠান শরণার্থীদের বাঁচার আশ্বাস জুগিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের খবর বহির্বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছে।

ঘ মুক্তিযুদ্ধের উক্ত দিকটি তথা যুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল গৌরবোজ্জ্বল, যা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি ছিল জনগণ। তদুপরি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সংস্কৃতিকর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। তারা নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। মূলত তারা তাদের বুদ্ধি ও মেধাশক্তি দিয়ে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধার মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে সহায়তা করেছেন। সাহস ও মনোবল যুগিয়েছে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

সুরকার আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, চিকিৎসক ড. ফজলে রাব্বি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গিয়াস উদ্দিনসহ অগণিত গুণীজনকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি সেনারা। তাদের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে এদেশ। মুক্তিযুদ্ধে নারী, কৃষক, পেশাজীবী, সাধারণ জনগণ, গণমাধ্যম, প্রবাসী বাঙালি যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তেমনি এ মহান যুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদানও অপরিসীম।

পরিশেষে বলা যায় যে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ভূমিকা রেখেছিল তেমনিভাবে এদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরাও তাদের অবদানের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়া অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত। বিদ্যমান খ্রিষ্টান রাজ শক্তির কাছে বসনীয় জনগণ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকেই অর্থনৈতিকভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। এতে বসনিয়ার জনগণ বিক্ষুব্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেয়। ফলে যুগোস্লাভিয়া সরকার তাদের দমনে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। বাড়িঘর লুণ্ঠন করে। নারীর ইজ্জত লুটে নেয়। শিশুরাও রেহাই পায়না, তারপরও বসনীয়দের দমাতে পারেনি। তারা তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এখনও সেখানে বসনীয়দের বহু কবর আবিষ্কৃত হচ্ছে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর]*

ক. বাংলাদেশকে কোন দেশ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে? ১

খ. আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বসনীয় জনগণের ন্যায় তোমার পাঠ্যবইয়ে কোন অঞ্চলের জনগণের বৈষম্য সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যমূলক নীতির ন্যায় ইঙ্গিতকৃত অঞ্চলের সীমাহীন বৈষম্য স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল? ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃত প্রদান করে।

খ শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে দমনের জন্য ১৯৬৮ সালে যে মামলা দায়ের করা হয় তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় কংগ্রেস নেতা শচীন্দ্র লালের সাথে বৈঠক করেন। পাকিস্তান সরকার বিষয়টি জেনে যায় এবং ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করে। এ জন্য এ মামলা আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। মূলত বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে চলমান ছয়দফা আন্দোলন দমন করার জন্য পাকিস্তান সরকার এ মামলা দায়ের করে।

গ উদ্দীপকের বসনীয় জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি সাদৃশ্য হলো বসনীয় জনগণের মতো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শাসন, শোষণের শিকার হতে থাকে। তারা সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। একইভাবে উদ্দীপকেও আমরা লক্ষ করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই খ্রিষ্টান রাজশক্তির কাছে বসনীয় জনগণ শোষিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত হতে থাকে।

প্রথম থেকেই বাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধিকারের প্রশ্নে ক্রমাগত উপেক্ষিত হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পশ্চিম

https://teachingbd24.com

পাকিস্তানিরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসনক্ষমতার কর্ণধার। পূর্ব বাংলার জননেতা এ কে ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। পশ্চিমাদের এ বৈষম্য নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং সামরিক, সামাজিক, শিক্ষাক্ষেত্রসহ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। আর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এরূপ নির্লজ্জ বৈষম্যনীতিই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। এ বঞ্চনার দিকটিই উদ্দীপকের সাথে পূর্ব পাকিস্তানিদের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যমূলক নীতির ন্যায় ইংগিতকৃত অঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তানে সীমাহীন বৈষম্য সে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রথম থেকেই বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা উদ্দীপকে বসনিয়ার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বসনিয়ার জনগণ বিদ্যমান খ্রিষ্টান শক্তির দ্বারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক সকল ক্ষেত্রে শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। বসনিয়ার জনগণ এতে বিমুখ হয়ে সর্বাগ্র আন্দোলনের ডাক দেয়। অনেক দমন নিপীড়নের পর তারা এক পর্যায়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকের বসনিয়ার বৈষম্যগুলো যেভাবে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সীমাহীন বৈষম্য তাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। শুরু থেকেই তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষমের শিকার হতে থাকে।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্য থাকা স্বত্তেও গর্ভনর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদেই নিয়োগপ্রাপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এ সময় অর্থনৈতিক ও সামরিক বৈষম্যও ছিল প্রকট। পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় সম্পদ ও আয় ব্যবহৃত হত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। সামরিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যই তাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল।

প্রশ্ন ▶২০ আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম দিশারী আব্রাহাম লিংকন বিশ্ব ইতিহাসের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়ে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মানবীয় গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। গেটিসবার্গ ভাষণের 'Government of the people, by the people and for the people' এ ভাষণের ফলে আমেরিকার ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটে। *[রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? ১

খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের কৃতিত্বের সাথে আমরা আমাদের কোন মহান নেতার প্রতিচ্ছবি দেখি-আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত ভাষণের ন্যায় তোমার পঠিত ভাষণের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের কৃতিত্বের মধ্যে আমরা আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা।

৭ মার্চের ভাষণের পরপরই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এ ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে তৃতীয়। ১৮৬৩ সালে আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের দৈর্ঘ্য মাত্র তিন মিনিট হলেও ঐ ভাষণটি আজও ইতিহাস হয়ে আছে। তাঁর এ ভাষণটি ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। ঠিক একই ভাবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে একটি তাৎপর্য বহুল ঘটনা। ৭ মার্চ ছিল স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের শৃঙ্খলা জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা। তবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালিকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিল তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দেশকে স্বাধীন করে। আর এদিক থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের থেকে অধিক তাৎপর্যবহ। সুতরাং বলা যায়, আব্রাহাম লিংকনের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ উভয়ই ছিল গণতন্ত্রের জন্য। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য।

ঘ প্রেসিডেন্ট লিংকনের ভাষণের মতো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। কেননা এর মাধ্যমে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। এই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। যদিও এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তবে মুক্তিপাগল বাঙালি এই ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার গ্রিন সিগন্যাল দেখতে পায়। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণকে কৌশলগত স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে গ্রহণ করে। "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে" বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানকে বাঙালি গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান হিসেবে গ্রহণ করে। স্বাধীনতাপাগল জনগণের সর্বাত্মক অসহযোগিতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল সরকারি কর্মতৎপরতা অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সদর দপ্তর হতে জারিকৃত আদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলতে থাকে। ১৫ মার্চ বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ৩৫টি বিধি জারি করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তাঁর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ।

পরিশেষে বলা যায়, ৭ মার্চের ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶২১ কানাডার নাগরিক বিকি বিশ্ববিখ্যাত একটি টেলিভিশন চ্যানেলে 'যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ' শীর্ষক রিপোর্টের কাজ করে থাকেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশের একটি যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন। সে দেশটি মুসলিম অধ্যুষিত এবং দুটি অঞ্চলে বিভক্ত, একটি অঞ্চলের হাতেই অন্য অঞ্চলের সকল অর্থ-সম্পদ ব্যবহৃত হতো। শোষিত অঞ্চলের মধ্যে তাদের অর্জিত সম্পদের মাত্র ১৬% ব্যয় হতো। এ ধরনের বৈষম্যের কারণেই বৃহৎ দেশটি ভেঙ্গে শোষিত অঞ্চলটি একটি স্বাধীন দেশে রূপ নেয়। *[গাজীপুর সরকারী মহিলা কলেজ, গাজীপুর]*

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? ১

খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বোঝ? ২

গ. বিকির রিপোর্টের আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের আলোকে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি চিত্র তুলে ধর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

গ রিকির রিপোর্টে বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য এবং এর প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে।
১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৩ বছরের স্বৈরশাসন ও শোষণের বেড়াজাল ভেঙে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের এ যুদ্ধে বাঙালি জাতিকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়েছে স্বাধীনতা। উদ্দীপকে এ সময়ের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, রিকি দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশের একটি যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন যা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের কথা মনে করিয়ে দেয়। জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় কিছু চিহ্নিত দল বা ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক এবং আপামর জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক রাজনৈতিকসহ নানা ধরনের বৈষম্যের কারণে এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। উদ্দীপকের রিপোর্টে একথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যের ন্যায় তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল পাহাড় সমান।
পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় ৩২% বেশি। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেত। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের হলেও জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় হতো এদের জন্য।
মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল না। তাছাড়া স্টেট ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদেশি মিশনসমূহের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে গৃহীত মোট তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ ছিল অনেক কম।
উদ্দীপকে এশিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের দুটি অংশের দ্বারা পাকিস্তানের দুটি অংশ তথা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানকে বোঝানো হয়েছে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত সম্পদের ১২% সে অঞ্চলে ব্যয়ের কথা বলা হলেও এ বৈষম্য ছিল আরও বেশি। ওপরের আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২২ আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম দিশারী আব্রাহাম লিংকন বিশ্ব ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়ে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। গেটিসবার্গে ভাষণের 'Government of the people, by the people and for the people'. ভাষ্যটি তাকে অমরত্ব দান করে।

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১
খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা কী? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের কৃতিত্বের সাথে আমাদের কোন মহান নেতার প্রতিচ্ছবি দেখি? আলোচনা কর। ৩
ঘ. ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকেই বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ।

খ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলে সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ তো দূরে থাকুক বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা প্রস্তাবও জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা উত্থাপন করতে পারেনি। বরং বিষয়টিকে জাতিসংঘ ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গ সৃজনশীল ২০ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২৩ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতাকামী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মীরজাফর, ঘসেটি বেগমের মতো বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্বে বাংলারই কতকগুলো দেশদ্রোহী ব্রিটিশদের সহায়তা করে নবাবসহ বাংলার অসংখ্য মানুষকে হত্যা কর। কিন্তু তারা আজও বাংলার মানুষদের কাছে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত।

[নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? ১
খ. কাদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'মীরজাফরদের দল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন নামে সক্রিয় ছিল'— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মীরজাফরদের দল ব্রিটিশদের সমর্থন দিয়ে প্রমাণ করে যে, বাংলার মানুষ হলেও তারা বাংলার স্বাধীনতা চায়নি'— উক্তিটির আলোকে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।
মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র ও কৃষিমন্ত্রী কামরুজ্জামান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

গ উদ্দীপকে মীর জাফরের দলের মতো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি বিভিন্ন নামে সক্রিয় ছিল— উক্তিটি সঠিক।
বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের কলঙ্কজনক অধ্যায় হলো শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনীর অপতৎপরতা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা। এ সকল বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর হয়ে হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতনসহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা করে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়।
১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতাকামী নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মীর জাফর, ঘসেটি বেগমের মতো বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্বে বাংলারই কতিপয় দেশদ্রোহী ব্রিটিশদেরকে সহায়তা করে নবাবসহ বাংলার অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। ঠিক একইভাবে রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি নামে দালালরা পাকিস্তানিদের সহায়তা করে বাংলার অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে।

ঘ মীরজাফরের দল ব্রিটিশদের সমর্থন দিয়ে প্রমাণ করে যে, বাংলার মানুষ হলেও তারা বাংলার স্বাধীনতা চায়নি—উক্তিটি যথার্থ।
মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী সংগঠনের মধ্যে অন্যতম হলো রাজাকার, আলবদর, আল শামস, শান্তিকমিটি। তারা নির্যাতন, হত্যা অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন

https://teachingbd24.com

ইত্যাদি অপরাধকর্মে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। মীর জাফরের দল ব্রিটিশদের সমর্থন দিয়ে যেমন প্রমাণ করে যে, বাংলার মানুষ হলেও তারা বাংলার স্বাধীনতা চায়নি। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী এ সকল দল পাকিস্তানিদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে প্রমাণ করে যে তারা বাঙালি হয়েও এদেশের স্বাধীনতা চায়নি।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগী এদেশীয় ব্যক্তিবর্গ এক কথায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে ও ধর্মের দোহাই দিয়ে এই স্বাধীনতাবিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতনসহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ সকল কর্মকাণ্ডের জন্য তারা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও পাক বাহিনীর দোসর হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে আল বদর, আল শামস ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিত; পাকিস্তানিদেরকে পথঘাট চিনিয়ে দিত। পাকিস্তানি সেনাদের জন্য বিভিন্ন রসদ সংগ্রহ করত এবং বিভিন্ন হাট-বাজার, ঘরবাড়িতে আগুন লাগাতে সহযোগিতা করত। এরা যদি পাকিস্তানিদের সাহায্য-সহযোগিতা না করত তাহলে বাঙালিদের নয় মাস যুদ্ধ করতে হতো না। আরও অল্প সময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৭৫৭ সালে বাংলার বিশ্বাসঘাতকদের কারণে যেভাবে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল একইভাবে ১৯৭১ সালে বাংলার কতিপয় বিশ্বাসঘাতক স্বার্থান্বেষী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে বিলম্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রবিন টেলিভিশনে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতিবেদন দেখছিল। যুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষেরা কেউ পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করছে, কেউ দেশাত্মবোধক গান গাইছে, কেউ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা, গান গেয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তি যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে জনৈক পাঠকের সংবাদ পাঠ রবিনকে পুলকিত করে তোলে। *[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. কত সালে ছয় দফা আন্দোলন সংঘটিত হয়? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রবিনের দেখা প্রতিবেদনের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোন দিকটির মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের উক্ত দিকটি আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে– বক্তব্যটি যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন হয়েছিল।

খ পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল অবিস্মরণীয়।

তাদের নিজের প্রাণের ওপর কোনো মায়া-মমতা ছিল না। স্বাধীনতাকামী কৃষকেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অসীম সাহস আর মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করে। মুক্তিযুদ্ধে কৃষকেরা ছিল নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসেব তারা করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই মাতৃভূমির জন্য লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করা।

গ সৃজনশীল ১৮ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ফিরে দেখা ৭১-এ অমি রহমান পিয়াল তার এক প্রবন্ধে 'বুদ্ধিজীবী হত্যায় রাজাকার আল বদর' এ লিখেছেন। ''আল বদর ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাহিনী। রাজাকারদের সঙ্গে আল বদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে। কিন্তু আল বদরের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন তারা হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে। *[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. কবে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গঠন করেছিল? ১

খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা কীরূপ ছিল? ২

গ. অমি রহমানের বক্তব্যের আলোকে স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর মুষ্টিমেয় কিছু লোক স্বাধীনতা বিরোধী হলেও অধিকাংশ মানুষই মুক্তিযুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গঠন করেছিল ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর।

খ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলে সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ তো দূরে থাকুক বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা প্রস্তাবও জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা উত্থাপন করতে পারেনি। বরং বিষয়টিকে জাতিসংঘ ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গ উদ্দীপকে অমি রহমানের বক্তব্যের মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আলবদর ও রাজাকারদের অপতৎপরতা ফুটে উঠেছে।

১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত তখন কতিপয় বিশ্বাসঘাতক স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করে। পাক বাহিনীকে সহযোগিতার জন্য তারা কতগুলো দল গড়ে তোলে। এই দলগুলোর মধ্যে আলবদর ও রাজাকার বাহিনী ছিল অন্যতম। তারা পাকিস্তানিদের সাথে মিলিত হয়ে বাঙালিদের ওপর হত্যা ও নির্যাতন চালায়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানপন্থিদের নিয়ে। এদেরকে ট্রেনিং দিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী। এরা দখলদার বাহিনীর দোসর হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান দায়িত্ব ছিল আলবদর বাহিনীর ওপর। আল শামস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহচর ছিল। জেনারেল টিক্কা খানের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীকে হটানোর জন্য গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি। ১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের হত্যাকাণ্ডে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিল এদেশের দালালরা। অমি রহমান পিয়ালের প্রবন্ধে পাকিস্তানি দোসরদের উল্লিখিত অপতৎপরতার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, মুষ্টিমেয় কিছু লোক স্বাধীনতাবিরোধী হলেও অধিকাংশ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ। জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে কিছু চিহ্নিত দল বা ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এবং আপামর জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণপন্থি ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালন করে। তবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের অধিকাংশ লোক কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের সামরিক, বেসামরিক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিক্ষক কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাবকে গুরুত্ব না দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলার কৃষকেরা। আর মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান ছিল গৌরবোজ্জ্বল। যুদ্ধের নয় মাস কয়েক লক্ষ মা-বোন পাক বাহিনীর অত্যাচারের শিকার হন। সারাদেশে অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাক বাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমেরও অনেক ভূমিকা ছিল। অনেক প্রবাসী বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে

https://teachingbd24.com

নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, সেবা দিয়ে ও খাবার সরবরাহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, মুষ্টিমেয় কিছু লোক স্বাধীনতাবিরোধী হলেও এদেশের অধিকাংশ জনগণ স্বাধীনতা, যুদ্ধে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করলেও এককভাবেই তারা সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় আসনে জয় লাভ করে। আওয়ামী লীগের এ জনসমর্থন দেখে রায়হানের বাবা বললেন, পাকিস্তান আমলেও আমাদের এ দলটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা তখন সরকার গঠন করতে পারিনি। তবে এ নির্বাচন আমাদের বিজয় ছিনিয়ে আনার অনুপ্রেরণা দেয়। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে পরিচিত ছিলেন কে? ১

খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রায়হানের বাবা অতীতের কোন নির্বাচনের কথা মনে করলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের নির্বাচনের চেয়ে উক্ত নির্বাচন ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত ছিলেন টিক্কা খান।

খ শত্রু বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর যে যুদ্ধকৌশল সেটিই গেরিলাযুদ্ধ নামে পরিচিত।

গেরিলা যুদ্ধে সৈনিকরা অভ্যন্তরীণ রণাঙ্গনে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সংগঠিত হয়ে থাকে। এ ধরনের যুদ্ধে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যোদ্ধারা নানা কৌশলে শত্রুবাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলা করার পূর্বপর্যন্ত তারা শত্রু বাহিনীকে নিজেদের অবস্থান টের পেতে দেয় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

গ রায়হানের বাবা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা মনে করলেন।

পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পরও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়নি। উদ্দীপকেও এ নির্বাচনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে রায়হানের বাবা পাকিস্তান আমলের একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কথা বললেন। এর মাধ্যমে তিনি মূলত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা মনে করেছেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিলে ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। তিনি ২৮ মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও এ নির্বাচন নিয়ে নানা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ভোটারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ৩ কোটি ২২ লক্ষ। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। এককভাবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের গণরায় লাভ করলেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সরকার গঠন করতে দেয়নি। তাই বলা যায়, রায়হানের বাবা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথাই স্মরণ করেছেন।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের নির্বাচনের চেয়ে উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের অপরিসীম ভূমিকা ও প্রভাব ছিল। এ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পতনঘণ্টা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বার্তাবাহক হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে, উদ্দীপকের ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তৎকালীন প্রেক্ষাপটের আঙ্গিকে সুদূরপ্রসারী কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়। অপরপক্ষে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি লাভ করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা শাসকেরা নির্বাচনি বিজয়কে নস্যাতের চক্রান্ত শুরু করলে বাঙালি জাতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে এই নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের চেয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জন ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৭ আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম দিশারী আব্রাহাম লিংকন বিশ্ব ইতিহাসের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়ে তিনি নিজের যোগ্যতায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। প্রেসিডেন্ট হয়ে ১৮৬৩ সালে তিনি একটি অমূল্য ভাষণ প্রদান করেন গেটিসবার্গে। স্বল্প সময়ের তার এ ভাষণটি ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। কারণ এ ভাষণ ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের স্বাধীনতার জন্য এবং মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। *[শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ]*

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল? ১

খ. মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারদের অপতৎপরতা সম্পর্কে যা জান লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে মহান আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের তুলনায় আমাদের মহান নেতার ভাষণের তাৎপর্য আরও অনেক বেশী- মূল্যায়ণ কর। ৩

ঘ. বঙ্গবন্ধুর '৭' মার্চের সমগ্র ভাষণের একটাই দিক নির্দেশনা 'স্বাধীনতা'–এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তোমার পাঠ্য বই এর আলোকে লেখ। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম তাজউদ্দিন আহমদ।

খ মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার বাহিনী নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন সব ধরনের অপকর্মে পাকিস্তানবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। দখলদার বাহিনীর আজ্ঞাবহ হিসেবে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এদের অন্যতম কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসন্ধান দেওয়া, হানাদারবাহিনীদের সহায়তা দান, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতাদের ওপর অত্যাচার, হত্যা লুণ্ঠনসহ সকল অপকর্মে তারা জড়িত ছিল।

গ উদ্দীপকে মহান আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের তুলনায় আমাদের মহান নেতার ভাষণের তাৎপর্য আরোও অনেক বেশি। কেননা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল অধিক নির্দেশনামূলক ও চেতনায় উদ্দীপ্ত।

১৮৬৩ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ৩ মিনিটের ভাষণ এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয়ই ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। লিংকনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তি, 'Government of the people, by the people and for the people.' আর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' ৭ মার্চের এ ৭টি শব্দ বাঙালিকে দুর্বার করে তুলেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। অনেকে এই ভাষণকে বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ হিসেবে আখ্যা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। এর মাধ্যমে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। যদিও বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের

https://teachingbd24.com

স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তারপরও মুক্তিপাগল বাঙালি এই ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার সবুজ সংকেত দেখতে পান। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তার এ ঘোষণা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। পরবর্তীতে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে এ ভাষণটি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ৭ মার্চের ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর এদিক থেকেই আব্রাহাম লিংকনের চেয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অধিক নির্দেশনামূলক ও গুরুত্ববহ।

ঘ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সমগ্র ভাষণের একটাই দিকনির্দেশনা ছিল তা হলো 'স্বাধীনতা'। এ ভাষণের পরপরই পূর্ব বাংলার জনগণ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি আদায়ের লক্ষ্যে সোচ্চার হয়ে উঠে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। এই ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কেননা এর মধ্যে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও মুক্তিপাগল বাঙালি এ ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার গ্রিন সিগন্যাল দেখতে পায়— যা বাঙালিদেরকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। তার নির্দেশে সকল অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকায় ১৩ মার্চ সরকার দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক আইন জারি করে। ১৪ মার্চ পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দিলে বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করে ৩৫ দফা দাবি জারি করেন এবং জনগণকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়া খান প্রহসনমূলক আলোচনার জন্য ঢাকায় আসে। ঢাকা ত্যাগ করার আগে সামরিক বাহিনীকে বাঙালির ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। শুরু হয় বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করে।

পরিশেষে বলা যায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

প্রশ্ন ▶২৮ একাত্তর সালের আগে বিশ্বের মানচিত্রে যে বাংলাদেশের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শুরু হয় অগ্নিঝরা মার্চের বিক্ষুব্ধ আন্দোলন। এ ভূখণ্ডের মানুষের হৃদয়ের মানচিত্রে আঁকা হচ্ছিল স্বদেশের সীমানা। ১৯৭১ সালের মার্চে ঢাকাসহ সারা দেশে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেন সমুদ্রের মতো গর্জে ওঠে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বাংলাদেশে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১

খ. মুজিবনগর সরকার কেন গঠিত হয়? ২

গ. ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা মার্চের বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের মতো গর্জে ওঠেছিল কেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ডিসেম্বর ১৪ তারিখে পালন করা হয়।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেও ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তান সরকারের টালবাহানা অগ্নিঝরা মার্চের জন্ম দিয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আলোচনায় বসার জন্য অনুরোধ করে টালবাহানা করেন। কিন্তু ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকহানাদার বাহিনী ট্যাঙ্ক ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকা শহরের ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে দেয় গণহত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে। পাকিস্তান সৈন্যদের হাতে বন্দি হবার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দেন। তার এ ঘোষণাটি ২৬ মার্চ মো. আব্দুল হান্নান এবং ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন। এ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে শুরু হয় প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রাম। গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ দ্বিধাহীনচিত্তে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করে স্বাধীনতা।

ঘ ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতার "আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের মতো গর্জে উঠেছিল। কারণ, তাদের দীর্ঘ ২৪ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে এ নিপীড়নমূলক আচরণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করে আসছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্তির জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। যা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কেননা, ১৯৭০ সালের এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের বিজয়। নির্বাচনের রায় স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা আরো বলিষ্ঠ ও শাণিত করে এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও ত্বরান্বিত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে নানা টালবাহানা করে। ১৯৭১ সালে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে ঢাকায় এসে গোপনে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। হুকুম মতো ২৫ মার্চ ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এই হত্যা, অত্যাচার-অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের মতো গর্জে উঠেছিল। ফলশ্রুতিতে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাঙালি জনগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ▶২৯ ১৯৬৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের দৈর্ঘ্য মাত্র ৩ মিনিট হলেও ঐ ভাষণটি আজও ইতিহাস হয়ে আছে। কারণ ঐ ভাষণটি ছিল গণতন্ত্রের জন্য মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। *[ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা]*

ক. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যামূলক অভিযানের নাম কী? ১

খ. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের সাথে বাংলাদেশের কোন মহান নেতার ভাষণকে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আব্রাহাম লিংকনের মতো বাংলাদেশের উক্ত মহান নেতার ভাষণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যামূলক অভিযানের নাম হলো অপারেশন সার্চলাইট।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩০ রুবেল, পাভেল, শামীমসহ অনেকেই তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। তারা তাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা

https://teachingbd24.com

করে দেশ স্বাধীন করেছিল। তাদের অনেক বন্ধু প্রাণ হারালেও তারা ভয় পেয়ে ঘরে ফিরে আসেনি। যুদ্ধকে তারা 'জয় অথবা মৃত্যু' হিসেবে বিবেচনা করেছিল। *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক. ২৫শে মার্চের গণহত্যাকে কী নাম দেয়া হয়? ১

খ. খিলাফত আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যাদের সাহসের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, এ শ্রেণির লোকদের আত্মত্যাগ ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২৫ মার্চের গণহত্যাকে অপারেশন সার্চলাইট নাম দেয়া হয়।

খ তুরস্কের খিলাফত রক্ষার জন্য ১৯২০-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষের মুসলমানদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তাই ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন হিসেবে পরিচিত।

খিলাফত ইসলামের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষা ও খিলাফত রক্ষার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তোলে ইতিহাসে তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গ উদ্দীপকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রসমাজের সাহসের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫২ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ছাত্রদের মনে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। যেটি উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রুবেল, পাভেল, শামীমসহ অনেকেই তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। তারা তাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে দেশ স্বাধীন করেছিল। তাদের অনেক বন্ধু প্রাণ হারালেও তারা ভয় পেয়ে ঘরে ফিরে আসেনি। যুদ্ধকে তারা 'জয় অথবা মৃত্যু' হিসেবে বিবেচনা করেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্রসমাজের মধ্যে অনুরূপ চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোরও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার ছাত্র-যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে। অল্প দিনের প্রশিক্ষণে হালকা অস্ত্র নিয়ে অসীম সাহস, মনোবল আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ জীবন বাজি রেখে তারা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য মৃত্যুবরণ করতেও পিছপা হননি। তাদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রদের অসীম সাহস এবং ভূমিকার কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রেণি অর্থাৎ ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগ ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

যেকোনো প্রকারের চ্যালেঞ্জিং কাজ করার জন্য যৌবনই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। মানুষের যৌবনের বিরাট অংশ কাটে ছাত্রাবস্থায়। এসময় ছাত্ররা যেকোনো বীরত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে মোটেই কুণ্ঠিত হয় না। যেমনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের কর্মকাণ্ডেও লক্ষণীয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পেছনে ছাত্রদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা পাকিস্তানি বাহিনীর শিক্ষিত সৈনিক এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবিলায় প্রশিক্ষণবিহীন এবং অস্ত্রবিহীন অবস্থায় এদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অনেকে সরাসরি যুদ্ধ করেছে। অনেকে ভারত থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। ছাত্ররা অনেকটা নিজ উদ্যোগে কখনও গণবাহিনী, কখনও মুজিব বাহিনী, কখনও বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী নামে সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অকুতোভয় ছাত্রসমাজ অনেক ক্ষেত্রে চোখের সামনে বন্ধু ও সাথিকে মরতে দেখেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেনি। তাদের পণ ছিল- হয় বিজয় না হয় মৃত্যু-এর মাঝে আর কিছু নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

প্রশ্ন ▶৩১ সীমাহীন বৈষম্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে কোরিয়ার দুই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসমতা তৈরি হয়। এর ফলে গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে কোরিয়ার একজন সামরিক কর্মকর্তার নির্দেশে উত্তর কোরিয়ার একটি অংশে মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। এতে বহু নিরপরাধ ও নিরস্ত্র নারী-পুরুষ এবং শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটি তাদেরকে বিশ্ববাসীর ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। অবশেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয়। *[কক্সবাজার সিটি কলেজ]*

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা কত ছিল? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডটি দুই পাকিস্তানের কোন হত্যাকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের হত্যাকাণ্ডের মতো উক্ত হত্যাকাণ্ডটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত চিত্রমাত্র— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩টি।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩২ জনাব সাদমান ও সুমাইয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আলোচনা করছিল। সাদমান বলল, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ছয় দফার বিজয়। একমত পোষণ করে সুমাইয়া বলল এ নির্বাচনে বিজয় এবং ৭ মার্চের ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' আমাদের পথ প্রর্দশন করেছে। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]*

ক. ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের ভিত্তি কী? ১

খ. ১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সাদমানের বক্তব্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুমাইয়ার বক্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের ভিত্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচি।

খ ১৯৭০ এর নির্বাচনে সকল বাঙালি একত্রিত হয়ে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে, যার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে।

https://teachingbd24.com

১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ভিত্তি লাভ করে। এছাড়াও নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিকরূপ লাভ করে। তাই এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়।

গ উদ্দীপকে সাদমানের বক্তব্য অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ছয় দফার বিজয় — কথাটি সঠিক।

১৯৭০ সালের নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানে মূলত ছয় দফার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ছয় দফা ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি, মুক্তির সনদ। পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। উদ্দীপকের সাদমানের বক্তব্যে এই বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

ছয় দফার দাবি ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের অনাচার ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এটি ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি। বাংলার জনগণের মনে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের ক্ষেত্রে ছয় দফার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছয় দফার মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমা শাসকচক্রকে আঘাত হানে, তাই এটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, যেখানে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। আর এই ছয় দফাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং আওয়ামী লীগকে জয়ী করে। তাই বলা যায়, ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় পূর্ব পাকিস্তানিদের বিজয়। আর পূর্ব পাকিস্তানিদের বিজয় মানেই ছয় দফার বিজয়।

ঘ উদ্দীপকে সুমাইয়ার বক্তব্য অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিজয় এবং ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের পথ প্রদর্শন করেছে— বক্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগের ব্যাপক জয়ের ফলে বাঙালি জাতি সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। নিজেদেরকে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত জাতি হিসেবে ভাবতে শেখে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে এবং এ ফলাফল বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। উদ্দীপকে সুমাইয়ার বক্তব্যেও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার অপতৎপরতায় মেতে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ফলে বীর বাঙালি যুদ্ধের ইঙ্গিত পায় এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। পরে ১৬ মার্চ–২২ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের ব্যর্থ আলোচনা সমাপ্ত হতে না হতেই পাক শাসকগোষ্ঠী ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালির ওপর নিষ্ঠুর অভিযান চালায়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বাঙালিরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বীর বাঙালি অর্জন করে মহান স্বাধীনতা– যা মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রকৃত রূপদান।

পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পথ নির্দেশক হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ টিভিতে একটি গণকবরের প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হয়। এটি সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তেই বের হয়ে আসল মানুষের হাড়গোড় আর পঁচা লাশ। পাশাপাশি দুটি বিশাল গর্ত। আনুমানিক তিন চারশ মানুষের মরদেহ এখানে মাটি চাপা দেওয়া আছে। এগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নিরাপদ মানুষের সমাধি। হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার আল বদরদের হাতে তারা শহিদ হয়েছেন।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. বর্তমান মুজিবনগরের পূর্বনাম কী ছিল? ১

খ. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য আমাদের কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যের আলোকে উক্ত সময়ের সংঘটিত নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমান মুজিবনগরের পূর্বনাম বৈদ্যনাথতলা।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার বসনিয়া অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত। বিদ্যমান খ্রিস্টান রাজশক্তির কাছে বসনিয়ার জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শোষিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। এতে বসনীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেয়। ফলে যুগোশ্লাভিয়া সরকার তাদের দমনে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। রাজকীয় সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে অসংখ্য নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করে, বাড়িঘর লুণ্ঠন করে। নারী, শিশুরাও তাদের নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। তারপরও বসনীয়দের দমাতে পারেনি। তারা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ]*

ক. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ কে? ১

খ. ছয়দফা দাবীকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বসনীয় জনগণের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি সাদৃশ্য রয়েছে— ব্যাখ্যাসহ লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বসনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিবরণ দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ হলেন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান।

খ ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির পথ সূচিত হওয়ায় এটিকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত, নির্যাতিত জনগণ ছয় দফাকে মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত করে। পাকিস্তানি শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন ম্যাগনাকার্টা অধিকার বিল, ঠিক তেমনি বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি হলো ছয় দফা। এ জন্য এটিকে ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৭ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-৬: স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

৩১৭. গণঅভ্যুত্থান কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)
ক) ১৯৭৮ খ) ১৯৬৯
গ) ১৯৬৮ ঘ) ১৯৬৭ **খ**

৩১৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল বিজয় লাভ করে? (জ্ঞান) [সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]
ক) পাকিস্তান পিপলস পার্টি
খ) মুসলিম লীগ
গ) আওয়ামী লীগ ঘ) ন্যাপ **গ**

৩১৯. ন্যাপ এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক) মওলানা ভাসানী খ) এ.কে ফজলুল হক
গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান **ক**

৩২০. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? (জ্ঞান)
ক) নৌকা খ) কাঁচি
গ) কোদাল ঘ) দেয়াল ঘড়ি **ক**

৩২১. নিচের কোন রাজনৈতিক দল ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কোনো আসন লাভ করেনি?
ক) পিপিপি খ) ন্যাপ (ওয়ালি)
গ) ন্যাপ (ভাসানী) ঘ) পিডিপি **গ**

৩২২. কোন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয় হয়েছিল? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক) ১৯৫৬ সালের খ) ১৯৭০ সালের
গ) ১৯৭৩ সালের ঘ) ১৯৭৯ সালের **খ**

৩২৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের কয়টি আসনে জয়ী হন? (জ্ঞান) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার]
ক) ৫৮ খ) ৬৮
গ) ৭৮ ঘ) ৮৮ **ঘ**

৩২৪. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক) প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের চাপে
খ) তীব্র ছাত্র আন্দোলন ও গণআন্দোলনের ফলে
গ) সামরিক অভ্যুত্থান হতে পারে এ আশংকায়
ঘ) তৃতীয় শক্তির উত্থানের সম্ভাবনা থাকায় **খ**

৩২৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণের অন্যতম প্রকৃতি ছিল কোনটি? (অনুধাবন) [কুমিল্লা মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ]
ক) জনগণকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান
খ) জনগণকে দেশত্যাগ করার আহ্বান
গ) জনগণকে অর্থ সম্পদ জমা করার আহ্বান
ঘ) জনগণকে ঘরে বসে থাকার আহ্বান **ক**

৩২৬. মাকসুদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এসে একটি ভাষণের কথা স্মরণ করলেন। মাকসুদ কোন ভাষণের কথা মনে করলেন? (প্রয়োগ)
ক) আব্রাহাম লিংকনের খ) ৭ মার্চের
গ) পল্টন ময়দানের ঘ) কাগমারীর **খ**

৩২৭. 'বাঙালির তাজা রক্ত মাড়িয়ে আমি কোনো সম্মেলনে বসতে পারি না'– উক্তিটি করেছেন— (অনুধাবন)
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) মওলানা ভাসানী
গ) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী **ক**

৩২৮. ২৫ মার্চের রাতের গণহত্যা কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক) অপারেশন ডালভাত
খ) অপারেশন ক্লিনহার্ট
গ) অপারেশন সার্চলাইট
ঘ) অপারেশন রোবেল হান্ট **গ**

৩২৯. 'অপারেশন সার্চলাইট' সংঘটিত হয়েছিল কখন? (জ্ঞান)
ক) ১৯৫২ খ্রি. খ) ১৯৬৬ খ্রি.
গ) ১৯৬৯ খ্রি. ঘ) ১৯৭১ খ্রি. **ঘ**

৩৩০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের বর্তমান নাম কী? (জ্ঞান) [সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, সুনামগঞ্জ]
ক) জগন্নাথ হল খ) জহুরুল হক হল
গ) ফজলুল হক হল ঘ) শেখ মুজিব হল **খ**

৩৩১. জনাব ক নিজ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের বিশাল জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন। তার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ৪টি। জনাব ক ব্যক্তির সাথে কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক) শেখ মুজিবুর রহমানের
খ) ইয়াহিয়া খানের
গ) জুলফিকার আলী ভুট্টোর
ঘ) এম মনসুর আলীর **ক**

৩৩২. ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? (জ্ঞান) [কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]
ক) রমনা পার্ক খ) রমনা উদ্যান
গ) বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ঘ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান **ঘ**

৩৩৩. মুজিবনগর বর্তমান কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক) কুষ্টিয়া খ) চুয়াডাঙ্গা
গ) মেহেরপুর ঘ) ঝিনাইদহ **ক**

৩৩৪. প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সেনাপ্রধান কে ছিলেন? (জ্ঞান) [কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]
ক) এম এ জি ওসমানী খ) মেজর শফিউল্লাহ
গ) এ কে খন্দকার ঘ) মেজর জলিল **ক**

Teachingbd.com

৩৩৫. **মুজিবনগর সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান কে?** (জ্ঞান) [ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]
ⓚ অধ্যাপক ইউসুফ আলী
ⓛ তাজউদ্দিন আহমদ
ⓖ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ⓘ মোশতাক আহমদ — ক

৩৩৬. **কোন সময়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে?** (জ্ঞান) [শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]
ক) ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ
খ) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
গ) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল
ঘ) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ — গ

৩৩৭. **অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার কোথায় গঠন করা হয়?** (জ্ঞান) [সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]
ক) মেহেরপুর জেলায় খ) চুয়াডাঙ্গা জেলায়
গ) রাজশাহী জেলায় ঘ) ঢাকা জেলায় — ক

৩৩৮. **প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সেনাপ্রধান কে ছিলেন?** (জ্ঞান) [লালমনিরহাট সরকারি কলেজ]
ক) এমএজি ওসমানী খ) মেজর শফিউল্লাহ
গ) এ কে খন্দকার ঘ) মেজর জলিল — ক

৩৩৯. **অস্থায়ী সরকারের শপথবাক্য কে পাঠ করান?** (জ্ঞান)
ক) অধ্যাপক রহমত আলীকে
খ) অধ্যাপক মুজাফফর আহমদকে
গ) অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে
ঘ) অধ্যাপক মুদাচ্ছের আলীকে — গ

৩৪০. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সেনাপ্রধান কে ছিলেন?** (জ্ঞান)
ক) আতাউল গনি ওসমানী
খ) কে. এম. আশরাফ সিদ্দিকি
গ) কর্নেল শওকত উসমান
ঘ) ড. কে খন্দকার — ক

৩৪১. **মুজিব নগর অস্থায়ী সরকারের কয়টি মন্ত্রণালয় ছিল?** (জ্ঞান) [সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]
ক) ১০ খ) ১২
গ) ১৪ ঘ) ১৬ — খ

৩৪২. **মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র নৌ অঞ্চল কত সেক্টরের অধীনে ছিল?** (জ্ঞান) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]
ক) ১০ খ) ৯
গ) ১১ ঘ) ৮ — ক

৩৪৩. **বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ?** (জ্ঞান)
ক) ভুটান খ) নেপাল
গ) ভারত ঘ) মালদ্বীপ — গ

৩৪৪. **'ফ্রিডম ফাইটার্স' এর সরকারি নাম কী ছিল?** (জ্ঞান)
ক) বাংলাদেশ নৌ বাহিনী খ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
গ) গণ বাহিনী ঘ) মুজিব বাহিনী — গ

৩৪৫. **কত তারিখে বাংলাদেশ-ভারত একটি যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়?** (জ্ঞান) [ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]
ক) ১৭ নভেম্বর খ) ১৯ নভেম্বর
গ) ২১ নভেম্বর ঘ) ২৩ নভেম্বর — গ

৩৪৬. **মুক্তিযুদ্ধে অনিয়মিত বাহিনীকে কেন গেরিলা বাহিনী বলা হয়?** (অনুধাবন)
ক) দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছিল বলে
খ) দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছে বলে
গ) সামনাসামনি যুদ্ধ করেছে বলে
ঘ) কৌশলে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেছে বলে — ঘ

৩৪৭. **বুদ্ধিজীবী হত্যার কারণ কী?** (অনুধাবন) [জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ, জয়পুরহাট]
ক) ব্যক্তিগত শত্রুতা খ) জাতিকে মেধাশূন্য করা
গ) শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে ফেলা
ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের ভীতি প্রদর্শন — খ

৩৪৮. **মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য তারামন বিবি ও ডাক্তার সিতারা বেগম কোন খেতাবে ভূষিত হন?** (জ্ঞান) [পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ]
ক) বীরশ্রেষ্ঠ খ) বীরউত্তম
গ) বীরবিক্রম ঘ) বীরপ্রতীক — ঘ

৩৪৯. **সর্বপ্রথম মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যে সংগঠন সৃষ্টি হয় তার নাম কী?** (জ্ঞান) [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]
ক) শান্তি কমিটি খ) রাজাকার
গ) আলবদর ঘ) আলশামস — ক

৩৫০. **শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়—** (জ্ঞান)
ক) ১৩ ডিসেম্বর খ) ১৪ ডিসেম্বর
গ) ১৫ ডিসেম্বর ঘ) ১৬ ডিসেম্বর — খ

৩৫১. **বাংলাদেশ কত তারিখে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল?** (জ্ঞান)
ক) ১৭ ডিসেম্বর খ) ১৬ ডিসেম্বর
গ) ১৮ ডিসেম্বর ঘ) ১৯ ডিসেম্বর — খ

৩৫২. **১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে কত তারিখ?** (জ্ঞান)
ক) ১৩ ডিসেম্বর খ) ১৪ ডিসেম্বর
গ) ১৫ ডিসেম্বর ঘ) ১৬ ডিসেম্বর — ঘ

৩৫৩. **কার নির্দেশে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়?** (জ্ঞান) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার]
ক) জেনারেল নিয়াজির খ) টিক্কা খানের
গ) ইয়াহিয়া খানের ঘ) ভুট্টোর — ক

৩৫৪. **ভারতীয় সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ কে ছিলেন?** (জ্ঞান)
ক) জেনারেল মনরো খ) জেনারেল যশোবন্ত
গ) জেনারেল খুশবন্ত ঘ) জেনারেল নিয়াজি — ক

৩৫৫. **আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন কে?** (জ্ঞান) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]
ক) সফিউর রহমান খ) একে খন্দকার
গ) মেজর শওকত আলী ঘ) এমএজি ওসমানী — খ

Teachingbd.com

৩৫৬. মুক্তিযুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক কে ছিলেন? (জ্ঞান) [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]
ক) লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
খ) লে. জেনারেল টিক্কা খান
গ) লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী
ঘ) জেনারেল (অব.) ওসমানী — গ

৩৫৭. ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক) ৭ মার্চ খ) ৭ অক্টোবর
গ) ৭ নভেম্বর ঘ) ৭ ডিসেম্বর — ঘ

৩৫৮. ২৫ মার্চের রাত কেন বাঙালির ইতিহাসে কালরাত হিসেবে খ্যাত? (অনুধাবন)
ক) ঐ রাতে অনেক অন্ধকার ছিল বিধায়
খ) ঐ রাতে অমাবস্যা ছিল বিধায়
গ) ঐ রাতে আকাশে চাঁদ ছিল না বলে
ঘ) ঐ রাতে নিরীহ বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল বলে — ঘ

৩৫৯. ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন? (অনুধাবন) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক) ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য
খ) ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জন্য
গ) মুক্তিযুদ্ধকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য
ঘ) শাসকগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে — গ

৩৬০. মুজিবনগর সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কোনটি? (অনুধাবন)
ক) সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা
খ) যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসা
গ) অস্ত্র কারখানা নির্মাণ করা
ঘ) চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা — ক

৩৬১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সার্বজনীন গণযুদ্ধ বলা হয়ে থাকে কেন? (অনুধাবন)
ক) আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় বলে
খ) ভারত মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করে বলে
গ) চীন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বলে
ঘ) যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বলে — ক

৩৬২. ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে প্রস্তাব দেন তা হলো— (অনুধাবন) [কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার]
i. সংবিধান রচনা করা
ii. ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনর্বহাল
iii. গণভোটের আয়োজন ও আইন কাঠামো তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

৩৬৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল— (অনুধাবন) [বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর]
i. অবাধ
ii. স্বাধীন
iii. নিরপেক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i,ii ও iii — ঘ

৩৬৪. স্বাধীনতা দিবসের অন্যতম গুরুত্ব হচ্ছে— (অনুধাবন)
i. পাক শোষকশ্রেণির পরাজয়
ii. বীর বাঙালির মুক্তি অর্জন
iii. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

৩৬৫. মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন) [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]
i. বঙ্গবন্ধুকে সন্তুষ্ট করা
ii. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা
iii. আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — গ

৩৬৬. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল— (অনুধাবন)
i. দক্ষিণপন্থি দল
ii. ধর্মভিত্তিক দল iii. গণতান্ত্রিক দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ক

৩৬৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী শান্তি কমিটির কাজ ছিল— (অনুধাবন) [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]
i. বাংলাদেশের আদর্শের বিরুদ্ধে প্রচারণা
ii. মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী হিসেবে উল্লেখ করা
iii. মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — গ

৩৬৮. ১৯৭১ খ্রি. বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সময় পাক হানাদারদের দোসর ছিল— (অনুধাবন)
i. রাজাকার বাহিনী ii. আলবদর বাহিনী
iii. বিহারী সম্প্রদায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

৩৬৯. ১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সময় পাক হানাদারদের দোসর ছিল— (অনুধাবন) [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]
i. রাজাকার বাহিনী ii. আলবদর বাহিনী
iii. বিহারী সম্প্রদায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

http://teachingbd.com

৩৭০. আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরের সময় যারা উপস্থিত ছিলেন? (অনুধাবন) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ]
i. জেনারেল নিয়াজি ii. এ কে খন্দকার
iii. জগজিৎ সিং অরোরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i,ii ও iii **ঘ**

৩৭১. আফজাল বলেন যে, বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল। এখানে বলা হয়েছে— (প্রয়োগ)
i. ভারতের কথা ii. নেপালের কথা
iii. রাশিয়ার কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **খ**

৩৭২. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয়ের সাথে মিল রয়েছে— (অনুধাবন)
i. সামরিক আইন প্রত্যাহার
ii. গণহত্যার তদন্ত করা
iii. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক ?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **ঘ**

৩৭৩. ১৯৬৯ সালে গঠিত নির্বাচন কমিশনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত
ii. একটি সার্বজনীন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা
iii. এ ভোটার তালিকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্ত না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৪ ও ৩৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব মুর্তজা সাহেব বলেন এই নেতার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেই আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আর প্রায় দীর্ঘ নয় মাস এই নেতার নেতৃত্বেই আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম।

৩৭৪. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন নেতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে? (প্রয়োগ)
ⓚ মওলানা ভাসানী
ⓛ শেখ মুজিবুর রহমান
ⓜ এ. কে. ফজলুল হক
ⓝ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী **খ**

৩৭৫. উক্ত নেতা অংশগ্রহণ করেছেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভাষা আন্দোলনে
ii. গণঅভ্যুত্থানে
iii. ছয়দফা আন্দোলনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৬-৩৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব রহিম স্যার বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যেই এই সরকার গঠন করা হয়েছিল। এছাড়াও স্যার বলেন যে, এ সরকার মুক্তিবাহিনী গঠন করে সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল।

৩৭৬. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ⓚ আইয়ুব সরকার
ⓛ আওয়ামী সরকার
ⓜ মুজিবনগর সরকার
ⓝ শমসেরনগর সরকার **গ**

৩৭৭. উক্ত সরকারের অন্যতম মন্ত্রণালয় ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ii. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
iii. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **ঘ**

৩৭৮. উক্ত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ক্যাপ্টেন মুনসুর আলী
ii. এ.এইচ এম কামরুজ্জামান
iii. খন্দকার মোশতাক আহমেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৯ ও ৩৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাসুদ সাহেব বলেন যে, এই দিন যুদ্ধ শেষে আমরা বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠেছিলাম। সেদিন যেন ঢাকা হয়ে উঠেছিল আনন্দপুরী। স্বাধীন দেশের কেতন যেন অবিরামভাবে উড়তে শুরু করল।

৩৭৯. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন দিবসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ⓚ ১৬ ডিসেম্বর ⓛ ২৬ মার্চ
ⓜ ২৮ মার্চ ⓝ ২১ ফেব্রুয়ারি **ক**

৩৮০. উক্ত দিবসের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়
ii. স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু
iii. বাঙালি জাতির শত্রুমুক্ত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **খ**

http://teachingbd.com